মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

আল-কুরআনে

রাষ্ট্র ও সরকার

পূর্ব-কথা

রাষ্ট্র ও সরকার মানব জীবনের দুটি অপরিহার্য বিষয়। দুনিয়ায় মানুষের স্থিতি, বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্যে রাষ্ট্র ও সরকারের অস্তিত্ব একান্তই আবশ্যক। অন্তত মানুষের সমাজবদ্ধ জীবন যে রাষ্ট্র ও সরকার ছাড়া চলতে পারে না, এ বিষয়ে প্রাচীন ও আধুনিক কালের মনীষীগণ প্রায় সকলেই একমত। তবে কোন্ ধরনের রাষ্ট্র ও সরকার মানুষের জন্যে সত্যিকারভাবে কল্যাণকর, সে বিষয়ে মনীষীদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। এই মতভেদ মানবজাতিকে শুধু নানা বর্ণ, গোত্র ও শ্রেণীতেই বিভক্ত করেনি,তাকে এক নিরন্তর সংগ্রামের মাঝেও ঠেলে দিয়েছে। এই সংগ্রামের ফলে সমাজ ও সভ্যতা বারবার ওলট-পালট হয়েছে, মানুষের জীবনে অন্তহীন দুঃখ-দুর্দশা নেমে এসেছে। মানব জাতির গোটা ইতিহাস এ সত্যেরই অকাট্য সাক্ষ্য বহন করছে। রাষ্ট্র ও সরকার যেখানে মানুষের প্রয়োজনে অস্তিত্ব লাভ করেছে, সেখানে রাষ্ট্র ও সরকারের যূপকাষ্ঠেই মানবতাকে বারবার বলি দেয়া হয়েছে। এর ফলে রাষ্ট্র ও সরকারের অস্তিত্ব বহুতর ক্ষেত্রেই মানুষের জন্যে আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপ রূপে দেখা দিয়েছে।

ইসলাম মানুষের জন্যে আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র জীবন-ব্যবস্থা। রাষ্ট্র ও সরকার এ জীবন-ব্যবস্থারও দুটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামের প্রধান উৎস আল-কুরআন মানুষকে শুধু কতিপয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, বরং মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনের জন্যেও দিয়েছে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা। এই দিক-নির্দেশনাতেই স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠেছে দেশ-কাল-নির্বিশেষে মানুষের জন্যে কল্যাণকর এবং গতিশীল রাষ্ট্র ও সরকারের এক অনবদ্য চিত্র। ইসলাম-নির্দেশিত এই রাষ্ট্র ও সরকার কোন অবাস্তব কল্পনা-বিলাস নয়, বিশ্ববাসী এর বাস্তব নমুনা প্রত্যক্ষ করেছে সুদীর্ঘকাল ধরে। প্রকৃতপক্ষে এই রাষ্ট্র ও সরকারই যে মানব জাতির জন্যে অফুরন্ত আশীর্বাদ বয়ে আনতে সক্ষম, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তারও সাক্ষ্য-প্রমাণ লিপিবদ্ধ রয়েছে স্বর্ণাক্ষরে।

বর্তমান শতকের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক হযরত আল্লামা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) ইসলামের নির্দেশিত এই রাষ্ট্র ও সরকারেরই এক সুবিস্তৃত চিত্র এঁকেছেন তাঁর 'আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার' গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তিনি ইসলামের রাষ্ট ও সরকার বিষয়ক ধ্যান-ধারণাকে উপস্থাপন করেছেন প্রধানতঃ কুরআনের প্রাসঙ্গিক আয়াত ও বক্তব্যের আলোকে। এর ফলে

কুরআনের বিষয়-ভিত্তিক তফসীর রচনার ক্ষেত্রেও একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। তবে এই গ্রন্থে স্বীয় বক্তব্য উপস্থাপনে গ্রন্থকার শুধু কুরআনের প্রাসঙ্গিক আয়াতসমূহই উদ্ধৃত করেননি, সেসবের ব্যাখ্যায় মযহাব নির্বিশেষে প্রাচীন ও আধুনিক কালের বিশিষ্ট মুফাসসিরদের অভিমতসমূহও তিনি উল্লেখ করেছেন অত্যন্ত কুশলতার সাথে। এর ফলে ইসলামের রাষ্ট্র ও সরকার সম্পর্কে সকল মযহাবের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি অভিন্ন চিত্র ফুটে উঠেছে এই গ্রন্থে।

এই সুবৃহৎ গ্রন্থটি ১৯৮৫ সালে রচিত হলেও এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালের ১লা অক্টোবর—গ্রন্থকারের প্রথম স্মৃতি বার্ষিকীতে। গ্রন্থটি পাঠক মহলে বিপুলভাবে সমাদৃত হয় এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই এর সমুদয় কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। বর্তমানে মুদ্রণ সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির মাঝে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে এর অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ পারিপাট্যও বহুলাংশে উন্নত হচ্ছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, গ্রন্থটির এই সংস্করণ পাঠক মহলে অধিকতর সমাদর লাভ করবে।

মহান আল্লাহ্ গ্রন্থকারের এই অনন্য খেদমতের বদৌলতে তাঁকে জান্নাতুল ফিরদৌসে স্থান দিন, এটাই আমাদের সানুনয় প্রার্থনা।

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
চেয়ারম্যান
মওলানা আবদুর রহীম ফাউণ্ডেশন

ঢাকাঃ আগস্ট ১৯৯৫

গ্রন্থকার পরিচিতি

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) বর্তমান শতকের এক অনন্যসাধারণ ইসলামী প্রতিভা। এ শতকে যে ক'জন খ্যাতনামা মনীষী ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েমের জিহাদে নেতৃত্ব দানের পাশাপাশি লেখনীর সাহায্যে ইসলামকে একটি কালজয়ী জীবন দর্শন রূপে তুলে ধরতে পেরেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম।

এই ক্ষণজন্মা পুরুষ বাংলা ১৩২৫ সনের ৮ ফাল্গুন, (ইংরেজী ১৯১৮ সালের ২ মার্চ) সোমবার বর্তমান পিরোজপুর জিলার কাউখালী থানার অন্তর্গত শিয়ালকাঠি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সনে তিনি শর্ষীনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম এবং ১৯৪০ ও ১৯৪২ সনে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে যথাক্রমে ফাযিল ও কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সন পর্যন্ত তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণায় নিরত থাকেন। ১৯৪৬ সালে তিনি এ ভূখণ্ডে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং অত্যল্প কালের মধ্যেই একজন দক্ষ সংগঠক রূপে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) শুধু পথিকৃতই ছিলেন না, ইসলামী জীবন-দর্শনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ৬০ টিরও বেশী অতুলনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা' 'ইসলামের অর্থনীতি', 'মহাসত্যের সন্ধানে', 'বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব', 'আজকের চিন্তাধারা', 'পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি', 'কমিউনিজম ও ইসলাম', 'সুন্নাত ও বিদয়াত', 'নারী', 'ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন', 'পরিবার ও পারিবারিক জীবন', 'আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ', 'আল-কুরআনের আলোকে শিরক ও তওহীদ', 'আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার', 'বিজ্ঞান ও জীবন বিধান', 'ইসলাম ও মানবাধিকার', 'ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা', 'আল-কুরআনের আলোকে নবুয়্যাত ও রিসালাত', 'ইসলামী শরীয়াতের উৎস', 'অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম' ইত্যাকার গ্রন্থ দেশের সুধীমহলে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছে। এছাড়া অপ্রকাশিত রয়েছে তাঁর অনেক মূল্যবান পাণ্ডুলিপি।

মৌলিক ও গবেষণামূলক রচনার পাশাপাশি বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী মনীষীদের রচনাবলী বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারেও তাঁর কোন জুড়ি নেই। এসব অনুবাদের মধ্যে রয়েছে মওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর বিখ্যাত তফসীর 'তাফহীমুল কুরআন', আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী কৃত 'ইসলামের যাকাত বিধান' (দুই খণ্ড) ও 'ইসলামে হালাল-হারামের বিধান', মুহাম্মদ কুতুবের 'বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত' এবং ইমাম আবু বকর আল-জাস্সাসের ঐতিহাসিক তফসীর 'আহ্কামুল কুরআন'। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যাও ৬০টির উর্ধ্বে।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-র অন্তর্গত ফিকাহ্ একাডেমীর একমাত্র সদস্য ছিলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সূচিত 'আল-কুরআনে অর্থনীতি' এবং 'ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' শীর্ষক দুটি গবেষণা প্রকল্পেরও সদস্য ছিলেন। প্রথমোক্ত প্রকল্পের অধীনে প্রকাশিত দুটি গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ তাঁরই রচিত। শেষোক্ত প্রকল্পের অধীনে তাঁর রচিত 'সৃষ্টিতত্ত্ব ও ইতিহাস দর্শন' নামক গ্রন্থটি এখনও প্রকাশের অপেক্ষায়।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) ১৯৭৭ সনে মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন ও রাবেতা আলমে ইসলামীর সম্মেলন, ১৯৭৮ সনে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইসলামী দাওয়াত সম্মেলন, একই বছর করাচীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ইসলামী মহাসম্মেলন, ১৯৮০ সনে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত আন্তঃপার্লামেন্টারী সম্মেলন এবং ১৯৮২ সনে তেহরানে অনুষ্ঠিত ইসলামী বিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিকী উৎসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

এই যুগস্রষ্টা মনীষী বাংলা ১৩৯৪ সনের ১৪ আশ্বিন (ইংরেজী ১৯৮৭ সনের ১ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার এই নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন।

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রাথমিক আলোচনা

[রাষ্ট্র ও সরকার তথা প্রশাসন ব্যবস্থার স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা—রাসূলে করীম (স) ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা—ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় রাসূলে করীম (স)-এর তৎপরতা—রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ইসলামেরই ঐকান্তিক দাবি—রাষ্ট্র ও সরকারের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকারের কারণ—রাষ্ট্রের অপ্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে চারটি মত—কুরআনের দৃষ্টিতে ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের রূপরেখা—অত্যাচারী সরকার—সরকারের প্রতি জনগণের কর্তব্য।]

রাষ্ট্র ও সরকার তথা প্রশাসন ব্যবস্থার স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান সময় দুনিয়ার মুসলমানদের মনে-মগজে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কামনা-বাসনা প্রবল হয়ে উঠেছে। যে দেশেই মুসলমান বাস করে, তারা যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থা কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রাণ-মন দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং সেজন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ তাঁদের নিকট অপরিহার্য বিবেচিত হয়েছে, সে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে তাঁরা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হচ্ছে না।

বস্তুত সাধারণভাবে মানব জীবনে এবং বিশেষভাবে মুসলিম সমাজে একটি রাষ্ট্র—তথা প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এ প্রয়োজনীয়তা বোধ কেবল আধুনিক কালেরই সৃষ্ট নয়, প্রাচীনতম কাল থেকেই এর প্রয়োজনীয়তা সর্বস্তরের মানুষের নিকট তীব্রভাবে অনুভূত। প্রাচীন ইতিহাসের দার্শনিক চিন্তাবিদগণও এ বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক ও গভীর চিন্তা, বিবেচনা ও আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন।

এ্যারিস্টটল প্রাচীনকালের একজন উল্লেখযোগ্য দার্শনিক ব্যক্তিত্ব। তিনি বলেছেনঃ

> রাষ্ট্র একটি স্বভাবগত কার্যক্রম। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক। যে মানুষ সমাজ-বহির্ভূত জীবন যাপন করে, যার জীবন কোন নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন নয়—নিঃসন্দেহে বলা যায়, সে হয় মানবেতর জীব, না হয় মানব-প্রজাতি ঊর্ধ্ব কোন সত্তা।[১]

এ্যারিস্টটল-এর মতে রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা একটি স্বাভাবিক প্রয়োজন। মানুষের প্রকৃতিই তার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করে। শুধু তা-ই নয়, যে

১. রাজনীতি

লোক রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রয়োজন বোধ করে না, তার দৃষ্টিতে সে হয় মানবেতর জীব, না হয় মানব প্রজাতিরও উর্ধ্বের কোন সত্তা, যার মধ্যে মানবীয় প্রকৃতির কোন অস্তিত্ব নেই।

প্লেটোও প্রাচীন প্রখ্যাত দার্শনিকদের একজন। তিনি মনে করেনঃ

> রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনতা ব্যতিরেকে উন্নত মানের জীবন লাভ করা কোন ব্যক্তির পক্ষে অকল্পনীয়। কেননা মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে রাজনীতি—তথা রাষ্ট্রীয় তৎপরতার দিকে। মানুষ তার এ স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে কখনো মুক্ত হতে পরে না।[১]

ইতিহাস-দার্শনিক আল্লামা ইবনে খালদূন মানব-সমাজের অপরিহার্য প্রয়োজনের দৃষ্টিতেই রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অকাট্য যুক্তির ভিত্তিতে প্রমাণিত করেছেন। আর এই দৃষ্টিতেই তিনি দার্শনিক পরিভাষায় বলেছেনঃ 'মানুষ স্বভাবতই সামাজিক'। শেষ পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্র ও সরকার উদ্ভাবনের পক্ষে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।[২]

একালের চিন্তাবিদগণও এ ব্যাপারে কোন উপেক্ষাই প্রদর্শন করেননি। সারওয়াত বদাভী লিখেছেনঃ

> রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রথম কাঠামোই হচ্ছে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। বরং সমাজের প্রত্যেক রাজনৈতিক সংগঠন-সংস্থাই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অপরিহার্য করে তোলে। অনেকে তো রাজনীতির বাস্তবতা রাষ্ট্রীয় চিন্তায় খুঁজে বেড়িয়েছেন এবং রাষ্ট্র ব্যতীত সামষ্টিক রাজনীতির কোন পরিচয় মেনে নিতে তাঁরা প্রস্তুত নন।[৩]

ইসলাম অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে মানব জীবনে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা বাধ্যতামূলক বলে পেশ করেছেন। স্বয়ং রাসূলে করীম (স)-এর জীবন বৃত্তান্তও সেই প্রয়োজনীয়তাকে অত্যধিক প্রকট করে তুলেছে। রাসূলে করীম (স)-এর জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই এ ব্যাপারের যাবতীয় শোবাহ্-সন্দেহ কর্পূরের মতই উবে যেতে বাধ্য হয়।

রাসূলে করীম (স) ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা

রাসূলে করীম (স)-এর জীবনেতিহাস অধ্যয়ন করলেই জানতে পারা যায়, তিনি মদীনায় উপস্থিত হয়েই একটি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন

---

১. গণপ্রজাতন্ত্র

২. ইবনে খালদূনের ইতিহাসের ভূমিকা

৩. النظم السياسية

করেছিলেন। একজন রাষ্ট্রপ্রধান বা রাষ্ট্র পরিচালকের ন্যায় তিনি যাবতীয় রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। তিনি যুদ্ধকালে একটি সুসংবদ্ধ সৈন্যবাহিনী গঠন করেছেন। বিভিন্ন গোত্রপতি বা রাষ্ট্র-প্রধানদের সাথে নানা ধরনের চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছেন। অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুষ্ঠুরূপে গড়ে তুলেছেন ও পরিচালনা করেছেন। সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। এক-একটি সুসংগঠিত সমাজ পরিচালনার জন্য যা যা করা অপরিহার্য, তিনি তার প্রত্যেকটি কাজই সুষ্ঠুরূপে আঞ্জাম দিয়েছেন। বিচার বিভাগ সুসংগঠিত করে তার সুষ্ঠু পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর নির্মিত মসজিদই ছিল এই সমস্ত কাজের কেন্দ্রস্থান। রাষ্ট্র-প্রধান হিসেবে তিনি যাবতীয় দায়িত্ব এই মসজিদেই পালন করেছেন। রাষ্ট্রীয় ফরমান জারি করেছেন। বিভিন্ন গোত্র প্রধান ও রাষ্ট্র-প্রধানের নিকট রাষ্ট্রীয় পত্রাদিও প্রেরণ করেছেন । সে পত্রাদি যেমন আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট পাঠিয়েছেন, তেমনি তার বাইরের ব্যক্তিদের নিকটও।

তিনি যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তিনি নিজেই সে রাষ্ট্রটি ক্রমাগতভাবে দশটি বছর পর্যন্ত পরিচালনা করেছেন। তাঁর অন্তর্ধানের পরও সেই রাষ্ট্র শুধু টিকে থাকে তা-ই নয়, তা ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয় ও পর্যায়ে পর্যায়ে উত্তরোত্তর উন্নতি-অগ্রগতিও লাভ করে–প্রবল শক্তি ও ক্ষমতাও অর্জন করে। ফলে তার রূপায়ণ সম্পূর্ণতা পায়–যদিও তার নিজের হাতেই তার পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল।

রাসূলে করীম (স)-এর জীবনেতিহাস বিশ্লেষণ করলেই জানতে পারা যায়, তিনি নবুয়্যাত লাভ করার পরই একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও সরকার গঠনের জন্য চেষ্টানুবর্তী হয়েছিলেন। কার্যত তিনি তা করেছিলেনও। তবে তা দুটি পর্যায়ে সুসম্পন্ন হয়। তার প্রথম পর্যায় ছিল মক্কায় এবং দ্বিতীয় পর্যায় মদীনা তাইয়্যেবায়।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় রাসূলে করীম (স)-এর তৎপরতা

মক্কায় নবুয়্যাত লাভের পরবর্তীকালে তাঁর দাওয়াত প্রকাশ্যভাবে লোকদের নিকট পৌঁছাবার জন্য আদিষ্ট না হওয়া কালে–বলা যায়–একটি গোপন দল গড়ে তুলেছিলেন (অনেকেই হয়ত এ ব্যাখ্যা পছন্দ করবেন না)। তখন তিনি তাঁর উপস্থাপিত আদর্শের ভিত্তিতে আদর্শবাদী ব্যক্তি গঠনের কাজ সমাধা করেছেন। সেই পর্যায়ে ঈমান গ্রহণকারী লোকদের পরস্পরে গভীর যোগাযোগ ও অত্যন্ত প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। অত্যন্ত গোপনে তাদের পরস্পরে

দেখা-সাক্ষাৎ ও ইসলামী জ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। আরকাম (রা)-এর ঘরই ছিল সেই সময়ের গোপন মিলনকেন্দ্র।

পরে তাঁর প্রতি যখন (الحجر : ٩٤) فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ 'তোমাকে যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে তা তুমি চতুর্দিকে ব্যাপকভাবে প্রচার করে দাও', নাযিল হল, তখন তিনি বিভিন্ন গোত্রপ্রধান ও মক্কায় বাইরে থেকে আগত বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের সরদারকে আহবান জানালেন দ্বীন-ইসলাম কবুল করার জন্য এবং তার গঠিত দলে শমিল হয়ে যাওয়ার জন্য। তিনি ঘোষিত আল্লাহ্‌র হুকুমাত কায়েম করার লক্ষ্যে নানা দিক থেকে মক্কায় আসা কোন কোন প্রতিনিধি দলের বায়'আত গ্রহণ করলেন এবং তাঁর এই মহান লক্ষ্যে তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন। এভাবে আকাবা'র প্রথম ও দ্বিতীয় 'বায়'আত' সম্পন্ন হয়।[১]

পরে তিনি মদীনায় হিজরাত করে গেলেন। সেখানে স্বাধীন-উন্মুক্ত পরিবেশে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেন। প্রথমে তিনি মুহাজির ও আনসার-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেন। তা-ই ছিল ইসলামী সমাজ-সংস্থার প্রথম প্রতিষ্ঠা। আর মসজিদ কায়েম করলেন মুসলিম উম্মতের একত্রিত হওয়ার কেন্দ্র হিসেবে। এই মসজিদে যেমন জামা'আতের সাথে সালাত কায়েম করা হতো, তেমনি ইসলামী সমাজ রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দেয়া হত।

এতদ্ব্যতীত তিনি একটি ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে করণীয় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজও সম্পন্ন করেন। এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি বড় বড় কাজের উল্লেখ করা যাচ্ছেঃ

১. তিনি তাঁর সাহাবী ও মদীনায় বসবাসকারী ইয়াহুদী প্রভৃতি গোত্র বা জনগোষ্ঠীর সাথে একত্বের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ইতিহাসে তা-ই ইসলামী হুকুমাতের 'প্রথম লিখিত সংবিধান' নামে পরিচিত ও খ্যাত। (এ সংবিধানের ধারাসমূহ পরে উল্লেখ করা হবে।)

২. তিনি এ মসজিদ থেকেই সেনাবাহিনী ও সামরিক গোষ্ঠী উপদ্বীপের বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করেছেন। তিনি মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত করেছেন এবং কার্যত তা করেছেনও। তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। শত্রুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করার নানা পন্থা অবলম্বন করেছেন। ঐতিহাসিকগণের হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে যে, রাসূলে করীম (স) তাঁর মদীনীয় জিন্দেগীর দশটি বছরে আশিটি যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন।

---

১. السيرت النبو يت ج :١ ص : ٤٣١

৩. মদীনায় স্থিতি লাভ এবং মক্কার দিক থেকে আক্রমণের ভয় তিরোহিত হলে উপদ্বীপের বাইরের দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ করেছেন। যে যে এলাকায় দাওয়াত তখন পর্যন্ত পৌছেনি, সেই সব এলাকায় দ্বীনের তওহীদী দাওয়াত পৌছাবার ব্যবস্থা করলেন। এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন, যার ফলে নিকট ও দূরের সকল লোকের নিকট এই দাওয়াত পৌছে যায়। তিনি বিভিন্ন গোত্রপতি, রাষ্ট্রপ্রধান ও শাসকদের নিকট সরাসরি পত্র পাঠিয়ে তওহীদী দাওয়াত কবুলের বলিষ্ঠ আহবান জানালেন। তাঁর এ প্রতিষ্ঠিত হুকুমাতে ইলাহীয়ার অধীন শামিল হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিলেন।

তিনি পত্র পাঠালেন রোমান সম্রাট কাইজারের নিকট।

মিসরের কিবতী প্রধান মুকাউকাসের নিকট।

হাবশার বাদশাহ নাজাশীর নিকট।

এ ছাড়া সিরিয়া ও ইয়ামনের বড় বড় নেতা ও রাজন্যবর্গের নিকট, গোত্রপতি ও রাজা-বাদশাহদের নিকটও অনুরূপ পত্র পাঠালেন।

তাদের অনেকের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হলো, সামরিক ও রাজনৈতিক মৈত্রী স্থাপিত হলো, অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়ীক আদান প্রদানের ব্যবস্থা সাব্যস্ত করা হলো।

আজদ ও আম্মানের রাজার নামে লিখিত পত্রে তিনি যা লিখেছিলেন, তা এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছেঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ سَلاَمٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى، اَمَّا بَعْدُ، فَاِنِّىْ اَدْعُوكُمْ
بِدُعَايَةِ الْاِسْلاَمِ اَسْلِمَا تَسْلِمَا، اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً لِاُنْذِرَ مَنْ كَانَ
حَيًّا. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ. اِنَّكُمَا اِنْ اَقْرَرْتُمَا بِالْاِسْلاَمِ وَلَّيْتُكُمَا وَاِنْ اَبَيْتُمَا
اَنْ تَقِرَّا بِالْاِسْلاَمِ فَاِنَّ مُلْكَكُمَا زَائِلٌ عَنْكُمَا وَخَيْلِىْ تَحُلُّ بِسَاحَتِكُمَا وَتَظْهَرُ نُبُوَّتِىْ
عَلٰى مُلْكِكُمَا.

মহা দয়াময় ও অসীম করুণাশীল আল্লাহর নামে। শান্তি বর্ষিত হোক তার উপর, যে ইসলামের হেদায়েতকে অনুসরণ করেছে। অতঃপর আমি তোমাদেরকে ইসলামের আহবান অনুযায়ী আহবান করছি। তোমরা দু'জন ইসলাম কবুল কর, তাহলে দু'জনই রক্ষা পেয়ে যাবে। আমি সমগ্র মানবতার প্রতি আল্লাহর রাসূল, যেন আমি সব জীবনধারী মানুষকেই পরকাল সম্পর্কে

সতর্ক করতে পারি এবং কাফিরদের সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা তাদের উপর বাস্তবায়িত হয়। তোমরা দু'জন যদি ইসলামকে স্বীকার করে নাও তাহলে আমিই তোমাদেরকে ক্ষমতাসীন করে দেব, আর তোমরা যদি ইসলামকে মেনে নিতেই অস্বীকার কর, তাহলে তোমাদের দু'জনের রাজত্ব তোমাদের হাত থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। আর আমার অশ্ব তোমাদের দু'জনার আঙ্গিনায় উপস্থিত হবে ও দখল করে নেবে এবং তোমাদের দু'জনার দেশের উপর আমার নবুয়্যাত প্রকাশিত, বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।[১]

আরব উপদ্বীপেরই এক অঞ্চলের শাসক রাফা'আত ইবনে জায়দ আল-জুজামীকে লিখিত পত্রে এইরূপ লেখা হয়েছিলঃ

بسم الله الرّحمن الرّحيم. هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد. انى قد بعثة الى قومه عامة ومن دخل فيهم يدعوهم الى الله ورسوله فمن اقبل منهم ففى حزب الله وحزب رسول ومن دابر فله امان شهرين -

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে রাফা'আ ইবনে জায়দের প্রতি! আমি সেই ব্যক্তি, যাকে সাধারণভাবে তার সমস্ত জনগণের প্রতি প্রেরিত হয়েছে, তাদের প্রতিও যারা তাদের মধ্যে শামিল হবে। তিনি তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আহবান জানাচ্ছেন। লোকদের মধ্য থেকে যারাই সে দাওয়াত কবুল করবে, সে আল্লাহ্‌র দল ও রাসূলের দলের মধ্যে গণ্য হবে। আর যে তা গ্রহণ করতে পশ্চাদপদ হবে, তার জন্য মাত্র দুই মাসের নিরাপত্তা।[২]

নাজরান-এর বিশপের নিকট প্রেরিত পত্রে লিখিত হয়েছিলঃ

بسم الله ابراهيم واسحاق ويعقوب، من محمد النبى رسول الله الى اسقف نجران، اسلم انتم (اى انتم سالمون اذا اسلمتم) فانى احمد الله اليكم اله ابراهيم واسحاق ويعقوب - اما بعد، فانى ادعوكم الى عبادة الله من عبادة العباد وادعوكم الى ولاية الله من ولا ية العباد فان ابيتم فالجزية وان ابيتم اذنتكم بحرب والسلام -

ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের আল্লাহ্‌র নামে—আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদের নিকট থেকে নাজরানের বিশপের নিকট এই পত্র প্রেরিত হল। তোমরা

---

১. السيرة الحلبية ج: ٣، ص: ٢٨٤، المواهب الدنية ج: ٢، ص: ٤٤٠، مكاتب الرسول ص: ١٤٧

২. السيرة الدحلية على هاش السيرة الحلبية ج: ٣، ص: ١٣١

> ইসলাম গ্রহণ করে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ কর। আমি আল্লাহ্র হাম্দ করছি তোমাদের নিকট, যিনি ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের ইলাহ্। অতঃপর, আমি বান্দাদের দাসত্ব পরিহার করে আল্লাহ্র দাসত্ব কবুল করার জন্য তোমাদেরকে আহবান জানাচ্ছি। তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি বান্দাদের বন্ধুত্ব-কর্তৃত্ব-পৃষ্ঠপোষকতা পরিহার করে আল্লাহ্র বন্ধুত্ব-কর্তৃত্ব-পৃষ্ঠপোষকতা মেনে নেয়ার জন্য। তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে তোমাদেরকে জিযিয়া দিতে রাযী হতে হবে। আর তা দিতেও অস্বীকার করলে আমি তোমাদেরকে যুদ্ধের আগাম জানান দিচ্ছি.....শান্তি.....।

৪. রাসূলে করীম (স) রাষ্ট্রীয় দূত ও রাজনৈতিক প্রতিনিধি দল বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদের ও বড় বড় রাজন্যবর্গের নিকট পাঠিয়েছেন। এ পর্যায়ে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেনঃ

> এভাবে দূত পাঠানো ও চিঠিপত্র প্রেরণ তদানীন্তন সময়ের প্রেক্ষিতে এক সম্পূর্ণ অভিনব কূটনৈতিক কার্যক্রম ছিল। বরং সত্য কথা হচ্ছে ইসলামই এ ক্ষেত্রে এরূপ কার্যক্রম সর্বপ্রথম শুরু করেছে।

রাসূলে করীম (স) তাঁর সময়ের বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ-শাসক ও রাজন্যবর্গের প্রতি এই বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ কূটনৈতিক কার্যক্রম সর্বতোভাবে নিষ্ফল যায়নি, যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি।[১]

৫. রাসূলে করীম (স) বিচারপতি নিয়োজিত করেছিলেন, বিভিন্ন এলাকায় শাসক নিয়োগ করেছিলেন। তিনি তাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক ও পলিসিগত কার্যসূচীও প্রদান করেছিলেন। তাদেরকে ইসলামী বিধান ও আইন-কানুনের ব্যাপক শিক্ষাদান করেছিলেন। ইসলাম উপস্থাপিত নৈতিক আদর্শ ও রীতিনীতি সম্পর্কে—যা কুরআনের মৌল শিক্ষা—তাদেরকে পূর্ণ মাত্রায় অবহিত করেছিলেন। যাকাত ও অন্যান্য সরকারী করসমূহ আদায় করা ও তা পাওয়ার যোগ্য অধিকারী লোকদের মধ্যে যথাযথ বন্টনের নিয়মাদি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করে তুলেছিলেন। এক কথায় যাবতীয় জনকল্যাণমূলক কাজের প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজ নিজ দায়িত্বে বসিয়েছিলেন। লোকদের মধ্যে বিবাদ মীমাংসার, তাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধানের এবং জুলুম ও সীমালংঘনমূলক কার্যক্রমের বিচার পদ্ধতি শিক্ষাদান করেছিলেন।

এ পর্যায়ে চূড়ান্ত কথা হচ্ছে, আধুনিক কালের রাষ্ট্রনেতা ও শাসন-কর্তৃপক্ষকে প্রতিষ্ঠানগতভাবে যে যে কাজ করতে হয়, নবী করীম (স) সেই সব কাজই করেছেন। কিন্তু তা তিনি করেছেন নিজের ইচ্ছা মত নয়, বরং আল্লাহ্ তা'আলার

---

১. مواقف حاسمة فى تاريخ الاسلام ص ٢٠٨

হেদায়েত ও নির্দেশ অনুযায়ী। তিনি যেমন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করতেন, প্রয়োজনে পদচ্যুতও করতেন। বিভিন্ন লোকদের নিটক পত্র প্রেরণও করতেন। চুক্তি স্বাক্ষর করতেন। রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর ও সীলমোহরও লাগাতেন। এই সব কাজই তিনি সম্পন্ন করতেন ইসলামী কল্যাণের দৃষ্টিতে, সামষ্টিক কল্যাণের জন্য এবং রাষ্ট্রশক্তির বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

কুরআন মজীদের সূরা আল-আনফাল, আত-তওবা ও সূরা মুহাম্মাদ গভীর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করলেই লক্ষ্য করা যায়, তাতে ইসলামী হুকুমাতের রাজনৈতিক কর্মধারা ও কার্যসূচী, দায়িত্ব, কর্তব্য ইত্যাদির মৌল নীতিসমূহ উপস্থাপিত হয়েছে। সূরা আল-মায়েদায়ও এ পর্যায়ের বহু বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। অনৈসলামী সমাজ-সমষ্টির সাথে কার্যক্রমের নীতি, জিহাদ, প্রতিরক্ষা ও ইসলামী ঐক্য একত্ব রক্ষার যাবতীয় বিধান বলে দেয়া হয়েছে। কেননা একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য এসব বিধান একান্তই অপরিহার্য। কুরআন মজীদে ইসলামী রাষ্ট্র সংক্রান্ত সকল প্রয়োজনীয় বিধান দেয়া হয়েছে, কুরআনের একনিষ্ঠ কোন পাঠকই তা অস্বীকার করতে পারবেন না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলে করীম (স)-ই হচ্ছেন প্রথম ইসলামী হুকুমাতের প্রতিষ্ঠাতা। আর তিনি যে রাষ্ট্র ও হুকুমাতের ব্যবস্থা কার্যকর করেছিলেন, তা যেমন সর্বোত্তম, তেমনি তা-ই দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

একালে রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনেক রূপান্তর ঘটেছে, তার মূল কান্ড থেকে অনেক নতুন শাখা-প্রশাখাও উদ্ভাবিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। অনেক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ নতুন গড়ে উঠেছে। কিন্তু রাসূলে করীম (স) প্রতিষ্ঠিত সরকারযন্ত্র ও প্রতিষ্ঠান আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থারই প্রতিভূ, তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। সেই সময়ের প্রয়োজনের দৃষ্টিতে কোন ক্ষেত্রেই একবিন্দু কমতি ছিল না তাতে।

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ইসলামেরই ঐকান্তিক দাবি

এই সব কথা নবী জীবন-চরিত ছাড়াও সীরাতে ইবনে হিশাম, তারীখে তাবারী, জজরীর তারীখুল কামিল, সূফীদের আল-ইরশাদ ও আরবেলীর কাশফুল গুম্মাহ প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক কালে লিখিত ইতিহাস গ্রন্থ থেকে নিঃসন্দেহে জানা যায়।

এছাড়া মূল দ্বীন-ইসলামের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেও জানা যায় যে, ইসলামের মৌল বিধান ও নিয়ম-পদ্ধতি এই ধরনেরই এক পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। অন্যথায় তা কখনই বাস্তবায়িত হতে পারে না। দুটি দিক দিয়ে তার বিবেচনা করা চলেঃ

প্রথমঃ ইসলাম কুরআন-সুন্নাতের অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে ইসলামের অনুসারী ও বিশ্বাসীদের ঐক্য ও একাত্মতা একান্তই অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেছে। তাদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, পরস্পর সম্পর্কহীন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া ও পরস্পর মতপার্থক্যে লিপ্ত হওয়ার থেকে অত্যন্ত বলিষ্ঠতা সহকারে নিষেধ করেছে। ফলে ইসলাম সম্পর্কে একথা সকলেরই জানা হয়ে আছে যে, ইসলামের ভিত্তি দুটি কালেমার উপর প্রতিষ্ঠিতঃ তওহীদের কালেমা (ঐক্যের বাণী) ও কালেমা'র তওহীদ (বানীর একতা)। কুরআন মজীদ উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (الانعام: ١٥٣)

জেনে রাখবে, এটাই আমার সুদৃঢ় ঋজু পথ। অতএব তোমরা সকলে এ পথ অনুসরণ করেই চলতে থাক। নানা পথ (তোমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত; কিন্তু) তোমরা তা অনুসরণ করো না। করতে গেলে সে পথসমূহ তোমাদেরকে এই সঠিক দৃঢ় পথকে বিচ্ছিন্ন করে বিভিন্ন দিকে নিয়ে যাবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর প্রদর্শিত পথ-ই অনুসরণ করবার নির্দেশ দিয়েছেন এই আশায় যে, তোমরা সেই বিভিন্ন পথ থেকে বাঁচতে পারবে।

বলেছেনঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا - وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا (ال عمران: ١٠٣)

তোমরা সকলে মিলিত হয়ে শক্ত করে আঁকড়ে ধর আল্লাহর রজ্জু এবং তোমরা পরস্পর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হবে না। আর তোমরা সকলে তোমাদের প্রতি আল্লাহর সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, তোমরা যখন পরস্পরের শত্রু ছিলে তখন আল্লাহ-ই তোমাদের দিনগুলিকে পরস্পর মিলিত ও প্রীতিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন। ফলে তোমরা তাঁরই মহা অনুগ্রহে পরস্পর ভাই হয়ে গিয়েছিলে।

বলেছেনঃ

وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ - اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (الانفال: ٦٣)

আর আল্লাহ্ই তাদের দিলসমূহের মধ্যে বন্ধুত্ব-প্রীতির সৃষ্টি করে দিয়েছেন। হে নবী! তুমি যদি দুনিয়ার সব কিছু ব্যয়ও কর, তবু তাদের দিলসমূহের

মধ্যে সেই মিল ও প্রীতি সৃষ্টি করতে পারবে না, কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে সেই প্রীতি-বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছেন। বস্তুত তিনিই সর্বজয়ী মহাশক্তিমান সুবিজ্ঞানী।

এসব আয়াতে দুটি কথা স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। একটি এই যে, মুসলমানরা পূর্বে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ ও প্রীতি-বন্ধুত্ব সম্পন্ন ছিল না, আল্লাহ্ তা'আলাই তা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এটা আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশেষ অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আল্লাহ মুসলমানদের দিলে এই প্রেম-প্রীতি বন্ধুত্ব জাগিয়ে দিয়েছেন তাঁর বিধানের ভিত্তিতে। এই বিধানের প্রতি সকলের গভীর ঈমান গ্রহণের ফলেই তা সম্ভবপর হয়েছে। তা কোন বস্তুগত জিনিসের বা অর্থ সম্পদ ব্যয়ের ফলে হয়নি। সারা দুনিয়ার সকল সম্পদ ব্যয় করেও নবী (স) নিজে তা সৃষ্টি করতে পারতেন না। আল্লাহ্র সে বিধান হচ্ছে তওহীদের বিধান। আর তা-ই ইসলামের সারকথা—তা-ই ইসলামের চরম লক্ষ্য।

এক কথায় ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে মুসলিম উম্মতের ঐক্য ও একাত্মতা।

এ কথারই ব্যাখ্যা করে নবী করীম (স) নিজের ভাষায় বলেছেনঃ

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ الْمَرْصُوصِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ـ

(المسند : ج ٤، اصحاب الصحاح والسنن)

একজন মু'মিনের সাথে অপর মু'মিনের সম্পর্কের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সীসাঢালা সুদৃঢ় প্রাচীরের মত। একজন অপর জনকে শক্ত ও দৃঢ় করে।

মুসলমানদের এ ঐক্যবদ্ধ সামষ্টিক জীবন দুর্গের ন্যায় সুরক্ষিত রাখা আবশ্যক। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

مَنْ اَتَاكُمْ وَاَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلٰى رَجُلٍ وَّاحِدٍ يُرِيدُ اَنْ يَّشُقَّ عَصَاكُمْ اَوْيُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ (مسلم)

তোমরা যখন এক ব্যক্তির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ, তখন যদি কোন লোক তোমাদের অসিকে চূর্ণ করতে কিংবা তোমাদের সংঘবদ্ধতাকে ছিন্ন ভিন্ন করতে চেষ্টিত হয়, তাহলে তোমরা সকলে মিলে তাকে হত্যা কর।

কুরআন ও হাদীস—ইসলামের এই মৌল উৎস উম্মতে মুসলিমার যে ঐক্য ও একাত্মতার বলিষ্ঠ তাকীদ করছে, নিজেদের মধ্যে পূর্ণ শৃঙ্খলাবদ্ধতা ও গভীর একাত্মতা সৃষ্টি করার জোর তাকীদ জানাচ্ছে, কোনক্রমেই প্রতিষ্ঠিত ঐক্য ও

একাত্মতা চূর্ণ করতে বা চূর্ণ করার সুযোগ দিতেও নিষেধ করা হয়েছে। এমনকি কোন লোক সেই ঐক্যকে চূর্ণ করার চেষ্টা করলে তাকে সকলে মিলে হত্যা করতে পর্যন্ত স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তা বাস্তবে কি করে সম্ভব হতে পারে? সকলেই স্বীকার করবেন যে, তা সম্ভব হতে পারে কেবলমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে। অন্যথায় এ কাজ কখনই বাস্তবে সম্ভব হতে পারে না। একটি রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব বিভিন্ন লোকের মধ্যে মতের ঐক্য সৃষ্টি করা ইসলামী আদর্শ সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে। ইসলামী রাষ্ট্রই পারে সকল নাগরিকের সমান মানের কল্যাণ বিধানের মাধ্যমে তাদের মধ্যে পরম একাত্মতা সৃষ্টি করতে, পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করতে, বিভ্রান্ত ও বিচ্ছিন্নতাকারীকে ঐক্যের দিকে ফিরিয়ে আনতে ও পুনরায় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে।

মোটকথা, রাষ্ট্রই হচ্ছে ঐক্য সৃষ্টিকারী, ঐক্য রক্ষাকারী, ঐক্য বিরোধী তৎপরতা প্রতিরোধকারী, পারস্পরিক মতবিরোধ ও পার্থক্য বিদূরণকারী।

দ্বিতীয়ঃ নাগরিকদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক অধিকার, অর্থনৈতিক ন্যায্য প্রাপ্য পর্যায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ইসলামের আইন-বিধানসমূহ অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করলেও বোঝা যায় যে, এ সবের প্রকৃতিই একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার দাবিদার।

ইসলাম জিহাদের আহবান জানিয়েছে, প্রতিরক্ষার পূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণের স্পষ্ট বলিষ্ঠ নির্দেশ দিয়েছে, হদ্দসমূহ কার্যকর করার হুকুম দিয়েছে, অপরাধের শাস্তি বিধান করেছে ও তা প্রয়োজন অনুযায়ী প্রয়োগ করার হুকুম দিয়েছে অপরাধীদের উপর, মজলুমের প্রতি ইনসাফ করার আহবান জানিয়েছে, জালিমকে প্রতিরোধ করতে বলেছে এবং অর্থ ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বিধানও উপস্থাপিত করেছে।

এ সবের প্রতি লক্ষ্য দিলে এতে আর কোনই সংশয় থাকতে পারে না যে, আল্লাহ তা'আলা এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করতে বলেছেন, যা এই সব আইন-বিধান-নির্দেশ পুরাপুরি ও যথাযথভাবে কার্যকর করবে।

কেননা ইসলাম তো অন্তঃসারশূন্য দোয়া-তাবিজ বা দাবি-দাওয়ার ধর্ম নয়। বিউগল বাজানো বা নিছক ব্যক্তিগতভাবে পালনীয় কতগুলি সওয়াব কামাই করার বিধান নয়। ব্যক্তির ব্যক্তিগতভাবে নিজের ঘরে বা উপাসনালয়ে পালন করার কোন ধর্ম নয়। ইসলাম তো এক পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অধিকার প্রতিষ্ঠার বিধান—সে অধিকার ব্যক্তির যেমন, তেমনি সমষ্টিরও। তা ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ। এই পর্যায়ে যে সব আইন-কানুন ও বিধি-বিধান এসেছে, তা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, এ সবের রচয়িতা ও নাযিলকারী মহান আল্লাহ্ তাঁর ও তাঁর বিধানের প্রতি ঈমানদার লোকদের জন্য এ সবের

বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি সক্ষম ও শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। যেহেতু এ ধরনের আইন বিধান দেয়া ও তার বাস্তবায়নের একমাত্র উপায় রাষ্ট্র। তাই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নির্দেশ না দেয়া খুবই হাস্যকর ব্যাপার, যা আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রয়োগ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কাউকে গাছ কাটতে বলা অথচ গাছ কাটার জন্য একমাত্র হাতিয়ার কুঠার না দেয়ার মত বোকামী দুনিয়ার মানুষ করলেও করতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্ সম্পর্কে তা ভাবাও যায় না।

বস্তুত সৃষ্টিলোকের জীবন ও স্থিতি যে কয়টি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, আদেশ ও নিষেধ হচ্ছে তন্মধ্যে প্রধান বিষয়। আদেশ, যেমন আল্লাহ্ বলেছেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ (الانفال: ٢٤)

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আহ্বানের সাড়া দাও যখন তোমাদেরকে তোমাদের জীবনদায়িনী বিষয়ের দিকে ডাকবেন।

এ আহ্বান তো আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ ও নিষেধে পর্যবসিত।

বলেছেনঃ

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاُولِى الْاَلْبَابِ- (البقرة: ١٧٩)

হে বুদ্ধিমান লোকেরা! কিসাসে তোমাদের জীবন নিহিত।

এ আয়াতে ভালো কাজের আদেশ হত্যাকারীর কিসাস করায় প্রতিবিম্বিত, যা জীবনের উৎস।

এসব আয়াত দ্বারা যদি আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধই জীবনের উৎস প্রমাণিত হয়, তাহলে জনগণের জন্য এমন একজন সর্বজনমান্য ইমামের প্রয়োজন, যে এই আদেশ ও নিষেধের বিধান বাস্তবে কার্যকর করবে, 'হদ্দ' সমূহ কায়েম করবে, শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, জাতীয় সম্পদ জনগণের মধ্যে বন্টন করবে। এমন কাজেই জনগণের কল্যাণ নিহিত। আর যাবতীয় ক্ষতিকর জিনিস ও কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখবে। এ কারণে 'আমর বিল মারুফ' মানব সমাজের স্থিতির অন্যতম উপায় সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা এসব না হলে কোন লোকই দুষ্কৃতি থেকে বিরত হবে না। বিপর্যয় বন্ধ হবে না। ব্যবস্থাপনাসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। আর তাহলে জনগণের ধ্বংস হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়বে। ইসলামের যাবতীয় হুকুম-আহকাম যে বাস্তবায়িত হওয়ার লক্ষ্যেই বিধিবদ্ধ হয়েছে, তা চিন্তা করলেই একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণে ইসলাম উপস্থাপিত অকাট্য দলীলসমূহ যে কত, তা গুণে শেষ করা যাবে না। সহজেই বোঝা যায়, একটা প্রশাসনিক ব্যবস্থা

ও তার একজন দায়িত্বশীল পরিচালক ব্যতীত কোন জনসমষ্টিই চলতে পারে না—বাঁচতে পারে না। বিশেষ করে দ্বীন-ইসলামের আইন-বিধানসমূহ একটি রাষ্ট্র ছাড়া কিছুতেই এবং কোনক্রমেই বাস্তবায়িত হতে পারে না। মহান স্রষ্টা তা খুব ভালোভাবেই জানতেন বলেই মানব সমাজে রাষ্ট্রের ব্যবস্থা করেছেন এবং সে রাষ্ট্রের সুষ্ঠুরূপে চলবার জন্য প্রয়োজনীয় আইন-বিধানও দিয়েছেন। ফলে সে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় একদিকে যেমন অভ্যন্তরীণ লোকদের জীবন পরিচালন সম্ভব হচ্ছে, তেমনি সে জনসমষ্টির উপর শত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করা, ওদেরকে বৈদেশিক বিজাতীয় শক্তির গোলামী থেকে রক্ষা করাও সম্ভবপর হচ্ছে। ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও সরকারের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব এত বেশী যে, রাসূলে করীম (স)-এর হাদীসে একটি জনসমষ্টির কল্যাণ ও অকল্যাণ—সুষ্ঠুতা ও বিপর্যয় একান্তভাবে নির্ভরশীল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ

صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِى إِذَا صَلَحَا صَلَحَتْ أُمَّتِى وَإِذَا فَسَدَا فَسَدَتْ أُمَّتِى ..... قِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَالْأُمَرَاءُ.

আমার উম্মতের মধ্যে দুটি শ্রেণী এমন যে, তারা ঠিক হলে গোটা উম্মত ঠিক হয়ে যাবে আর তারাই বিপর্যস্ত হলে গোটা উম্মত বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ তারা কারা হে রাসূল! বললেনঃ তারা ফিকহ্‌বিদ ও প্রশাসকবৃন্দ।[১]

বস্তুত মানুষের বিশেষ করে সামষ্টিক জীবনে রাষ্ট্র ও সরকারের প্রয়োজনীয়তা বিবেক-বুদ্ধি ও শরীয়াত উভয়ের দৃষ্টিতেই অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ঐতিহাসিক বিচারেও মানব সমাজের বিকাশে কোন একটি সময় অতীতে ছিল না ....ভবিষ্যতেও থাকতে পারে না যখন রাষ্ট্র ও সরকারের কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না বা হবে না। কাজেই তার প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আরও দীর্ঘ ও বিস্তারিত কোন আলোচনার আবশ্যকতা আছে বলে মনে হয় না।

রাষ্ট্র ও সরকারের এ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাই ইসলামের মনীষীবৃন্দের উপর কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় যে, তাঁরা তার রূপরেখা, কার্যপদ্ধতি, নিয়মনীতি বিশেষত বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট করে লোকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করবেন এবং কাল ও সময়ের প্রতিটি অধ্যায়ে তা সেই সব রূপরেখা, পদ্ধতি-নিয়ম-নীতি ও বিশেষত্ব-বৈশিষ্ট্য সহকারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা চালাবেন।

---

১. معالم الحكومة الاسلامية ص: ١٥، تحف العقول ص: ٤٢

রাষ্ট্র ও সরকারের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার কারণ

এতদসত্ত্বেও দু'ধরনের লোক সমাজ-জীবনে রাষ্ট্র ও সরকারের প্রয়োজনীয়ত অস্বীকার করছে। এক, যারা নীতিগতভাবেই রাষ্ট্র-সরকারের পক্ষপাতী নয়। এরা হচ্ছে কার্লমার্ক্স ও তার মতের লোকেরা।

দুই, যারা নিছক মনস্তাত্ত্বিক কারণে তার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না। এরা আবার তিন ভাগে বিভক্ত।

বস্তুত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা মূলত কোন মতবিরোধের বিষয় ছিল না—এ ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টিরও কোন কারণ ছিল না। কেননা পূর্বে যেমন দেখিয়েছি ও প্রমাণ করেছি, মানব জীবনের প্রকৃত সৌভাগ্য, সভ্যতার অগ্রগতি স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা এরই উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু লোক—সংখ্যায় তারা যত কম-ই হোক—রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে একটা বিভীষিকা মনে করে। তার অস্তিত্বকেই ভয় পায় ও তার প্রয়োজনীয়তা মেনে নিতে রাযী হয় না। কেউ কেউ আবার এ-ও বলতে চায় যে, হ্যাঁ, রাষ্ট্র ও সরকারের প্রয়োজনীয়তা আছে বটে; তবে বিশেষ বিশেষ সময়ে মাত্র। সর্বসময়ে নয়, স্থানীয়ভাবেও নয়। চিরন্তনও নয়।

রাষ্ট্রের অপ্রয়োজনীয়তার চারটি মত

এ মতের লোক চার ভাগে বিভক্ত।

প্রথম ভাগের লোক, কার্লমার্ক্স ও তার অনুসারীরা। তাদের মধ্যে রাষ্ট্র সরকারের প্রয়োজনীয়তা শুধু ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ সমাজে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম চলতে থাকে। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর মধ্যকার অর্থনৈতিক সমস্যাবলী দূরীভূত হয়ে যাবে—প্রকৃত কমিউনিজম যখন প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন কোন রাষ্ট্র বা সরকারের প্রয়োজন নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবতার আলোকে এ মতের কোন যৌক্তিকতাই নেই।

কেননা রাষ্ট্র ও সরকারের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা কতগুলি বস্তুগত সমস্যা ও কার্যকারণের উপরই নির্ভরশীল নয়। নিছক অর্থনৈতিক কারণেই তার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতব্য নয়। শ্রেণীগত পার্থক্য দ্বন্দ্ব ও বিরোধ নিঃশেষ করার জন্যই তার প্রয়োজনীয়তা, এমন কথাও যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। শ্রেণী-দ্বন্দ্ব নিঃশেষ হয়ে গেলেই রাষ্ট্র ও সরকারের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে, এ কথার সমর্থনে অকাট্য কোন যুক্তিই পেশ করা যেতে পারে না। এসব বস্তুগত কারণ ছাড়াও নৈতিক ও স্বাভাবিক ভাবধারাগত এমন অনেক কারণই আছে, যা মানব-সমষ্টির জন্য রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠাকে একান্তই অপরিহার্য করে তোলে।

দ্বিতীয় ভাগের লোক হচ্ছে তারা, যারা প্রাচীনকালীন নৈরাজ্য ও শাসনহীন অবস্থাকেই পছন্দ করে নিজেদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে। কেউ তাদের উপর শাসনকার্য চালাক, তাদের তৎপরতা ও কাজকর্মের উপর কোনরূপ বিধি-নিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হোক, তা তারা আদৌ পছন্দ করে না। শুধু তাই নয়, তা তারা রীতিমত ভয় পায়। কেননা তাতে পাকড়াও হওয়ার কারণ ঘটে, নানা প্রকারের শাস্তি ও দণ্ড ভোগ করতে বাধ্য হওয়ার মত অবস্থাও দেখা দিতে পারে। এ কারণে তারা রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধতা করে, যেমন তাদের মনে যখন যা করার ইচ্ছা জাগবে তাই করার তারা অবাধ ও নির্বিঘ্ন সুযোগ পেয়ে যেতে পারে। কেউ যেন তাদের নিকট কোন কাজের জন্য কৈফিয়ত চাইতে না পারে, কেউ তাদেরকে কোন কাজের জন্য শাস্তি দিতে না পারে। তারা নিজেদের ইচ্ছামত বা কল্যাণ চিন্তায় যা-ই করবে বা করতে চাইবে, তার পথে যেন কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা না দেয়। তাদের জোর-প্রয়োগ ও ছিনতাই কাজে কেউ বাধা দিতে না পারে।

তৃতীয় হচ্ছে সেই জনগোষ্ঠী, যারা রাষ্ট্র-সরকারের নিকট থেকে কেবল শাসন ও শোষণ, রুঢ়তা, নির্যাতন-নিষ্পেষণ, স্বৈরতান্ত্রিকতা ও শক্তিমানদের পক্ষপাতিত্বই দেখতে পেয়েছে চিরকাল। যা সকল কালের দুর্বলদের উপর চরম অত্যাচারই চালিয়েছে, তাদের—এমনকি—মৌলিক মানবিক অধিকারও হরণ করেছে, তাদের তাজা-তপ্ত রক্ত নির্মমভাবে শুঁষে নিয়েছে, তাদের কল্যাণের সকল পথ ও উপায় সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে, তাদের মানবিক মর্যাদাটুকুকেও পদদলিত ও ধুলি-লুণ্ঠিত করেছে।

এসব লোকের সম্মুখে রাষ্ট্র ও সরকারের নাম উচ্চারণ করলেই তারা সেই বিভীষিকায় সন্ত্রস্ত ও কম্পিত হয়ে উঠে, বিচার ও শাসনের নামে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন ও নির্যাতনে ভরপুর কারাগারের কথা স্মরণ করে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে, যা তারা সর্বত্র দাঁড়িয়ে থাকতে ও তাদেরকে গ্রাস করার জন্য মুখ ব্যাদান করে থাকতে দেখতে পায়। এ কারণে তারা রাষ্ট্র ব্যবস্থা সরকার-প্রশাসনকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। তার নাম শুনতেও তারা প্রস্তুত নয়। তা না থাকলে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হোক, তা তারা চায় না, বরং সবচাইতে বেশী আতংকিত হয়ে উঠে। জুলুম, স্বৈরতন্ত্র ও নির্মমতা কোন্ মানুষ-ই বা পছন্দ করতে পারে!

তবে সেই সাথে এ কথাও সত্য যে, এই লোকদেরকে যদি ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের মানবিক কল্যাণময় আদর্শের কথা, জনগণের অব্যাহত খেদমতের কথা সাধারণ মানুষের প্রয়োজনপূর্ণ ন্যায়পরতা সহকারে পুরিপূরণ করার, নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের মধ্যে ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার কথা যখন বলা

হবে, তখন এই লোকেরা হয়ত এমন এক রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উক্তরূপ নেতিবাচক মনোভাব গ্রহণ করতে পারবে না। বরং তারা ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে সেরূপ একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে রায় দেবে এবং সেজন্য চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রাম করতে কিছু মাত্র নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারবে না।

চতুর্থ হচ্ছে সেসব লোক, যারা নিরংকুশ ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষপাতী, যারা সে স্বাধীনতা কোন সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ হোক, কোন প্রশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সংকুচিত হোক, তা চায় না। এরা মনে করে রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা—এ দুটি পরস্পর বিরোধী—একটি ক্ষেত্র। এ দুটি কখনই একত্রিত হতে পারে না। কেননা রাষ্ট্র ও সরকার ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত ও সংকুচিত করবে, তাতে তাদের কোনই সন্দেহ নেই।

স্পষ্ট মনে হচ্ছে, মানুষের উপযোগী ব্যক্তি-স্বাধীনতা-মানুষের জন্য যা একান্তই প্রয়োজন—আর বন্য স্বাধীনতা এ দুটিকে এই লোকেরা এক করে দেখেছে। এই দুটির মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, হয় তারা তা বুঝে না বা বুঝতে চায় না অথবা তারা বুঝে-শুনেই সে পার্থক্যের কথা স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়।

বন্য স্বাধীনতা বলতে বোঝায় যেখানে কোন বিবেকসম্মত নিয়ম-নীতিরও নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। সকলের অধিকার রক্ষার জন্য কোন আইনের বালাই থাকবে না। মানুষের মর্যাদা রক্ষার জন্য কোন সীমাই চিহ্নিত হবে না। বনে-জঙ্গলে যেমন পশুকুল যা-ইচ্ছা তাই করে—করতে পারে, যার শক্তি অন্যদের তুলনায় বেশী, তারই কর্তৃত্ব স্বীকৃত, অন্য কথায় Might is Right-এর নীতি, যার আক্রমণের ক্ষমতা বেশী, যে অন্যদের অপেক্ষা বেশী জোরে হুংকার চালাতে পারে, দাপট দেখাতে পারে, রোষ ও আক্রোশ প্রকাশ করতে পারে, অন্যান্য সবাই তার ভয়তেই কম্পমান।

কিন্তু এ স্বাধীনতা বনে-জঙ্গলে থাকলেও—সেখানে শোভা পেলেও—মানব সমাজে তা কখনই শোভন হতে পারে না—বাঞ্ছনীয়ও নয়। মানুষের জন্য যে স্বাধীনতা কাম্য তা অবশ্যই আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সে জন্য সচেতনভাবে গৃহীত কিছু নিয়ম-নীতি থাকতে হবে। এমন কিছু মৌল মূল্যমান (Values) থাকতে হবে, যা মানুষের মধ্যে নিহিত স্বাভাবিক শক্তি ও প্রতিভার বিকাশ ও প্রবৃদ্ধি সাধন করবে। মানবীয় গুণ-গরিমা পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হবে ও নির্ভুল কল্যাণময় দিকে পরিচালিত হবে। সম্ভাব্য সম্পূর্ণতা কোন দিকেই কারোর নাগালের বাইরে থাকবে না। এরূপ এক স্বাধীনতা বিবেকসম্মত ও যুক্তিসম্মত নিয়ম-নীতি ভিত্তিক হওয়া ছাড়া পাওয়ার কল্পনাও করা যায় না।

অন্য কথায়, মানুষের জন্য নির্ভুল ও শোভন স্বাধীনতা তাই হতে পারে, যার দরুন ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে নিহিত স্বাভাবিক যোগ্যতা কর্মক্ষমতা বিকাশ লাভের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ও আনুকূল্য পাবে। তাহলেই তা স্বাভাবিকতার পর্যায় থেকে বাস্তবতার পর্যায়ে উন্নীত হতে পারবে এবং শেষ পর্যন্ত তা পূর্ণত্বের মাত্রায় পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাব্য পথ নির্দেশ লাভ করতে পারবে।

কিন্তু এই বিকাশ ও প্রবৃদ্ধি লাভ অরাজক পরিবেশে পাওয়া যেতে পারে না। সেজন্য কিছু শর্ত ও সীমা একান্তই অপরিহার্য। উপযুক্ত কতিপয় নিয়ম-নীতিই সেই শর্তের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। তার বিকাশ ও প্রবৃদ্ধি নিষিদ্ধ করবে বা তার পথ বন্ধ করে দেবে, এমন কথা তো নয়।

প্রকৃত ও শোভন ব্যক্তি-স্বাধীনতা হচ্ছে, মানুষ একটি বিশ্বাস গ্রহণ করবে, তার কর্মের মাধ্যমে সে বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করার অবাধ সুযোগ পাবে। তাও হবে তখন যখন ব্যক্তি অজ্ঞাত-মুর্খতার অন্ধকার থেকে বের হয়ে নির্ভুল জ্ঞান ও সমঝ-বুঝের আলোকোজ্জ্বল পরিবেশের মধ্যে এসে যেতে পারবে। তাহলেই সে স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করে একদিকে স্বীয় বিশ্বাসকে সত্যতা, যথার্থতা ও একনিষ্ঠতা প্রমাণ করতে পারবে, আর সেই সাথে তার স্বভাবগত কর্মপ্রতিভা ও দক্ষতাকে বিকশিত ও প্রবৃদ্ধ করতে সমর্থ হবে। আর মানুষ যে এভাবেই পূর্ণত্ব অর্জন করতে পারে, পারে জীবনের সার্থকতা লাভ করতে, তাতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। বস্তুত মানুষের জন্য এই স্বাধীনতাই কাম্য।

তবে মানব সমাজের ইতিহাস প্রমাণ করে যে, অন্ধ জাতীয়তাবোধ প্রসূত রাষ্ট্র সরকার উপরে বর্ণিত শোভন স্বাধীনতাকে পর্যুদস্ত করে। যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে কঠিনভাবে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখে। কিন্তু ইসলাম উপস্থাপিত রাষ্ট্র-সরকার কখনই তা করে না। ইসলামী সরকার বা তার প্রশাসক জনগণের উপর কেবলমাত্র সে সব আদেশ-নিষেধই কার্যত করে, যা মানুষ ও বিশ্বলোকের মহান স্রষ্টা মানুষের সার্বিক কল্যাণের দৃষ্টিতেই নাযিল করেছেন। সে সরকার বা প্রশাসক নিজ ইচ্ছামত কোন কাজের আদেশও করে না, কোন কাজ করতে নিষেধাজ্ঞাও জারি করে না। তা করার অধিকার সেখানে কাউকেই দেয়া হয় না। আর আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধ সামগ্রিকভাবে গোটা মানবতার জন্যই কল্যাণকর, তা যে মানুষের পূর্ণত্ব বিধান করে, মানুষের স্বভাব নিহিত প্রতিভা ও কর্মক্ষমতাকে বিকাশ ও প্রবৃদ্ধি দান করে, মানুষের জন্য সার্বিকভাবে যাবতীয় অকল্যাণ ও ক্ষতির প্রতিরোধ করে ও মানুষকে উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে নিয়ে যায়, তাতে কারোর কি একবিন্দু সংশয় থাকতে পারে?

বস্তুত, ইসলাম মানুষের জন্য রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা উদাত্ত কণ্ঠে প্রকাশ করেছে, কিন্তু সে রাষ্ট্র ও সরকার নিশ্চয়ই তা নয় যার কিছুটা আভাষ এই মাত্র দেয়া হলো। ইসলাম উপস্থাপিত রাষ্ট্র ও সরকারের কিছু রূপরেখা কুরআন মজীদের আয়াতের ভিত্তিতে এখানে পেশ করা হচ্ছে।

কুরআনের দৃষ্টিতে ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের রূপরেখা

কুরআনের ঘোষণানুযায়ী ইসলামী প্রশাসক কেবল জনসমষ্টির লাগামের ধারকই হয় না—লাগাম ধরে যেমন ইচ্ছামত অশ্ব বা উট চালানো হয়, প্রশাসক মানুষকে সেদিকেই চালিয়ে নেবে। নিজ ইচ্ছামত প্রদত্ত আদেশ-নিষেধ মানতে মানুষকে বাধ্য করবে, স্বীয় নিরংকুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিতকরণ ও প্রভুত্বের লালসা চরিতার্থ করবে, তা কখনই হতে পারে না। সে তো হবে অত্যন্ত কঠিন দায়িত্বশীল, দুর্বহ কর্তব্য বোঝা নিজের মাথায় ধারণকারী। কুরআন বলেছেঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ (الحج: ٤١)

ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তা ও প্রশাসক যাদেরকে আমরা বানাই, তারা সালাত ব্যবস্থা কায়েম করে, যাকাত আদায় বন্টনের ব্যবস্থা কার্যকর করে, কেবল মাত্র ভাল ও কল্যাণকর কাজের আদেশ করে ও যাবতীয় অকল্যাণকর ও ক্ষতিকর কাজ করতে নিষেধ করে।

এ আয়াতটি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের কর্তা ও কর্মচারীদের অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব হচ্ছেঃ

১. সালাত কায়েম করা—ব্যাপকভাবে সালাত আদায়ের মাধ্যমে গোটা সমাজকে সর্বকল্যাণের আঁধার মহান আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দেয়া।

২. যাকাত আদায় ও বন্টনের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এরই ভিত্তিতে সমাজ-সমষ্টির জৈবিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ ও সুসংবদ্ধকরণের কাজ করবে।

৩. কল্যাণময় কার্যাবলীর প্রকাশ ও প্রচার ও সামষ্টিক কল্যাণের প্রতিষ্ঠা।

৪. সকল প্রকারের অকল্যাণকর, ক্ষতিকর, অনিষ্টকারী, বিপর্যয় ও বিকৃতি উদ্ভাবক কার্যাবলী নিষিদ্ধকরণ, জুলুম, নিপীড়ন, শোষণ ও মিথ্যার অপনোদন করা। শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা।

এইরূপ একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা যে সর্বমানুষের স্বভাবসম্মত যোগ্যতা-প্রতিভার স্ফূরণ, বিকাশ ও প্রবৃদ্ধি বিধানের সহায়তাকারী, নিরাপত্তা ব্যবস্থাকারী,

চিন্তা-বিশ্বাস ও জ্ঞানগত শক্তি-দক্ষতার প্রাচুর্য দানকারী—সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক—সকল পর্যায়ে সম্ভাব্য সকল উৎকৃষ্ট ও উন্নতি বিধানকারী, সে ব্যাপারে কারোর একবিন্দু সন্দেহ থাকতে পারে কি?

ইসলাম যদি এইরূপ একটি রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে থাকে, তাহলে সেজন্য ভয় পাওয়ার কোন কারণ আছে কি? এরূপ একটি রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ব্যতীত মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধন যে আদৌ সম্ভব নয়, মানুষের প্রকৃত ও ন্যায্য অধিকারসমূহ পেয়ে জীবন ধন্য করার একমাত্র উপায় যে এইরূপ একটি রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠিত করা, তা অস্বীকার করার সাধ্য কার আছে?

ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা হতে পারে সেই ব্যক্তির, যার মধ্যে এই তিনটি গুণ অবশ্যম্ভাবীরূপে বর্তমান রয়েছেঃ

—তাকওয়া পরহেযগারী, যা তাকে আল্লাহ্‌র না-ফরমানী থেকে বিরত রাখবে;

—এমন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, যা তার উদ্রিক্ত ক্রোধ ও রোষ-অসন্তোষকে দমন ও নিয়ন্ত্রণ করবে;

—এমন দয়ার্দ্র নেতৃত্ব গুণ, যা তাকে সাধারণ মানুষের জন্য পিতৃতুল্য স্নেহ-বাৎসল্য সদা আপ্লুত করে রাখবে।

> সন্দেহ নেই অতীব উত্তম জিনিস হচ্ছে সে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব, যা একজন গ্রহণ করবে তার যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে। আর তা অত্যন্ত খারাপ জিনিস হচ্ছে তার জন্য, যে তা গ্রহণ করবে তার কোন যোগ্যতা ও অধিকার ব্যতিরেকে। কিয়ামতের দিন তা তার জন্য লজ্জা ও অনুতাপেরই কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

মূলত রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব একটি অতি বড় আমানতের ব্যাপার। তবে কিয়ামতের দিন তাই-ই বড় অনুতাপ ও লজ্জার কারণ হয়েও দাঁড়াতে পারে। অবশ্য কেউ যদি সে দায়িত্ব পূর্ণ যোগ্যতা ও একনিষ্ঠতা সহকারে পালন করে তাহলে ভিন্ন কথা।

> "একজন ন্যায়বাদী সুবিচারক রাষ্ট্রনেতার সাধারণ মানুষের কল্যাণে একদিন কাজ করা একজন ইবাদতকারীর একশত বছর ইবাদত করার সমান।"

তুমি যখন কোন কঠিন দায়িত্বপূর্ণ কাজের সম্মুখীন হবে, তখন বেশী বেশী করে আল্লাহর স্মরণ কর। তুমি যখন জাতীয় সম্পদ বন্টন করবে, তখনও আল্লাহ্‌কে মুহূর্তের জন্যও ভুলে যেও না। আর যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করবে, কোন বিচার্য বিষয়ে রায় দেবে, তখন অবশ্যই তোমার রব্বকে স্মরণ করবে।[১]

রাসূলে করীম (স) এইসব—এবং এ ধরনের আরও বহু জ্ঞানপূর্ণ কথা দ্বারা তাঁর সাহাবীগণকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তিনি এই শিক্ষাও দিয়েছেনঃ

তোমাদের প্রত্যেকেই রাখালের ন্যায় দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে ও জবাবদিহি করতে বাধ্য করা হবে। জনগণের শাসনকার্যের দায়িত্বশীল জনগণের উপর রাখালের ন্যায় দায়িত্বশীল, তাকে তাদের বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই তার পরিবারবর্গ সম্পর্কে দায়িত্বশীল। তাকেও তাদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। স্ত্রী স্বামীর ঘর-সংসারের জন্য ও তার সন্তানের জন্য দায়িত্বশীল। তাকেও সে বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে। ....তোমরা সকলেই মনে রাখবে, তোমরা প্রত্যেকেই এবং সকলেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককে—এবং সকলকে-ই সেজন্য জবাবদিহি করতে হবে।[২]

হযরত আলী (রা) ইসলামী প্রশাসকের গুণ-পরিচিতি পর্যায়ে বলেছেনঃ

জনগণের উপর শাসকের অধিকার এবং শাসকের উপর জনগণের অধিকারসমূহ মহান আল্লাহ তা'আলা নিজেই ধার্য ও সুচিহ্নিত করে দিয়েছেন। প্রত্যেকেরই কর্তব্য রয়েছে অপর প্রত্যেকের জন্য একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা হিসেবে এবং তা তাদেরই কল্যাণের জন্য। তাদের দ্বীনের সম্মান ও শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে। বস্তুত জনগণের কল্যাণ হতে পারে না শাসকদের কল্যাণ ব্যতীত; শাসকদেরও কল্যাণ হতে পারে না জনগণের দৃঢ় স্থিতি ব্যতীত। জনগণ যদি শাসকের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে, শাসকও যদি জনগণের অধিকার যথাযথ রক্ষা করে, তাহলে সকলেরই অধিকার পারস্পরিকভাবে আদায় হয়ে যায়। দ্বীনের পথ ও পন্থাসমূহ যথাযথ কার্যকর হয়। সুবিচার ও ন্যায়পরতার দণ্ড যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রকট হতে পারে। তার উপর ভিত্তি করে সুষ্ঠু নিয়ম-নীতিসমূহ সুচারুরূপে চালু হতে পারে। তার ফলে গোটা সময়ই কল্যাণময় হয়ে উঠবে। রাষ্ট্র ও সরকারের স্থিতি জনগণের কাম্য হবে। শত্রুদের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যাবে। জনগণের নিটক শাসক যদি পরাজিত হয়ে পড়ে কিংবা শাসক যদি জনগণের ব্যাপারে ভুল নীতি গ্রহণ করে বসে, তাহলে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হবে। অত্যাচার ও

১. كتاب الاموال হাফেজ আবূ উবাইদ সালাম ইবনুল কাসেম রচিত থেকে এসব হাদীস গৃহীত; পৃঃ ১০।

২. ঐ

নির্যাতনের কারণসমূহ প্রকট হয়ে পড়বে। দ্বীন পালনে চরম দুর্নীতি ও নীতি লংঘনমূলক তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। চিরন্তন কল্যাণময় আদর্শ পদদলিত হবে। তখন মানুষ নফসের খাহেশ অনুযায়ী কাজ করতে শুরু করবে। আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ—হুকুম-আহকাম অকার্যকর হয়ে পড়বে। তখন মানুষের মধ্যে অশান্তি বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। তখন কোন পরম সত্য বাতিল হয়ে গেলেও লোকেরা খারাপ মনে করবে না। কোন বড় বাতিল কাজ দেখেও মানুষ সতর্ক সক্রিয় হয়ে উঠবে না। এরূপ অবস্থায় নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরা অপদস্ত ও অপমানিত হবে, সমাজের চরিত্রহীন দুষ্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তিরা সম্মান ও শক্তির অধিকারী হয়ে বসবে। তখন আল্লাহ্‌র বান্দাগণের পক্ষে আল্লাহ্‌র আদেশ পালন দুষ্কর হয়ে পড়বে।[১]

হযরত আলী (রা) তাঁর অপর এক ভাষণে শাসক ও শাসিতের মধ্যকার মিলিত অধিকারসমূহের কথা বলে প্রকাশ করেছেনঃ

فقد جعل الله لى عليكم حقا بولاية امركم ولكم على من الحق مثل الذى لى عليكم.

তোমাদের শাসনভার আমার উপর অর্পিত হওয়ার কারণে তোমাদের উপর আমার একটা অধিকার রয়েছে এবং আমার উপর তোমাদের জন্য অনুরূপ একটি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এ দৃষ্টিতে অধিকারের দিক দিয়ে শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। বরং ইসলামের দৃষ্টিতে আইনের সম্মুখে সকলেই সমান ও সম্পূর্ণভাবে অভিন্ন। সামাজিক ও প্রতিফলপূর্ণ সমস্ত কাজের দায়িত্ব পালনে সকলেই সমান ভাবে দায়ী। শাসক ও রাষ্ট্রপ্রধানের যেমন দায়িত্ব জনগণের অধিকারসমূহ যথাযথভাবে আদায় করা—জনগণের মধ্যেরই একজন ব্যক্তির মত, জনগণও তেমনি তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালন করা। এভাবে রাসূলে করীম (স)-এর এই প্রখ্যাত কথাটির বাস্তবতা সম্ভবপর হয়ঃ

اَلنَّاسُ اَمَامَ الْحَقِّ سَوَاءٌ.

সত্যের সমীপে সমস্ত মানুষ সর্বতোভাবে সমান।

চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা) যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁবুতে বসে নিজের জুতায় তালি লাগাচ্ছিলেন। তিনি তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন—বলতে পারেন, এই জুতার কি মূল্য? তিনি বললেনঃ এর কোন মূল্য নেই। তখন হযরত আলী (রা) বললেনঃ

১. نهج البلاغة طبعة عبدة الخطبة

والله لنعلي الي من امرتكم الاان اقيم حقا او ادفع باطلا

আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, তোমাদের এই রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের তুলনায় এই জুতাই আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। তবে আমি যদি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে ও বাতিলকে প্রতিরোধ করতে পারি, তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা।

বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্র দর্শনের দৃষ্টিতে শাসকের দিল জনগণের প্রতি দয়ালু ও অনুকম্পা সমৃদ্ধ হতে হবে। তাদের প্রতি সব সময় কল্যাণকামী হতে হবে। হিংস্র জন্তু যেমন তার শিকার নিয়ে খেলা করে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে চিড়ে-ফেঁড়ে খেয়ে ফেলে, শাসকদের কখনই সে রকম হওয়া উচিত নয়।

এই আলোচনার প্রেক্ষিতে আমার মূল আলোচ্য বিষয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে বলতে চাই, রাষ্ট্র ও সরকার—বিশেষ করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা শুনে যারা ভয় পায়, তারা আসলে ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের কল্যাণমুখী ও সুবিচার প্রতিষ্ঠাকামী ভাবধারা ও লক্ষ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এ-ও হতে পারে যে, যারা নীতিহীন আদর্শ বিবর্জিত উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের পক্ষপাতী, তারা জেনে বুঝে ইচ্ছা করেই এ ধরণের রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধতা করে।

ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার কেবল দেশবাসী মুসলিমদের জন্যই ন্যায়বিচার ও ইনসাফের ব্যবস্থা করে না, বিধর্মীদের প্রতিও তার ন্যায়নিষ্ঠা ও সুবিচারের একবিন্দু ব্যতিক্রম হয় না। ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষই এই রাষ্ট্রের অধীন পূর্ণ অধিকার ও মর্যাদা সহকারে নির্বিঘ্ন জীবন যাপন করার সুযোগ পেতে পারে। ধর্ম ও মতাদর্শের পার্থক্যের কারণে অধিকার আদায়ে কোন তারতম্যকে একবিন্দু স্থান দেয়া হয় না। এই পর্যায়ে ইসলামী শাসন প্রশাসনের ইতিহাসই অকাট্য প্রমাণ। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেরা যে ধরনের শাসন-প্রশাসনের অধীন জীবন যাপন করছিল, তা থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যেই তারা ইসলামী প্রশাসনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। তারা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে ইসলামের বিজয়ের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। মুসলমানদের নেতৃত্বের অধীনতা তারা নিজেরাই সাগ্রহে গ্রহণ করেছে। কেননা তারা মুসলিম শাসকদের হৃদয় মনে নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্য যে দয়া অনুকম্পার নিশ্চিত সন্ধান পেয়েছে, তা তাদের বর্তমান শাসকদের নিকট কখনই পায়নি, কোন দিন তা পাবে বলেও তাদের মনে কোন আশাবাদ ছিল না।

এই পর্যায়ে প্রমাণ হিসেবে 'মদীনার সনদ' নামে বিশ্ব ইতিহাসের প্রথম লিখিত সংবিধানের উল্লেখ করতে চাই। নবী করীম (স) মদীনায় প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার পর মুসলিম ও অমুসলিম—ইয়াহুদী ইত্যাদির সাথে এক রাষ্ট্রের অধীন বসবাসের জন্য একটি দলীল তৈরী করেন। তাতে সংশ্লিষ্ট সকলেরই ন্যায়সঙ্গত অধিকারের কথা স্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। এই দলীলের

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ধারা এখানে তুলে দেয়া হচ্ছেঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম—ইহা আল্লাহ্‌র রাসূল নবী মুহাম্মদ (স) ও (হুরায়রা বংশের) মু'মিন-মুসলিম এবং মদীনাবাসীদের মধ্যে এক লিখিত চুক্তি। যারা তাদের সাথে পরে মিলিত হয়েছে ও তাদের সাথে মিলিত হয়ে জিহাদ করেছে তারা এর মধ্যে শামিল ও গণ্য। এরা অন্যান্য মানুষ থেকে পৃথক এক উম্মত।

এরপর ইসলামী কবীলাসমূহের এবং নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব এবং দুর্বলের সহায়তা ও সুবিচার ইনসাফ ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখের পর এমন কতগুলি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে যা সর্বসাধারণ মুসলিমের সাথে সংশ্লিষ্ট। অতঃপর লিখিত হয়েছেঃ

> মু'মিন মু'মিনের সাথে কৃত বন্ধুত্ব ভঙ্গ করবে না, কারোর সাথে কৃত চুক্তির বিরুদ্ধতা করবে না। মু'মিন মুত্তাকীগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে তাদের মধ্য থেকে যে বিদ্রোহ করবে তার বিরুদ্ধে। কেউ জুলুম করতে উদ্যত হলেও তার বিরুদ্ধতা করবে। কোন অপরাধ করতে কাউকে দেবে না। মু'মিনদের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টাও সফল হতে দেবে না। মোটকথা, তাদের শক্তি-হস্ত থাকবে সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ—তাদেরই কারোর সন্তানের বিরুদ্ধে হলেও...... ইয়াহুদীদের মধ্য থেকে যে লোক আমাদের অনুসরণ করবে, তাকে সাহায্য করা হবে, কোনরূপ জুলুমের শিকার তারা হবে না, তাদের বিরুদ্ধে অন্যদেরও সাহায্য সহযোগিতা করা হবে না।
>
> বনু আওফ-এর ইয়াহুদীরা মু'মিনদের সাথে এক উম্মত। ইয়াহুদীরা তাদের ধর্ম পালন করবে, মুসলমানরা পালন করবে তাদের দ্বীন। প্রত্যেকে নিজ নিজ চুক্তিবদ্ধ লোকদের সাথে চুক্তি রক্ষার জন্য তারাই দায়ী হবে। তবে কেউ জুলুম করলে ও অপরাধ করলে সে নিজেকে—নিজের পরিবারবর্গকেই—বিপদে ফেলবে।
>
> ইয়াহুদীদের ব্যয়াদি তারা নিজেরাই বহন করবে, মুসলমানদের ব্যয় মুসলমানরাই বহন করবে। এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরকারী কোন পক্ষের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধ করলে তাদের পারস্পরিক সাহায্যদান অবশ্য কর্তব্য হবে। আর তাদের পরস্পরে হবে কল্যাণ কামনা, উপদেশ দান, পারস্পরিক উপকার সাধন— কোনরূপ পাপ বা অপরাধ ব্যতীত।[১]

মদীনায় স্বাক্ষরিত এই সনদের সারকথাঃ

---

১. كتاب الاموال طبع مصر- ص ١٧-١٠، سيرة ابن هشام المجلد الاول ص ٥٠١
البداية و النهاية ج ٢، ص ٢٢٤

১. মুসলমানদের বিভিন্ন গোত্র ও জাতিতে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের এক ও অভিন্ন উম্মতে পরিণত করা হয়েছে।

২. দিয়ত ও রক্তমূল্যের ব্যাপারে কুরাইশ বংশের মুহাজিরদিগকে তাদের চিরন্তন রীতি-নীতি ও অভ্যাসের উপর বহাল রাখার ঘোষণা হয়েছে, অবশ্য পরে 'হদ্দ' ও দিয়তকে একটি বিশেষ ধরনের ফরয করে দেয়ার ফলে তা নাকচ হয়ে যায়।

৩. মুহাজিরদের কোন লোক মুশরিকদের হাতে বন্দী হলে তার জন্য বিনিময় মূল্য নিয়ে তাকে তাদের নিকট থেকে মুক্ত করণের দায়িত্ব মুহাজিরদেরই বহন করতে হবে।

৪. সমগ্র জনগোষ্ঠী ও গোত্র ইনসাফপূর্ণ ও প্রচলিত নীতিতে বন্দী বিনিময় মূল্য দেয়ার দায়িত্বশীলতা ঘোষিত হয়েছে।

৫. যেসব গোত্রের নাম সনদে লিখিত হয়েছে, তাদেরকে তাদের নিজস্ব আদত-অভ্যাসের উপর বহাল রাখা হয়েছে। প্রত্যেক গোষ্ঠীই তার সাহায্যকারীর বিনিময় মূল্য দিতে বাধ্য হবে।

৬. বিনিময় মূল্য আদায় করার দরুন যে মু'মিন ব্যক্তি ঋণে ভারাক্রান্ত হবে, তার সাহায্যে সকল মু'মিনকে এগিয়ে আসতে হবে।

৭. বিদ্রোহ, জুলুম সকল ক্ষেত্রে ও ব্যাপারেই অস্বীকার করা এবং যে তা করবে তাকে প্রতিরোধ করা—কারোর নিজের বংশধর হলেও। তারা এর ব্যতিক্রম করলে তারা সকলেই সেজন্য দায়ী হবে।

৮. মু'মিন কাফিরকে হত্যা করলে তার কোন প্রতিশোধ নেয়া যাবে না, তবে শুধু দিয়ত বা রক্তমূল্যই আদায় করা হবে।

৯. মুসলমানরা নিকটবর্তী যাকেই চাইবে মজুরির বিনিময়ে কাজে নিযুক্ত করতে পারবে।

১০. কুরাইশ মুশরিকদের কোন ধন-মাল কিংবা রক্তমূল্য দেয়ার কোন অনুমতিই নেই।

১১. কোন মু'মিনের বিনা কারণে হত্যাকারীকে দণ্ডিত হতে হবে। তবে নিহতের অভিভাবক-উত্তরাধিকারীরা দিয়ত গ্রহণ করে দাবি ছেড়ে দিতে রাযী হলে সে দিয়ত অবশ্যই গ্রহণীয় হবে।

১২. ইসলামে নতুন নীতি প্রবর্তন বা সংযোগকারীদের সাহায্য করা কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না। তাদের অবশ্যই প্রতিরোধ করা হবে।

১৩.মুসলমানদের পরস্পরে কিংবা মুসলমান ও ইয়াহুদীদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব—ঝগড়া-বিবাদ ও সমস্যাসমূহ নবী করীম (স) নিজেই মীমাংসা করবেন।

১৪.ইয়াহুদীরা নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা পর্যায়ের সাধারণ অধিকারসমূহ লাভ করবে। তবে শর্ত এই যে, তারা মুসলমানদের সহযোগিতা করবে, পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা করবে না।

১৫.প্রতিবেশীর সাথে আপন জনের মতই আচরণ করতে হবে। কোনরূপ ক্ষতি বা পাপাচরণ করতে পারবে না।

মদীনা চুক্তির কতিপয় বড় বড় ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ধারা এখানে উদ্ধৃত করা হলো।[১]

রাসূলে করীম (স)-এর জীবনে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন বসবাসকারী অমুসলিমদের প্রতি সদাচারণ প্রদর্শনেরই এটা নিয়ম ছিল না। কেবল তাঁর জীবন-কালের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর পরও ইসলামী রাষ্ট্রে এরূপ সদাচারই কার্যকর হয়েছে. এটা ইসলামী রাষ্ট্রের নীতি।

ইসলামী রাষ্ট্রে শাসক ও শাসিতের মধ্যে পূর্ণ সমতা ও পার্থক্যহীনতা চিরকালই রক্ষিত হয়েছে। সকল ক্ষেত্রেই তা হয়েছে, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিচার বিভাগের কথা অনায়াসেই উল্লেখ করা যায়।

হযরত আলী (রা)-র খিলাফত কালের ঘটনা। তাঁর নিজের বর্মটি হারিয়ে যায় এবং পরে তা একজন খৃস্টানের নিকট দেখতে পাওয়া যায়। সে রাষ্ট্রের একজন সাধারণ নাগরিক মাত্র। তিনি ইচ্ছা করলে নিজে বা অন্য লোকদের দ্বারা সেটি সহজেই নিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু না, তিনি তা করেন নি। তিনি নিজে এজন বিচারকের নিকট উপস্থিত হলেন নিজের দাবি পেশ করার উদ্দেশ্যে। এই বিচারক ছিলেন শুরাইহ্। মামলা দায়ের করার পর বিচার কক্ষে বিচারকের সম্মুখে বাদী ও বিবাদী উভয়ই উপস্থিত হয়। বাদী হযরত আলী (রা) বললেনঃ বিবাদীর নিকট যে বর্মটি রয়েছে ওটি আসলে আমার। আমি তা বিক্রয় করিনি, তাকে দানও করিনি।

বিচারক বিবাদীকে তার বক্তব্য বলার জন্য আদেশ করলেন। বিবাদী বললঃ না, বর্ম আমার। তবে আমীরুল মু'মিনীন মিথ্যাবাদী, তাও বলব না।' এই সময় বিচারপতি হযরত আলী (রা) কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ এই বর্ম যে আপনার, তার প্রমাণের জন্য কোন সাক্ষ্য পেশ করতে পারেন? হযরত আলী (রা) সহাস্যে জবাব দিলেন, না, আমার নিকট কোন সাক্ষ্য বা প্রমাণ নেই।

---

১. النظام السياسى فى الاسلام ص: ١٥٥-١٥٦

অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে, সাক্ষী হিসেবে তিনি তাঁর ক্রীতদাস কুম্বরকে পেশ করেছিলেন। কিন্তু মনিবের পক্ষে তারই ক্রীতদাসের সাক্ষ্য সুবিচারের নীতিতে গ্রহণযোগ্য নয় বলে বিচারপতি সে সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেন এবং শেষ পর্যন্ত বিচারক রায় দেন যে, এই বর্মটি খৃষ্টান ব্যক্তিরই।

অতঃপর লোকটি বর্মটি গ্রহণ করে চলে যেতে লাগল। হযরত আলী (রা) নীরবে শুধু তাকিয়ে থাকলেন। কিন্তু লোকটি কয়েক পা চলে গিয়ে ফিরে এসে বললঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এ-ই নবী-রাসূলগণের বিচার পদ্ধতি। আমীরুল মু'মিনীন আমাকে বিচারকের নিকট নিয়ে চলুন। তিনি পুনরায় বিচার করবেন।

অতঃপর বললঃ আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, এ বর্মটি আমীরুল মু'মিনীনেরই। আমি পূর্বে মিথ্যা বলেছি।

ইসলামের এ দৃষ্টান্তহীন ন্যায়বিচার দেখে লোকটি পরবর্তীকালে ইসলাম কবুল করে এবং একজন দুঃসাহসী বীর যোদ্ধা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[১]

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফতকালে এক ইয়াহুদী হযরত আলী (রা)-র সাথে বিবাদ করে খলীফাতুল মুসলিমীনের দরবারে মামলা দায়ের করল।

খলীফার দরবারে বাদী-বিবাদী দু'জনই উপস্থিত। হযরত উমর ফারুক (রা) বললেন, 'হে আবুল হাসান! আপনি উঠে আপনার অপর পক্ষের পাশে সমান মর্যাদার স্থান গ্রহণ করুন।'

এ কথা শুনে হযরত আলী (রা)-র হয়ত অপমানিত বোধ হলো, মুখাবয়বে তার চিহ্ন প্রকট হয়ে দেখা দিল। তখন খলীফাতুল মুসলিমীন বললেনঃ

'হে আবুল হাসান (আলী), আপনাকে আপনার বিপক্ষ ইয়াহুদী ব্যক্তির পাশে স্থান নিতে বলায় আপনার হয়ত খুব খারাপ লেগেছে। তখন হযরত আলী (রা) বললেনঃ না, না, তা কখ্‌খনই নয়। আমার খারাপ লেগেছে শুধু এতটুকু যে, আপনি আমাকে আমার নিজের নাম ধরে না ডেকে আমার উপনাম আবুল-হাসান বলে সম্বোধন করেছেন। এ ব্যাপারে আপনি আমার ও আমার বিরুদ্ধ পক্ষ সমান মর্যাদায় রাখেন নি, পূর্ণ সমতা রক্ষা করেননি। অথচ ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম ও অমুসলিম-ইয়াহুদী-খৃষ্টান ইত্যাদি সকলেই সম্পূর্ণভাবে সমান ও অভিন্ন।[২]

দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা) একদা এক বৃদ্ধ অন্ধ ব্যক্তিকে লোকদের নিকট ভিক্ষা চাইতে দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ লোকটি

---

১. بحار الانوار ج: ٩ طبعة تبريز ص: ٥٩٨ الامام على نعلى صوب العدالة الانسانية ص: ٨٧–٨٨

২. ঐ, পৃঃ ৪৯।

কে? বলা হলো, একজন খৃস্টান ব্যক্তি। তিনি বললেনঃ "লোকটির যৌবন ও কর্মক্ষমতার কালে তো তাকে কাজে লাগানো হয়েছে। কিন্তু সে যখন বৃদ্ধ ও অক্ষম হয়ে পড়েছে, তখন তাকে ভিক্ষা করে রুজী রোজগার করার জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে! এটা আদৌ সুবিচার নীতি হতে পারে না। বায়তুলমাল থেকে তার যাবতীয় রুজির ব্যবস্থা করা হোক।"

একটি বর্ণনায় হযরত আলী (রা)-র খিলাফতকালেও এই রকম একটি ঘটনার ও খলীফার পক্ষ থেকে লোকটির জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

এই পর্যায়ে নীতি ও আদর্শের দিক দিয়ে সর্বপ্রথম কুরআনের বিধান উল্লেখ্য। কুরআন মজীদ অমুসলিমদের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করার এবং তাদের প্রতি পূর্ণ সহৃদয়তা ও সুবিচার রক্ষা করার অনুমতি এবং নির্দেশ দিয়েছে। এ পর্যায়ে কুরআন মজীদের আয়াত হচ্ছেঃ

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ* اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلٰى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ـ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (الممتحنة : ٨-٩)

যেসব লোক দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কৃতও করেনি, তাদের সাথে তোমরা কল্যাণময় ব্যবহার করবে ও সুবিচার নীতি কার্যকর করবে—তা থেকে আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিন্দুমাত্রও নিষেধ করছেন না। তোমাদেরকে নিষেধ করছেন সেসব লোকদের ক্ষেত্রে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে দ্বীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত করেছে ও তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করবার জন্য শক্তি প্রদর্শন করেছে, প্রস্তুতি নিয়েছে, তাদের সাথে তোমরা কোনরূপ বন্ধুত্ব পোষণ করবে না। বস্তুত যারাই এই ধরনের লোকদের সাথে কোনরূপ বন্ধুত্ব পোষণ করবে, তারাই জালিম লোক।

এ আয়াত অনুযায়ী মুসলমানদের প্রকৃত শত্রু তারা, যারা দ্বীনের ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করেছে, মুসলমানদের তাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত করেছে অথবা বহিষ্কৃত করার জন্য রীতিমত পাঁয়তারা করেছে, দাপট দেখিয়েছে ও প্রস্তুতি নিয়েছে! অতএব এই শত্রু ভাবাপন্ন লোকদের সাথে মুসলমানরা

কোনরূপ বন্ধুত্ব করতে পারে না। এইরূপ লোক—যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে দ্বীনের কারণে যুদ্ধ করেছে ও নানাভাবে মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে, ক্ষতি করতে চেয়েছে, তারা কখনই মুসলমানদের বন্ধু গণ্য হতে পারে না, তাদের সাথে কোন মুসলমান একবিন্দু বন্ধুত্বের ভাব পোষণও করতে পারে না। করলে তা হবে রীতিমত জুলুম এবং যারা বন্ধুত্ব পোষণ করবে, তারা জালিম বলে গণ্য হবে। অতএব তাদের সাথে মুসলমানদের কোনরূপ শুভ আচরণ বা কোনরূপ ন্যায়বিচার করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

পক্ষান্তরে যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে দ্বীনের ব্যাপার নিয়ে যুদ্ধ করেনি, তাদের ঘর-বাড়ি থেকে তাদের বহিষ্কৃতও করেনি, তারা প্রকাশ্য শত্রু রূপে চিহ্নিত হবে না। অতএব তাদের প্রতি শুভ আচরণ গ্রহণ করা—সর্বোপরি পূর্ণ মাত্রার সুবিচার করা কিছুমাত্র নিষিদ্ধ নয়।

বস্তুত অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের আচার-আচরণ কি হবে, তার জন্য একটি সুষ্ঠু ও চিরস্থায়ী মানদণ্ড এ আয়াতটি আমাদের সম্মুখে পেশ করেছে। আর সে মানদণ্ড হচ্ছে, যারাই মুসলমানদের সাথে শান্তিপূর্ণ নীতি গ্রহণ করে, মুসলমানরাও তাদের সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে। আর যারা মুসলমানদের সাথে শত্রুতার আচরণ করবে, তারা মুসলমানদের শত্রুরূপে চিহ্নিত হবে।

এই আয়াতটির বক্তব্যের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায় নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটিতে! ইরশাদ হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ۔ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۔ وَمَا تُخْفِىْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ (ال عمران: ١١٨)

হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কারোর সাথেই আন্তরিক গোপন বন্ধুত্ব গ্রহণ বা পোষণ করবে না। তারা তোমাদের অসুবিধা-বিপদ কালের সুযোগ নিতে বিন্দুমাত্রও ক্রুটি করবে না। যাতে তোমাদের ক্ষতি বা বিপদ হতে পারে, তা-ই ওদের কাম্য। তাদের মনের প্রতিহিংসা ও শত্রুতা তাদের মুখ থেকেই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। আর যা তাদের মনে এখনও অপ্রকাশিত—প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে, তা তো তার চাইতেও অনেক বড়, তীব্রতর।

আমরা তোমাদেরকে সুস্পষ্ট হেদায়েত দিলাম। তোমরা বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে তা বুঝতে পারলে (কখনই এ হেদায়েতের বিপরীত আচরণ গ্রহণ করবে না)।

অর্থাৎ যে সব লোক মুসলমানদের সাথে শত্রুতা করে, মুসলমানদেরকে নানাভাবে কষ্ট দেয়, নির্যাতন করে এবং মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়ার লক্ষ্যে মুশরিকদের সাথে সহযোগিতা করে, কুরআন মজীদ তাদের প্রতি কোনরূপ দয়া-দাক্ষিণ্যের আচরণ করতে, তাদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব করতে এবং তাদের প্রতি সুবিচার করতে নির্দেশ দেয়নি। বরং তা করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসের পৃষ্ঠার উপর দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যাবে, ইসলামের হুকুমাতের ন্যায়পরতা, সুবিচার ও নিরপেক্ষতাই অমুসলিম খৃস্টান ও ইয়াহুদী ইত্যাদি জাতি ইসলামী হুকুমাতের অধীন জীবন যাপন করাকে তাদের স্বধর্মীয় শাসকদের অধীন জীবন-যাপন করার তুলনায় অধিক অগ্রাধিকার দিয়েছিল। কেননা তারা নিজেদের চোক্ষেই ইসলাম ও মুসলিম সমাজের পরম দয়াশীলতা ও নিরপেক্ষ সুবিচার দেখতে পেয়েছিল। তাদের স্বধর্মীয় শাসকদের অত্যাচার-নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে তারা ইসলামী হুকুমাতের অধীন বসবাস করা অধিক নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ বলে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করত।

প্রখ্যাত ও প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থ 'ফুতুহুল-বুলদান' লেখক বালাযুরী এই পর্যায়ে লিখেছেনঃ

لَمَّا جَمَعَ هِرَقْلُ لِلْمُسْلِمِيْنَ الْجُمُوْعَ وَبَلَغَ الْمُسْلِمِيْنَ اِقْبَالُهُمْ اِلَيْهِمْ بِوَقْعَةِ الْيَرْمُوْكِ رَدُّوْا عَلٰى اَهْلِ حِمْصَ مَا كَانُوْا اَخَذُوْا مِنْهُمْ مِنَ الْخَرَاجِ وَقَالُوْا قَدْ شُغِلْنَا عَنْ نُصْرَتِكُمْ وَالدَّفْعِ عَنْكُمْ فَانْتُمْ عَلٰى اَمْرِكُمْ .....

হিরাক্লিয়াস যখন মুসলমানদের উপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে বিপুল সৈন্য সমাবেশ করল ও 'ইয়ারমুক' নামক স্থানের দিকে অগ্রসর হওয়ার সংবাদ পৌছল, তখন মুসলমানরা ইতিপূর্বে দখল করা 'হিম্‌স'-এর অধিবাসীদের নিকট থেকে গৃহীত 'খারাজ' ফিরিয়ে দিলেন। বললেনঃ এক্ষণে আমরা তোমাদের সাহায্য করতে ও তোমাদের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করতে পারছি না। এখন তোমরা নিজেরাই নিজেদের রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ কর।

এই কথা শুনে 'হিম্‌স'-এর অধিবাসী অমুসলিমরা বললেঃ

لَوِ لَا يَتِكُمْ وَعَدْلُكُمْ اَحَبُّ اِلَيْنَا مِمَّا كُنَّا فِيْهِ مِنَ الظُّلْمِ وَالْغَشْمِ وَلَنَدْفَعَنَّ جُنْدَ هِرَقْلَ عَنِ الْمَدِيْنَةِ مَعَ عَامِلِكُمْ ـ

পূর্বে আমাদের স্বধর্মীয় লোকদের শাসনাধীন যে ভাবে নির্যাতিত হচ্ছিলাম তার তুলনায় তোমাদের শাসন-কর্তৃত্বের অধীন থাকা আমাদের নিকট অধিক

শ্রেয় ও প্রিয়। আমরা তোমাদের সেনাবাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে হিরাক্লিয়াসের মুকাবিলা করব এবং 'হিম্‌স' যাতে সে দখল করতে না পারে তার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

এই সময় ইয়াহুদীরাও দাঁড়িয়ে বললঃ

وَالتَّوْرٰةِ لَا يَدْخُلُ عَامِلُ هِرَقْلَ مَدِيْنَةَ حِمْصَ اِلَّا اَنْ نُّغْلَبَ وَنُجْهَدَ

তওরাতের নামে কসম খেয়ে বলছি; হিরাক্লিয়াস কখ্‌খনই হিম্‌স নগরে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে করে পরাজিত হই। অতঃপর তারা নগর-প্রাচীর-দ্বারসমূহ বন্ধ করে দেয় ও তার পাহারাদারী করতে শুরু করে।[১]

ইয়াহুদী-খৃস্টানদের সাথে সন্ধিক্রমে যে সব নগর মুসলমানদের দখলে আসে, সেখানকার অধিবাসীরাও ঠিক এই নীতিতেই কাজ করেছে। তারা মনে করত—বলতোও যে, রোমানরা বিজয়ী হলে আমরা আবার আবহমানকাল থেকে চলে আসা নির্যাতন-নিষ্পেষণের মধ্যে পড়ে যাব। মুসলমানদের একজন লোক বেঁচে থাকতেও আমরা সে অবস্থা ফিরে আসতে দেব না।

পরে আল্লাহ্ যখন কাফিরদের পরাজিত করলেন ও মুসলমানদের বিজয়ী করলেন, তারা অমুসলমানদের শহর-নগরসমূহে কোনরূপ যুদ্ধ বা রক্তপাত ব্যতীতই দখল করে নিয়েছিলেন এবং অধিবাসীরা রীতিমত 'খারাজ' দিতে শুরু করে।[২]

ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয় ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা এত বেশী, যা গুণেও শেষ করা যাবে না।

খৃস্টানরা যখন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে মুসলমানদের অংশীদার হয়েছিল, তখনকার ইসলামের ইতিহাসে ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের উদারতা এক বিস্ময়কর পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিমদের প্রতি যে কত উদার তা সে সব ঘটনা থকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

ইসলামের বিচারনীতি ও ইসলামে অমুসলিম সংখ্যালঘুদের অধিকার পর্যায়ে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

---

১. فتوح البلدان للامام ابی الحسن للبلاذری
ص: ١٤٢، طبع م السحادة بمصر ١٩٥١

২. فتوح البلدان للبلاذری المتوفی ٢٧٩ هجر ص ١٤٢

অত্যাচারী সরকার

'গভর্নমেন্ট' বা সরকার—এর নাম শুনলেই কিছু লোকের চোখের সম্মুখে অত্যাচারী সরকার ও শাসকদের ভয়াবহ ও বীভৎস চেহারা ভেসে উঠতে পারে, তা কিছুমাত্র বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। কেননা বিশেষ করে প্রাচ্য দেশীয় নাগরিকগণ সাম্রাজ্যবাদী বা ঔপনিবেশিক শাসকদের নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতন-নিষ্পেষণ নিতান্ত অসহায়ভাবে ভোগ করে দীর্ঘকাল পর্যন্ত। 'ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেও ভয় পায়' কথাটিতে যা বোঝায়, এক্ষেত্রেও তা পুরাপুরি প্রযোজ্য। কেননা তারা অসহায় নাগরিকদের প্রতি কোনরূপ দয়া অনুগ্রহ দেখাতে দেখতে পায়নি, তারা দেখেছে কিভাবে সহায়-সম্বলহীন মানুষগুলোকে দুর্বল পেয়ে তাদের উপর অমানবিকভাবে পীড়ন চালানো হয়েছে, তাদের দেহের শেষ রক্তবিন্দুও শুষে নিয়েছে। লুটে নিয়েছে তাদের ঘর-বাড়ি, ভাঙ্গা-চোড়া হাড়ি-পাতিলও। তাদের উপর দাপট চালাবার জন্য তারা তাদেরই মত অন্যান্য শক্তিধর অত্যাচারী লোকদের সাথে মৈত্রী গড়ে তুলেছে, যেন এই নিপীড়িত অসহায় লোকগুলি কারোর নিকট ফরিয়াদও না জানাতে পারে।

কিন্তু ইসলাম এই ধরনের কোন অত্যাচারী নির্মম সরকার কখনই গঠন করেনি। বরং ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত সরকার তো সর্বোত্তম, সর্বাধিক মানবতাবাদী ও সর্বাধিক কল্যাণকামী হয়ে থাকে, ইতিহাসে তা-ই হয়েছে। সে সরকার সর্বক্ষণ জনগণের পক্ষে কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত রয়েছে, জনগণকে সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত রাখতে চেষ্টারত হয়েছে। সর্বোপরি, মহান আল্লাহ্‌র দেয়া সুবিচারক আইনসমূহই জনগণের উপর জারি করেছে, নিজেদের মনগড়াভাবে রচিত আইন নয়।

বস্তুত এ ধরনের সরকার ও প্রশাসনের একটি মাত্র লক্ষ্যই হতে পারে। আর তা হচ্ছে জনগণের নিঃস্বার্থ খেদমত, জনগণের অধিকারসমূহ যথাযথ আদায় করা, তাদের মান-মর্যাদা রক্ষা করা, তাদের ইজ্জত-আবরুর হেফাযত করা, তাদের সৌভাগ্য রচনা করা। ফলে এ ধরনের সরকার ও প্রশাসনের ভিত্তি কেবল যমীনের উপরই প্রতিষ্ঠিত হয় না, হয় জনগণের হৃদয় ফলকের উপর। আর তার শিক্‌ড় জনগণের মাংসের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত ও রক্তের সাথে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়।

আসলে কেবলমাত্র ইসলামই পারে একটি ন্যায়নিষ্ঠ সুবিচারকারী ও নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্য কল্যাণকর একটি সরকার গঠন করতে। মিসরের শাসনকর্তা মালিক আশ্‌তারকে লক্ষ্য করে চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা) লিখেছেনঃ

প্রয়োজনশীল লোকদের জন্য তুমি একটা সময় নির্দিষ্ট রাখবে, যেন তারা তোমাকে পুরাপুরি পায়। তুমি তাদের নিয়ে সাধারণ ও খোলা বৈঠক করবে। তখন তুমি তোমার স্রষ্টা আল্লাহ্র নিকট বিনয়াবনত হয়ে থাকবে। তোমার সৈন্যবাহিনীকে তখন তাদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। তোমার পাহারাদার পুলিশ ইত্যাদিকেও দূরে সরিয়ে দেবে, যেন তারা তোমার সাথে প্রাণখোলা কথা-বার্তা বলতে পারে এবং এই কথা-বলায় কোনরূপ বাধাগ্রস্ত না হয়।[১]

ইসলামের দৃষ্টিতে ন্যায়বাদী সুবিচারক শাসক হচ্ছে সে, যে জনগণের সুখে সুখী ও জনগণের দুঃখে দুঃখিত হয়। সে কখনই সুরক্ষিত দুর্ভেদ্য পাহারা প্রাচীর বেষ্টিত হয়ে থাকবে না। জনগণ রসাতলে ভেসে যাবে আর সে সুখের নিদ্রায় অচেতন হয়ে থাকবে, তা অন্তত ইসলামী শাসক সম্পর্কে চিন্তাই করা যায় না।

অথবা সে নিজের সুখ-শান্তি উন্নতি-উর্ধ্বগতি (Promotion) নিয়েই চিন্তামগ্ন হয়ে থাকবে, জনগণের কল্যাণের চিন্তা করবে না, তাও অকল্পনীয়।

ইসলাম রাষ্ট্রের পরিচালক বা কোন পর্যায়ের প্রশাসক হওয়ার জন্য যেসব শর্ত আরোপ করেছে. যেসব দায়িত্ব ও কঠিন কর্তব্যের কথা বলেছে, আধুনিক কালের রাষ্ট্রজ্ঞানীরা তা চিন্তাও করতে পারে না। তাকে তার যাবতীয় কাজে-কর্মে ইসলামী আইন-বিধানকে অনুসরণ করে চলতে হবে বাধ্যতামূলকভাবে। কোন একটি ক্ষেত্রে বা কোন একটি মুহূর্তেও তাকে জনগণের ব্যাপারে গাফিল হতে দেয় না ইসলাম। বরং প্রতটি মুহূর্তে তাকে এ কাজেই অতিবাহত করতে হবে। তা করলেই ইসলামের দৃষ্টিতে সে যোগ্য শাসক বিবেচিত হতে পারবে। পক্ষান্তরে যে শাসক স্বীয় গদি রক্ষার চিন্তায় দিন-রাত মশগুল থাকে, জনগণের দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটন দূর করার জন্য কোন চিন্তা-ভাবনা করে না, কোন বাস্তব ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে না, ইসলামের দৃষ্টিতে সে কোন পর্যায়েরই শাসক হতে পারে না।

সরকারের প্রতি জনগণের কর্তব্য

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, ইসলামী সরকার ও প্রশাসন জনগণের সর্বাত্মক কল্যাণ সাধনের কঠিন দায়িত্বে স্বয়ং আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই নিযুক্ত হয়ে থাকে এবং এসব দায়িত্ব পালনে তা একান্তই বাধ্য। মানবতাকে পূর্ণত্বের উচ্চতম শিখরে পৌছিয়ে দেয়ার লক্ষ্যেই তাকে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। অতএব এরূপ একটি ইসলামী সরকার ও প্রশাসন গড়ে তোলা মুসলিম উম্মতের জন্য একান্তই কর্তব্য। এরূপ একটি সরকার গঠনের ব্যাপারে কোনরূপ

১. نهج البلاغة – الرسالة رقم ٥٢

মতপার্থক্যের সৃষ্টি না করা, তা গড়ে তোলার পর তার সাথে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং তার প্রতি কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা না করা জনগণের সেই কর্তব্যেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ (الشورى: ١٣)

হে মুসলমানগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই বিধানই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার হুকুম তিনি নূহকে দিয়েছিলেন, আর যা—হে নবী! এখন তোমার প্রতি ওহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি, আর যার হেদায়েত আমরা ইবরাহীম—মূসা—ঈসাকে দিয়েছিলাম এই তাকীদ সহকারে যে, এই দ্বীনকে তোমরা কায়েম কর এবং এ ব্যাপরে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যেও না।

এ আয়াত স্পষ্ট করে বলেছে যে, দ্বীন কায়েম করার নির্দেশ পূর্ববর্তী নূহ-ইবরাহীম-মূসা-ঈসা (আ) প্রমুখ সকল নবী-রাসূলকেই দেয়া হয়েছে। তারই নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে। আর এ কাজেরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে—হে মুসলমানগণ—তোমাদেরকে। ইমাম কুরতুবী লিখেছেনঃ

اَىْ شَرَعَ لَكُمْ اِقَامَةَ الدِّيْنِ -

হে মুসলিমগণ! তোমাদের জন্য দ্বীন কায়েমের কাজকে বিধিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।[১]

অন্য কথায়ঃ দ্বীনকে কায়েম—প্রতিষ্ঠিত রাখো অর্থাৎ স্থায়ী, ধারাবাহিক—অব্যাহত সুরক্ষিত দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, কোনরূপ মতপার্থক্য নেই, কোন অস্থিরতা নেই।[২]

বস্তুত এ আয়াতটিতে দ্বীন কায়েম করার যে নির্দেশ নবী-রাসূলগণকে দেয়া হয়েছে, তা শুধু দ্বীনের কতিপয় আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিক বিধানের প্রচার দ্বারাই পালিত হয় না, সে জন্য দ্বীন-ইসলামকে চিন্তা-বিশ্বাস মতবাদ-মতাদর্শ, সংস্কৃতি-সভ্যতা, আইন-শাসন রাষ্ট্রীয়ভাবে পূর্ণ মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর করারই নির্দেশ রয়েছে এবং সেভাবেই তা পালন করতে হবে।[৩]

এরূপ একটি সরকার গড়ে তোলা, প্রতিষ্ঠিত করা যেমন কর্তব্য, তেমনিভাবে রক্ষা করা ও তার কল্যাণ বিধানে সক্রিয় তৎপরতা অবলম্বন মুসলিম মাত্রেরই

---

১. الجامع لاحكام القرآن ج ١٦. ص ١٠

২. ঐ, পৃঃ ১১।

৩. তাফহীমুল কুরআন, আবুল 'আলা মওদুদী, ৫ম খণ্ড পৃঃ ৪৯২।

কর্তব্য। কেননা উপরোদ্ধৃত আয়াতে أَقِيمُوا الدِّينَ এর একটি অর্থ যেমন দ্বীন কায়েম কর, তেমনি তার অপর একটি অর্থ হচ্ছে 'দ্বীন কায়েম রাখো'। অর্থাৎ যেখানে তা কায়েম নেই সেখানে তা কায়েম করতে হবে। আর যেখানে তা কায়েম রয়েছে, সেখানে তাকে কায়েম ও প্রতিষ্ঠা রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে।

একটি হাদীসের বর্ণনায় রাসূলে করীম (স)-এর উক্তি উদ্ধৃত হয়েছেঃ

الدِّينُ النَّصِيحَةُ দ্বীন হচ্ছে ঐকান্তিক ও নিস্বার্থ কল্যাণ কামনা।

জিজ্ঞাসা করা হলোঃ কল্যাণ কামনা কার জন্য হে রাসূল? বললেনঃ

তা আল্লাহ্‌র জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, রাষ্ট্রনেতাগণের জন্য এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য।[১]

হযরত আলী (রা) বলেছেনঃ

لِلّٰهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِأَئِمَّةِ وَلِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ

রাষ্ট্রনেতার দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করা, তার নিকট সোপর্দ করা আমানতের হক্ আদায় করা। রাষ্ট্রনেতা যদি তা করে তাহলে তার কথা শোনা, তার আনুগত্য করা এবং সে আহ্বান করলে তাতে সাড়া দেয়া জনগণের কর্তব্য।[২]

বস্তুত ইসলামী হুকুমাত যদি তার দায়িত্বসমূহ ইসলামী বিধান অনুযায়ী পালন করে এবং মুসলিম জনগণ যদি সরকারের প্রতি তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন করে, তাহলে তথায় সুবিচার ও ন্যায়পরতা পূর্ণ মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হবে, শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজিত হবে, সার্বিক কল্যাণের প্রস্রবণ প্রবাহিত হবে, সমগ্র দেশে সৌভাগ্য ও উন্নতি উৎকর্ষ ক্রমবৃদ্ধিমান হবে। আর তা-তো মানুষের কাম্য অতি স্বাভাবিকভাবে।

---

১. كتاب الاموال ص: ٩

২. كتاب الاموال ص: ١٢

বিভিন্ন ধরনের সরকার পদ্ধতি

[রাজতন্ত্র—কুরআনে রাজতান্ত্রিক পদ্ধতি—স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের মারাত্মক পরিণতি—বড় লোকদের শাসন —ধনী লোকদের শাসন —গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ।]

দুনিয়ায় বিভিন্ন ধরনের সরকার ব্যবস্থা রয়েছে। তন্মধ্য থেকে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছেঃ

১. রাজতন্ত্র

কোন এক ব্যক্তি যখন সামরিক বিপ্লব কিংবা অস্ত্রশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কোন দেশের কর্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা দখল করে নেয় এবং তারপরই নিজেকে দেশের-সর্বময় কর্তৃত্বের ধারক ও জনগণের রাজা বা বাদশাহ বলে ঘোষণা দেয়, তখন সে সেই দেশের রাজা বা নিরংকুশ বাদশাহ হয়ে বসেছে বলে প্রতিপন্ন হয়। তখন তার বিরুদ্ধতাকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে কঠিন-কঠোর শাস্তি দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। সে কেবল নিজেকে বাদশাহ ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হয় না, সে সর্বসাধারণকে জানিয়ে দেয় যে, অতঃপর দেশে রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চলতে থাকবে এবং তার মৃত্যুর পর তার সন্তানরাই এই রাজক্ষমতার অধিকারী হবে, বংশানুক্রমিকভাবে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তা-ই চলতে থাকবে।

এসব রাজা-বাদশাহ ক্ষমতার তুঙ্গে পৌঁছে যায় এবং ক্ষমতার নেশায় মত্ত হয়ে নিজেকে 'যিল্লুল্লাহ' বা আল্লাহ্‌র 'ছায়া' নামে অভিহিত করতেও সংকোচ বোধ করে না। অন্য কথায় সে ক্ষমতার সর্বোচ্চ আসনে একক ভাবে আসীন হয় ও নিরংকুশভাবে তা কার্যকর করার অবাধ সুযোগ পায় বলে নিজেকে ঠিক আল্লাহ্‌র স্থলাভিষিক্ত ধারণা করে।

রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাসমূহে ইতিহাসের প্রায় সকল অধ্যায়েই এই রূপ দেখা গেছে।

বস্তুত রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ব্যক্তি-শাসনেরই একটি বিশেষ রূপ। সেই ব্যক্তিই হয় তথায় সর্বেসর্বা। রাজা বা বাদশাহ তথায় সার্বভৌমত্বের ধারক, শক্তি ও ক্ষমতার একমাত্র উৎস। রাষ্ট্র ও রাজ্য পরিচালনার নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ সে নিজ দায়িত্বেই করে থাকে। দেশের শাসন ও বিচার ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় আইন সে নিজেই দেয়। অবশ্য এসব ব্যাপারে তার সন্তানরাও কোন কোন সময় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করে থাকে। উত্তরাধিকারসূত্রে তারাই হয় বিরাট রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের বিভিন্ন দিকের কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। এক

কথায়, এ গোটা শাসন ব্যবস্থাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক, উত্তরাধিকারসূত্রে হস্তান্তরিত এবং স্বৈরতান্ত্রিক।

এইরূপ শাসন ব্যবস্থা বাদশাহ বা রাজাকে নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধিকারী বানায় বিধায় তা যেমন স্বৈরতান্ত্রিক, তেমনি অহংকারমূলক। স্বৈরতান্ত্রিক হওয়ার দরুন এই ব্যবস্থাধীন সাধারণ মানুষের কোন মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হয় না — থাকেও না। আর অহংকারমূলক হওয়ার কারণে রাজপরিবার সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, রাজপরিবারের ব্যক্তিরা অন্য সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক শরাফাতের অধিকারী বিবেচিত হয়। আর তাদের ছাড়া অন্যান্য মানুষ হীন, নীচ ও পশুবৎ গণ্য হয়। আর এর পরিণামে বাহ্যিক ভাবে দেশের যতই চাকচিক্য বৃদ্ধি পাক, অন্তঃ সলিলা ফল্গুধারার লোক চক্ষুর ব্যাপক বিপর্যয় সমগ্র দেশটিকে গ্রাস করে নেয়।

ঠিক এই কারণে কুরআন মজীদে এর সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের লোকদের অগ্রাধিকার ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ (القصص: ٨٣)

এই পরকালের শান্তির ঘর তো সেই লোকদের জন্য বানাব, যারা এই দুনিয়ায় সর্বোচ্চতা—সর্বশ্রেষ্ঠত্ব দখল করার জন্য ইচ্ছুক বা সচেষ্ট নয় এবং যারা কোনরূপ বিপর্যয় সৃষ্টিরও পক্ষপাতী নয়।

কুরআনে রাজতান্ত্রিক—বাদশাহী পদ্ধতি

কুরআনুল করীমের দৃষ্টিতে মুলুকিয়াত—রাজতন্ত্র বা বাদশাহী শাসন পদ্ধতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলে স্বভাবতই ব্যাপক ও মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। তথায় ব্যক্তির ইচ্ছাকে সমগ্র জনগণের উপর শক্তিবলে চাপিয়ে দেয়া হয়। লোকেরা তা মেনে নিতে প্রস্তুত না হলে তাদেরকে তা মেনে নিতে বাধ্য করা হয়। ব্যক্তির কামনা-বাসনা-লালসা চরিতার্থ করার জন্য জাতীয় সম্পদকে বে-হিসেব ব্যয় ও প্রয়োগ করা হয়। কেননা দেশের সকল নৈসর্গিক সম্পদ ও শক্তির একচ্ছত্র মালিক হয়ে থাকে সেই রাজা বা বাদশাহ। এ ব্যাপারে কারোরই কোন আপত্তি জানাবার অধিকার থাকতে পারে না। তার সমালোচনা করা, দোষ-ত্রুটি বলে বেড়ানো বা সেজন্য কোনরূপ কটূক্তি করতে যাওয়াও নিজের জন্য ধ্বংস ডেকে আনা ছাড়া আর কিছু নয়। পৃথিবীর সুদীর্ঘ ইতিহাসে রাজতান্ত্রিক তথা বাদশাহী শাসন ব্যবস্থায় এর ব্যতিক্রম কুত্রাপি দেখা যায়নি। কুরআন মজীদ এ সত্যই ঘোষণা করেছে অত্যন্ত বলিষ্ঠ দৃঢ় ভাষায়। ইরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ

(النمل: ٣٤)

স্বৈরতান্ত্রিক ও রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনবসতির উপর কর্তৃত্ব লাভ করে তখন তারা সেই জনবসতিটিকে ধ্বংস করে এবং তার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে বানায় সর্বাধিক লাঞ্ছিত-অপমানিত। তাদের এইরূপ কাজ চিরন্তন।

আল্লাহ্র কালামে উদ্ধৃত এ কথাটি মানব জীবনে কার্যকর ইতিহাসের ধারাবাহিকতার সাথে পূর্ণ মাত্রায় সামঞ্জস্যশীল। ইতিহাসে এর ব্যতিক্রম কখনই দেখা যায়নি, ভবিষ্যতেও এর ব্যতিক্রম দেখা যাবে না। আজকের পৃথিবীর বাস্তব অবস্থা এই ঘোষণার পরম সত্যতা ও বাস্তবতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করছে।

সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ তাঁর তাফসীরে এ আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ স্বৈরতান্ত্রিক শাসক শক্তির প্রকৃতিই হচ্ছে এই যে, তা যে দেশেই প্রতিষ্ঠা পায়, সে দেশেই ব্যাপক বিপর্যয় প্রচণ্ড করে তোলে। সে দেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। সে দেশের মান-মর্যাদা পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে। সে দেশের প্রতিরক্ষা শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। সেখানকার সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে। কেননা এই ব্যক্তিরাই হয়ে থাকে সে দেশের প্রকৃত প্রতিরোধ শক্তি। বস্তুত এটাই হচ্ছে এই শাসক শক্তির স্থায়ী চরিত্র। এর ব্যতিক্রম কখনই হতে পারে না।[১]

বস্তুত কুরআন মজীদ বিভিন্ন প্রসঙ্গে রাজা-বাদশাহ ও স্বৈর শাসকদের মানবতা বিরোধী কার্যকলাপের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। তারা সাধারণ মানুষের উপর নিজেদের শান-শওকত ও শক্তির দাপট চালায়, জনগণের ধন-সম্পদ নির্মম ও নির্লজ্জভাবে লুটে-পুটে নিয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে তারা না কোন নিয়মনীতি মেনে চলে, না কোন সীমায় গিয়ে থেকে যেতে রাযী হয়। দুর্বল অক্ষম ও মিসকীন লোকদের সমান্য-সামান্য সম্পদ জোরপূর্বক কেড়ে নিতেও তারা কুণ্ঠিত হয় না। নিপীড়িত জনগণের মর্মবিদারী ফরিয়াদ তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না।

কুরআনে অন্য একটি প্রসঙ্গে একজন স্বৈরশাসকের চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, একজন দরিদ্র ব্যক্তি নিজের নৌকায় লোক পারাপার করে জীবিকা নির্বাহ করত। এক সময় এই আশঙ্কা প্রবল হয়ে দেখা দিল যে, বাদশাহ্ স্বৈরশাসক তার সেই নৌকাটি পর্যন্ত কেড়ে নেবে।

প্রসঙ্গটি হযরত খিজির ও হযরত মূসা (আ)-এর জ্ঞানান্বেষণমূলক সফর কাহিনী। হযরত খিজির একটি নৌকায় নদী পার হয়ে ওপারে পৌঁছে সেই

---

১. في ظلام القران ج: ١٩، ص: ١٤٦

নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দিয়েছিলেন। তার কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেনঃ

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (الكهف: ٧٩)

সেই নৌকাটির ব্যাপার এই ছিল যে, সেটি ছিল কয়েকজন গরীব ব্যক্তির মালিকানা, এই নৌকাটিকে কেন্দ্র করে তারা নদীতে শ্রম-মজুরী করত। আমি সেটিকে দোষযুক্ত করে দিতে চেয়েছিলাম কেননা তাদের অঞ্চলে একজন রাজা—স্বৈর শাসক—রয়েছে, যে প্রতিটি নৌকা জোরপূর্বক কেড়ে নেয়।

যে নৌকাটির কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে, কুরআনের কথানুযায়ী সেটি ছিল কয়েকজন মিসকীন দরিদ্র ব্যক্তির জীবিকার্জনের মাধ্যম বা উপায়। এই নৌকাটিতে চড়েই তারা নদী-পথে নিজেদের শ্রম বিনিয়োগ করতে পারছিল। নৌকাটি ব্যতীত তাদের শ্রম করার কোন উপায় ছিল না। সেই নৌকাটি কেড়ে নেয়া কোন ন্যায়পরায়ণ আদর্শবাদী—ইসলামী প্রশাসকের কাজ হতে পারে না। কিন্তু তথাকার বাদশাহ তাই কেড়ে নিত! অন্য কথায়, দরিদ্র জনগণের জীবিকা নির্বাহের উপায়সমূহ করায়ত্ত করে তাদেরকে শ্রম করে উপার্জন করার উপায় থেকে বঞ্চিত করে দিয়ে ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করে মরে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দেয়াই রাজা-বাদশাহ ও স্বৈর শাসকদের নীতি এবং চরিত্র। অর্থাৎ স্বৈর শাসন শুধু রাজনৈতিক শক্তিকে করায়ত্ব করা নয়, অর্থনৈতিক শক্তি ও উপায়গুলিকেও নিজের একক দখলে নিয়ে আসা। রাজতন্ত্র, বাদশাহী—তথা যে কোন প্রকারের সম্মান ঠিক এই কারণেই আল্লাহ প্রদত্ত আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

মিসরের ফিরাউনী শাসনের ইতিহাসেও এই অবস্থারই বাস্তব চিত্র লক্ষ্য করা যায়। ফিরাউন দেশের আপামর জনগণের উপর নিরংকুশ শাসন চাপিয়ে সারাদেশের যাবতীয় ধন-মালের একচ্ছত্র মালিক হয়ে বসার ঘোষণা দিয়েছিল। ফিরাউন উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করেছিলঃ

يٰقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْأَنْهٰرُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي ـ أَفَلَا تُبْصِرُونَ *

(الزخرف: ٥١)

হে জনগণ! সমগ্র মিসরের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কি আমার করায়ত্ত নয়? আর এই নদী সমুদ্র কি আমারই নিয়ন্ত্রণাধীন প্রবাহমান নয়? .... তোমরা কি এসব দেখতে পাও না, লক্ষ্য কর না?

এই নিরংকুশ—রাজতন্ত্র—স্বৈর শাসন আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান পালন করে না, কোন বিশেষ ও স্থির রীতি-নীতিরও অনুসারী নয়, বরং তা এক ব্যক্তির স্বাধীন বিমুক্ত ইচ্ছার অন্ধ অনুসারী, তাই সেই ব্যক্তির ইচ্ছা কামনা-বাসনা চরিতার্থ করাই হয় সে শাসনের একমাত্র লক্ষ্য। সারাদেশের যাবতীয় ধন-সম্পদ ও সম্পদ-উৎপাদনের উৎস সবকিছুরই নিরংকুশ মালিক হয়ে বসা এবং তার কোন কিছুর উপর জনগণের কোন অধিকার স্বীকার না করাই হচ্ছে তার প্রকৃতি ও স্বভাব। সাধারণ মানুষের দখলে কোথাও কিছু থাকলেও তা কোন-না-কোন সময়ে কেড়ে নেয়াই তার নীতি।

রাজতন্ত্র—বাদশাহী ও স্বৈর শাসনের এ-ই যখন স্বভাব, তখন শরীয়াতের বিধানের কথা তো অনেক দূরের, সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি কি করে তা সমর্থন করতে পারে? কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ এইরূপ শাসন ব্যবস্থার হাতে কি করে সঁপে দেয়া যেতে পারে? এসব স্বার্থপর অহংকারী শাসন-ব্যবস্থা কোনক্রমেই সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। ওরা মানুষের জীবন, ইজ্জত-আব্রু ও রুটি-রুজি নিয়ে স্বেচ্ছাচারিতায় মেতে থাকবে আর সাধারণ মানুষ তা চুপচাপ সহ্য করে যাবে—এটাই বা ধারণা করা যেতে পারে কিভাবে?

রাজতন্ত্র, বাদশাহী ও স্বৈর শাসনে ব্যক্তির ইচ্ছা সমষ্টির উপর বিজয়ী ও প্রবল হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। তা হয়ে দাঁড়ায় কোটি কোটি মানুষের হর্তা-কর্তা-বিধাতা, সেখানে সকল মানবিক মর্যাদা, মূল্যমান পদদলিত হয় অনিবার্যভাবে। মানুষের নৈতিকতা হয় চরমভাবে বিপর্যস্ত। দূর অতীত-নিকট অতীতের এবং বর্তমান সময়ের সকল রাজা-বাদশাহ্-স্বৈর শাসনের এ-ই হচ্ছে অভিন্ন রূপ।

আল্লামা তাবাতাবায়ী তাঁর প্রখ্যাত তাফসীর আল-মীযান-এ এ পর্যায়ে লিখেছেনঃ সমাজ সমষ্টির উপর কার কর্তৃত্ব চলবে, এই প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে যে, ইসলামী সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা রাজতান্ত্রিক-বাদশাহী-স্বৈর শাসন পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও সর্বদিক দিয়ে ভিন্নতর। রাজতান্ত্রিক-স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র দেয়া সম্পদ ও সম্পত্তি কেবল সিংহাসনাসীন ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট করা হয়, তারই ভোগ-সম্ভোগের ইন্ধন বানানো হয় সকল মানুষকে তা থেকে বঞ্চিত করে। সমস্ত মানুষ হয় তার দাসানুদাস, আর সে তাদের নিয়ে যা ইচ্ছা হয় নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে সে তা-ই করে যায়। নিজ ইচ্ছামত তাদের উপর শাসন চালায়। তা পাশ্চাত্যের তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ঘোষণারও পরিপন্থী, যদিও ইসলাম ও পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার

মধ্যে বিরাট ও মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, কোন একটি দিক দিয়েও এ দু'য়ের মাঝে একবিন্দু সাদৃশ্য নেই।

পাশ্চাত্যের এসব সমাজ ব্যবস্থায় স্থূল ও বস্তুগত ভোগ-সম্ভোগকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তার ফলে এক শ্রেণীর লোকেরা অধিক সুযোগ-সুবিধা লাভ ও বেশীর ভাগ লোকের নিকৃষ্ট গোলাম ও অধিকার বঞ্চিত হয়ে থাকা একান্তই অনিবার্য হয়ে পড়ে।

এ কথা কাল্পনিক নয়, ঐতিহাসিকভাবে সত্য। দূর অতীতের ইতিহাসে যেমন এ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু থাকার কথা উল্লিখিত হয়েছে, নিকট অতীতের—বরং বর্তমান দুনিয়ার অবস্থা—ইতিহাসেও এ ধরনের শাসন ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত কিছুমাত্র বিরল নয়।

মিসরীয় ইতিহাসের ফিরাউনী শাসন, রোমান ইতিহাসে কাইজারের শাসন এবং পারস্য ইতিহাসের কিসরা শাসন তো এমন ঐতিহাসিক ব্যাপার, যা অস্বীকার করা কোন শিক্ষিত লোকের পক্ষেই সম্ভব নয়। এই শাসন-ব্যবস্থাসমূহে শাসক নিজে ইচ্ছা ও খাহেশ অনুযায়ী শাসনকার্য চালিয়েছে। কেননা এ সব-কয়টি শাসনই ছিল নিরংকুশ কর্তৃত্বের শাসন। তরবারির জোরেই এই শাসন ব্যবস্থাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠার দিন থেকে যত কাল-ই তা অক্ষুণ্ন রয়েছে, তরবারিই তার বৈধতা প্রতিষ্ঠিত করেছে। সাধারণ মানুষ ছিল চরমভাবে অসহায়, মানবিক অধিকার থেকেও নির্মমভাবে বঞ্চিত, দাসানুদাস। রাজতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শাসনের তা ছিল নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। এসব শাসন কিভাবে মানুষের অধিকার হরণ করেছে, কিভাবে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে তাদের জোরপূর্বক বহিষ্কৃত করে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছে, তাদের জমি-ক্ষেত থেকে তাদের উৎখাত করেছে, এমন এক স্থানে নির্বাসিত করেছে, যেখানে ঘাস ও পানির নাম চিহ্ন-ও নেই, যেখানে জীবন সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং চরম প্রাণান্তকর অবস্থায় পড়ে থাকতে—হাজার হাজার নয়—লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাধ্য করেছে, সে সবের মর্মবিধারী কাহিনী বিশ্ব ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এখন জ্বলজ্বল করছে।

মোটকথা, রাজকীয় শাসন মূলত ও কার্যত স্বৈরতান্ত্রিক শাসন আর স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের নির্মম ও মানবতা-বিরোধী কার্যকলাপের বিবরণ দেয়া খুব একটা সহজসাধ্য—কাজ নয়। স্বৈর শাসনের মারাত্মক বিপর্যয় সত্যিই অবর্ণনীয়।

অবশ্য কুরআন মজীদে এ পর্যায়ের শাসন ব্যবস্থার যেসব কাহিনী উদ্ধৃত হয়েছে, তা আমরা এখানে সহজেই উল্লেখ করতে পারি।

স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের মারাত্মক পরিণতি

কুরআন মজীদে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন পর্যায়ে ফিরাউনী শাসনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন ফিরাউনকে একজন গর্বিত, অহংকারী 'মাথা উঁচুকারী' 'সীমালংঘনকারী', 'বাড়াবাড়িকারী' শাসকরূপে চিহ্নিত করেছেন। বলেছে, সে নিজেকে অন্যান্য সকল মানুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ, উন্নত ও উত্তম বলে দাবি করছে। সকলের ইচ্ছার উপর তার ইচ্ছা বিজয়ী, প্রধান ও প্রভাবশালী বলে ঘোষণা করছে। বলা হয়েছেঃ

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَرُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ بِآيَتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (يونس : ٧٥)

অতঃপর আমরা তাদের পরে মূসা ও হারুনকে আমাদের আয়াতসমূহ সহকারে ফিরাউন ও তার দলীয় সরদার মাতব্বরদের নিকট পাঠিয়ে ছিলাম। কিন্তু তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভ প্রকাশ করল। আসলে তারা ছিল-ই অপরাধী লোক।

فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ - وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ (يونس: ٨٣)

তারপর অবস্থা এই হলো যে, ফিরাউনের বিপুল লোকজনের মধ্য থেকে মাত্র কতিপয় যুবক ছাড়া মূসার প্রতি আর কেউ-ই ঈমান আনল না। তার কারণই ছিল ফিরাউন ও স্বয়ং নিজ জাতির কর্তৃত্বশালী লোকদের ভয়। ভয় ছিল এই যে, ফিরাউন তাদেরকে আযাবে নিমজ্জিত করবে। আর ফিরাউন তো দুনিয়ায় শক্তিমান ও সর্বোচ্চ কর্তৃত্বশালীরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর সে ছিল সকল সীমালংঘনকারী লোকদের একজন।

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَرُونَ بِآيَتِنَا وَسُلْطَنٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ (المؤمنون: ٤٥-٤٦)

অতঃপর আমরা মূসা ও তার ভাই হারুনকে আমাদের নির্দশনাদি ও সুস্পষ্ট দলীল সহকারে ফিরাউন ও তার দল-বলের নিকট পাঠিয়েছিলাম। তখন তারা অহংকার-গর্ব প্রকাশ করল। আর আসলে তারা নিজদিগকে সর্বোচ্চ স্থানীয় মনে করত।

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ (الدخان ٣٠- ٣١)

আমরা বনি ইসরাইলদের অত্যন্ত অপমানকর আযাব থেকে নিশ্চিতভাবেই মুক্তি দিয়েছিলাম। সে আযাব দিচ্ছিল ফিরাউন। আর সে ছিল সীমা-লংঘনকারী উচ্চাভিমানী ব্যক্তি।

ফিরাউন সম্পর্কে পর পর উদ্ধৃত এ চারটি আয়াতে ফিরাউনের একটি চিত্র স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে—ফিরাউন ছিল বড় অহংকারী। নিজেকে ও নিজেদের দলবলকে সে সর্বোচ্চ স্থানীয় ও অন্যান্য সকল মানুষের উপর প্রবল পরাক্রান্ত ও সর্বাধিক প্রভাব ও কর্তৃত্বসম্পন্ন জ্ঞান করত। ফলে সে তার শাসনাধীন—বিশেষ করে অসহায় বনি ইসরাইলীদের কঠিন অপমানকর আযাবের মধ্যে নিমজ্জিত করে দিয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুক্তিদানের উদ্দেশ্যেই হযরত মূসা ও তাঁর ভাই হারুন (আ)-কে ফিরাউন ও তার দলবলের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তারা এতই অহংকারী-গৌরবী ছিল যে, তারা হযরত মূসা ও হারুনের দাওয়াত মেনে নিতে রাযী হয়নি। মানবেই বা কি করে; তারা তো নিজেদেরকে অন্যসব মানুষ থেকে স্বতন্ত্র ও উচ্চ স্থানীয় মনে করে। তারা যেমন অপর কারোর কোন যুক্তিসঙ্গত কথা মেনে নিতে রাযী হতে পারে না, তেমনি তারা অন্যান্য সাধারণ মানুষের উপর নির্মম অত্যাচার চালাতে অবশ্যই উদ্যোগী হবে। তাদের অপমানকর আযবে মানুষ হবে অকথ্যভাবে নিপীড়িত, সারাদেশে ব্যাপক বিপর্যয় দেখা দেয়া এরূপ অবস্থায় নিতান্তই অপরিহার্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। ফিরাউনের মনোভাব ছিল নিঃসন্দেহে স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব, ওরূপ মনোভাবেরই ফসল হচ্ছে জনগণের উপর স্বৈরতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন। যেখানেই শাসকদের মধ্যে ওরূপ মনোভাবের জন্ম হয়েছে, সেখানেই স্বৈরতান্ত্রিক শাসন অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। কুরআন মজীদে এ পর্যায়ে আরও বলা হয়েছেঃ

وَجَاوَزْنَا بِبَنِىٓ إِسْرَآئِيلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا ـ حَتّٰى إِذَآ أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ـ قَالَ اٰمَنْتُ أَنَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا الَّذِىٓ اٰمَنَتْ بِهِ بَنُوٓا إِسْرَآئِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞ آلْئٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (يونس : ٩٠-٩١)

বনি ইসরাইলদের আমরা সমুদ্র অতিক্রম করালাম। তখন ফিরাউন তার সৈন্যবাহিনী তাদের অনুসরণে সমুদ্রে নেমে পড়ল। তারা বাড়াবাড়ি ও জুলুমের উদ্দেশ্যেই তা করেছিল। শেষ পর্যন্ত ফিরাউন যখন ডুবে যেতে লাগল, তখন বললঃ আমি বিশ্বাস করি যে, বনি ইসরাইলীরা যে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছে সে ব্যতীত ইলাহ্ আর কেউ নেই। আমি অনুগত লোকদের একজন। তখন বলা হলোঃ তুমি এখন ঈমান আনছো, অথচ এর পূর্ব পর্যন্ত তুমি আল্লাহ্র নাফরমানী করছিলে, আর তুমি ছিলে একজন বিপর্যয়কারী ব্যক্তি।

ফিরাউন তো মিসরের লোকদের দাসানুদাস বানিয়ে রেখেছিল। সে ছিল বড় অহংকারী। জনগণের মৌলিক মানবিক অধিকারটুকু পর্যন্ত হরণ করে নিয়েছিল। তার উপর দিয়ে যেমন কারোর কথা চলতো না, তেমনি তার উপর কথা বলার সাহসও কারোর ছিল না।

ফিরাউন হযরত মূসা ও হারুনের তওহীদী দাওয়াত কবুল করেনি, বনি ইসরাইলীদের মুক্তিদানের দাবিও মেনে নিতে রাযী হয়নি। তার কারণ কি?

কুরআনে বলা হয়েছেঃ

فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ـ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُونَ ـ

(المؤمنون: ٤٦-٤٧)

ওরা অহংকার দেখাল। ওরা ছিলই উচ্চতর স্থান দখলকারী লোক। ওরা বলেছিলঃ আমরা কি আমাদেরই মত দুইজন লোকের কথা মেনে নেব, অথচ ওদের লোকেরাই আমাদের অধীন দাসানুদাস?

হযরত মূসা ও হারুন (আ) নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র রাসূল রূপেই ফিরাউনের নিকট পেশ করেছিলেন এবং একদিকে ফিরাউনকে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিয়েছিলেন আর অপর দিকে বনি ইসরাইলীদের মুক্তি দানের দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু সে এর কোন একটি কথাও মেনে নেয়নি। না মানার কারণ হিসেবে উদ্ধৃত আয়াতটিতে তিনটি কথা বলা হয়েছে। একটিঃ ফিরাউন ও তার সঙ্গী-সাথীরা নিজেদেরকে সর্বোচ্চ স্থানীয় মনে করার অহংকারে লিপ্ত ছিল। দ্বিতীয়, তারা তাদেরই মত মানুষ মূসা ও হারুনকে আল্লাহ প্রেরিত বিশ্বাস করতে রাযী হতে পারেনি। আর তৃতীয় হচ্ছে, তারা বনি ইসরাইলীদের—যারা মূসা ও হারুনের বংশের লোক ছিল—দাসানুদাস বানিয়ে রেখেছিল। বনি ইসরাইলীদের দাসানুদাস বানিয়ে রাখার উপরই হযরত মূসা ও হারুন আপত্তি জানিয়েছিলেন ও তার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। জবাবে ফিরাউন বলেছিলঃ

أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَّلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ـ (الشعراء: ١٨)

আমরা কি তোমাকে বাচ্চা বয়সে লালন-পালন করিনি? এবং তুমি কি আমাদের মধ্যে তোমার বয়সের কতিপয় বছর-কাল অবস্থান কর নি?

এ কথার জবাবে হযরত মূসা (আ) বলেছিলেনঃ

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَّ بَنِيٓ إِسْرَآئِيلَ (الشعراء: ٢٢)

হ্যাঁ, এটা তো একটা নিয়ামত ছিল। আর তুমি আমার উপর সেই অনুগ্রহের দোহাই দিচ্ছ এবং এটাকে কারণ বানিয়ে তুমি বনি ইসরাইলদের দাসানুদাস বানিয়ে রেখেছ।

অর্থাৎ মূসার বাল্যকালে ফিরাউনের ঘরে লালিত-পালিত হওয়া ও তাদের মধ্যে তাঁর বয়সের কয়েকটি বছর অবস্থান করার ব্যাপারটি ছিল আল্লাহ্‌র একটি নিয়ামত—একটি বিশেষ ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থা দেখিয়ে মূসার প্রতি ফিরাউনের অনুগ্রহ প্রদর্শন যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। আর এই কারণ দেখিয়ে বনি ইসরাইলীদের দাসানুদাস বানিয় রাখারও কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

অর্থাৎ স্বৈর শাসক তার স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের পক্ষে ব্যক্তিগত অনুগ্রহ বর্ষণকে দাঁড় করাতে চেষ্টা করে। কিন্তু যুক্তির কষ্টিপাথরে তা কিছুতেই উত্তীর্ণ হতে বা যুক্তিসঙ্গত বলে প্রমাণিত হতে পারে না। আসলেই ফিরাউন ছিল চরম অহংকারী, উচ্ছৃঙ্খল, সীমালংঘনকারী ও স্বৈরতান্ত্রিক। সে কারোর উপদেশ-নসীহত শুনতে প্রস্তুত হয় না, কারোর একবিন্দু বিরূপ সমালোচনা বরদাশ্‌ত করতে রাযী হতে পারে না। তখন তার নিকৃষ্টতম কার্যাবলীকে সে সুন্দর ও কল্যাণময় কাজ হিসেবে জনগণের সম্মুখে পেশ করে ও সেই সব কাজের দোহাই দিয়ে স্বীয় স্বৈর শাসনের যৌক্তিকতা ও বৈধতা প্রমাণ করার জন্য নিষ্ফল চেষ্টা করে।

কুরআনের এ আয়াতদ্বয়ে সেই কথাই বলা হয়েছেঃ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ـ اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ـ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ـ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ (المؤمن: ٣٦-٣٧)

ফিরাউন বললঃ হে হামান, আমার জন্য একটি উচ্চ ইমারত নির্মাণ কর, যেন আমি উর্ধ্বলোকের পথসমূহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি—আকাশমণ্ডলের পথসমূহ এবং মূসার খোদাকে চোখ দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি। এই মূসা তো আমার কাজে মিথ্যাবাদী মনে হয়—এভাবে ফিরাউনের জন্য তার বদ আমল চাকচিক্যময় বানিয়ে দেয়া হলো এবং তাকে সঠিক পথ থেকে বিরত রাখা হলো। ফিরাউনের সমস্ত চালবাজি তার নিজের ধ্বংসেই ব্যবহৃত হলো।

বস্তুত স্বৈরতন্ত্রী শাসক নিজের মতকেই চূড়ান্ত মনে করে। তার বিশ্বাস—জনগণেরও উচিত তার মতকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নেয়া। সে যা চিন্তা করে, তার যৌক্তিকতা সকলেরই মাথা পেতে নেয়া কর্তব্য। সে মত ও চিন্তা বাস্তবিকই যুক্তিভিত্তিক ও সুবিবেচনাপ্রসূত কিনা, তা জনগণের বিচার্য বিষয় নয়। স্বৈর শাসক যখন বলে দিয়েছে, তখন আর সে বিষয়ে জনগণের কিছু বলবার বা

ভাববার কি থাকতে পারে। স্বৈর শাসকের কথাই হবে আইন, জনগণ তা অকুণ্ঠিত মনে ও নির্বাক চিত্তে মেনে নেবে, এ-ই তো হওয়া উচিত! তার মত ও ইচ্ছা-বাসনার নিকট সকলেরই আত্মসমর্পণ করা কর্তব্য।

হযরত মূসা (আ) লোকদের সম্বোধন করে ফিরাউনের স্বৈর শাসনের প্রেক্ষিতে বলেছিলেনঃ

يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِى الْاَرْضِ ـ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا (المؤمن : ٢٩)

হে আমার জনগণ! আজ তোমরাই বাদশাহী ও কর্তৃত্বের অধিকারী, পৃথিবীতে তোমরাই বিজয়ী—প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আল্লাহ্‌র আযাব যদি এসেই পড়ে, তাহলে তখন কে আমাদের সাহায্য করবে (তা ভেবে দেখছ কি)?

অর্থাৎ তোমাদের এই স্বৈর শাসন ও বিজয়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আল্লাহ্‌র আযাব আসার কারণ। সে আযাব যদি এসে-ই পড়ে, তাহলে তা ঠেকানো এবং জনগণকে সে আযাব থেকে রক্ষা করা এই স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে আদৌ সম্ভব হবে না।

ফিরাউন হযরত মূসার একথা শুনে জবাবে বললঃ

مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ (المؤمن: ٢٩)

আমি তো তোমাদেরকে সেই মত-ই দেব, যা আমার দৃষ্টিতে সমীচীন। আর আমি সেই পথই তোমাদেরকে দেখাব, যা (আমার দৃষ্টিতে) সত্য ও সঠিক।

অর্থাৎ স্বৈর শাসকের মত জনগণের মত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর এবং সে মতকেই সকলের উপর চাপিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। সে যে পথকেই সত্য ও সঠিক মনে করবে, তাকে অন্যরা সত্য ও সঠিক মনে না করলেও—তা আল্লাহ্ এবং রাসূলের দেখানো পথের বিপরীত হলেও সেই পথে সকলকে চলতে বাধ্য করাই নীতি। ফলে স্বৈর শাসক গোটা সমাজের বিপুল জনতাকে দুর্বল পেয়ে তাদের অপমান করতে একবিন্দু কুণ্ঠিত হয় না। যেমন ফিরাউন মিসরের জনগণকে অপমানিত করেছিল বলে কুরআন বলেছেঃ

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ ـ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ (الزخرف: ٥٤)

ফিরাউন তার অধীন বসবাসকারী জনগণকে নির্বোধ বানিয়ে তাদেরকে গুমরাহীর দিকে পরিচালিত করেছিল। আর সেই জনগণও তাকে মেনে নিয়েছিল। মেনে নিয়েছিল এজন্যে যে, তারা নিজেরাই ছিল আল্লাহ্‌র সীমালংঘনকারী লোক।

স্বৈর শাসনে শাসিত জনতা বাস্তবিকই নির্বোধ হয়ে যায়। তারা স্বাধীন বিমুক্ত চিন্তা-বিবেচনা শক্তিও হারিয়ে ফেলে। স্বৈর শাসনের অধীন স্বাধীন চিন্তার অবকাশ থাকে না বলেই এরূপ হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। তখন স্বৈরতন্ত্রী শাসন জনগণকে নিজের দাসানুদাসে পরিণত করে নেয়। তখন সে চায়, জনগণ অন্ধের মত তার অনুসরণ করুক, নিজেদের স্বাধীন চিন্তা-বিবেচনা তুলে রেখে নিতান্ত অক্ষমের ন্যায় তাকে মেনে চলুক। তার কার্যকলাপে কেউ 'টু' শব্দটি না করুক।

অন্য কথায়, স্বৈরতন্ত্রী শাসক চায়, মানুষ আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনে যেমন তাঁর দাসত্ব করা ও তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলা স্বীয় কর্তব্য বলে মনে করে, ঠিক সেই রকমই তার দাসত্ব করুক, তার কথা অকপটে মেনে নিক। স্বৈর শাসক কখনই পছন্দ বা বরদাশত করতে পারে না যে, মানুষ তার অধীন থেকে অন্য কারোর—এমন কি আল্লাহ্র—দাসত্ব করুক, আল্লাহ্র বিধান পালন করুক। তার পথে সে প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতেও কুণ্ঠিত হয় না। যদি কেউ সব বাধা অতিক্রম করে এক আল্লাহ্র দাসত্ব করে, তাহলে তখন সে তাদেরকে অমানুষিক অত্যাচারে জর্জরিত করে। তাকে কারাগারে বন্ধী করে। তথায় যত রকমে পীড়ন দেয়া সম্ভব তাই দিয়ে তার উপর নিপীড়ন চালায়। কুরআন মজীদ ফিরাউনের এ ধরনের কার্যকলাপের বিবরণ উপস্থাপিত করেছে। একটি আয়াতঃ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ (القصص: ٣٨)

ফিরাউন বললঃ হে জনগণ! আমি ছাড়া তোমাদের আর কেউ ইলাহ্ আছে বলে আমি জানি-ই না।

এভাবে স্বৈরতন্ত্রী শাসক শেষ পর্যন্ত নিজেকেই জনগণের সর্বময় কর্তা ও সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী শাসক রূপে জনগণকে মেনে নেয়ার আহবান জানায়। যেমন ফিরাউন জানিয়েছিলঃ

فَحَشَرَ فَنَادٰى - فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى (النزعت:٢٣-٢٤)

ফিরাউন জনগণকে একত্রিত করে ভাষণ দিল। বললঃ আমি-ই হচ্ছি তোমাদের সর্বোচ্চ রব্ব।

সে আল্লাহ্র রাসূল হযরত মূসা (আ)-কে পর্যন্ত ধমক দিল। বললঃ

لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ (الشعراء: ٢٩)

হে মূসা! তুমি যদি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে 'ইলাহ্' রূপে গ্রহণ কর, তাহলে আমি তোমাকে গ্রেফতার করে কারাগারে বন্দী করে দেব।

এই স্বৈরাচারীর ক্রোধের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যায় যখন সে দেখতে পায় যে, তার-ই অধীন, তারই শাসিত দুর্বল-অক্ষম-দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা তার পরিবর্তে অন্য কাউকে 'ইলাহ' বা 'রব্ব' মেনে নিয়েছে এবং তাঁরই সমীপে নিজেকে সমর্পিত করে দিয়েছে এবং তাঁরই আনুগত্য করে সম্পূর্ণ ভিন্নতর জীবন ধারা গ্রহণ করে চলেছে। তখন সে সর্বশক্তি নিয়োগ করে তার উপর নির্যাতন-নিষ্পেষণের স্টীম রোলার চালাতে শুরু করে। এ সময় স্বৈর শাসকের মুখ থেকে তার যে মনোভাব প্রকাশিত হয়, কুরআনের ভাষায় তা-ই ছিল ফিরাউনের কথা। সে বলেছিলঃ

اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ (الشعراء: ٤٩)

তোমরা মূসার কথা মেনে নিলে আমার অনুমতি দেয়ার আগেই? নিশ্চয়ই সে তোমাদের মধ্যে সেই বড় ব্যক্তি, যে তোমাদেরকে যাদুবিদ্যা শিখিয়েছে। (এর পরিণাম কত ভয়াবহ হতে পারে, তা) তোমরা শিগগীরই জানতে পারবে। আমি (তোমাদের এই অপরাধের শাস্তি স্বরূপ) তোমাদেরকে হাত ও পা বিপরীত দিক দিয়ে কেটে ফেলব এবং তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করব।

اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ـ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ـ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى (طه: ٧١)

তোমরা তার (মূসা'র) প্রতি ঈমান আনলে আমার অনুমতি দেয়ার আগেই? বোঝা গেল, সেই তোমাদের সেই বড় ব্যক্তিটি, যে তোমাদেরকে যাদুবিদ্যা শিখিয়েছে। ....ঠিক আছে, এখন আমি তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং খেজুর গাছের উপর তোমাদেরকে শূলে বসাব, তাহলেই তোমরা বুঝতে পারবে, আমাদের দু'জনার মধ্যে আযাব দেয়ার দিক দিয়ে কে অধিক কঠোর ও নির্মম এবং কে অধিক টিকে থাকতে সক্ষম।

স্বৈর শাসক জনগণকে উপদেশ ও সমঝ-বুঝ দিয়ে নিজের পক্ষে নিয়ে আসার সামাজিক পদ্ধতি অবলম্বনের ধার ধারে না, তার প্রয়োজনও মনে করে না। সে কারোর সাথে মত বিনিময় বা একজনের মতের মূলে নিহিত যুক্তিধারা বুঝতেও প্রস্তুত নয়। হযরত মূসা ও হারুন (আ)-এর তওহীদী দাওয়াতের মর্ম বুঝতে না পেরে তারা নিজেরা যেমন ক্ষমতালোভী, তাঁদেরকেও তেমনি মনে করে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিল এই বলেঃ

أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ ـ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ (يونس: ٧٨)

তোমরা কি আমার নিকট এ উদ্দেশ্যেই এসেছ যে, আমরা যে আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে চলে আসা ধর্মমত ও কাজকর্ম অনুসরণ করে চলেছি তা থেকে তোমরা আমাদেরকে ভিন্ন দিকে ফিরিয়ে নেবে? আর দেশে সকল প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব-প্রাধান্য-কর্তৃত্ব কেবল তোমাদের দু'জনারই প্রতিষ্ঠিত হবে? .....না, আমরা তোমাদের প্রতি বিশ্বাসী হতে পারছি না।

নবী-রাসূলগণের তওহীদী দাওয়াতের মুকাবিলা করার জন্য বাতিলপন্থী ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাসীন লোকেরা চিরদিনই এই ধরনের কথা বলেছে। ফিরাউন ও তার রাজন্যবর্গ যেমন মূসা ও হারুন (আ)-কে বলেছিল। তাদের এই কথা থেকে তাদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা সহজেই বোঝা যাচ্ছে। তওহীদের বিপ্লবী দাওয়াত শোনামাত্র এই শ্রেণীর লোকদের মনে ভয় জেগে উঠে যে, আসলে ওরা আমাদের চলমান জীবনধারা, চরিত্র, নৈতিকতা, সামাজিকতা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে চায়। তার কারণ এই যে, ওরা হয় তওহীদী দাওয়াতের মর্ম বুঝতে পারে না অথবা তা বুঝতেই চায় না কিংবা ওরা শক্তি ও ক্ষমতার নেশায় এতই বুঁদ হয়ে থাকে যে, সামান্য ব্যতিক্রমধর্মী কথা শুনলেই ওদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। ভাবে, এই বুঝি গেল আমাদের বাপ-দাদার নিকট থেকে পাওয়া ধর্ম, এই বুঝি উৎখাত হতে হলো বহুকাল ধরে প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা থেকে। এই কারণে তারা খুব দ্রুত জনগণের মনস্তাত্ত্বিক 'অপারেশন' করতে শুরু করে দেয়। এই তওহীদী দাওয়াত দাতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা করে জনমনে ঘৃণা ও বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। তারা জনগণকে ভয় পাইয়ে দেয় এই বলে যে, আমি ক্ষমতায় আছি বলে তোমরা সুখে আছ। ওরা যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে তোমরা গোল্লায় যাবে, বাপ-দাদার ধর্ম নষ্ট হবে এবং তোমাদেরকে কঠিন দুর্দশার মধ্যে ফেলে দেবে। কাজেই ওদের কথা কখনই শুনবে না, ওদের দিকে ভ্রূক্ষেপই করবে না।

আসলে এ সব-ই হচ্ছে স্বৈর শাসকের মারাত্মক ধোঁকাবাজি। তখন জনগণকে ভুল বোঝানো ও প্রতারিত করা ছাড়া ওদের উপায়ও কিছু থাকে না। ফিরাউন এই ধোঁকাবাজির ধুম্রজাল সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই হযরত মূসা (আ)-কে লক্ষ্য করে বলল:

أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَمُوسَى (طه: ٥٧)

হে মূসা! তুমি কি এ উদ্দেশ্যেই আমাদের কাছে এসেছ যে, তুমি তোমার

যাদুবিদ্যার জোরে আমাদেরকে আমাদের দেশ-ঘর-বাড়ি-ক্ষমতা-প্রতিপত্তি থেকে বহিষ্কৃত ও উৎখাত করবে?

অপর আয়াতে কথাটি এইঃ

إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا (طه: ٦٣)

আসলে এ দুজন (মূসা ও হারুন) মস্তবড় যাদুকর। ওরা দুজনই তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে উৎখাত করার মতলবে আছে।

স্বৈর শাসনের অধীন জনগণের যে চরম মাত্রার দুর্দশা ও দুরবস্থা হয়, তাকে স্বৈরতন্ত্রীরা খুবই উত্তম-উজ্জ্বল-সুন্দর প্রমাণ করতে প্রাণ-পণে চেষ্টা করে। তারা লোকদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, আসলে তোমাদের বর্তমান জীবন-ধারা ও রীতি-ই অতীব উত্তম। কিন্তু ওরা তা খতম করে দিতে বদ্ধ পরিকর। ফিরাউন ও তার দল-বলের ভাষায় কথাটি এইঃ

إِنَّ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ (طه: ٦٣)

এই দুই যাদুকর তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে উৎখাত করতে চায় তাদের যাদুবিদ্যার জোরে এবং তোমাদের সর্বোন্নত মানের আদর্শ জীবন-ধারা ও পদ্ধতিকে বিনষ্ট করতে বদ্ধপরিকর।

স্বৈর শাসকরা অনেক সময় নিজেদের নিরংকুশ কর্তৃত্বের সিংহাসনকে রক্ষা করার লক্ষ্যে শেষ অস্ত্র হিসেবে নিজেদের বড় ধার্মিক, আল্লাহ-ভীরু, রাসূল-প্রেমিক ও মানব দরদী রূপী মিথ্যামিথ্যি পেশ করতেও লজ্জা পায় না। অথচ তাদের আসল উদ্দেশ্য হয় নিজেদেরকে স্থায়ীভাবে ক্ষমতাসীন রেখে দ্বীন-ধর্মকে সমূলে উৎপাটিত করা। আর যারা প্রকৃতই কোন কল্যাণকর বিধান নিয়ে মানুষের নিকট উপস্থিত হয়, তাদেরকেই স্বার্থপর অসদুদ্দেশ্যপরায়ণ এবং মানুষের জন্য বিপদজ্জনক রূপে চিহ্নিত করতে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা চালায়। হযরত মূসা (আ) যখন ফিরাউনের নিকট এক আল্লাহর বন্দেগী কবুলের দাওয়াত দিলেন, তখনই ফিরাউন বলে উঠলঃ

ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (المؤمن: ٢٦)

আমাকে ছাড়ো তো। আমি এ মূসাকে হত্যা করে ফেলি! রক্ষা পাওয়ার জন্য সে তার আল্লাহ্‌কে ডাকুক না! (দেখা যাবে, সে কেমন করে আমার হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে!) আমার আশঙ্কা হচ্ছে, এই লোকটি

তোমাদের আবহমান কাল থেক অনুসৃত তোমাদের জীবন-বিধিকে বদলে দেবে অথবা দেশে এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে।

স্বৈর শাসক যখন মনে করে, জনগণের মধ্যে ধর্মীয় ভাবধারা অত্যন্ত প্রবল, ধর্মের কথা শুনলে যখন বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়, তখন সে জনগণের সম্মুখে নিজেকে একজন বড় ধার্মিক, সত্য পথের পথিক ও সত্য পথ-প্রদর্শক রূপে পেশ করে। কুরআনে ফিরাউনের কথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছেঃ

مَا اُرِيْكُمْ اِلاَّ مَا اَرٰى وَمَا اَهْدِيْكُمْ اِلاَّ سَبِيْلَ الرَّشَادِ (المؤمن: ٢٩) ١

আমি তো তোমাদেরকে তা-ই বলি, যা আমি সর্বোত্তম মনে করি। আর আমি নির্ভুল ও সত্য পথেরই সন্ধান দেই।

স্বৈরতান্ত্রিক-স্বেচ্ছাচারী শাসকরা স্বীয় ক্ষমতার 'ময়ূর সিংহাসন' অক্ষুণ্ন ও স্থায়ী করে রাখার জন্য সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত সমাজকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দিয়ে থাকে। তার একটি ভাগে থাকে সমাজের সেসব লোক, যারা চূড়ান্ত পর্যায়ের বড় লোক, যারা 'Elite' বলে পরিচিত, যারা ধন-বল জন-বল ও বুদ্ধি-কৌশলের বলে সমাজের শীর্ষস্থানে আসীন হয়ে রয়েছে এবং সে সব কারণে চরম মাত্রার অহংকারী, দাম্ভিক! আর দ্বিতীয় ভাগে থাকে সেসব লোক, যারা দরিদ্র, দুর্বল, অক্ষম, অসহায়, মৌলিক মানবিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত, জীবন-ধারায় পশুর চাইতেও নিম্ন পর্যায়ে গণ্য। এজন্য সমাজকে নির্দিষ্টভাবে কেবল দুটি ভাগেই বিভক্ত করা হয় তা-ই নয়, প্রয়োজনবোধে ও অবস্থার অনুপাতে শত শত খণ্ডে বিভক্ত করতেও দ্বিধা বোধ করে না। তখন স্বৈরশাসক সেই অল্প সংখ্যক বড় লোকদের সহায়তা নিয়ে বিপুল সংখ্যক 'ছোট লোক'দের উপর স্বৈর শাসনের স্টীম রোলার চালাতে থাকে। ঐক্যবদ্ধতাকে খান খান করে দিয়ে জনতার মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতাকে সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত করে দেয়। স্বৈর শাসকের এই নীতিকেই ইংরেজীতে বলা হয় Divide and Rule। আল্লাহ্ তা'আলা ফিরাউন সম্পর্কে ঠিক এ কথা-ই বলেছেনঃ

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا (القصص: ٤)

ফিরাউন দেশে বিজয়ী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসেছে এবং দেশের জনগণকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করে দিয়েছে।

এইরূপ স্বৈর শাসক নিজেকে গোটা দেশের একচ্ছত্র মালিক ও মনিব বলে মনে করে। দেশের সব নৈসর্গিক ও মানবিক সম্পদের নিরংকুশ মালিকানা দাবি করে। ফিরাউনও তাই করেছিল। সে ঘোষণা দিয়েছিলঃ

يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ - اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ*
(الزخرف: ٥١)

হে দেশের জনগণ! এই মিসর দেশের একচ্ছত্র মালিক কি আমি-ই নই? এই খাল-বিল-নদী-সমুদ্র কি আমার-ই নিরংকুশ কর্তৃত্বাধীন প্রবাহিত হচ্ছে না? ...তোমরা কি দেখতে পাও না, লক্ষ্য করো না?

এভাবে স্বৈর শাসক যখন নিজেকে সকল প্রকার বিরুদ্ধতা-প্রতিরোধ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মনে করতে শুরু করে, যখন দেখতে পায় প্রতিবাদী সমালোচক কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গেছে, সকল মানুষ তারই অধীনতা স্বীকার করে তাকে পুরাপুরিভাবে মেনে নেয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত, তখন সে নিজেকে আইনদাতা-বিধানতাদারূপে ঘোষণা করে এবং জানিয়ে দেয় যে, কেবল তারই ঘোষিত নীতি ও তারই জারি করা আইন মানতে হবে। অন্যথায় কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হতে হবে। তখন সে নিজ ইচ্ছা ও খাহেশে কোন জিনিসকে হালাল ঘোষণা করে আবার কোন জিনিসকে করে হারাম। অথচ আল্লাহ্র বিধানকে বাদ দিয়ে এরূপ করার কোন অধিকারই এ দুনিয়ার কারোরই থাকতে পারে না। আল্লাহ্ বলেছেনঃ

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ (النحل: ١١٦)

তোমাদের মুখে যেমন আসে মিথ্যামিথ্যি বলতে থেকো না যে, এটা হালাল আর এটা হারাম। কেননা তাতে মিথ্যামিথ্যি ভাবে স্বরচিত বিধানকে আল্লাহ্র নামে চালিয়ে দেয়ার অপরাধে তোমরা অপরাধী হয়ে পড়বে।

স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এতই মারাত্মক নেশার মত যে, যে-লোকই এরূপ শাসন চালাতে শুরু করবে, সে নিজেকে সারাটি দেশের একচ্ছত্র মালিক মুখতার ঘোষণা দিয়ে ও নিজ ইচ্ছামত আইন-বিধান রচনা করে জনগণের উপর জারি করেই ক্ষান্ত হয় না, শেষ পর্যন্ত সে নিজেকে জনগণের জীবন-মরণেরও একমাত্র কর্তা রূপে পেশ করে। অথচ কোটি কোটি বছরের ইতিহাস নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, মানুষ এই দুনিয়ায় ক্ষমতার অনেক দাপট দেখিয়েছে বটে; কিন্তু নিজেকে মানুষের জীবন-মরণের নিরংকুশ কর্তা প্রমাণ করা কখনই সম্ভব হয়নি। কোন মানুষ বা জীবকে জীবন দেয়াও সম্ভব হয়নি, কারোর মৃত্যুর চূড়ান্ত ফয়সালা করাও কারোর সাধ্যে কুলায়নি। (যদিও মানুষ জীবন ও মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে)। জীবন ও মরণের মালিক হওয়ার এই স্বৈরতান্ত্রিক আহমিকতা

দেখিয়েছে ফিরাউনের-ই মত—ফিরাউনেরও বহু পূর্বে আর একজন স্বৈর শাসক, যার নাম নমরূদ। কুরআন মজীদে তার সম্পর্কে এভাবে বলা হয়েছেঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ـ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ـ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ (البقرة: ٢٥٨)

তুমি কি সেই ব্যক্তির অবস্থা চিন্তা করনি, যে ব্যক্তি ইবরাহীমের সাথে তর্ক করেছিল এই নিয়ে যে, তার রব্ব কে? এবং সে তর্ক করেছিল এই কারণে যে, আল্লাহ্ই তাকে বাদশাহী দিয়েছিলেন। ইবরাহীম যখন বলল, আমার রব্ব তিনিই যিনি জীবন ও মৃত্যু দানকারী। সে তখন বললঃ আমিই তো জীবন দেই ও মৃত্যু ঘটাই।

বস্তুত এরূপ স্বৈরশাসন মানব জীবনে কত যে লাঞ্ছনা, দুঃখ, অশান্তি সৃষ্টির প্রত্যক্ষ কারণ হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বিশ্বমানবের ইতিহাস এই পর্যায়ের দুঃখময় কাহিনীতে ভরপুর হয়ে রয়েছে। মানুষকে এত কঠিন আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে, যা সহ্য করার কোন সাধ্যই মানুষের হতে পারে না। 'গর্তকর্তারা' কিছু সংখ্যক আল্লাহ্র অনুগত মানুষকে যে কঠিন আযাব দিয়েছিল, তা প্রাচীনকালীন ইতিহাস পাঠক মাত্রেরই জানা থাকার কথা। কুরআন মজীদে তাদের এই কীর্তিকলাপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ওরা ছিল অত্যাচারী স্বৈরতান্ত্রিক শাসক। ওরা জোর করে জনগণকে নিজেদের শিরকী বিশ্বাস গ্রহণে বাধ্য করতে চেয়েছিল, কিন্তু লোকেরা তা গ্রহণ করতে যখন প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করল, তখন তাদের জন্য বড় বড় ও গভীর গর্ত খুদলো। তাতে প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালালো এবং সে সব লোককে তার মধ্যে জীবন্ত নিক্ষেপ করল। কেবল তাদেরকেই নয়, সেই সাথে তাদের স্ত্রী-পুত্র ও বাচ্চা-কাচ্চাদেরও তার মধ্যে ফেলে দিল। ইতিহাসে স্বৈরতন্ত্রীরা মানুষকে যত আযাব দিয়েছে বলে উল্লিখিত হয়েছে, এটা ছিল তার মধ্যে একটি নির্মমতম ঘটনা। এজন্য কুরআন মজীদ তার বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছে। বলেছেঃ

قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ـ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ـ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ـ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ـ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

(البروج: ٤-٨)

ধ্বংস হয়েছে গর্তকর্তারা। (সেই গর্তকর্তারা) যারা জ্বালিয়েছিল দাউ-দাউ করে জ্বলা ইন্ধনের আগুন।—যখন তারা সেই গর্তের মুখে উপবিষ্ট ছিল। আর তারা ঈমানদার লোকদের সাথে যে ব্যবহারটা করছিল, তা তারা প্রত্যক্ষ

করছিল। এই ঈমানদার লোকদের সাথে তাদের শত্রুতার একমাত্র কারণ এই ছিল যে, তারা প্রবল পরাক্রান্ত ও স্ব-প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল।

প্রথম কথাটিঃ ধ্বংস হয়েছে গর্তকর্তারা অর্থ, যারা গর্ত খুড়ে অগ্নিকুণ্ডলি বানিয়ে সেই দাউ-দাউ করা আগুনের মধ্যে ঈমানদার লোকদেরকে জীবন্ত নিক্ষেপ করেছিল, তাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র আযাব পাওয়ার যোগ্য প্রমাণিত হয়েছে।

ঈমানদার লোকদেরকে জ্বলন্ত দাউ দাউ করা অগ্নি গহ্বরে নিক্ষেপ করার ঘটনা হাদীসেও উল্লিখিত হয়েছে। তাতে মনে হয়, দুনিয়ার ইতিহাসে এই ধরনের ঘটনা বহুবার সংঘটিত হয়েছে। মওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী এই কাহিনীর উপর ঐতিহাসিক প্রামাণ্য ও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ পর্যায়ের বহু কয়টি ঘটনার মধ্য থেকে একটি ঘটনার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এখানে করা যাচ্ছে। ইয়েমন শাসক যু-নাওয়াস দক্ষিণ আরবের নাজরান দখল করে ও তথাকার সাইয়্যেদ হারিসা সুরিয়ানী (Arethas)-কে হত্যা করে। তার স্ত্রী রুমা'র চোখের সামনেই তার দুই ক্যনাকে হত্যা করে তাদের রক্ত পান করতে তাকে বাধ্য করল। শেষ পর্যন্ত তাকেও হত্যা করল। বিশপ পলের অস্থি কবর থেকে বের করে ভস্ম করা হলো এবং আগুন ভর্তি গর্তসমূহে নারী-পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, পাদ্রী, পূজারী সকলকেই নিক্ষেপ করল। নিহতের সংখ্যা মোট ২০ থেকে ৪০ হাজার দাঁড়িয়েছিল। ৫২৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল।[১]

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে গর্তকর্তাদের এই ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে যে, একজন বাদশাহ মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে নিজ ঔরসজাত কন্যার উপর (অথবা আপন ভগ্নীর উপর) বলাৎ করে। পরে তার মনে প্রশ্ন জাগে যে, অতঃপর যে দুর্নাম হবে তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় কি? কন্যা (বা ভগ্নী) পরামর্শ দিল যে, জনগণের এক মহাসম্মেলন আহ্বান করে এ কথা ঘোষণা করে দেয়া হোক যে, আপন কন্যা (বা বোন) বিয়ে করা আমার মতে সম্পূর্ণ বৈধ এবং একথা মেনে নিতে সকলকে বাধ্য করতে হবে। বাদশাহ তাই করল। কিন্তু তার এই মত জনতার কেউ-ই গ্রহণ করতে রাযী হলো না। তখন সে গর্ত খুড়ে তার মধ্যে কাষ্ঠের স্তূপ করে আগুন ধরিয়ে দিল এবং তার মত গ্রহণ করতে রাযী নয়—এমন সমস্ত মানুষকে তাতে নিক্ষেপ করল।[২]

এ সব বিবরণ থেক অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, স্বৈর শাসকরা পশুত্বের নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছতে ও তা সকলকে অকপটে মেনে নিতে বাধ্য করতেও লজ্জা

---

১. তাফহীমুল কোরআন, সূরা আল-বুরুজ।

২. তাফসীর মাজমাউল বায়ান, দুররে মনসুর।

বোধ করে না। সকল প্রকার হারাম কাজ সে স্বীয় খাহেশ পূরণের জন্য করে এবং তা করতে বা তা করা হারাম নয় বলে মেনে নিতে বাধ্য করতে সচেষ্ট হয়ে থাকে। আর কেউ যদি স্বীয় সঠিক ঈমানের কারণে তা মেনে নিতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে তার উপর অত্যাচারের পাহাড় ভাঙ্গতেও কুণ্ঠিত হয় না। কুরআন মজীদ ফিরাউন ও অন্যান্য স্বৈর শাসকদের যেসব চরিত্র ও কার্যকলাপের উল্লেখ করেছে তা কেবল সেই বিশেষ ব্যক্তিদেরই নয়, সকল স্বৈর শাসকেরই এই চরিত্র ও কার্যকলাপ। এই স্বৈর শাসন পদ্ধতিই শাসকের মধ্যে এরূপ চরিত্র সৃষ্টি করে ও অনুরূপ কার্যকলাপ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এ স্বৈর শাসনের আসল পরিচিতি হচ্ছে নিরংকুশ কর্তৃত্বের রাজতন্ত্র বাদশাহী বা অস্ত্র বলে দখল করা ক্ষমতা। তা যেমন আল্লাহ্‌র বিধান মেনে চলে না, তেমনি কোনরূপ মানবিকতারও ধার ধারে না। এক ব্যক্তিই হয়ে থাকে কোটি কোটি মানুষের উপর নিরংকুশ কর্তৃত্বের একচ্ছত্র অধিকারী। কুরআনে বিশেষভাবে ফিরাউন ও নমরূদের কথা বলা হয়েছে এজন্য যে, এরা দু'জন হচ্ছে মানবেতিহাসে স্বৈরতন্ত্রী শাসকের জীবন্ত প্রতীক।

তবে স্বৈরতন্ত্রের বিপর্যয় পরিমাণ ও পরিস্থিতির (quantity and quality) দিক দিয়ে যথেষ্ট পার্থক্য হয়ে থাকে। এ পার্থক্য হয় ব্যক্তির যোগ্যতা ও মন-মানসিকতার মাত্রা-পার্থক্যের কারণে। এ দিক দিয়ে ব্যক্তি ব্যক্তিতে যে পার্থক্য হয়ে থাকে, তা তো সর্বজনস্বীকৃত।

কোন কোন স্বৈরতন্ত্রী জনগণের কতিপয় মৌলিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করে, আর কতিপয় দিক দিয়ে তা হরণ করে না, রক্ষা করে। আবার কোন কোন স্বৈরতন্ত্রী প্রত্যেকটি নাগরিকের সমস্ত অধিকারই হরণ করে নেয়, ব্যক্তির স্বাধীনতা বলতে কিছুই থাকতে দেয়া হয় না। এক্ষেত্রে সে সাধারণ সীমা পর্যন্ত লংঘন করে যায়। জনগণের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করা সমস্ত ধন-সম্পদও নিঃশেষ লুটেপুটে নিয়ে যায়। আর শেষ পর্যন্ত সে শুধু রাজ্য সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র মালিক হয়ে বসতেই রাযী হয় না, সেই সাথে সারা দেশের কোটি কোটি মানুষের যাবতীয় ধন-সম্পদের—এমন কি সেই লোকদেরও নিরংকুশ মালিক হয়ে বসার অহমিকতা বোধ করতে থাকে। এরূপ অবস্থায় স্বৈরতন্ত্র কতটা প্রচণ্ড হতে পারে, তা অনুমান করলেও রোমাঞ্চিত হতে হয়। এই সময় এ ধরনের স্বৈরতন্ত্রী মানুষের আল্লাহ্‌ হয়ে বসে আর মানুষের উপর চলে স্বেচ্ছাচারিতাজনিত সীমাহীন বর্বরতা। সে মানুষের খোদা হয়ে সকলকে একমাত্র তারই দাসত্ব করতে বাধ্য করে।

এইরূপ একটি শাসন ব্যবস্থার সাথে ইসলামের যে দূরতম সম্পর্ক-ও থাকতে পারে না, তা ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন হয় না। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে

নাজিবাদ, ফ্যাসীবাদ ও বিপ্লবী সমাজতন্ত্রবাদ প্রভৃতি শাসন ব্যবস্থার সাথে তার পুরাপুরি সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। বলা যায়, প্রাচীনকালীন নমরূদী ফিরাউনী শাসনের এগুলিই হচ্ছে অতি আধুনিক সংস্করণ। অন্য কথায়, এই সব কয়টি শাসন ব্যবস্থাই আল্লাহ্‌দ্রোহী শাসন ব্যবস্থা, আল্লাহ্‌র আল্লাহ্‌ত্বকে অস্বীকার করে জনগণের উপর নিজেকে আল্লাহ্‌ বানিয়ে বসার শাসন ব্যবস্থা।

এ প্রসঙ্গে কুরআনে উল্লিখিত কতিপয় বাদশাহী ব্যবস্থা সম্পর্কেও আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করছি। কেননা পূর্ববর্তী আলোচনা পাঠান্তে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, বাদশাহী ব্যবস্থা যদি ইসলাম পরিপন্থী স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাই হবে, তাহলে কুরআনের কোন কোন নবী ও অ-নবীকে বাদশাহ বানানো ও তাকে ইসলামী মনে করার কথা বলা হলো কেমন করে? .....তা কি ইসলাম সম্মত?

বস্তুত ইসরাইলীদের ইতিহাসে বহু বাদশাহের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং সে বাদশাহী আল্লাহ্‌ দিয়েছেন বলে তিনি নিজেই তাঁর কালামে-কুরআনে দাবি করেছেন। এই বাদশাহীগুলি কি ধরনের এবং তা আল্লাহ্‌ দিয়েছেন কেমন করে?

এর জবাবে বলা যায়, আল্লাহ্‌ তা'আলার দেয়া রাজত্ব-বাদশাহী এ সব রাজত্ব-বাদশাহী থেকে চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও রীতি-নীতি সর্ব দিক দিয়েই সম্পূর্ণ ভিন্নতর। কেননা আল্লাহ্‌র দেয়া বাদশাহী হয় নবুয়্যাতের সাথে জড়িত, না হয় বিশেষ অবস্থায় আল্লাহ্‌র এক বিশেষ দান। তাতে ফিরাউনিয়ত হতে পারে না, গর্ব-অহংকার-অহমিকতা, আল্লাহ্‌দ্রোহিতা ও মানব জীবনে কোনরূপ বিপর্যয় সৃষ্টির কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এ রাজতন্ত্র নয়, এ বাদশাহী প্রকৃতই বাদশাহী নয়, বরং তা হচ্ছে নবুয়্যাতের দায়িত্ব পালন এবং পরিভাষার দিক দিয়ে তা আল্লাহ্‌র মহান খিলাফত। তা সম্পূর্ণরূপে ও সর্বতোভাবে আল্লাহ্‌র বিধানের ভিত্তিতে চলে। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত দাউদ (আ)-কে সম্বোধন করে বলেছেনঃ

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ (ص: ٢٦)

> হে দাউদ! আমরাই তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছি। অতএব তুমি লোকদের উপর শাসন চালাও—লোকদের পরস্পরের মধ্যে বিচার কার্য সম্পাদন কর পরম সত্য নীতি অবলম্বন ও ইনসাফ সহকারে। আর নিজের স্বেচ্ছাচারিতাকে অনুসরণ করো না। তা হলে তোমার এই স্বেচ্ছাচারিতাই তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ভ্রষ্ট করে দেবে।

এ আয়াত অনুযায়ী আল্লাহ্র দেয়া শাসন ক্ষমতা খিলাফত নামে অভিহিত। যাকে এই শাসন ক্ষমতা দেয়া হয়, সে আল্লাহ্র খলীফা।

এ খিলাফতী শাসন ব্যবস্থায় লোকদের উপর শাসনকার্য পরিচালিত হয় পরম সত্য নীতি আদর্শ—আল্লাহ্র দেয়া বিধান—অনুযায়ী।

এখানে বাদশাহর ব্যক্তিগত খামখেয়ালী, স্বেচ্ছাচারিতা ও খাহেশ অনুসরণের একবিন্দু অবকাশ থাকতে পারে না। যদি তা হয়, তাহলে সে বাদশাহী আল্লাহ্র সমর্থন হারিয়ে ফেলবে। তখনই তা হবে চরম স্বৈরতন্ত্র, যা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম।

হযরত মুহাম্মাদ (স)-ও মদীনায় প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন। তাঁকেও অনুরূপ নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ বলেছিলেনঃ

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ (المائدة: ٤٩)

এবং শাসন কার্য পরিচালনা কর লোকদের মধ্যে আল্লাহ্র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী এবং লোকদের কামনা বাসনা কে অনুসরণ করো না।

এ শাসনকার্য মূলত কোন ব্যক্তির শাসন নয়, ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতাও চলে না তাতে। বরং তা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র বিধান-ভিত্তিক শাসন। অতএব এ শাসন কখনই স্বৈরতন্ত্রী হয় না।

বনি ইসরাইলীদের মধ্যে এরূপ বাদশাহী গড়ে তোলা হয়েছিল এবং তা-ও অনুরূপ শাসন ব্যবস্থা ছিল। ফলে তা কখনই স্বৈরতান্ত্রিক নয়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছেঃ

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوْكًا (المائدة: ٢٠)

মূসা যখন তার জনগণকে ডেকে বললঃ হে জনগণ! তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র দেয়া সেই নিয়ামতের কথা, যার ফলে তিনি তোমাদের নবী বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে বাদশাহ বানিয়েছেন।

এই বাদশাহগণ আসলে নবী-রাসূল। যেমন হযরত ইউসুফ, হযরত দাউদ, হযরত সুলায়মান (আ)—তাঁদের সম্পর্কেই কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ـ فَقَدْ اٰتَيْنَا اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُلْكًا عَظِيْمًا (النساء: ٥٤)

আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহের ফলে যা কিছু দান করেছেন, তা দেখে এ লোকদের প্রতি তারা হিংসা পোষণ করে? .....বস্তুত আমরা তো ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরদেরকে কিতাব ও হিকমাত দিয়েছি, আমরা তাদেরকে বিরাট রাজত্বও দিয়েছি।[১]

হযরত ইউসুফ ও দাউদ (আ) যে হযরত ইবরাহীমের বংশধর ছিলেন, তা সর্বজনজ্ঞাত। আর তাঁরাই ছিলেন বনি ইসরাইলের শীর্ষস্থানীয় নবী-রাসূল।

এক পর্যায়ে বনি ইসরাইলের জন্য একজন বাদশাহ্ নিয়োগ করার দাবি জানানো হয় আল্লাহ্র নিকট এবং তিনি তা নিয়োগ করেন একজন অ-নবী ব্যক্তিকে। কুরআন মজীদেই বলা হয়েছেঃ

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ـ قَالُوا أَنّٰى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ـ وَاللّٰهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَّشَاءُ ـ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ـ

(البقرة: ٢٤٧)

তাদের নবী তাদেরকে ডেকে বললঃ বস্তুতই আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ বানিয়ে পাঠিয়েছেন। লোকেরা বললঃ সে কি করে আমাদের বাদশাহ্ হতে পারে, তার তুলনায় আমরাই বরং বাদশাহীর বেশী অধিকারী। তাকে তো বিপুল ধন-মালও দেয়া হয়নি! নবী বললঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাকেই তোমাদের উপর বাদশাহ বাছাই করে নিয়োগ করেছেন এবং তাকে ইলম ও দেহের দিক দিয়ে বিপুলতা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তার বাদশাহী দান করেন। আল্লাহ্ তো বিপুল-বিশাল, সর্বজ্ঞ।

তালূত নবী ছিলেন না বটে; তবে তার সঙ্গে ছিলেন একজন নবী। আর সে ব্যক্তিও কোন সীমালংঘনকারী ব্যক্তি ছিল না। সে আল্লাহ্র বিশেষ ব্যবস্থাধীন লালন ও প্রশিক্ষণ লাভ করেছিল। শাসন ক্ষমতা ও রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা তার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান ছিল। উপরোদ্ধৃত আয়াতের শেষ ভাগে তা-ই বলা হয়েছে।

সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেনঃ বনি-ইসরাইলের বাদশাহী প্রাপ্তিতে তাদের অগ্রাধিকার লাভের কথা বলে তাদের প্রকৃত মনোবৃত্তিই

---

১. এই ملك বা রাজত্ব বলতে বস্তুগত ও আদর্শগত উভয় পর্যায়ের ব্যাপারাদির উপর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বোঝায়। তাতে নবুয়্যাত, নেতৃত্ব ও ধন-সম্পদ—সব কিছুর মালিকত্ব সামিল রয়েছে। এর পূর্ববর্তী আয়াতের দৃষ্টিতে এর অর্থ তা-ই বোঝা যায়।

تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي ج: ٤، ص: ٣٧٥

প্রকাশ করেছে। তাদের বক্তব্য ছিল, তাদের একজন বাদশাহ্ হবে, যার পতাকাতলে মিলিত হয়ে তারা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তারা তা বলেই দিয়েছে যে, তারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করতে ইচ্ছুক এবং প্রস্তুত। নবীর নিকট তারা একজন বাদশাহের দাবিও জানিয়েছিল। সেই অনুযায়ী নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের খবর দিলেন যে, আল্লাহ্ তালূতকে বাদশাহ রূপে নিযুক্ত করেছেন। কিন্তু তারা আল্লাহ্র এ বাছাই ও নিয়োগ ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে। বলে, তালূত কি করে বাদশাহ্ হতে পারে; ওর তো ধন-মালের বিপুলতাই নেই, আমরাই বরং বাদশাহী পাওয়ার বেশী অধিকারী, বিশেষ করে বংশানুক্রমিকতার দৃষ্টিতে, উত্তরাধিকার নীতির ভিত্তিতে। ও তো বাদশাহদের বংশের সন্তান নয়। এ হচ্ছে বাদশাহ সংক্রান্ত ধারণার অনিবার্য পরিণতি। বনি ইসরাইলের বংশীয় গৌরব ও বিদ্বেষের কথা কে না জানে?

নবী তাদের এই দুই ভিত্তিক দাবিকে অগ্রাহ্য করলেন। তিনি বাদশাহ্ হওয়ার জন্য বিপুল ধন-মালের মালিক হওয়ার ভিত্তিকেও মানলেন না, মানলেন না বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের দোহাই। এ দুটিকে অস্বীকার করে বাদশাহীর জন্য প্রয়োজনীয় গুণকে ভিত্তিরূপে ঘোষণা করলেন। সে ভিত্তি হচ্ছে ইল্ম ও সুস্বাস্থ্য। এ দুটি দিক নিয়ে সে-ই বাদশাহ হওয়ার অধিক উপযুক্ত প্রমাণিত হয়েছে। আর সর্বোপরি স্বয়ং আল্লাহ্র বাছাই—মনোনয়ন নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। বললেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ـ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ই তাকে তোমাদের উপর মনোনীত করেছেন এবং তাকে ইলম ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে আধিক্য দিয়েছেন।[১]

তালূতের বাদশাহ হওয়ার অকাট্য প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ্র মনোনয়ন। কিন্তু আল্লাহ্ তাকে মনোনীত করলেন কেন? তার কারণ হচ্ছে, সে রাজা-বাদশাহ্র বংশধর বা বেশী ধন-মালের মালিক না হলেও সে ইলম ও সুস্বাস্থ্যের—দৈহিক ক্ষমতার—দিক দিয়ে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। ইলম হচ্ছে মানুষের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য আর রাষ্ট্র পরিচালনা ও যুদ্ধ-জিহাদ চালাবার কঠিন অবিশ্রান্ত কষ্ট স্বীকারের জন্য স্বাস্থ্যগত যোগ্যতা শুধু সাহায্যকারী-ই নয়, অপরিহার্য শর্ত।

প্রমাণিত হলো যে, তালূতের বাদশাহ হওয়ার অধিকার দ্বীন সম্পর্কিত ইলমের কারণে এবং দৈহিক শক্তি-সামর্থ্যের কারণে। বংশের দরুন নয়।[২]

---

১. فى ظلال القران ج: ٢، ص: ٢٢٨

২. الجامع لاحكام القران ج: ٣، ص: ٢٤٦

সেই সাথে এ কথাও বলা যায় যে, কুরআন যে রাজতন্ত্র বা বাদশাহীকে হারাম করেছে, তা হচ্ছে জনগণের উপর নিরংকুশ কর্তৃত্বসম্পন্ন রাজতন্ত্র বা বাদশাহী। নবী-রাসূলগণ যে বাদশাহী পেয়েছিলেন, তা সে রকমের নয়। তা নিছক জনগণের ব্যাপারাদির ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী। এখানে নিরংকুশতার কোন অবকাশ নেই।

তা সত্ত্বেও তাঁদের ক্ষমতাসীনতাকে 'শাসক' ও মালিক বা বাদশাহ্ নামে অভিহিত করার কারণ কি? মনে হয় শাসন-প্রশাসনের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে পরিচিত ও প্রচলিত শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে, যেন কথা জনগণের বোধগম্য হয়। কেননা বিশ্ব ইতিহাসের যে যে অধ্যায়ের এই সব কাহিনী, তখন বলতে গেলে দুনিয়ার সর্বত্রই এই বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র ও বাদশাহী অথবা ক্ষমতা দখল ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি প্রচলিত ও জনগণের নিকট পরিচিত ছিল না। যদিও আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূলগণকে বা কোন অ-নবীকে প্রচলিত ধরনের রাজা বা বাদশাহ বানান নি, তার বিপরীত আল্লাহ্‌র বিধান অনুসরণ করে প্রশাসক হিসেবেই তাঁদের নিযুক্ত করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তাদের জন্যও প্রচলিত পরিভাষাই ব্যবহার করা জরুরী হয়ে পড়েছিল, যদিও এ দু'ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে নীতি-আদর্শ ও আচার-আচরণের দিক দিয়ে আসমান-যমীনের পার্থক্য রয়েছে।

উপরন্তু আল্লাহ্ যে অল্প সংখ্যক নবীকে 'বাদশাহ' বা 'শাসক' নামে অভিহিত করেছেন, তাদের শাসন-প্রশাসন আমাদের এখানে আলোচ্য রাজতন্ত্র, বাদশাহী ও স্বৈরতন্ত্র থেকে মৌলিকভাবেই ভিন্নতর। কেননা আল্লাহ্ তাঁর নবীগণের মধ্য থেকে যে নেক বান্দাকে বাদশাহ বানিয়েছিলেন বলে কুরআনের আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে, তা কখনও শক্তি প্রয়োগ, জবরদস্তি সহকারে ও পায়ের জোরে জনগণের মালিক-মুখতার হয়ে বসার নীতিতে অর্জিত হয়নি। অথচ দুনিয়ার প্রায় সব রাজতন্ত্র, বাদশাহী ও নিরংকুশ শাসকর্তার মূলে এ জিনিসই ছিল প্রধান হাতিয়ার।

এ দুই ধরনের বাদশাহী ও শাসনকর্তার মধ্যকার পার্থক্য আরও দুটি দিক দিয়ে দেখানো যেতে পারেঃ

প্রথম, নবী-রাসূলগণ শাসক-প্রশাসক হলেও তাঁরা ছিলেন মা'সুম এবং মহান পবিত্র গুণের অধিকারী। দুনিয়ার অন্যান্য রাজা-বাদশাহ-স্বৈরতন্ত্রীরা সে রূপ ছিল না, হতেও পারে না।

দ্বিতীয়, নবী-রাসূলগণ যে রাজত্ব-বাদশাহী পেয়েছিলেন মূলত তা মহান আল্লাহ্‌র দান বিশেষ। তাঁরা তা কখনই ক্ষমতাবলে—শক্তি প্রয়োগে অর্জন

করেননি। শক্তি বলে বা প্রতারণা ইত্যাদির মাধ্যমে রাজত্ব লাভ তো আল্লাহ্দ্রোহী ব্যক্তিদের চিরন্তনী চরিত্র।

এ দুটি দিক বাদ দিয়ে যে রাজতন্ত্র ও বাদশাহী, তা-ই হচ্ছে স্বৈরতন্ত্র। তা অনিবার্যভাবে ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ ঘটাবে এবং এই শাসকরাই নমরূদ ফিরাউন হয়ে বসতে পারে। ইতিহাস তা-ই প্রমাণ করে।

কোন কোন নবী-রাসূলকে আল্লাহ্ তা'আলা 'মালিক'—বাদশাহ নামে অবিহিত করেছেন বটে; কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, সাধারণভাবে রাজা-বাদশাহরা অহংকারী, প্রতাপান্বিত ও স্বৈরতন্ত্রী হলেও কুরআন নাযিল হওয়ার সময় নবী-রাসূলগণকে 'বাদশাহ' ইত্যাদি বলার দরুণ তাঁদেরকে সে ধরনের রাজা-বাদশাহরূপে কেউ-ই মনে করতে পারেনি। কারো-ই মনে রাজা-বাদশাহদের সম্পর্কিত খারাপ ধারণা নবী-রাসূল সম্পর্কে জেগে উঠেনি আর আজও তা কখনই মনে হয় না।

আর এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তালূতকেও মালিক-বাদশাহ নামে অভিহিত করতে দ্বিধা করেন নি। উদাত্ত কণ্ঠে তিনি বলেছেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا (البقرة: ٢٤٧)

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তালূতকে একজন বাদশাহ করেই তোমাদের জন্য পাঠিয়েছেন।

আর বনি ইসরাইলীদের প্রতি এই বলে অনুগ্রহ দেখিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তাদের মধ্যে নবী বানিয়েছেন, রাজা-বাদশাহ্ বানিয়েছেন। আর এটা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলারই একটি অতি বড় নিয়ামত বিশেষ। বলেছেনঃ

اُذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاۤءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا (المائدة: ٢٠)

স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র সেই নিয়ামতকে যে তিনি তোমাদের মধ্যে নবীও বানিয়েছেন, তোমাদেরকে রাজা-বাদশাহ্ও বানিয়েছেন।

ইবরাহীমী বংশধরদের কিতাব হিকমাত এবং বিরাট রাজ্য-রাজত্ব দেয়ার কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। (আন্-নিসাঃ ৫৪) শেষ পর্যন্ত হযরত দাউদ (আ)-এর এ কথাটিরও উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আল্লাহ্র নিকট রাজত্ব মালিকত্ব চেয়েছিলেন, যা তাঁর পর আর কারোর ভাগ্যে জুটবে না।

رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ (ص: ٣٥)

হে আমার পরওয়ারদিগার, আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন এক রাজত্ব দাও, যা আমার পরে আর কারোর জন্যই বাঞ্ছনীয় হবে না।

মোটকথা, আল্লাহ্‌র দেয়া ও আল্লাহ্‌র নিকট থেকে চেয়ে পাওয়া এসব রাজত্ব ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকারের রাজত্ব বাদশাহী—যার পেছনে আল্লাহ্‌র অনুমতি বা সমর্থন নেই—ইসলামে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য। বিশেষত উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া রাজত্ব, মালিকত্ব ও বাদশাহী।

তার কারণ, এই ধরনের রাজত্ব বাদশাহীতে ব্যাপক বিপর্যয়, জনগণের হক্ বিনষ্ট, মৌলিক মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং সুবিচার-ন্যায়পরতা-নিরপেক্ষ ইনসাফ পদদলিত হওয়া একান্তই অপরিহার্য। মানুষের ইতিহাসের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতাই তার অকাট্য প্রমাণ।

প্রখ্যাত ইতিহাস-দার্শনিক আল্লামা ইবনে খালদূন তাঁর গ্রন্থের ভূমিকা অংশে লিখেছেনঃ

> কোন জাতি বা কোন গোত্রের বিশেষ একটি পরিবারে বা ঘরে রাজত্ব যখন স্থিতি লাভ করে, সমস্ত বিজয়ী জাতির মধ্যে যখন তা এককভাবে দেশের ও রাজত্বের একচ্ছত্র মালিক হয়ে বসে এবং অন্যান্য পরিবারগুলিকে পেছনে ফেলে দেয়, পরে রাজত্ব ক্রমাগতভাবে একই বংশের লোকদের মধ্যে হস্তান্তরিত হয়ে চলতে থাকে, তখন বাদশাহের বেশীর ভাগ রাজন্য ও পরিষদবর্গের পক্ষ থেকে বাদশাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব জেগে উঠে। আর সরকার পরিচালন ক্ষমতা সে পরিবারের হাত থেকে কেড়ে নেয়া হয়। আর তার মূলে প্রায়ই এই কারণ হয় যে, বংশের কোন অযোগ্য কিংবা কম বয়সের বালক নিজের পিতার জীবদ্দশা থেকেই প্রিন্স বা পরবর্তী বাদশাহ নিযুক্ত হয়। কিংবা তার মৃত্যুর পর আপনজনের চেষ্টা-সহযোগিতার বলে রাজসিংহাসনে আরোহণ করে। যখন অনুভব করা যায় যে, রাজত্বের নতুন উত্তরাধিকারী স্বীয় অল্প বয়স্কতা বা অযোগ্যতার কারণে শাসনকার্য চালাতে অক্ষম, তখন তার অভিভাবক রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ধারণ করে—সে তার পিতার উজীর বা পরিষদ হোক বা গোত্রেরই কোন ব্যক্তি। দেশ শাসনের পূর্ণ কর্তৃত্ব নিজ হাতে নিয়ে রাজত্ব চালাতে থাকে। তখন অল্প বয়স্ক বাদশাহকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদি থেকে অনেক দূরে রেখে সুখ-সম্ভোগ, বিলাস-ব্যসন ও আনন্দ স্ফূর্তির মধ্যে ডুবিয়া রেখে দেয়। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদির প্রতি তাকে চোখ তুলে তাকাতেও দেয় না। ফলে দেশ ও রাষ্ট্রের একচ্ছত্র স্বাধীন মালিক সে-ই হয়ে যায়। অতঃপর বাদশাহী—সাম্রাজ্যকতার গন্ধ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তখন তার মনে এই খেয়াল জাগে যে, 'শাহান শাহী'র অর্থ শুধু এতটুকুই যে, কখনও কখনও সিংহাসনে আরোহণ করে লোকদের প্রতি উপহার উপঢৌকন, সম্মান-প্রদর্শন ও উপাধি বিতরণ করা ও স্ত্রীলোকদের নিয়ে ঘরের চার

প্রাচীরের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করা মাত্র। আর দেশের শাসন-শৃঙ্খলা, তার সমস্যাবলীর সমাধান, তার আইন-কানুন জারী করা, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদি দেখা-শুনা করা, দেশের সামরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা বা তার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা, সীমান্তসমূহের ব্যবস্থাপনা—ইত্যাদি বাদশাহের মতে উজীর-নাজীর বা মন্ত্রীমণ্ডলের কাজ। এজন্য এ সব ব্যাপারই সে উজীরের উপর ন্যস্ত করে দেয়। এভাবেই বাদশাহ'র একটা স্বৈরতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে যায়। পরে তা তার পুত্র দৌহিত্রদের মধ্যে চলতে থাকে।........দুনিয়ার বিভিন্ন বংশের রাজত্বের ইতিহাসে তা-ই দেখা যায়।.......

কখনও এমনও হয় যে, ক্ষমতাহীন বাদশাহ খাবে গাফলত থেকে জেগে উঠে নিজের অবস্থার যথার্থ পর্যালোচনা করে। আর চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে হারানো ক্ষমতা ও স্বাধীনতা পুনরায় করায়ত্ত করে নেয় এবং স্বাধীন ক্ষমতার মালিক হয়ে কর্তৃত্বশীলরা বিদ্রোহীদের মস্তক চূর্ণ করে দেয়। কখনও তরবারির দ্বারা তাদের হত্যা করে। আবার কখনও তাদেরকে তাদের দখল করা ক্ষমতা বা পদ থেকে বিচ্যুত করে.......[১]

সারকথা হচ্ছে, নিরংকুশ রাজতান্ত্রিক বা বাদশাহী ও উত্তরাধিকার মূলক শাসন ব্যবস্থা স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়।

২. বড় লোকদের শাসন

সমাজের বড় লোকদের হাতে যখন শাসনযন্ত্র সমর্পিত হয়, তখন এক ভিন্ন ধরনের শাসন-অবস্থা দেখা দেয়। বলা হয়, যেহেতু তারা শিক্ষা, জ্ঞান, সংস্কৃতি, ধন-সম্পদের মালিকানা বা বংশীয় আভিজাত্যের অন্যান্যদের অপেক্ষা অনেক উঁচু, শ্রেষ্ঠ, তাই তাদের হাতে শাসনকার্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হতে পারবে। এরূপ শাসন ব্যবস্থাকে আধুনিক ভাষায় বলা হয়, 'এ্যারিস্টোক্র্যাসী' বা বড় লোকদের—অভিজাত লোকদের শাসন।

কিন্তু এ শাসন-ব্যবস্থার মূলে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এর যৌক্তিকতা কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এক শ্রেণীর লোক সর্বসাধারণের তুলনায় অধিক শিক্ষিত, অধিক সংস্কৃতিবান, অধিক বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন বা অধিক উশ্বর্যশালী হলেই যে তারা রাষ্ট্র পরিচালনার দিক দিয়েও অধিক যোগ্যতা, দূরদৃষ্টি ও ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন হবে, তা বলা যায় না। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। তা ওসব দিক দিয়ে অগ্রসর লোকদের মধ্যেই পাওয়া যাবে

১. মুকাদ্দমাঃ ইবনে খালদুন

অন্যত্র পাওয়া যাবে না, এ কথার কোন যুক্তি নেই। কাজেই অভিজাত শ্রেণীর বা ভদ্র লোকদের শাসন বাস্তবিকই ভিত্তিহীন ব্যাপার। অনেকে এসব দিক দিয়ে 'বড় লোক' হওয়ার দাবি করা সত্ত্বেও বাস্তবে দেখা গেছে, রাষ্ট্র পরিচালনায় তারা চরম অযোগ্যতা, অপদার্থতার প্রমাণ দিয়েছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে।

৩. ধনী লোকদের শাসন

অনেক সময় সমাজের অধিক ঐশ্বর্যশালী লোকেরা নিজেদের ধনশীলতার দোহাই দিয়ে বা তার উপর নির্ভর করে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের দাবি করে এবং সরকারযন্ত্র দখল করে বসে। এইরূপ শাসন ব্যবস্থাকে ঐশ্বর্যশালীদের শাসন বলা হয়।

এই শ্রেণীর লোকদের ধারণা, যেহেতু সমাজের মধ্যে তারাই ধনী ও ঐশ্বর্যশালী, সারাদেশের অর্থনীতির চাবিকাঠি তাদেরই মুঠের মধ্যে। অতএব দেশ শাসনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া অগ্রাধিকার তাদেরই থাকতে পারে।

কিন্তু ধনশালী হওয়া রাষ্ট্র পরিচালনায় অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়ার কোন লক্ষণ বা প্রমাণ নয়। ধনশালী হলেই যে কারোর মধ্যে এই যোগ্যতা স্বতঃই এসে যাবে,তার কোন প্রমাণ নেই।

এছাড়া ধনীদের ধন-সম্পদের মালিক হওয়ার এবং অন্যান্য লক্ষ্য কোটি মানুষের দরিদ্র হওয়ার ব্যাপারটিও প্রশ্নাতীত তো নয়-ই, বরং এ নিয়ে অতি সহজেই প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যে, তারা অন্যদের অপেক্ষা অধিক ধন-সম্পদের মালিক হয়ে বসলো কিভাবে? নিশ্চয়ই অন্যদের শোষণ করে, অন্যদের ন্যায্য হক্ থেকে বঞ্চিত করেই তাদের পক্ষে অধিক ধন-সম্পদের মালিক হওয়া সম্ভবপর হয়েছে। এসব অসদুপায়ের আশ্রয় না নিলে তারা কখনই এত বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদের মালিক হতে পারতো না। প্রশ্ন হচ্ছে ধন-সম্পদের আহরণে—আয়ত্তকরণেই যদি তারা শোষণ-বঞ্চনার আশ্রয় নিয়ে থাকে, তাহলে রাষ্ট্রের সর্বাত্মক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে তারা যে যোগ্যতা সহকারে রাষ্ট্র চালাতে পারবে, জনগণের অধিকার ইনসাফ সহকারে আদায় করতে পারবে, তা কি করে আশা করা যেতে পারে?

আসল কথা, কারোর অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ বা কারোর অধিক ধন-সম্পদের মালিক হওয়ার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এর সাথে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়ার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। এই জন্যই ইসলামের এ সবের দোহাই দিয়ে কারোর রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা বা দাবি

সমর্থনীয় নয়। কেননা এসব শাসন শেষ পর্যন্ত স্বৈরতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাচারি শাসনে পরিণত হওয়া অবধারিত। যদিও অনেক সময় এই শ্রেণীর লোকেরা তথাকথিত গণতান্ত্রিকতারও আশ্রয় নিয়ে থাকে।

৪. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে এক কথায় 'জনগণের শাসন', জনগণের উপর, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য' 'শাসন' বলা হয়। ইংরেজীতে তা হচ্ছেঃ Government of the people by the people and for the people.

বাহ্যত এ শাসন ব্যবস্থা পূর্বোল্লিখিত শাসন ব্যবস্থা থেকে ভিন্নতর। কেননা এ শাসন ব্যবস্থা জনগণের সমর্থন, রায় বা ভোটের উপর নির্ভরশীল। জনগণের ভোটেই এ শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠে এবং জনগণের মর্জী মাফিক শাসনকার্য চালিয়ে যায়। বলা হয়, জনগণের মর্জীর বিপরীত কাজ করলে কিংবা জনগণের সমর্থন হারালে এ শাসন ব্যবস্থার পতন ঘটে। অতঃপর সেই জনগণের সমর্থন নিয়ে আর একটি সরকার গড়ে উঠে।

এই শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্র প্রধান কিংবা শাসক দল জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়। পরবর্তী নির্বাচনে জনগণ সে রাষ্ট্র প্রধান বা শাসক দলের পক্ষে রায় না দিলে সে সরকারের পতন ঘটবে এবং যার বা যে দলের পক্ষে রায় দেবে, তার বা সে দলের সরকার গঠিত হবে।

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার দুটি ধরণ পৃথিবীতে চালু আছে। একটি প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি। আর অপরটি পার্লামেন্টারী বা সংসদীয় পদ্ধতি। প্রথমটিতে প্রেসিডেন্ট সরাসরি জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়। আর শেষেরটিতে পার্লামেন্ট সদস্যগণ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন ও পরিচালন করে। প্রথমটিতে প্রেসিডেন্ট-ই ক্ষমতার ধারক, আর দ্বিতীয়টিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল—দলের নেতা—প্রধান মন্ত্রীই ক্ষমতার ধারক হয়ে থাকে।

প্রথমটিতে পার্লামেন্ট সদস্য সরাসরি জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হলেও মূল ক্ষমতার মালিক হতে পারে না। মূল ক্ষমতার ধারক প্রেসিডেন্টের মর্জী-ই পার্লামেন্টে প্রধান ভূমিকা পালন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মাধ্যমেই সে মর্জী কার্যকর হয়। আর দ্বিতীয়টিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা—প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টে উপস্থিত থেকে জনগণের মর্জীর প্রতিফলন ঘটায়।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কার্যত মানুষের নিরংকুশ শাসন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) মানুষেরই করায়ত্ত, মানুষের হাতেই

ব্যবহৃত। এ সার্বভৌমত্বের বলেই মানুষ মানুষের উপর নিরংকুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী—খোদা—হয়ে বসে।

কিন্তু কোন মানুষ কি সার্বভৌম হতে পারে? রাজতন্ত্র, বাদশাহী ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে মানুষ এই সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র অধিকারী হয়ে সাধারণ মানুষকে দাসানুদাসের জীবন যাপনে বাধ্য করে। এ দিক দিয়ে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পূর্বে আলোচিত অন্যান্য বাতিল শাসন ব্যবস্থার মতই নিপীড়নমূলক। মৌলিকতার দিক দিয়ে এ সবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

তবে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা একটা মারাত্মক ধরনের ধোঁকা ও প্রতারণার শাসন। রাজতন্ত্র, বাদশাহী ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে জনগণ জানে এবং তারা ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক—মেনে নিতে বাধ্য হয় যে, এ শাসন ব্যবস্থায় তাদের যেমন কোন ক্ষমতা নেই, তেমনি নেই কোন অধিকারও। এক দিক দিয়ে এটা একটা নৈরাশ্যজনক অবস্থা।

এই নৈরাশ্যজনক অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার উদ্দেশ্যেই পাশ্চাত্যে আধুনিক গণতন্ত্রের প্রবর্তন হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, জনগণ-ই ক্ষমতার উৎস। জনগণের রায় ও সমর্থনেই একটি শাসন-ব্যবস্থা গড়ে উঠতে ও শাসন কার্য চালানো যেতে পারে। তাতে জনগণ বিপুলভাবে আশান্বিত হয়ে উঠে।

কিন্তু বাস্তবে গণতন্ত্রের নামে জনগণ কঠিনভাবে প্রতারিত হতে বাধ্য হয়। জনগণ ভোট দেয়ার অধিকারী হয় বটে, কিন্তু সেই ভোট দান ক্ষমতা তারা নিজেদের ইচ্ছা ও বিশ্বাস অনুযায়ী প্রয়োগ করতে পারে না। ভোট দান কেবল মাত্র নির্ধারিত ভোট প্রার্থীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। প্রার্থীদের মধ্য থেকেই কাউকে-না কাউকে ভোট দিতে হবে। তাদের বাইরে কাউকে ভোট দেয়ার কোন অবকাশ নেই। এমনকি প্রার্থীদের মধ্যে কাউকে ভোটদাতার পছন্দ না হলেও তাদেরই মধ্য থেকে একজনকে ভোট দিতে হবে। ভোট দানের স্বাধীনতা এখানে ক্ষুণ্ন হয়ে যায়।

ভোট প্রার্থীরা সাধারণত কোন-না-কোন দলের মনোনীত হয়ে থাকে। ব্যক্তি হিসেবে কোন প্রার্থীকে পছন্দ হলেও তার দলকেও পছন্দ এবং সমর্থন করার বাধ্যবাধকতা অনিবার্য হয়ে পড়ে। অথবা দল পছন্দ হলে আর ব্যক্তি প্রার্থীকে পছন্দ করতে না পারলেও ভোট তাকেই দিতে হবে। এভাবে দলীয় প্রভাবের দোহাই দিয়ে কত 'কলা গাছ' যে ভোট পেয়ে বিরাট বৃক্ষে পরিণত হয়েছে,তার ইয়ত্তা নেই।

প্রার্থীদের ভোট প্রার্থনাও নির্ভেজাল নয়। প্রত্যেক প্রার্থী নিজের বা স্বীয় দলের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের দোহাই দিয়ে ভোট পেতে চায়। সে জন্য ক্যানভাসার বাহিনী

ময়দানে নামিয়ে দেয়া হয়। বিপুল মৌখিক প্রচারণার সাথে পান-সিগারেট-চায়ের প্রবাহ চলে। সাধারণ অ-সচেতন জনমত কোন প্রার্থীর প্রচারণার ব্যাপকতা-চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে, অথবা নগদ অর্থ পেয়ে বা পাওয়ার লোভে পড়ে ভোট দিতে বাধ্য হয়। আর ভোটটা দিয়ে দেয়ার পর তার আর কোন ক্ষমতাই থাকে না। তখন ভোট প্রাপ্ত ব্যক্তিই জনগণের দোহাই দিয়ে একান্ত নিজস্ব মত প্রকাশ ও প্রচার করতে থাকে। ভোট দাতা জনগণ তাদের প্রকৃত মতের বিপরীত কথা সেই ভোট প্রাপ্ত ব্যক্তির মুখে শুনে বা তার কাজ কর্ম দেখে স্তব্ধ নির্বাক হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তার প্রতিবাদ করার বা তার সাথে সম্পর্কহীনতার কথা বলা বা বলে প্রমাণিত করার কোন উপায়-ই তার থাকে না। ভোট ফিরিয়ে নেয়ার (Re call) কথা বলা হলেও তার বাস্তবতা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ফলে জনগণের অসহায়ত্ত অত্যন্ত করুণ হয়ে উঠে।

বলা হয়, গণতান্ত্রিক শাসনেই জনমতের প্রতিফলন ঘটে। জনগণের মত-ই তাদের নির্বাচিত ব্যক্তিদের পার্লামেন্ট সদস্য বা প্রেসিডেন্টের মুখে ধ্বনিত হচ্ছে। এ কথাটি যে কতখানি অসত্য ও ভিত্তিহীন, তা যে-কোন তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই বাস্তবে পরিলক্ষিত হয়।

বলা হয়, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। হ্যাঁ, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের শাসন নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচিত ব্যক্তিদের শাসন। প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতিতে এক ব্যক্তির নিরংকুশ শাসন এবং পার্লামেন্টারী পদ্ধতি মুষ্টিমেয় নির্বাচিত ব্যক্তিদের মধ্যে বেশী সংখ্যক সদস্যদের—তাদের দলীয় নেতার 'প্রধান মন্ত্রীর' নিরংকুশ শাসন। কেননা দলীয় প্রধানই প্রধান মন্ত্রী, সংসদ নেতা। জাতির অল্প সংখ্যক লোক দ্বারাই শাসিত হয় দেশের কোটি কোটি মানুষ। তাদের রচিত আইন-ই হয় দেশের আইন (Law of the land)। তাই মানতে বাধ্য হয় গোটা জনগণ। আর মানুষ মানব রচিত আইন দ্বারা শাসিত। ইসলামের দৃষ্টিতে তা-ই হচ্ছে রাজনৈতিক ও আইনগত শিরক্। আইন পাস করার সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের লোকেরা জনগণের স্বার্থের পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থটাই বড় করে দেখে থাকে অতি স্বাভাবিকভাবে।[১] এটাই গণতন্ত্রের আসল রূপ।

একটি বিশ্লেষণে গণতান্ত্রিক শাসন বেশীর ভাগ জনগণের মতের শাসন নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের ভোটেই বিজয়ী প্রার্থী নির্বাচিত বলে ঘোষিত হয়। মনে

১. Professor Robert Dahl said: Democracy is neither rule by the majority nor ruled by a minority, but ruled by minorities. Thus the making of governmental decisions, is not a majestic march of great majorities united on certain matters of basic policy, it is the steady appeasment of relatively small (pressure) groups. Preface to Democratic theory. p. 146

করা যায়, একটি ভোট এলাকায় ৫ জন প্রার্থী। বিজয়ী ব্যক্তি তুলনামূলকভাবে একটি ভোট বেশী পেলেই নির্বাচিত ঘোষিত হচ্ছে অথচ তার প্রাপ্ত ভোটসংখ্যা পরাজিত প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোট সমষ্টির তুলনায় অনেক কম হয়ে থাকে। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠের (Majority) দোহাই দিয়ে সংখ্যা লঘিষ্ঠ লোকদের নির্বাচিত ব্যক্তিই দেশ শাসনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার সুযোগ পেয়ে থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটদাতাগণ সমর্থন না দিয়েও কম সংখ্যক লোকদের ভোট প্রাপ্ত ব্যক্তিকে নির্বাচিত মেনে নিতে বাধ্য হয়।

ফলে মানুষকে প্রকাশ্যে যা বলা হয়, তা তাদেরকে দেয়া হয় না, যা পাওয়ার জন্য তারা আশাবাদী হয়ে উঠে, তা থেকে নির্মমভাবে বঞ্চিত হয়। এই পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারকে গণতান্ত্রিক সরকার বলা হয়। বলা হয়, রাজতান্ত্রিক, উত্তরাধিকার ভিত্তিক বাদশাহী বা স্বৈরতান্ত্রিক শাসন থেকে নিষ্কৃতি লাভের এক মাত্র পথ হচ্ছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকার ও শাসন ব্যবস্থা। কিন্তু উপরের বিশ্লেষণে আমরা দেখিয়েছি, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রেসিডেন্সিয়াল হোক বা পার্লামেন্টারী পদ্ধতির, উভয় ক্ষেত্রে দলীয় নেতার ভূমিকা সর্বাধিক বলিষ্ঠ এবং বিজয়ী সে প্রেসিডেন্ট হোক বা প্রধানমন্ত্রী এবং এই এক ব্যক্তির শাসনই গণতান্ত্রিক শাসনের আসল কথা। ফলে গণতন্ত্রে কার্যত এক ব্যক্তির শাসনই হয়ে থাকে, যদিও দোহাই দেয়া হয় বহু লোকের—জনগণের। তাই বাস্তব গণতন্ত্র আর স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যাবে না।

শুধু তা-ই নয়, গণতান্ত্রিক শাসন গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে-দিয়েই কার্যত ভয়াবহ স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হয়ে যায় দলীয় নেতার মর্জীতে। কেননা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দলীয় নেতার নেতৃত্ব নিরংকুশতার দিক দিয়ে যখন কিছুটা ব্যাহত হতে থাকে, তখন নেতা তা বরদাশ্‌ত করতে প্রস্তুত হয় না। তখন গণতন্ত্রের খোলাসটা খুলে ফেলে পূর্ণমাত্রার স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করে দেয়। আর তখনও জাতির বা গণতন্ত্রের দোহাই দিতে মুখের পানি একটুও শুকিয়ে যায় না।[১]

গণতন্ত্র যেহেতু 'সেকিউলার'—ধর্ম নিরপেক্ষ বা কার্যত ধর্মহীন। তাই ভোটদাতা থেকে ভোটপ্রার্থী পর্যন্ত এবং প্রেসিডেন্ট থেকে প্রধানমন্ত্রী হওয়া পর্যন্ত কোন পর্যায়ের নির্বাচনে ও রাষ্ট্র পরিচালনায় কোন নীতি বা ধর্মীয় আদর্শের অনুসরণের একবিন্দু বাধ্যবাধকতা থাকে না। সেই কারণে ধর্মহীন চরিত্রহীন ব্যক্তি ধার্মিক সেজে, জনগণের দুশমন ব্যক্তিও জনদরদী সেজে জনগণের সমর্থন

১. ১৯৭৩-৭৪ সনে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংবিধান নিমেষের মধ্যে স্বৈরতান্ত্রিক সংবিধানে পরিণত হওয়া তার বাস্তব প্রমাণ।

আদায় করতে কোনরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হয় না। ফলে তাদের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ মাত্র, এ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্যই তারা দেখতে পায় না।

কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এইসব কয়টি শাসন পদ্ধতি ও ব্যবস্থাই সম্পূর্ণরূপে বাতিল, অগ্রহণযোগ্য। মানবতার পক্ষে চরমভাবে মারাত্মক। মানুষের মানবিক মর্যাদা হরণকারী, অধিকার বঞ্চনাকারী, মনুষ্যত্ব ধ্বংসকারী। তাই তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। যে কোন দিক দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা হলে এ সব কয়টি শাসন ব্যবস্থার তুলনায় ইসলামী শাসন ব্যবস্থাই সর্বোত্তম; প্রকৃতপক্ষেই মানব কল্যাণকামী, মানুষের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠাকারী এবং সমগ্র বিশ্বলোক ব্যবস্থার সাথে পূর্ণ মাত্রায় সামঞ্জস্যশীল শাসনব্যবস্থা।

আমাদের পরবর্তী আলোচনা 'ইসলামী শাসন পদ্ধতি' তা অকাট্যভাবে প্রমাণ করবে।

ইসলামী রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থা

[পূর্ববর্তী আলোচনার সারনির্যাস—ইসলামী হুকুমাতের বিশেষত্ব—সার্বভৌমত্ব কার? সাধারণ জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন—সার্বভৌমত্ব প্রয়োগে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব—দাউদ (আ)-এর খিলাফত আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের অধীন—শাসন প্রশাসন ব্যবস্থা—হুকুমাত ছাড়া আমানত আদায় করা সম্ভব নয়—শাসনকার্য পরিচালনা ও নেতৃত্ব দানে খিলাফত—সরকার সংগঠনে সামষ্টিক দায়িত্ব—দার্শনিকদের দৃষ্টিতে সমাজ-সমষ্টি—কুরআনের দৃষ্টিতে সমাজ-সমষ্টি—বিবেক-বুদ্ধির দৃষ্টিতে সরকার গঠন—নবী করীম (স)-এর পরবর্তী মুসলিম সমাজ—জনগণ তাদের ধন-মালের জন্য দায়িত্বশীল। প্রশাসনিক ক্ষমতা—সার্বভৌমত্ব— প্রশাসনের নিকট আমানত।]

পূর্ববর্তী আলোচনার সারনির্যাস

১. কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলীল বাদ দিলেও মানুষের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি একটি দেশের শানস-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্য একটি রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার অপরিহার্যতা একান্তভাবে অনুভব করে। সেজন্য প্রবলভাবে তাকীদ জানায়। কেননা এইরূপ রাষ্ট্র না হলে যেমন একটি সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না, তেমনি সমাজের লোকদের মধ্যে সুবিচার ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠা, প্রত্যেকটি নাগরিকের মানবিক মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করা কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। সম্ভব নয় জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা ও সকল প্রকার বিজাতীয় বা বৈদেশিক আগ্রাসন থেকে নিরাপত্তা দান করা। এরূপ একটি রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা কার্যকর না হলে চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা, লুট-পাট ও মারমারি রক্তা-রক্তি দেখা দেয়া অনিবার্য হয়ে পড়বে।

২. বিশেষত মুসলিম জনগণ একটি রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা কায়েম করতে বাধ্য। আল্লাহ্‌র কুরআন ও রাসূলের সুন্নাত স্পষ্ট ও উদাত্ত কণ্ঠে সেজন্য আদেশ দিয়েছে, যা মেনে চলতে তারা সকলেই বাধ্য। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান—আদেশ ও নিষেধসমূহ বাস্তবায়িত করার জন্য রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা একান্তই অপরিহার্য। মানুষের ব্যক্তিগত, সমাজগত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পালন ও অনুসরণের জন্য আল্লাহ্ ও রাসূলের দেয়া বিধান কার্যকর ও বাস্তবায়িত হতে পারে না একটি রাষ্ট্র ও সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা ব্যতিরেকে।

৩. দ্বীন ইসলামের প্রতিষ্ঠা, নির্বিঘ্নে জনগণের দ্বীন পালন ও সকল প্রকা

ভয়-ভীতি প্রতিবন্ধকতা মুক্ত আদর্শিক জীবন যাপনের সুযোগ লাভের জন্যই একটি রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা—সরকার—কায়েম করা অপরিহার্য।

৪. ইসলামী প্রশাসন—সরকার—রাজতান্ত্রিক, স্বৈরতান্ত্রিক, অভিজাত লোকদের বা ধনী লোকদের শাসন ব্যবস্থা নয়। তা তথাকথিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কায়েম হওয়া সরকার-ও নয়—যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশসমূহে চালু রয়েছে এবং তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহে যা প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া হচ্ছে বা যার দিন-রাত দোহাই দেয়া হচ্ছে।

এই সব কয়টি কথার বিশ্লেষণ পূর্ববর্তী আলোচনায় বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। প্রমাণ করা হয়েছে যে, মানুষ কল্পিত সব কয়টি শাসন ব্যবস্থাই বাতিল। এক্ষণে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, তাহলে সর্বোত্তম শাসন ব্যবস্থা—ইসলামী শাসন ব্যবস্থা—কি, কি তার পরিচয়?

ইসলামী হুকুমাত বা শাসন-ব্যবস্থার রূপরেখা কি, এ পর্যায়ে প্রাচীনকালীন মুসলিম চিন্তাবিদদের নিকট থেকে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে কিছু পাওয়া গেছে এমন দাবি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যে দু'চারখানি গ্রন্থ এ পর্যায়ে পাওয়া গেছে, তার কোন একটিতেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত ও সহজবোধ্যভাবে কিছুই লেখা হয়নি। মোটামুটিভাবে কয়েকটি কথা লিখে-ই দায়িত্ব পালন করতে চেষ্টা করা হয়েছে বলে মনে হয়। কুরআন ও সুন্নাতে প্রায় সব মৌলিক বিষয়াদি আলোচিত হওয়া সত্ত্বেও মনীষীদের লেখনীপ্রসূত গ্রন্থাদিতে তার বিস্তাতির আলোচনা না থাকা আমাদের—বিশেষ করে এই পর্যায়ের—দীনতাই প্রমাণ করে।[১]

প্রাচীন মনীষীদের লিখিত গ্রন্থাদিতে ইসলামী হুকুমাতের প্রকৃত রূপরেখা বিস্তারিত ও স্পষ্ট আলোচিত না হওয়ার মূলে কতকগুলি বাস্তব ও ঐতিহাসিক কারণ নিহিত রয়েছে বলে মনে হয়। কারণগুলি নিম্নরূপঃ

১. 'খিলাফতে রাশেদা'র পর—গ্রন্থ প্রণয়ন শুরু হওয়ার সময়—মুসলিম জাহানে কুরআন-সুন্নাহ মুতাবিক প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম না হওয়া—কায়েম না থাকা। রাষ্ট্র-শাসনে প্রকৃত ইসলামী আদর্শ অনুসরণ না করা ও তার উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকার দরুণ—অত্যাচারী গায়ের-ইসলামী হুকুমাতের সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করে। ফলে 'কুরআন-সুন্না'র মৌলনীতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা সম্বলিত গ্রন্থ রচনা অসম্ভব হয়ে দেখা দিয়েছিল।

---

১. প্রাচীন মনীষীদের মধ্যে কেবলমাত্র আল-মা-ওয়ার্দী লিখিত গ্রন্থ الاحكام السلطانية এরই উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু তাতেও প্রশাসন পদ্ধতি পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না। —গ্রন্থকার।

এ সময়ে মুসলমানদের শাসন ব্যবস্থা 'খিলাফত' নামে অভিহিত করা হলেও তা প্রকৃত 'খিলাফত' ছিল না। মুসলমানের শাসন চললেও ইসলামের শাসন চলেনি। ইসলামী শাসনের জরুরী শর্তাবলী সে শাসনে ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

২. রাসূলে করীম (স) ও 'খিলাফতে রাশেদা'র আমল থেকে অনেক দূরে সরে যাওয়ার দরুন কুরআন-সুন্নায় ব্যবহৃত যে সব পরিভাষা নির্ভুলভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের সঠিক রূপরেখা প্রকাশ করে, তার যথার্থ তাৎপর্য অনুধাবন করা কঠিন হয়ে যায়। প্রথম যুগে তা বুঝতে পারা যতটা সহজ ছিল, পরবর্তী যুগে তা আর সহজ থাকে না।

৩. এই আমলের ইতিহাস থেকে মুসলিম শাসনের রূপরেখা তো জানা যায়; কিন্তু ইসলামী শাসনের রূপরেখা বোঝার জন্য তা কিছুমাত্র সহায়ক নয়। বরং তা নির্ভুল ধারণা (Conception) লাভের পথে বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলিম ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস তাতে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বলা বাহুল্য, আমরা ইসলামী জ্ঞান-গবেষণার প্রাথমিক যুগের মনীষীদের মহান অবদানের কথা অস্বীকার করছি না। তাঁরা ইসলামী চিন্তার প্রণয়ন, তার সমর্থন সংরক্ষণ, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাতে গভীরতা ব্যাপকতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে দিনরাত পরিশ্রম করে গেছেন। তা না হলে আজকের দিনে আমরা ইসলাম সম্পর্কে কোন জ্ঞানই লাভ করতে পারতাম না, তার কোন মাধ্যমও পেতাম না, তা অকপটে স্বীকার করতে হবে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও একথাও বলতে আমরা বাধ্য যে, তাঁদের জ্ঞান-গবেষণা আজকের দিনের প্রয়োজন পূরণ করতে পুরাপুরিভাবে সমর্থন হচ্ছে না। এজন্য আজ নতুনভাবে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ইসলামের মৌল উৎস কুরআন ও সুন্নাতকে ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় বিষয় চিন্তা-গবেষণা চালানো অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এখানে আমরা সেই কাজে-ই প্রবৃত্ত হচ্ছি।

আজকের দিনে মুসলিম চিন্তাবিদদের নিকট প্রকৃত ইসলামী হুকুমাতের রূপরেখা অস্পষ্ট ও ম্লান হয়ে গেছে। বহু মুসলিম দেশের শাসকরা ইসলামী পদ্ধতির সরকার না হওয়া সত্ত্বেও এবং নিছক মুসলমান নামধারী ব্যক্তিদের রাজতান্ত্রিক বাদশাহী ও স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের প্রধান হয়েও নিজেদের ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হওয়ার দাবি করছে। আর এই ধরনের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্র প্রধানদের ঐক্য সংস্থাকে 'ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন' এবং এসব রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সংস্থাকে 'ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন' নামে অভিহিত করছে। শুধু তা-ই নয়, এ সব সম্মেলন অনুষ্ঠানকালে তাদের সকল প্রকার

কার্যকলাপকেই ইসলামী বলে চালিয়ে দিচ্ছে, যদিও কুরআন-সুন্নাহ নিঃসৃত ইসলামের সাথে তার দূরতম সম্পর্কও নেই।

এখানেই শেষ নয়। ইসলামের প্রকৃত তত্ত্ব ও রূপ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানহীন মুসলিম রাজনীতিকরা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিকে ইসলামী রাজনীতি, নিজেদের কায়েম করা বা পরিচালিত রাষ্ট্রকে 'ইসলামী রাষ্ট্র' নামে অভিহিত করতে লজ্জা পান না। পাশ্চাত্যের আল্লাহ্ অস্বীকারকারী ধর্মহীন গণতন্ত্রকে 'ইসলামী' ও ইসলামী হুকুমাত কায়েমের একমাত্র উপায় বলে প্রচার করছে। এসব কারণে বর্তমানে প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা অস্পষ্ট ও ম্লান হয়ে যাওয়া এবং অ-ইসলামীকে ইসলামী মনে করা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়।

এই জাতীয় বিভ্রান্তির দিনে সর্বগ্রাসী জাহিলিয়াতের অন্ধকার থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক প্রত্যক্ষ গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা। তা-ই আমাদের একমাত্র অবলম্বন।

ইসলামী হুকুমাতের বিশেষত্ব

কুরআনের দৃষ্টিতে ইসলামী হুকুমাতের কয়েকটি বিশেষত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এই বিশেষত্বসমূহ ইসলামী হুকুমাতকে অন্যান্য ধরনের হুকুমাত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্রভাবে প্রতিভাত করে। বর্তমানে যে সব রাষ্ট্র সম্পূর্ণ মিথ্যামিথ্যিভাবে ইসলামী হুকুমাত না হয়েও ইসলামের পতাকা উড়ায় দুনিয়ার মানুষকে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে, সেগুলোও যে আসলে আদৌ ইসলামী নয়, তা এ বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়ে যায়।

বস্তুত ইসলামী হুকুমাতের প্রথম ভিত্তি হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব। আর দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে, আল্লাহ্‌র কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহ-ই আইনের একমাত্র উৎস।

যে সরকারে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব নিরংকুশভাবে গৃহীত নয় বরং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য কারোর—জনগণের, কোন ব্যক্তির, কোন বংশের বা কোন শ্রেণীর সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত, তা কখনই ইসলামী সরকার হতে পারে না।

আল্লাহ্‌র শুধু সার্বভৌমত্ব স্বীকার করলেই হবে না, আল্লাহ্‌র একক আইনকেও পূর্ণ স্বীকৃতি দিতে হবে। আল্লাহ্‌র কালাম কুরআন মজীদ এবং কুরআনের বাহক রাসূলের সুন্নাতকে আইনের উৎস—তারই আইনকে দেশের আইনরূপে স্বীকৃতি দিতে ও জারি করতে হবে। অন্যথায় আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব স্বীকারকারী রাষ্ট্র বা সরকারও 'ইসলামী' পরিচিতি লাভ করতে পারে না। কেননা আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের বাস্তবতা তো আল্লাহ্‌র আইন পালনের মাধ্যমেই সম্ভব। আল্লাহ্‌র

আইন পালনে অনীহা দেখালে আল্লাহ্‌র স্বার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে যায়।

বস্তুত ইসলামী ও অ-ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে এ দুটি ভিত্তিতেই পার্থক্য হয়ে থাকে। এ পার্থক্য একটি শানিত তীক্ষ্ণ মানদণ্ড। এই মানদণ্ডে ওজন করলে বর্তমানকালের বহু ইসলামী হুকুমাত হওয়ার দাবিদার রাষ্ট্র ও সরকারও সম্পূর্ণ 'গায়র ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার' বলে প্রমাণিত হবে।

সার্বভৌমত্ব কার?

'আল-কুরআনের আলোকে শিরক ও তওহীদ' গ্রন্থে আমরা কুরআন ভিত্তিক আলোচনায় দেখিয়েছি যে, সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র। সার্বভৌমত্বের যে সংজ্ঞা ও পরিচিতি আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে দেয়া হয়েছে, সে দৃষ্টিতেও সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহই হতে পারেন, আসমান-যমীনে আল্লাহ্‌ ছাড়া সার্বভৌম আর কেউ নেই, কেউ হতেই পারে না।

কুরআনের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র, সার্বভৌম আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউ-ই নয়; তাঁর মুকাবিলায় মানুষের স্থান ও মর্যাদা শুধু সেই সার্বভৌম আল্লাহ্‌র দাসত্ব করা, একান্ত অনুগত দাস হয়ে জীবন যাপন করা। তিনিই মানুষের দাসত্ব-ব্যবস্থা নাযিল করেছেন তাঁরই মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে। রাসূল (স) আল্লাহ্‌র আইন বিধান অনুসরণ ও কার্যকরকরণের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব বাস্তবায়িত করেছেন। এই বাস্তবায়ন পদ্ধতি-ই হচ্ছে রাসূলের সুন্নাত। কুরআন মজীদের বহু সংখ্যক আয়াতে এ কথা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বলা হয়েছে। এখানে কতিপয় আয়াত আমরা পুনরায় উদ্ধৃত করছিঃ

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (الانعام: ٥٧)

চূড়ান্ত হুকুম দেয়ার—সার্বভৌমত্বের—অধিকার কারোরই নেই, আছে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। তিনি পরম সত্য কথা বলেন, আর তিনি-ই হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ (الانعام: ٦٢)

তোমরা জেনে রাখবে, সার্বভীমত্ব কেবলমাত্র (সেই) আল্লাহ্‌রই, আর তিনিই হচ্ছেন সর্বাধিক দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রাকৃতিক জগতের একমাত্র স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রণকারী ও পরিচালক। এখানেই শেষ নয়। বরং তিনি মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয়

আইন-বিধান দাতাও। মৌলিকভাবে এ অধিকারও কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য সংরক্ষিত।[১] কেননা এই সৃষ্টি তাঁর, এর উপর হুকুম চালাবার অধিকারও একমাত্র তাঁরই হতে পার! তাই রয়েছেও। তবে তিনি নিজেই যদি কাউকে তাঁর দেয়া শিক্ষা ও বিধানের ভিত্তিতে হুকুম দেয়ার অনুমতি দেন, তবে সেই অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিও 'হুকুম' দিতে পারবে। তবে তার জন্য দুটি শর্ত! একটি, মূলত সার্বভৌমত্ব ও হুকুম দেয়ার অধিকার যে একমাত্র আল্লাহ্‌র—একথা তাকে অকপটে ও নিঃশর্তে মেনে নিতে হবে এবং তা ঘোষণা করতে হবে। আর দ্বিতীয় এই যে, তার হুকুম দেয়ার প্রাপ্ত ক্ষমতা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যবহার করতে হবে। হুকুম দেয়ার তার নিজের কোন মৌলিক অধিকার নেই—একথা যেমন তাকে মানতে হবে, সেই সাথে আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমা লংঘন করে মানুষের উপর নিজের হুকুম চালাবার কোন অধিকারই তার নেই, একথাও তাকে মানতে হবে। কেননা এই উভয় ব্যাপারে আল্লাহ্‌র অধিকার নিরংকুশ, অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

আল্লাহ্‌র পরে হুকুম দেয়ার অধিকার আল্লাহ্‌ই দিয়েছেন তাঁর নিজ মনোনীত নবী-রাসূলগণকে! কুরআনে এ পর্যায়ের বহু আয়াত রয়েছে। একটি আয়াতে হযরত দাউদ (আ)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ্ বলেছেনঃ

إِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ (ص: ٢٦)

হে দাউদ, আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে পরম সত্যতা সহকারে হুকুম চালাও।

এ আয়াতের প্রথম কথা, হযরত দাউদ (আ) নিজে সার্বভৌম নন, তিনি সার্বভৌমের খলীফা, প্রতিনিধি, স্থলাভিষিক্ত এবং তাঁরই নিয়োজিত। আয়াতে তাঁকে লোকদের মধ্যে হুকুম চালাবার নির্দেশ আল্লাহ্‌ই দিয়েছেন। কিন্তু তা

---

১. পাশ্চাত্যের রাষ্ট্র বিজ্ঞানীগণও ইসলামী রাষ্ট্রের এই বিশেষত্বকে অকপটে স্বীকার করেছেন। এ পর্যায়ে সাক্ষ্য হিসেবে আমরা এখানে মাত্র একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর উক্তিই উদ্ধৃত করছি। তিনি হচ্ছেন David de santillana.

তিনি বলেছেনঃ

Islam is the direct government of Allah, the rule of God, whose eyes are upon his people. The principle of unity and order which in other societies is called civitas, polis state, in Islam is personified by Allah: Allah is the name of the supreme power acting in the common interest. Thus the public treasury is the treasury of Allah, the army is the army of Allah, even the Public functionaries are the employees of Allah. (santillana 'Law and society' The legacy of Islam' ed. Thomas Walker Arnold Coxpord The Etaroandon Press. 1931) P. 286

নিরংকুশ নয়। সে জন্য দুটি শর্ত স্পষ্ট। একটি, তিনি নিজেকে আল্লাহ্র নিয়োজিত খলীফা মনে করবেন, খলীফা হিসেবেই হুকুম চালাবেন, সার্বভৌম হিসেবে নয়। আর দ্বিতীয়, তিনি নিজ ইচ্ছা ও খাহেশ অনুযায়ী হুকুম চালাতে পারবেন না, তা চালাতে হবে পরম সত্যতা সহকারে। الحق শব্দটির অর্থ প্রায় তাফসীর লেখক-ই বলেছেন العدل সুবিচার ও ন্যায়পরতা. যা কেবলমাত্র আল্লাহ্র বিধানভিত্তিক বিচার ও শাসনকার্যেই সম্ভব। মানুষের ইচ্ছামত হুকুম দেয়া বা বিচার করায় সুবিচার ও ইনসাফ হতে পারে না. একথা উপরোদ্ধৃত আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেনঃ

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

এবং তুমি নিজের ইচ্ছা-বাসনা-খাহেশকে অনুসরণ করে হুকুম দিও না, ফায়সালা করো না। যদি তা-ই কর তাহলে তোমার এই ইচ্ছা-বাসনা কামনা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে ভ্রষ্ট করে দেবে।

আর আল্লাহ্র পথ থেকে ভ্রষ্ট হওয়ার অর্থ জুলুম করা, সুবিচার না করা।

কেননা মানুষের ইচ্ছা-বাসনা-কামনা কখনই নির্ভুল হতে পারে না—নির্ভুল হতে পারে কেবল মাত্র আল্লাহ্র বিধান। মানুষ আল্লাহ্র বিধানকে বাদ দিয়ে নিজ ইচ্ছা বাসনা-কামনা অনুযায়ী হুকুম দিলে—বিচার করলে নিজেকেই আল্লাহ্র আসনে আসীন বানানো হয়। তখন সে আল্লাহ্র বান্দা থাকে না. নিজের বান্দা হয়ে যায়। এ কথা যেমন সাধারণ মানুষ—মুসলমানদের ক্ষেত্রে সত্য, তেমনি নবী-রাসূলগণও যেহেতু মানুষ, তাঁদের বেলায়ও সত্য।

নবী-রাসূলগণের বেলায়ও উক্ত কথা সত্য, তার প্রমাণ উক্ত সূরা'র ২২-২৩ আয়াতে উল্লেখ করা একটি মামলার বিবরণ দিয়ে আল্লাহ নিজেই পেশ করেছেন। দুইজন বিবদমান ব্যক্তি হযরত দাউদ (আ)-এর নিকট বিচার প্রার্থনা করেছিল এবং বলেছিলঃ

فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا اِلٰى سَوَاۤءِ الصِّرَاطِ ـ

আপনি আমাদের দুইজনের মধ্যে পরম সত্যতা-সুবিচার-ন্যায়পরতা সহকারে ফয়সালা করে দিন, বাড়াবাড়ি বা জুলুম করবেন না এবং আমাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ পথ দেখাবেন।

কিন্তু হযরত দাউদ (আ) রায় হিসেবে যা বলেছিলেন, তিনি নিজেই তা বলতে বলতেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, কথাটি ঠিক হয়নি।

فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ (ص: ٢٤)

তাই তার রব্ব্-এর নিকট মাগফিরাত চাইল, সিজদায় পড়ে গেল এবং রব্ব্-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করল।

লক্ষণীয় যে, বিচার প্রার্থীরা বিচার চেয়েছিল পূর্ণ ন্যায়পরতা ও ইনসাফ সহকারে। আর নবীর পক্ষেও যে বাড়াবাড়ি-সীমালংঘন-অবিচার করা অসম্ভব নয়, তা বুঝতে পেরে—মনে এই বিশ্বাস রেখেই তারা বলেছিলেনঃ অবিচার ও বাড়াবাড়ি করবেন না। আর আমাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ পথ দেখাবেন। ভারসাম্যপূর্ণ পথ তো ভারসাম্যপূর্ণ—পক্ষপাতহীণ, তা বিচারের মাধ্যমেই দেখানো সম্ভব। আর তারই দাবি তারা জানিয়েছিল।

এ আলোচনা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো যে, নবী আল্লাহ্‌র খলীফা, হুকুম দেয়ার অধিকার আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রাপ্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর নিজের ইচ্ছা-বাসনা-কামনা অনুযায়ী হুকুম করার, রায় দেয়ার কোন অধিকার তাঁর ছিল না। এ অধিকার করোরই থাকতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী-রাসূলগণকে যে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে লোকদের মধ্যে হুকুম চালাবার অধিকার দিয়েছেন, তা যেমন পূর্ববর্তী আয়াত ও আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি একটি আয়াতে সাধারণভাবেই এই অধিকার দেয়ার কথা আল্লাহ নিজেই বলেছেনঃ

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا (المائدة: ٤٤)

আমরা তওরাত নাযিল করেছি, তাতে ছিল হেদায়েত ও আলো, সমস্ত নবী যারা মুসলিম ছিল—তদানুযায়ী হুকুম চালাবে—ফয়সালা করবে.....

এ আয়াতে মূলত হুকুম দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র, একথা চূড়ান্তভাবে মনে করিয়েই আল্লাহ্ তওরাত নাযিল করেছেন। বলেছেনঃ সেই তওরাত অনুযায়ী নবীগণ হুকুম চালাবেন। তবে সেজন্য শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁদেরকে সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের নিকট আত্মসমর্পিত হতে হবে, তারপরই আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী হুকুম চালাবার অধিকার জন্মাবে নবী-রাসূলগণের, তার পূর্বে নয়।

নবী-রাসূলগণ ছাড়া সাধারণ লোকেরাও লোকদের উপর হুকুম চালাতে পারে। তার জন্যও শর্ত রয়েছে যে, তাদের সুবিচার নীতির অনুসারী হতে হবে। সুবিচার নীতির অনুসারী হওয়ার অর্থ যে আল্লাহ্‌র বিধান পালনকারী ও আল্লাহ্‌র বিধান-ভিত্তিক হুকুমদাতা সুবিচারক হওয়া, তা পূর্বেই প্রমাণ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আল্লাহর কথা হচ্ছেঃ

يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ (المائدة: ٩٥)

তোমাদের মধ্য থেকে কেবল তারাই হুকুম চালাবে, যারা সুবিচার নীতির অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধানের—ধারক ও অনুসারী।

এ কারণে আল্লাহ্ নিজেকে সকল হুকুমদাতা—সকল বিচারকের তুলনায় অধিক উচ্চমানের হুকুমদাতা—সর্বোচ্চ বিচারক হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। বলেছেনঃ

أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ (التين: ٨)

আল্লাহ কি সকল হুকুমদাতা—বিচারকের তুলনায় অধিক ভালো হুকুমদাতা—বিচারক নন?

আল্লাহ্র হুকুম দান মৌলিক, অন্যদের হুকুম দান আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতা ভিত্তিক। আল্লাহ্র বিচার সর্বাধিক নিরপেক্ষ, অন্যদের বিচার আল্লাহ্র বিধানের ভিত্তি গ্রহণের মুখাপেক্ষী। আল্লাহর কথাঃ

وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ (الاعراف: ٨٧)

তিনি-ই সর্বোত্তম হুকুমদাতা, বিচারক এই পর্যায়েরই।

আল্লাহ মানুষের জন্য বিধান নাযিল করেছেন, কিন্তু সেই বিধান মানব সমাজের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় ব্যাপারে কার্যকর ও বাস্তবায়িত করা আল্লাহ্র কাজ নয়। সেজন্য তিনি প্রথম দিন থেকেই মানুষের নিকট নবী-রাসূল পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। নবী-রাসূলগণের কাজ হচ্ছে, একদিকে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়ার সাধারণ ও ব্যাপক আহবান জানানো এবং অপরদিকে আল্লাহর নাযিল করা বিধানকে বাস্তবায়িত করা। এ কারণে আল্লাহ্ নিজেই তাদেরকে হুকুম দেয়ার অধিকার দান করেছেন। নবী-রাসূলগণ এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োজিত। কাজেই আল্লাহ্র বিধানের ভিত্তিতে নবী-রাসূলগণ যখন কোন হুকুম করেন, তখন তা সেইসব লোকের জন্য অবশ্য পালনীয় হয়ে যায়, যারা আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের প্রতি পূর্বেই ঈমান এনেছে। তাই আল্লাহ্ বলেছেনঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ـ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا (الاحزاب: ٣٦)

আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে আদেশ করেন—চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেন, তখন কোন মু'মিন পুরুষ স্ত্রীর জন্য তাদের ব্যাপার সংক্রান্ত এই হুকুম বা ফয়সালা মেনে নেয়া-না নেয়ার কোন ইখতিয়ারই থাকতে পারে না। যদি কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অমান্য করে, তাহলে সে সুস্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে পড়ে গেল।

নবী-রাসূলগণের যেমন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ভিত্তিক হুকুম দেওয়ার অধিকার আছে—আল্লাহ্-ই দিয়েছেন, অনুরূপভাবে নবী-রাসূলগণের অনুপস্থিতিতে মুসলমানদের মধ্য থেকে বাছাই করে নেয়া সমাষ্টিক দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদেরও হুকুম করার, বিচার-ফয়সালা করার অধিকার রয়েছে—আল্লাহ্ নিজেই এ অধিকার দিয়েছেন। তবে তা কোন অবস্থায়ই স্বতঃস্ফূর্ত বা নিঃশর্ত নয়, তা একান্তভাবে আল্লাহ ও রাসূল প্রদত্ত এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যের শর্তাধীন। ইরশাদ হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ (النساء: ٥٩)

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে সামষ্টিক দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদেরও।

এ আয়াতে সর্বপ্রথম নির্দেশ হচ্ছে আল্লাহ্র আনুগত্যের, তারপর রাসূলের আনুগত্যের, তারপর সামষ্টিক দায়িত্ব সম্পন্ন লোকদের।

আদেশটি যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ্র, তাই তিনি একক ও মৌলিকভাবে আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী হয়েও রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন, কেননা আল্লাহ্র আনুগত্য বাস্তবায়িত হতে পারে না রাসূলের আনুগত্য না করলে। রাসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ্রও আনুগত্য বাস্তবভাবে হওয়া সম্ভব। তাই আল্লাহ্র আনুগত্যের বাস্তব উপায়ই হচ্ছে রাসূলের আনুগত্য করা। যেমন আল্লাহ্ নিজেই ঘোষণা করেছেনঃ

وَمَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ (النساء: ٨٠)

যে-লোক রাসূলের আনুগত্য করল, সে কার্যত আল্লাহ্রই আনুগত্য করল।

কিন্তু আল্লাহ্র আনুগত্য করার স্পষ্ট শব্দগত নির্দেশ দেয়ার পর অনুরূপ শব্দগত নির্দেশ اَطِيْعُوْا বলে কেবল রাসূল সম্পর্কেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারপরে সামষ্টিক দায়িত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তিদের আনুগত্য করার নির্দেশের বেলায় সেই اَطِيْعُوْا শব্দের উল্লেখ নেই। কেন নেই? ..... স্পষ্ট বোঝা যায়, রাসূলের আনুগত্য করা মৌলিকভাবেই প্রয়োজন। অন্যথায় আল্লাহ্র আনুগত্য হতে পারে না। অতঃপর মানুষের নিকট আনুগত্য পাওয়ার ও চাওয়ার মৌলিক অধিকার আর কারোরই নেই। সে আনুগত্য অবশ্যই শর্তাধীন হবে। অর্থাৎ রাসূলের অনুপস্থিতিতে মানব সমাজের নিকট আনুগত্য চাওয়ার ও পাওয়ার অধিকার কেবলমাত্র সেই সব সমাষ্টিক দায়িত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিদের, যারা নিজেরা আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ্র বিধান ও রাসূলের বাস্তব

অনুসরণ—সুন্নাত-অনুযায়ী হুকুম দেবে। যারা তা করবে না, তাদের কোন অধিকারই থাকতে পারে না মানুষের নিকট আনুগত্য চাওয়ার ও পাওয়ার।

এই ব্যাখ্যার বাস্তব রূপ আমরা পাই রাসূলে করীম (স)-এর ইন্তেকালের পর মুসলিম জনগণ কর্তৃক 'খলীফায়ে রাসূল' হিসেবে নির্বাচিত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর প্রথম নীতি নির্ধারণী ভাষণে। তাঁর সেই নাতিদীর্ঘ ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি বলেছিলেনঃ

إِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي .... أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَإِذَا عَصَيْتُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ (بخارى، حديث عائشة رض)

আমি ভালো করলে তোমরা আমার সাহায্য করবে। আর মন্দ করলে তোমরা আমাকে ঠিক করে দেবে। তোমরা আমার আনুগত্য করবে যতক্ষণ আমি নিজে আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করতে থাকব। আর আমিই যদি নাফরমানী করি তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য করতে বাধ্য নও।

রাসূলে করীম (স)-এর নেতৃস্থানীয় সাহাবীগণ মসজিদে নববীতে উপস্থিত থেকে প্রথম খলীফার এই ভাষণ শুনেছিলেন। রাসূলে করীম (স)-এর অনুপস্থিতিতে মুসলমানদের সরকার বা প্রশাসন ব্যবস্থা কি হবে তার স্পষ্ট নীতি নির্দেশ এই ভাষণে ধ্বনিত হয়েছে এবং তা সকল সাহাবী কর্তৃক সমর্থিতও হয়েছে।

বস্তুত রাষ্ট্র ও প্রশাসনে নাগরিকদের আনুগত্যই হচ্ছে মূল ভিত্তি। যেখানে এই আনুগত্য নেই সেখানে ভৌগোলিক এলাকা ও জনতা ইত্যাদির উপস্থিত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে একটি রাষ্ট্র ও সরকার গড়ে উঠতে ও চলতে পারে না। হযরত আবূ বকর (রা) সেই আনুগত্যের কথা-ই বলেছেন, চেয়েছেন, তবে তা নিরংকুশ যেমন নয়, তেমনি নিঃশর্তও নয়।

নিরংকুশ নয় বলেই তিনি বলেছিলেনঃ আমি ভাল কাজ করলে তোমরা আমার সাহায্য করবে। আর মন্দ কাজ করলে তোমরা আমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেবে।

বোঝা যাচ্ছে, ইসলামী বিধানে নাগরিকদের শুধু অন্ধ-নির্বাক আনুগত্য করে যাওয়াই কাজ নয়। সরকার ও সরকার চালক ভাল করছে কি মন্দ করছে সে দিকে তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখাও তাদের কর্তব্য। শুধু দৃষ্টি রাখাই নয়, শুধু আনুগত্য করে যাওয়াই নয়—সরকারের সাথে সহযোগিতা করাও কর্তব্য। কিন্তু সে সহযোগিতাও নিঃশর্ত নয়। জনগণ সরকারের সকল কাজে সহযোগিতা করতে সরকারী দায়িত্ব পালনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য। তবে জেন্য

শর্ত হচ্ছে সরকারের 'ভাল কাজ' করা। সরকার ভাল কাজ করলেই এই সহযোগিতা করা যাবে, ভাল কাজ করলেই সরকার জনগণের নিকট সহযোগিতা চাইতে পারে। আর সেই ভাল কাজে জনগণ সরকারের সাথে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে একান্তই বাধ্য।

এই সহযোগিতা ছাড়া কোন সরকার চলতে পারে না। তাই সরকার—সরকার প্রধানকেই জনগণের নিকট এই সহযোগিতা চাইতে হবে এবং জনগণ যাতে সরকারের কাজে সহযোগিতা করতে পারে তার উপায় ও সুযোগ সরকারকেই বের করতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে সরকার কোন বহির্দেশীয় বা বহির্জগতের ব্যাপার নয়। সরকার ও জনগণের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই যে রাষ্ট্রীয় কাজ সম্পন্ন হয়, তা-ই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার। আর এ জন্যই ইসলাম নাগরিকদের গঠনমূলক সমালোচনা করার পাশ্চাত্য ধর্মহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ন্যায় শুধু অধিকারই দেয়নি বরং তা করা প্রত্যেকটি নাগরিকের দ্বীনী কর্তব্য বলেও ঘোষিত হয়েছে।

প্রথম খলীফার শেষ কথা ছিলঃ তোমরা আমার আনুগত্য করে চলবে, যতক্ষণ আমি আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করি। আর আমি-ই যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের নাফরমানী করি, তা হলে তোমরা আমার আনুগত্য করতে বাধ্য নও, আমিও তোমাদের নিকট আনুগত্য চাওয়ার কোন অধিকার রাখি না।

এই শর্তাধীন আনুগত্যই ইসলামের তাওহীদী আকীদার সংরক্ষক। এই আনুগত্য নীতিই রাসূল পরবর্তী কালে ইসলামী সরকার গঠনের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া স্থায়ীভাবে নির্ধারিত করে দিয়েছে। তার সারকথা হচ্ছে, আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ও রাসূলের চূড়ান্ত নেতৃত্ব স্বীকার করা এবং আল্লাহ্র কুরআন ও রাসূলের সুন্নাত ভিত্তিক শাসন-প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

সাধারণ জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন

কুরআন, সুন্নাতে রাসূল ও প্রাথমিক কালের মুসলিম উম্মতের ইতিহাস স্পষ্টভাবে পথ-নির্দেশ করে যে, মুসলিম উম্মত তাদের শাসক, প্রশাসক ও নেতা নির্বাচন করবে। অবশ্য তা তারা করবে ইসলামী নিয়ম-কানুন অনুযায়ী ও ইসলাম নির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে। মুসলিম উম্মতের এই শাসক ও নেতা নির্বাচনের অধিকারই ইসলামী সরকারের প্রকৃতি নির্ধারণ করে। আর এ নির্বাচন পদ্ধতিই ইসলামী হুকুমাতকে দুনিয়ায় প্রচলিত গণতান্ত্রিক ও অন্যান্য সরকার পদ্ধতিসমূহ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে।

এ পর্যায়ের দলীলঃ ১. কুরআন মজীদের কতিপয় আয়াত স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছে যে, মানুষ এই যমীনে আল্লাহ্‌র খলীফা। খলীফা হওয়ার ব্যাপারে মানুষে মানুষে কোন তারতম্য বা পার্থক্য নেই। সকল মানুষ সম্পূর্ণ সমান ও পার্থক্যহীনভাবেই আল্লাহ্‌র খলীফা। মানুষের এই খিলাফত দুনিয়ায় শেষ পর্যন্ত এক চিরন্তন সত্য হিসেবেই স্বীকৃত এবং ঘোষিত। কিয়ামত পর্যন্ত তাতে কোন পরিবর্তনই সূচিত হবে না।

কুরআন মজীদে মানব সৃষ্টির ইতিহাস উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, মানুষ যখন সৃষ্টি হয় নি সেই সময় মানব সৃষ্টির সংকল্প প্রকাশ করে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছিলেনঃ

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (البقرة: ٣٠)

আমি পৃথিবীতে খলীফা বানাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

আল্লাহ্‌র ঘোষিত এই খিলাফত ব্যক্তি বিশেষের জন্য বা কোন মানুষের জন্য ব্যক্তিগতভাবে নির্দিষ্ট করা হয়নি। বরং অতঃপর তিনি যে 'আদমকে' সৃষ্টি করলেন, তার সমস্ত বংশধর—সমস্ত মানুষই খলীফা রূপে চিহ্নিত হয়েছিল। কেননা আল্লাহ্‌র এই ঘোষণা শ্রবণ করে ফেরেশতাগণ 'খলীফা' সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিলেনঃ

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ (البقرة: ٣٠)

হে আল্লাহ্, তুমি দুনিয়ায় এমন এক মাখলূক বানাবে, যা তথায় বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে এবং রক্তের বন্যা প্রবাহিত করবে?

ফেরেশতাদের এ আশঙ্কা নিশ্চয় প্রথম সৃষ্ট ব্যক্তি আদমের ব্যাপারে ছিল না, তা ছিল সেই আদমের বংশধরদের ব্যাপারে। অর্থাৎ ফেরেশতাদের আশঙ্কা ছিল, সমগ্র বিশ্বলোকের প্রতিটি বস্তু ও অণু-পরমাণু যখন একান্তভাবে আল্লাহ্‌র অনুগত হয়ে আছে, সেখানে 'খলীফা' পদবাচ্য কোন স্বাধীন ইচ্ছাসম্পন্ন সৃষ্টির অবকাশ কোথায়? তাহলে তো তারা এমন-এমন কাজ করতে থাকবে, যার ফলে এই দুনিয়ার শান্তিপূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ভাঙন ও বিপর্যয় দেখা দেয়া এবং রক্তের বন্যা বয়ে যাওয়া একান্তই অপরিহার্য হয়ে পড়বে। স্মরণীয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের এই আশঙ্কা বোধকে প্রতিবাদ করেন নি, অমূলক বলে উড়িয়েও দেন নি।

এ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহর 'খলীফা' বানানোর ঘোষণাটি কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্য ছিল না, ছিল সমগ্র মানব বংশের জন্য, মানব-বংশের প্রতিটি সন্তানের জন্য। প্রতিটি মানুষ-ই—সে পুরুষ হোক বা নারী—আল্লাহ্‌র

খলীফা। কেননা—ফেরেশ্‌তাদের আশংকা নিশ্চয়ই ব্যক্তি আদম সম্পর্কে ছিল না, ছিল সমগ্র আদম সন্তানের ব্যাপারে, সমস্ত মানুষের ব্যাপারে। অতএব প্রত্যেকটি মানুষেরই আল্লাহ্‌র 'খলীফা' হওয়া অনিবার্যভাবে সুনিশ্চিত।

এ পর্যায়ের আরও কতিপয় আয়াত থেকে এই কথায়ই স্পষ্ট সমর্থন পাওয়া যায়। একটি আয়াতঃ

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ (فاطر: ٣٩)

সেই আল্লাহ্‌-ই তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছেন।

এ আয়াতে একবচনে 'খলীফা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি; বরং বহুবচনের শব্দ خَلَائِف 'খলীফাগণ' ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে তো অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো যে, পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র খলীফা একজন নয়—কোন এক ব্যক্তি নয়, ব্যক্তিগতভাবে কেউ আল্লাহ্‌র খলীফা নয়। বরং প্রত্যেকটি মানুষই আল্লাহ্‌র খলীফা। এই মানুষগণই আল্লাহ্‌র খলীফাগণ।

আর একটি আয়াতঃ

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ - ءَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ (النمل: ٦٢)

কে সেই মহান সত্তা, যিনি ব্যাকুল ও বিপন্ন-অস্থির ব্যক্তির দোয়া শুনেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং কে তার কষ্ট ও বিপদ দূর করেন, (আর কে তিনি) যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করেন? ....আল্লাহ্‌র সাথে অপর কোন ইলাহ্‌ আছে কি?

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে, বিপন্ন মানুষের দোয়া শুনেন একমাত্র আল্লাহ্‌ এবং তাদের বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট কেবলমাত্র তিনি-ই দূর করেন। তিনি ছাড়া এ কাজ করার আর কেউ কোথাও নেই। এ-ই হচ্ছে কুরআন উপস্থাপিত প্রকৃত তওহীদী আকীদা। এই তওহীদী আকীদারই অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে, আল্লাহ্‌ই মানুষকে দুনিয়ায় তাঁর খলীফা নিযুক্ত করেছেন। এ দুনিয়ায় মানুষ যা-ই করবে, তা যদি আল্লাহ্‌র খলীফা হিসেবে করে, তা হলেই সে তা করার অধিকারী হবে। অন্যথায় তা করার কোন অধিকারই তার থাকতে পারে না। এই খলীফা হওয়ার অধিকার সর্বজনীন—সকল মানুষের ক্ষেত্রে একেবারে সাধারণ।

বলা বাহুল্য, মানুষের এ 'খিলাফত' পূর্ববর্তী কোন সৃষ্টি সমষ্টির স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দিক দিয়ে নয়। পূর্ববর্তী কোন সৃষ্টির স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দিক দিয়ে মানুষকে খলীফা বলা হয়ে থাকলে কথাটি এভাবে বলার কোন প্রয়োজন ছিল না।

সে কথার ধরনই সম্পূর্ণ ভিন্নতর। যেমন এ দিক দিয়েও মানুষকে 'খলীফা' করা হয়েছে কোন কোন আয়াতে। যেমন এই আয়াতটিতেঃ

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ (يونس: ١٤)

অতঃপর তোমাদেরকেই পৃথিবীতে তাদের পরে স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি বানালাম।

উপরোদ্ধৃত আয়াতসমূহের সারকথা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টিকূলের মধ্যে অত্যন্ত মর্যাদাবান বানিয়েছেন, তাকে পৃথিবীতে তাঁর খলীফা বানিয়েছেন। ফলে মানুষ সমগ্র সৃষ্টিলোকের উপর এক বিশিষ্ট সৃষ্টিরূপে গণ্য হতে পারছে। এ মর্যাদা এই অসংখ্য সৃষ্টিকূলের মধ্যে আর কারোরই নেই। আর মানুষ যেহেতু দুনিয়ায় আল্লাহ্র খলীফা, এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন তাকে সিজদা করার জন্য। এই সিজদা আসলে মানুষের অধীনতা ও বশ্যতা স্বীকারের প্রতীক। এ দুনিয়ায় আল্লাহ্র খলীফা হিসেবে মানুষ যা-ই করবে, ফেরেশতারা তাতে মানুষের আনুকূল্য করবে, সহযোগিতা করবে, সিজদা তারই নিঃশব্দ স্বীকৃতি মাত্র। সেই সাথে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বেরও স্বীকৃতি।

দুনিয়ায় মানুষকে আল্লাহ্র খলীফা বলে ঘোষণার ফলে দুটি কথা অনিবার্য হয়ে পড়ে।

১. মানুষ আল্লাহ্র খলীফা—আল্লাহ্র মহান নাম ও উচ্চতর পবিত্র গুণাবলীর বাস্তব রূপায়ণে।

মানুষ আল্লাহ্র খলীফা, সে তার অস্তিত্ব দ্বারাই মহান আল্লাহ্র অসীম কুদরতের প্রমাণ ও প্রকাশ করছে। মানুষ এ দুনিয়ায় নানা জিনিস উদ্ভাবন করবে, নানা শিল্প কর্ম তৈয়ার করবে, আবিষ্কার করবে, নবোদ্ভাবন করবে, দিন-রাত কাজ করবে এবং এই সব করে মানুষ তার দুঃখকে হাল্কা করবে, অনুর্বরকে উর্বর করবে, বিরান স্থানকে আবাদ করবে, স্থলভাগকে জলভাগে ও জলভাগকে স্থলভাগে পরিণত করবে। গাছ-পালা রোপণ করবে, শ্যামল শোভামণ্ডিত বাগান রচনা করবে, পশু পালন করবে, তার বংশ বৃদ্ধি করবে। সে সবের মধ্যে কেউ ছোট হবে, কেউ বড় হবে। কোনটি গৃহপালিত হবে, আবার কোনটি বন্যই থেকে যাবে। এই সকল প্রকারের প্রজাতি দ্বারা মানুষ উপকৃত হবে, তাকে নিজের কাজে ব্যবহার করবে ঠিক যেমন প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক শক্তিসমূহ এবং অন্যান্য যাবতীয় সৃষ্টিকূলকে মানুষ নিজের ইচ্ছামত নানা কাজে ব্যবহার করছে।

যে আল্লাহ্ প্রত্যেকটি জিনিসকেই সৃষ্টি করেছেন এবং তার জন্য একটা বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى। তিনিই এইসব কিছু দিয়ে মানুষকে ধন্য করেছেন। মানুষকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছেন, যেন মানুষ

আল্লাহ্‌র সুন্নাতকে এখানে কার্যকর করে। তাঁর সৃষ্টি কুশলতাকে উদ্ভাসিত করে তোলে, তাঁর হিকমতের তত্ত্ব-রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করে, তাঁর বিধানের সার্বিক কল্যাণ মানুষ গ্রহণ করে। বস্তুত এ দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র অসীম-বিস্ময়কর শক্তির ও ব্যাপক-গভীর-সূক্ষ্ম জ্ঞানের বাস্তব নিদর্শনই হচ্ছে মানুষ। মানুষকে তিনি সর্বোত্তম মানে ও কাঠামোয় সৃষ্টি করেছেনঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِىْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

আর মানুষ তো এই সব দিক দিয়েই পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র খলীফা।

প্রাকৃতিক-স্বাভাবিক ব্যাপারাদির ক্ষেত্রে মানুষ আল্লাহ্‌র খলীফা, তাই পৃথিবীকে আবাদ করা, আবর্জনা-জঞ্জাল মুক্ত করা, এখানে বসবাসের বিপদ সংকুলতা দূর করার দায়িত্ব মানুষের উপরই অর্পিত। আর এ দুনিয়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেই আল্লাহ্‌র লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করবে মানুষ।

যেমন আল্লাহ্ বলেছেনঃ

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا (هود : ٦١)

সেই আল্লাহ্‌ই তোমাদেরকে যমীন থেকে পয়দা করেছেন এবং এখানেই তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলাই স্থান—যমীন ও পশুকুলেরও রব্ব্। অতএব আল্লাহ্‌র খলীফা এই মানুষই সেই সম্পর্কিত যাবতীয় কাজের দায়িত্বশীল। হযরত আলী (রা) তাই বলেছেনঃ

إِنَّكُمْ مَسْئُوْلُوْنَ حَتّٰى عَنِ الْبِقَاعِ وَالْبَهَائِمِ

তোমরাই দুনিয়ার স্থান ও পশুকূলের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।

সারকথা, মানুষ এ দুনিয়ায় প্রাকৃতিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্‌র দেয়া শক্তি ও ক্ষমতার বলে আল্লাহ্ সুবহানুহু'র প্রতিনিধি।

২. সেই সাথে মানুষ এ দুনিয়ার মানুষের সামষ্টিক ব্যাপারাদিতে নেতৃত্ব ও প্রশাসকত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র খলীফা।

অর্থাৎ দুনিয়ায় মানুষের আল্লাহ্‌র খলীফা হওয়ার ব্যাপারটি শুধু উপরে উল্লিখিত ব্যাপারসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, মানুষ দেশ শাসন ও জনগণকে নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌র খলীফা। কেননা মানুষ যখন দুনিয়ার স্থানসমূহের ব্যবস্থাপনা, জন্তু-জানোয়ারের রক্ষণাবেক্ষণ ও যাবতীয় ব্যাপারাদি সুচারুরূপে সম্পাদনের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল—কিয়ামতের দিন এইসব বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে,

তখন মানুষ তাদের নিজেদের ব্যাপারেও জিজ্ঞাসিত হবে অনিবার্যভাবে। মানুষের ব্যক্তিজীবন, সমাজ, রাষ্ট্র সরকার-প্রশাসন, শিক্ষা, অর্থনীতি ও বিচার ইনসাফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত না হয়ে পারে না। আর জিজ্ঞাসিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, এসব ব্যাপারে তাদের কঠিন দায়িত্ব রয়েছে। অতএব এসব ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান তাদের কর্তব্য। আর এ কর্তব্যের কারণেই তারা এ ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌র খলীফা।

এসব ক্ষেত্রে মানুষের খিলাফতের দায়িত্ব অবশ্যই পালিত হতে হবে আল্লাহ্‌র দেয়া বিধানের ভিত্তিতে। নিজেদের ইচ্ছামত এ দায়িত্ব পালন করার কোন অধিকার মানুষের থাকতে পারে না। ফলে মানুষের প্রশাসনিকতা আল্লাহ্‌র খলিফা হিসেবেই কার্যকর হবে এবং আল্লাহ্‌র বিধানের ভিত্তিতে এই প্রশাসনিক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সম্পাদিত হলেই বাস্তবায়িত হতে পারবে এই যমীনে আল্লাহ্‌র খিলাফত। মানুষ আল্লাহ্‌র খলীফা হিসেবেই প্রশাসনিক কর্তৃত্ব প্রয়োগীয় সার্বভৌমত্বের অধিকারী হবে, যদিও আসল ও প্রকৃত সার্বভৌমত্ব সম্পূর্ণরূপে ও একান্তভাবে আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট, যাতে মানুষের কোন অংশ আদপেই নেই।

তাই বলা যায়, মানুষ এ দুনিয়ায় প্রশাসনিক কর্তৃত্ব সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করবে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র খলীফা হিসেবে, আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি রূপে, নিজস্ব ভাবে নয়।

এই প্রয়োগীয় সার্বভৌমত্ব বা প্রশাসনিক কর্তৃত্বের অধিকারী সাধারণভাবে সমস্ত মানুষ। কিন্তু সমস্ত মানুষের পক্ষে এ কর্তৃত্ব চালানো সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ একসাথে কখনই সম্ভব হতে পারে না। সেজন্য মানুষের মধ্য থেকেই কতিপয় লোককে বাছাই করে নিতে হবে ও তাদেরকে সুযোগ দিতে হবে এই কর্তৃত্ব পালন ও সার্বভৌমত্ব কার্যত প্রয়োগ করার জন্য। আর এখানেই নির্বাচনের প্রশ্ন।

সকল মানুষ একসাথে প্রয়োজনীয় সার্বভৌমত্ব—প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ব্যবহার করতে পারে না। তা করার জন্য নির্দিষ্ট এক বা একাধিক ব্যক্তির নিযুক্তি ও ভারপ্রাপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সেই এক বা একাধিক ব্যক্তি কে বা কারা? তাদের সাধারণ জনগণ থেকে আলাদা করা ও কার্যে নিয়োজিত করা কিভাবে সম্ভব হতে পারে?

তার একটি মাত্র উপায়ই আছে এবং সে উপায় হচ্ছে নির্বাচন। অর্থাৎ সাধারণ মানুষেরা সমানভাবে প্রয়োগীয় সার্বভৌমত্ব তথা প্রশাসনিক কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েও তারা সকলে একই সময় কার্যত তা করতে পারে না বলে তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্য থেকে অপেক্ষাকৃত অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে বাছাই করে তাদেরকে এ কাজের দায়িত্ব দেবে, সেই সাথে বাস্তব সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়ে তাদেরকে প্রাপ্ত দায়িত্ব সুষ্ঠুরূপে পালন করার অবাধ ও নির্বিঘ্ন সুযোগ করে দেবে।

এই পর্যায়ে দুটি মৌলিক কথা অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে। প্রথম এই যে, জনগণ নিজেদের মধ্য থেকে এক বা একাধিক লোককে বাছাই করবে সেই কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য, যা মূলত তাদের সকলের, কেবল সেই ব্যক্তিদেরই নয়, যাদেরকে বাছাই করা হয়েছে ও দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অতএব এই বাছাই কার্যটি নিঃশর্ত ও পক্ষপাতহীনভাবে সম্পাদিত হতে হবে। অর্থাৎ তারা তাদের নিজেদের সুস্থ ও অনাবিল বিবেচনায় যাকে বা যাদেরকেই অধিক যোগ্য মনে করবে অর্পিতব্য দায়িত্ব পালনের দিক দিয়ে, কেবল তাদেরকেই বাছাই করবে। সে জন্য না নিকটাত্মীয়তার কোন শর্ত থাকবে, না নগদ কোন স্বার্থ লাভের প্রশ্ন উঠবে। উপরন্তু এ ভাবে বাছাই করার পর নির্বাচিত ব্যক্তিদেরকে অর্পিত দায়িত্ব পালনে পূর্ণ সুযোগ ও সহযোগিতাও দেবে। কেননা তারা যে কাজ করছে, তা তাদের একান্ত নিজস্ব কোন কাজ নয়, তা সকল মানুষের কাজ। কাজেই সে কাজে সকলেরই আন্তরিক সদিচ্ছা ও সহযোগিতা থাকা আবশ্যক।

আর দ্বিতীয় এই— যে বা যারা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হলো, সে কখনই মনে করবে না যে, প্রয়োগীয় সার্বভৌমত্ব বা প্রশাসনিক কর্তৃত্ব কেবল মাত্র তাদেরই, অন্য কারোরই নয়। বরং মনে করবে, এ কর্তৃত্ব সকলেরই। তবে সকলে তা এক সাথে করতে পারবে না বলেই সকলের পক্ষ থেকেই এই দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করা হয়েছে। তারা এ কাজ 'নিজেদের কাজ' মন করে করবে না, করবে সকলের কাজ মনে করে। অতএব এই 'ক্ষমতা' লাভের সুযোগে তারা কোন ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার করার দিকে মনোযোগ দেবে না, সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকবে এই সামষ্টিক দায়িত্ব পালনের জন্য। উপরন্তু তারা ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ্‌র খলীফা হওয়া সত্ত্বেও সামষ্টিক খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য জনগণ তাদের নিজস্ব খিলাফতের একটা অংশ তাদেরকে দিয়েছে। এ জন্য তারা তাদেরও খলীফা। এ ভাবে এক দিকে আল্লাহ্‌র খলীফা হওয়ার সাথে সাথে মানুষেরও খলীফা হওয়ার কারণে তারা যেমন আল্লাহ্‌র নিকট দায়ী—জবাবদিহি করতে বাধ্য—তেমনি জনগণের নিকটও দায়ী, তাদের নিকটও জবাবদিহি করতে বাধ্য। এ উভয় দিকে জবাবদিহি দায়িত্ববোধের তীব্রতায় এই নির্বাচিত ব্যক্তিরা কখনই স্বৈরতান্ত্রিক হতে পারে না। বরং তারা এ দুনিয়ায় যেমন জনগণের নিকট দায়ী হওয়ার কারণে জনগণের স্বাধীন সমালোচনার সম্মুখীন হতে বাধ্য, তেমনি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে আল্লাহ্‌র ও জনগণের খিলাফতের দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন না করলে। এই ভয়ে তাকে বা তাদেরকে সদা কম্পমান হয়ে থাকতে হবে।

এমনকি, জনগণ যে সব গুণের অগ্রবর্তিতা দেখে ও যে-সব দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে বা তাদেরকে নির্বাচিত করেছে—নির্বাচিত হওয়ার পর সেই গুণ

হারিয়ে ফেললে ও সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে জনগণ তাদের দেয়া খিলাফতের অংশ ফিরিয়ে নিতেও পারবে। কেননা খিলাফতের এই অংশ দান বিশেষ গুণের শর্তে ও বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্যই ছিল। তা-ই যখন থাকল না বা দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম হয়ে গেল, তখন জনগণের দেয়া খিলাফতের অংশ দখল করে থাকার তার বা তাদের কোন অধিকারই থাকতে পারে না।

সার্বভৌমত্ব প্রয়োগে আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্ব

সার্বভৌমত্ব মূলত একমাত্র আল্লাহ্র। কিন্তু মানব সমাজে এই সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ হতে পারে মানুষের দ্বারাই। তা করার পন্থা স্বয়ং সার্বভৌম আল্লাহ্ তা'আলাই নিরূপন করে দিয়েছেন এ ভাবে যে, তিনি নিজেই মানুষকে দুনিয়ায় তাঁর খলীফা রূপে নিযুক্ত করেছেন। আল্লাহ্র খিলাফত—প্রতিনিধিত্ব—করার দায়িত্ব তিনি নিজেই মানুষের উপর অর্পণ করেছেন। এই খিলাফতের অধিকার ও মর্যাদা প্রত্যেকটি মানুষের অভিন্ন। সকল মানুষ একত্রিত হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এই খিলাফতের দায়িত্ব পালনে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকে প্রয়োগ করবে। এই প্রয়োগীয় সার্বভৌমত্ব মানুষের নিকট এক মহান আমানত হিসেবে গচ্ছিত। কিন্তু কার্যত সকল মানুষ একত্রিত হয়েও এক সাথে এই প্রয়োগীয় সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করতে পারে না বলেই সকলের পক্ষ থেকে এক বা একাধিক ব্যক্তি তা প্রয়োগ করবে। এই কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থার একান্তভাবেই প্রয়োজনঃ

প্রথমত গোটা মানব সমাজকে এক ও অভিন্ন কেন্দ্রবিন্দুতে একত্রিত হতে হবে, যারা প্রদত্ত খিলাফত প্রয়োগ করে এই পৃথিবীতে ঐক্যবদ্ধ খলীফাসমষ্টি রূপে গণ্য হবে। তারা অন্যান্য সকল প্রকারের সম্পর্ক ছিন্ন করে নেবে এবং সমগ্র বিশ্বলোক ও তার মধ্যকার সব কিছুর একমাত্র মালিক ও নিয়ন্ত্রকরূপে সেই 'এক'কেই স্বীকার করবে।

এই গভীর ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব কুরআন বোঝাতে চেয়েছে একটি দৃষ্টান্তমূলক কথা দ্বারা। ইরশাদ হয়েছেঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لِرَجُلٍ - هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلاً (الزمر: ٢٩)

আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এক ব্যক্তি তো সে, যার মালিকানায় বহু সংখ্যক বাঁকা স্বভাবের মনিব শরীক হয়ে আছে, যারা প্রত্যেকেই তাকে নিজের দিকে টানে। আর অপর এক ব্যক্তি পুরাপুরিভাবে একই মনিবের জন্য নির্দিষ্ট।.....এই দুইজনের অবস্থা কি একই রকমের হতে পারে?

এ দৃষ্টান্ত থেকে মু'মিন ও কাফির—এক আল্লাহ্‌র অনুগত ও বহু আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী মুশরিকের অবস্থা এবং এ দুয়ের মধ্যকার আসমান-যমীনের পার্থক্য স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে গেছে।

এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্‌র দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্ধী। তার মনিব সেই এক আল্লাহ্-ই। আর মুশরিক—কাফির ব্যক্তি বহু সংখ্যক বিভিন্ন ইলাহ্‌তে বিশ্বাসী বলে সে সেই ক্রীতদাসের মত, যার মনিব বহু সংখ্যক, বিভিন্ন সাংঘর্ষিক মর্জী ও ইচ্ছার দাসত্ব করতে হয় তাকে। একই সময় প্রত্যেক মনিবই তাকে তার কাজ করতে বলে। ফলে এই ক্রীতদাস একই সময় বহু মনিবের নির্দেশ পালনের দায়িত্বের নিষ্পেষণে প্রতিনিয়ত নিষ্পেষিত, জর্জরিত ও দিশেহারা হয়ে যেতে বাধ্য হয়। একটি মানব সমাজ-সমষ্টির ব্যাপারও এই দৃষ্টিতে বিবেচ্য। তা যদি এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী হয়, এক আল্লাহ্‌র একক সার্বভৌমত্ব মেনে চলাই হবে তার নীতি ও আদর্শ। সেই সমাজ-সমষ্টি উপরোক্ত দৃষ্টান্তের সেই ক্রীতদাসের ন্যায় হবে, যার মনিব মাত্র একজন। পক্ষান্তরে তা যদি কাফির বা মুশরিক হয়, তাহলে একক সার্বভৌমত্ব মেনে চলা তার পক্ষে সম্ভব হবে না, একক সার্বভৌমত্ব-ভিত্তিক কোন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলাও তার পক্ষে সম্ভব হবে না। বরং বিভিন্ন সার্বভৌম শক্তি সেই সমাজের উপর কর্তৃত্ব করবে, যেমন কুরআনী দৃষ্টান্তে বহু মনিবের একজন ক্রীতদাসের উপর চলে তাদের ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছা ও মর্জী। তাকে নিয়ে তখন বহু সংখ্যক সার্বভৌম শক্তির টানাটানি চলবে, যেমন একটি লাশ নিয়ে টানাটানি ও কামড়া-কামড়ি করে বহু সংখ্যক কুকুর।

হযরত ইউসুফ (আ) এই একক সার্বভৌমত্বের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলেনঃ

ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (يوسف: ٣٩)

বিভিন্ন-বিচ্ছিন্ন বহু সংখ্যক রব্ব—সার্বভৌম উত্তম, না মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ্ সার্বভৌম হিসেবে উত্তম?

দ্বিতীয়ত, সেই সমাজ-সমষ্টিকে এক আল্লাহ্‌র জন্য খালেস দাসত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠতে হবে, সমাজের লোকদের পারস্পরিক সম্পর্কও সেই অনুযায়ী গড়ে উঠতে হবে এবং অন্যান্য অসংখ্য তাগুতী শক্তির সার্বভৌমত্বের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও স্বাধীন হতে হবে। কেননা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য যে সব শক্তির নাম করা হয় সার্বভৌম হিসেবে, সেগুলি তো নিছক নাম মাত্র। সে নামগুলি হয় তোমরা রেখেছ, না হয় তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখে নিয়েছে। বলা হয়েছেঃ

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ (يوسف: ٤٠)

এক আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আর যার যার দাসত্ব তোমরা কর (সার্বভৌম মনে করে), সেগুলি নিছক কতকগুলি নাম মাত্র (সেই নামগুলির অন্তরালে ব্যক্তিসত্তা বলতে কিছুরই অস্তিত্ব নেই)। এই নাম তোমরা আর তোমাদের বাপ-দাদারা রেখে নিয়েছ।

বস্তুত বহু সংখ্যক সার্বভৌমের দাসত্ব থেকে মানবকূলকে মুক্তি দিয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌র একক সার্বভৌমত্বের অধীন ও অনুসারী বানাবার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে সর্বশেষ নবী রাসূল রূপে পাঠিয়েছেন। তাই মানুষকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকারের সার্বভৌমত্ব স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করতে হবে। একক সার্বভৌম আল্লাহ্‌র সাথে কৃত চুক্তিকে একক চুক্তিরূপে মানতে হবে। অ-খোদা শক্তি ও ব্যক্তির আনুগত্য খতম করে দিয়ে এক আল্লাহ্‌র আনুগত্য স্বীকার করতে হবে। এবং এক আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকারের কর্তৃত্ব থেকে বিদ্রোহ করতে হবে, উৎপাটিত করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এক আল্লাহ্‌র সার্বভৌম-ভিত্তিক সমাজ, রাষ্ট্র ও প্রশাসন-ব্যবস্থা।

তৃতীয়ত, সমগ্র সামাজিক সামগ্রিক সম্পর্ক-সম্বন্ধের ক্ষেত্র থেকে পার্থক্য প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার নীতি নির্মূল করে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের প্রাণস্পর্শী পবিত্র ভাবধারাকে মূর্ত ও প্রবল করে তুলতে হবে। এখানে আল্লাহ্‌ই হবেন একমাত্র সার্বভৌম, কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ রূপে একমাত্র আল্লাহ্‌র। আর সমগ্র মানুষ সর্বতোভাবে সমান, অভিন্ন সেই আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে। আর এই সমস্ত মানুষই পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র খলীফা বিশ্ব ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে, মানব জীবন সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার ব্যাপারে। এখানে মান-মর্যাদা ও মৌলিক স্বাভাবিক অধিকারও সমস্ত মানুষের এক ও অভিন্ন, ঠিক যেমন চিরুনীর কাঁটাগুলি হয়ে থাকে।

এরূপ অবস্থায়ই মানব সমষ্টি পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র খিলাফতের দায়িত্ব পালনে রত থাকবে, তা এই গুণ-পরিচিতি সহকারে আল্লাহ্‌র খলীফা হওয়ার ভূমিকা পালন করবে। এই রূপ এক মানব-সমষ্টি সম্পর্কে একথা ভাবা যায় না যে, তা স্বেচ্ছাচারিতার সাথে শাসনকার্য চালাতে কিংবা আল্লাহ্‌র সম্মতিহীন ইজতিহাদের বলে আইন-কানুন রচনা করবে। কেননা তা আল্লাহ্‌র খলীফা হওয়ার প্রকৃতির সাথে একবিন্দু সঙ্গতিসম্পন্ন নয়।

এ দিক দিয়ে কুরআনী ইসলামী আদর্শনুসারী মানব-সমষ্টি পাশ্চাত্যের তথাকথিত গণতান্ত্রিক সমাজ-সংস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর হয়ে থাকে।

কেননা পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অনুসারী সমাজ নিজেই নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী। এই কর্তৃত্ব-সার্বভৌমত্ব প্রয়োগে তা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব করে না, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শাসনকার্য চালায় না। ফলে তা কারোর নিকটই দায়ী নয়, জবাবদিহি করতে বাধ্য নয় কারোর নিকটই। শাসনকার্য পরিচালনায় ও আইন প্রণয়নে কোন স্থায়ী আদর্শ ও মানদণ্ড মেনে চলতেও বাধ্য নয়। সেখানে জাতির জনগণ আইন-বিধান হিসেবে গ্রহণ করতে যা'তেই একমত হবে, তা যদি তার মান-মর্যাদা পরিপন্থী হয়ও এবং তা যদি সেই সমাজেরই কোন একটা অংশের কল্যাণ-বিরোধী হয়ও তবু তা গ্রহণ ও কার্যকর করতে কোন বাধা থাকে না।

আল্লাহ্‌র খলীফা রূপে গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত সমাজ সম্পূর্ণ ভিন্নতর প্রকৃতি ও ভাবধারার হয়ে থাকে। তার শাসন-প্রশাসন স্বাধীন ও নিরংকুশ হয় না কখনই। তা এক দায়িত্বসম্পন্ন—জবাবদিহি করতে বাধ্য সমাজ। সে সমাজ-সংস্থাকে সর্বক্ষেত্রে সত্য ও ইনসাফকে অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, জুলুম-শোষণকে নির্মূল করতে হয়, আল্লাহ্‌দ্রোহীতাকে প্রতিরোধ করতে হয়। তার প্রতিটি কাজ করতে হয় মহান আল্লাহ্‌র সম্মুখে জবাবদিহি করার তীব্র দায়িত্ব বোধ সহকারে। এ দৃষ্টিতে বলা যায়—ইসলামী হুকুমাত উম্মতের উপর উম্মতের শাসন আল্লাহ্‌র খিলাফত হিসেব অর্থাৎ দেশ শাসন ও পরিচালনায় মুসলিম উম্মত স্বীয় ইচ্ছা ও কামনা-বাসনাকেই বাস্তবায়িত করবে না, বরং মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পূরণ ও তাঁরই দেয়া আইন-বিধান ও রীতি-নীতিকে পূর্ণ শক্তিতে বাস্তবায়িত করে তুলবে। আল্লাহ্‌র ঘোষিত সীমা সমূহের মধ্যে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব কার্যকর হবে।

দাউদ (আ)-এর খিলাফত আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের অধীন

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাউদ (আ)-কে পৃথিবীতে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে তাঁরই দেয়া বিধান অনুযায়ী শাসন-প্রশাসনের কাজ সুসম্পন্ন করেই এই খিলাফতের দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি পূর্ণ সত্যতা, সততা ও নিরপেক্ষ ন্যায়পরতা সহকারে শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে আল্লাহ্‌র ঘোষণাঃ

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ (ص: ٢٦)

হে দাউদ! আমরাই তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করেছি। অতএব তুমি জনগণের মধ্যে পরম সত্যতা-সততা-ন্যায়পরতা সহকারে শাসন-কার্য পরিচালনা কর।

আদম (আ)-কে লক্ষ্য করে 'খলীফা' বানাবার ঘোষণা এবং হযরত দাউদ (আ)-কে সম্বোধন করে বলা এই 'খলীফা' মূলত একই—এ দুয়ের মধ্যে মৌলিকভাবে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, এখানে হযরত দাউদ (আ)-কে ব্যক্তিগতভাবে খলীফা বানাবার কথা বলা হয়েছে। আর হযরত আদমের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে সমস্ত আদম বংশধরদের খলীফা বানাবার সংকল্প ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) খিলাফতের প্রথমোক্ত দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করে অর্থ করেছেন এভাবেঃ 'সে দুনিয়ায় ফসল উৎপাদনে, ফল বের করণে ও খাল-নদী তৈরী করার ক্ষেত্রে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে।'

আর দ্বিতীয়, উক্ত দিকে ইঙ্গিত করে তার তাফসীর করেছেন এই বলেঃ সৃষ্টিকূলের উপর শাসন-প্রশাসন চালানোর ক্ষেত্রে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে। আর খলীফা হবেন আদম ও তাঁর সন্তানদের মধ্যে যারাই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবে।[১]

শাসন প্রশাসন ব্যবস্থা–হুকুমাত–ছাড় আমানত আদায় করা সম্ভব নয়

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা 'আমানত' গ্রহণের জন্য সমস্ত জিনিসের নিকট প্রস্তাব পেশ করেছেন—আসমান যমীন ইত্যাদিকে এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলেছেন। কিন্তু সবকিছুই তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। এ পর্যায়ে আল্লাহ্র কথা হচ্ছেঃ

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ - إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا - لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ - وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (الاحزاب: ٧٢-٧٣)

আমরা এই আমানতকে আকাশমণ্ডল, যমীন ও পাহাড়-পর্বতের সম্মুখে পেশ করেছি। কিন্তু ওরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে, ওরা ভয় পেয়ে গেছে। কিন্তু মানুষ তা নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছে। বস্তুত মানুষ যে জালিম ও জাহিল তাতে সন্দেহ নেই। আমানতের এই দুর্বহ বোঝা গ্রহণ করার অনিবার্য পরিণাম হলো, আল্লাহ্ মুনাফিক পুরুষ স্ত্রীলোক ও মুশরিক পুরুষ-স্ত্রীলোকদের শাস্তি দেবেন ও মু'মিন পুরুষ-স্ত্রীলোকদের তওবা কবুল করবেন। বস্তুত আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল এবং অশেষ দয়াবান।

---

১. التبيان ج ١، ص ١٣١

আয়াতটিতে যে আমানতের কথা বলা হয়েছে, সে 'আমানত' বলে কি বুঝিয়েছে? ইমাম কুরতুবী ও অন্যান্য মুফাস্সির বলেছেনঃ 'তা হচ্ছে সাধারণভাবে দ্বীন পালনের যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য।' এ পর্যায়ে যত কথা বলা হয়েছে, তন্মধ্যে এই মতই অধিক সহীহ্।[১] আল্লামা তাবরিযী লিখেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে মানুষের যে সব হুকুম-আহকাম, কর্তব্য ও সীমাসমূহ নাযিল করেছন, তা সবই আমানত এবং এ আমানত রক্ষার দায়িত্ব মানুষ গ্রহণ করেছে।[২]

আর একথা তো নিঃসন্দেহ যে, মানুষ এই আমানত গ্রহণ করেছিল তা যথাযথভাবে পালন ও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে। তাই এ কথায়ও কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না যে, আল্লাহ্র নাযিল করা হুকুম-আহকাম—আইন-বিধান, কর্তব্য ও সীমাসমূহ মানব জীবনে কার্যকর করা এমন একটি হুকুমত বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছাড়া কখনই সম্ভব হতে পারে না, যা মূলত আল্লাহ্র দ্বীনের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে, যা গড়ে তুলবে মু'মিন উম্মত এই মনোভাব সহকারে যে, এইরূপ একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধীন আল্লাহ্র আনুগত্য ভিত্তিক জীবন যাপন করা সম্ভব, অন্য কোন ধরনের শাসন ব্যবস্থার অধীন তা সম্ভবপর নয়।

দ্বিতীয় আয়াতটি...لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ 'যেন আল্লাহ্ আযাব দেন'......... উল্লিখিত আমানতের নিগূঢ় সত্য কথা উদ্ঘাটিত ও প্রকাশিত করছে। বোঝা যাচ্ছে যে, 'আমানত' ধারণকারী মানুষ মু'মিন, মুশরিক ও মুনাফিক—এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। মানুষকে এইরূপ বিভক্তকরণ কেবল সত্য আকীদা গ্রহণ ও দ্বীন পালনের দৃষ্টিতেই সম্ভব হতে পারে! এ দৃষ্টিতে মু'মিন সে, যে দ্বীন পালন ও কায়েম করবে। এ ক্ষেত্রে যারা শির্ক-এ লিপ্ত হবে, তারা মুশরিক হবে। তারা কিছুটা দ্বীন পালন করলেও দ্বীন-বিরোধী কার্যকলাপই বেশী করবে। আর মুনাফিক বলে চিহ্নিত হবে সেইসব লোক, যারা দ্বীনের প্রতি ঈমানদার বলে বাহ্যত দাবি ও প্রচার করবে কিন্তু আসলে ও প্রকৃতপক্ষে দ্বীনের প্রতি তারা ঈমানদারও নয়, নয় তারা দ্বীন পালনকারীও।

প্রথম আয়াতের শেষাংশে মানুষকে 'যালুম' ও 'জাহল' বলা হয়েছে তো এই কারণে যে, মানুষ সামষ্টিকভাবে এই আমানত বহন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেও তারা তাতে খিয়ানত করেছে, কার্যত আমানতের দায়িত্ব বহন করেনি। ফলে মানুষ মু'মিন, মুশরিক ও মুনাফিক— এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মু'মিন হয়েছে তারা, যারা ওয়াদা অনুযায়ী কাজ করেছে—কার্যত দ্বীন পালনের

---

১. الجامع لاحكام القران ج ١٤ ص ٢٥٢

২. التبيان ج ٨ ص ٢٧٣

দায়িত্ব বহন করেছে। মুনাফিক হয়েছে তারা, যারা প্রকৃত অবস্থার বিপরীত বাইরে প্রকাশ করেছে কেননা তারা অন্তর দিয়ে দ্বীনের প্রতি ঈমান না এনেও নিজেদেরকে ঈমানদার বলে যাহির করেছে। আর মুশরিক হয়েছে তারা, যারা এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঐকান্তিক-আন্তরিক ঈমান গ্রহণ করতে পারেনি—অন্যান্য শক্তির প্রতিও ঈমান এনেছে এবং কার্যত এক আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান পালন করেনি। কিছুটা আল্লাহ্‌র বিধান আর কিছুটা মানুষের মনগড়া বিধান পালন করেছে। কার্যত নফসের খায়েশাতেরই অনুসরণ করেছে।

শাসনকার্য পরিচালনা ও নেতৃত্ব দানে খিলাফত

পূর্ববর্তী দীর্ঘ আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মানুষ এ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র খলীফা। এ খিলাফত কার্যত শাসনকার্য পরিচালনা ও নেতৃত্ব দানে বাস্তবায়িত হবে।

পূর্বোল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে খিলাফতের এই তাৎপর্যই প্রতিভাত হচ্ছে। শাসনকার্যের এই নেতৃত্ব দান নিঃসন্দেহে সেই নেতৃত্ব থেকে মৌলিকভাবেই সম্পূর্ণ ভিন্নতর, যা সাধারণত দুনিয়ার আল্লাহ্‌দ্রোহী ব্যক্তিরা, রাজা-বাদশাহ স্বৈরতন্ত্রীরা দিয়ে থাকে। এ সব লোক যুগের পর যুগ ধরে জনগণের উপর নির্মম স্বৈর শাসন চালিয়ে যাচ্ছে, তার সাথে কুরআনে উপস্থাপিত খিলাফতের—শাসনকার্য পরিচালনায় নেতৃত্বদানের দূরতম কোন সম্পর্কই নেই। ওদের এ স্বৈর শাসন যদিও আল্লাহ্‌র নামেই দুর্বল-অক্ষম-অসহায় মানবকুলের উপর চালানো হচ্ছে। কিন্তু আসলে ওরা নিজেরাই নিজেদেরকে মানুষের উপর আল্লাহ্‌র আসনে বসাচ্ছে, মানুষের উপর প্রভুত্ব করে যাচ্ছে।

উপরন্তু খিলাফতের শাসনকার্য ও ওদের স্বৈর শাসন যেমন কোন দিক দিয়েই এক নয়, তেমনি একটি সমাজ-সমষ্টির জন্য আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সার্বভৌমত্ব প্রদানও অভিন্ন নয়। একটি সমাজ-সমষ্টির জন্য আল্লাহ্‌র দেয়া সার্বভৌমত্ব মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব মাত্র। আল্লাহ্‌র খিলাফত আল্লাহ্‌র শাসন-নীতিরই বাস্তবায়ন মাত্র। শাসকের স্বেচ্ছাচারিতা করার একবিন্দু অবকাশ সেখানে নেই।

খিলাফতে আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন সার্বভৌমত্বের একক অধিকারী, মানুষের নিকট যে কর্তৃত্বটুকু আসে, আল্লাহ্‌-ই হচ্ছেন তার একমাত্র উৎস। আর আল্লাহ্‌র বিধান শরীয়াত-ই তথায় একমাত্র শাসন ব্যবস্থা। শরীয়াত মানুষকে যতটা সীমাবদ্ধ দেয়, মানুষকে তথায় ততটা সীমার মধ্যে থেকেই শাসনকার্য পরিচালনা ও নেতৃত্ব দান করতে হয়। সে শরীয়াতকে ইচ্ছামত পরিবর্তন বা ব্যাখ্যা দানের কোন অধিকারই মানুষের থাকতে পারে না।

এই কারণে খিলাফতের শাসন ব্যবস্থায় মানুষ আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করে আল্লাহ্‌র নিকট অক্ষরে অক্ষরে জবাবদিহি করার তীব্র অনুভূতি সহকারে। কেননা এখানে কোন মানুষই নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধিকারী হয় না। গোটা সমাজ-সমষ্টিও নয়। আল্লাহ্‌র অর্পিত আমানত রক্ষা এবং সে জন্য তাঁরই নিকট জবাবদিহি করার তীব্র অনুভূতিতে প্রতি মুহূর্তেই কম্পমান হয়ে থাকা একান্তই অপরিহার্য গুণ।

সরকার সংগঠনে সামষ্টিক দায়িত্ব

পূর্বোদ্ধৃত আয়াতসমূহ অনিবার্যভাবে প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী মুসলিম উম্মতের কর্তব্য হচ্ছে—ইসলামী আইন-কানুনের পরিমণ্ডলে একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এখানে এ দায়িত্ব যেমন গোটা মুসলিম উম্মতের উপর সাধারণভাবে অর্পিত, তেমনি কোন ব্যক্তির অধিকার নেই নিজেকে গোটা উম্মতের উপরে চাপিয়ে বসানোর এবং তাদের ইচ্ছা-মর্জী-অনুমতি ব্যতিরেকে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দখল করে বসার।

বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের পূর্বে একটি প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব নির্ধারণ আবশ্যক। প্রশ্নটি হচ্ছেঃ

> বাহ্যিক পটভূমিতে সমাজ-সমষ্টির কোন অস্তিত্ব আছে কি, যা ব্যক্তির অস্তিত্ব থেকে স্বতন্ত্র ও বাস্তব? কিংবা তা ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির একাত্ম হওয়ার কোন আপেক্ষিক বা কল্পিত রূপ মাত্র?

দার্শনিকদের দৃষ্টিতে সমাজ-সমষ্টি

দার্শনিকরা মনে করেন, বাহ্যিক পটভূমিতে সমাজ-সমষ্টির কোন অস্তিত্ব নেই। বাহ্যত আছে শুধু ব্যক্তিগণ। এই ব্যক্তিগণের একজনের সাথে আর একজনের মিলিত হওয়া থেকে লব্ধ রূপ ব্যতীত সমাজ-সমষ্টি বলতে কিছুই নেই।

এই দার্শনিকদের বাইরে সমাজ-বিদ্যা পারদর্শিগণ এই ধারণা পোষণ করেন যে, সমাজ-সমষ্টির একটা বাহ্যিক অস্তিত্ব অবশ্যই আছে। এই অস্তিত্ব স্বতন্ত্র এবং বাস্তব। এ কারণেই তো ব্যক্তিগণের পরস্পরের মধ্যে একটা সামাজিক সম্পর্ক বর্তমান থাকে, ব্যক্তিগণের অধিকার নির্ধারিত থাকে এবং সে সমাজের থাকে কতগুলি সুস্পষ্ট আইন-বিধান ও নিয়ম-ধারা।

সত্যি কথা এই যে, এই উভয় মত পরস্পর বিরোধী হলেও সত্য ও নির্ভুল। তা এজন্য যে. দার্শনিকগণ বস্তু বা বিষয়সমূহের নিরেট স্পর্শযোগ্য বাস্তবতার

দৃষ্টিকোণ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন। অথচ ব্যক্তির সত্তাগত বাস্তবতার বাইরে প্রকৃতি জগতের পটভূমিতে বাস্তব হিসেবে তা পায় না। এ কারণে ব্যক্তিগণের অস্তিত্বের বাইরে সমাজ-সমষ্টির একটা বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকার করার কোন উপায় দেখতে পান না।

পাঁচজন ব্যক্তি যখন একটি টেবিলের চতুষ্পার্শ্বে গোল হয়ে বসে, তখন দার্শনিক এই পাঁচজনের একত্র সমাবেশ লব্ধ সামষ্টিক রূপকে কোন স্বতন্ত্র ও বিশেষ সত্তা—যা এই পাঁচজনের বাইরে ষষ্ঠ হতে পারে—গণ্য করেন না।

কিন্তু অধিকারের দৃষ্টিকোণে প্রকট হয়ে উঠে যে, মানব-সমষ্টি আকারে যত ক্ষুদ্রই হোক, একটি সুপরিচিত বাস্তবতার অধিকারী। প্রচলিত ধারায় এই দৃষ্টিকোণই সর্বাধিক পরিচিত। সেই সমষ্টির এমন কতগুলি অবশ্য পূরণীয় অধিকার রয়েছে, যা ব্যক্তির জন্য নেই। অথবা এখানকার ব্যক্তির এমন কতগুলি কর্তব্য, অধিকার ও দায়-দায়িত্ব রয়েছে, যেমন রয়েছে সমষ্টির জন্য। বর্তমান দুনিয়ার সংস্কৃতিবান জাতিসমূহ সমাজকে এই দৃষ্টিকোণ দিয়েই দেখে থাকে। তাই সমাজের একটা স্বতন্ত্র সত্তা তাদের নিকট প্রকট ও স্বীকৃত। তার একটা নিয়ম-শৃঙ্খলার আবশ্যকতাও এবং বিশেষ কিছু অধিকার ও কর্তব্যও নির্ধারণ করে।

কুরআনের দৃষ্টিতে সমাজ-সমষ্টি

ইসলামের দৃষ্টিকোণে ব্যক্তি ও সমষ্টির অধিকার বিবেচনা করা হলে উভয়েরই নিজ ক্ষেত্রে ও পরিবেশে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার না করে কোন উপায় থাকে না। উভয়েরই স্বাতন্ত্র্য, অধিকার ও সমান-সমান দায়িত্ব-কর্তব্য অবশ্যই মেনে নিতে হয়।

কুরআনুল করীম এ অধিকারের দৃষ্টিতে সমাজের উপর দৃষ্টিপাত করে। তা সমাজের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব, জীবন ও পুনরুজ্জীবন, নির্দিষ্ট সময়কাল এবং অগ্রবর্তিতা ও পশ্চাদপদতা প্রভৃতি সবই রয়েছে বলে স্বীকার করে, যেমন এসব হয়ে থাকে ব্যক্তির ক্ষেত্রেও।

এ কারণে ব্যক্তির প্রতিকূলে সমাজ-সমষ্টির বাস্তব অবস্থান অস্তিত্ব যথোপযুক্তভাবে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। এ পর্যায়ে কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ আমাদেরকে স্পষ্ট পথ-নির্দেশ করে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اَجَلٌ ـ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ*

(الاعراف: ٣٤)

প্রত্যেকটি জনসমষ্টির জন্য নির্দিষ্ট একটা সময়কাল রয়েছে। তাদের জন্য সেই নির্দিষ্ট সময়কাল যখন নিঃশেষ হয়ে আসবে, তখন একটা মুহূর্ত বিলম্বেও যাবে না, আগেও আসবে না।

كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا (الجاثية: ٢٨)

প্রত্যেকটি উম্মতকে ডাকা হবে এই বলে যে, এস ও নিজ নিজ আমল নামা দেখে নাও।

وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ (الانعام: ١٠٨)

আমরা এমনিভাবেই প্রতিটি মানব মণ্ডলীর জন্য তাদের কার্যকলাপকে চাকচিক্য করে দিয়েছি।

مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ (المائده: ٦٦)

তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক ন্যায়বাদী সত্যপন্থীও রয়েছে।

أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ (ال عمران: ١١٣)

এদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা সত্য সঠিক পথে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পাঠ করে।

وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ ۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (المؤمن: ٥)

প্রত্যেক জনগোষ্ঠীই তাদের রাসূলের উপর হামলা চালিয়েছে, যেন তারা তাকে গ্রেফতার করতে পারে। তারা সকলেই বাতিলের হাতিয়ারসমূহের দ্বারা দ্বীনকে নীচা দেখাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি তাদের পাকড়াও করেছি। পরে দেখ, আমার দেয়া শাস্তি কত কঠিন ও কঠোর ছিল!

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ ۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ (يونس: ٤٧)

প্রত্যেক উম্মত—জনসমষ্টির জন্য একজন রাসূল রয়েছে। অতঃপর যখন কোন উম্মতের নিকট তার রাসূল এসে পৌঁছেছে, তখন পূর্ণ ইনসাফ সহকারে তাদের মধ্যকার ফয়সালা চুকিয়ে দেয়া হয়েছে।

এ আয়াতসমূহ স্পষ্ট ও উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছে যে, ব্যক্তিগণের সামষ্টিকতা সমাজ ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়, ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে সমাজের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। আর সে সমাজের একটা সময়কাল রয়েছে, কিতাব রয়েছে, চেতনা রয়েছে, সমঝ-বুঝ আছে, আনুগত্য ও অনানুগত্য—গুনাহ নাফরমানী ও পুণ্যশীলতা রয়েছে এবং সামষ্টিকভাবে অনেক বিষয়ে ফয়সালাও হয়ে থাকে।[১]

---

১. تفسير الميزان

এ সব আয়াতের প্রেক্ষিতে একথাও প্রকট হয়ে উঠে যে, কুরআন জনসমষ্টির—উম্মতের ইতিহাসকে ততটাই গুরুত্ব দিয়েছে, যতটা দিয়েছে ব্যক্তির কাহিনীর উপর। বরং সত্যি কথা এই যে, পূর্বে ইতিহাসে প্রধানত ব্যক্তিরাই অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। তখনকার ইতিহাস রাজা-বাদশাহ্ ও বড় বড় দিগ্বিজয়ী রাজ্য স্থাপনকারী ব্যক্তিদেরই কাহিনীতে পূর্ণ ছিল। তাতে জাতি ও জনসমষ্টিসমূহের ইতিহাস বড় একটা ছিল না। আসলে জাতি ও জনসমষ্টির ইতিহাস গুরুত্ব ও স্বীকৃতি লাভ করেছে কুরআন মজীদ নাযিল হওয়ার পর। তাই উত্তরকালে আল-মাস্উদী ও ইবনে খালদূনের ন্যায় ব্যক্তিবর্গ মানব জাতির ও জনসমষ্টির খ্যাতনামা ইতিহাসবেত্তা রূপে আবির্ভূত হতে পেরেছেন। ফলে পরবর্তীকালে ব্যক্তিদের কাহিনীর স্থানে জাতি ও জনসমষ্টির ইতিবৃত্তই হয় ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য। বস্তুত ইসলামে সমাজ-সমষ্টির উপর যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বলেই এরূপ হওয়া সম্ভব হয়েছিল। সমাজ-সমষ্টির ইতিহাসের প্রতি এরূপ গুরুত্ব দুনিয়ার অপর কোন ধর্ম বিধান বা সামষ্টিক রীতিতে লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, ব্যক্তির চরিত্র গঠন ও মানুষোপযোগী প্রশিক্ষণ কেবল সমাজ-সমষ্টির মধ্যেই সম্ভব। এ কারণে ব্যক্তির পূর্ণত্ব বিধানের জন্যই সমাজ-সমষ্টির অপরিহার্য প্রয়োজন। মানব-চরিত্র ও ভাবধারার সাংঘর্ষিক বৈচিত্র ও বিভিন্নতা সমাজ-পরিবেশের মধ্যেই মেরুকৃত ও একাকার হতে পারে কোন-না-কোন মাত্রায়। আর অন্যান্য দৃষ্টিতে ব্যক্তি ছাড়া সমাজ-সমষ্টির যেমন ধারণা মাত্র করা যায় না, তেমনি সমাজ-সমষ্টি ছাড়া 'ব্যক্তি'র ধারণা করাও কঠিন।

এই কারণেই ইসলামের সালাত, হজ্জ, জিহাদ ও অর্থ ব্যয় প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিধানই সমাজ-সমষ্টির ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত। আর এইগুলির সমাজ-সমষ্টির ভিত্তি হিসেবে যথাযথ দায়িত্ব পালন সম্ভব করার জন্যই ইসলামী হুকুমাত একান্ত অপরিহার্য। এই হুকুমাতই কার্যত ইসলামের বিধানকে বাস্তবায়িত করে, আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমাসমূহকে রক্ষা করে। এ ছাড়া সাধারণ মানুষকে সর্বাত্মক কল্যাণের দিকে আবহ্বান—'আমর বিল মারূফ ও নিহী আনিল মুনকার'-এর দায়িত্ব এই সরকারই যথাযথভাবে পালন করতে পারে। এই সবের ফলে যে সৌভাগ্যপূর্ণ ও পবিত্র ভাবধারা সম্পন্ন সমাজ গড়ে উঠে, তা-ই ব্যক্তিদের নৈতিক উন্নয়ন সাধন করে। আর তাই হচ্ছে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের প্রধান উপায়। আর এ সব কারণেই ইসলামী সমাজ দুনিয়ার অন্যান্য সমাজ-সমষ্টি থেকে অধিক উন্নত ও সর্বাধিক কল্যাণময় হয়ে উঠতে পারে।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তির জন্য কতগুলি কর্তব্য অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক মাস কালীন সিয়াম, পিতা-মাতার প্রতি

সম্মান প্রদর্শন ও এই ধরনের অন্যান্য বহু কাজ ব্যক্তিকে অবশ্যই করতে হবে। অনুরূপভাবে ইসলামী সমাজের জন্য বহু কয়টি দায়িত্ব ও কর্তব্যও নির্ধারিত হয়েছে, যেগুলি সামাজিকভাবেই কাজে পরিণত করতে হবে এবং এ ব্যাপারে কোন টাল-বাহানা বা গড়িমসি করা চলবে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আল্লাহ্ ইসলামী সমাজ-সমষ্টিকে নির্দেশ দিয়েছেনঃ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (المائده: ٣٨)

মেয়েলোক চোর ও পুরুষলোক চোর—উভয়ের হাতসমূহ কেটে দাও তাদের উভয়ের দুষ্কৃতির শাস্তিস্বরূপ, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শিক্ষা দান হিসেবে। আর আল্লাহ্ প্রবল শক্তি সম্পন্ন সুবিবেচক।

ব্যভিচারী নারী-পুরুষ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেনঃ

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (النور: ٢)

ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ এদের প্রত্যেককে একশ'টি করে দোর্‌রা মার এবং তাদের প্রতি দয়াশীলতা আল্লাহ্‌র আইন কার্যকর করার ব্যাপারে তোমাদেরকে যেন বাধাগ্রস্থ করতে না পারে—যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হও এবং এই দুইজনকে দেয়া শাস্তি যেন মু'মিনদের কিছু সংখ্যক লোক প্রত্যক্ষ্য করে।

অনুরূপভাবে ইসলামী দেশ ও রাজ্যের সীমানা সংরক্ষণ ও বহিরাক্রমণ প্রতিরোধে সক্রিয় থাকতে বলা হয়েছে ধৈর্য ও পাহারাদারির সাথে।

ইরশাদ হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ (ال عمران: ٢٠٠)

হে ঈমানদার লোকগণ, ধৈর্য অবলম্ব কর, বাতিল পন্থীদের প্রতিরোধে দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা প্রদর্শন কর, ইসলামী রাজ্য সংরক্ষণে সর্বদা প্রস্তুত থাক এবং আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক। আশা আছে, তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে।

অপর এক আয়াতে রাষ্ট্রদ্রোহী আল্লাহ্‌দ্রোহীদের মুকাবিলায় যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন শেষ পর্যন্ত তারা দমিত হয়ে সত্য দ্বীনের আনুগত্য করতে

বাধ্য হয় এবং রাষ্ট্রদ্রোহীতা, আল্লাহ্‌দ্রোহীতা ও সর্ব প্রকারের সীমালংঘনমূলক কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত হয়। ইরশাদ হয়েছেঃ

وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ـ فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْءَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ ـ فَاِنْ فَاءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ـ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ (الحجرات: ٩)

আর ঈমানদার লোকদের মধ্য থেকে দুটি দল যদি পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও। পরে যদি তাদের মধ্য থেকে কোন এক পক্ষ অন্য পক্ষের প্রতি বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনমূলক আচরণ করে তাহলে এই সীমালংঘনকারী পক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না সে পক্ষটি আল্লাহ্‌র বিধান পালনের দিকে ফিরে আসছে। অতঃপর সে পক্ষ ফিরে এলে তাদের মাঝে সুবিচার সহকারে মীমাংসা-মিল-মিশ করিয়ে দাও। আর সব সময়ই সুবিচার নীতি অনুসরণ করে চলতে থাক। কেননা আল্লাহ্‌ সুবিচার কারীদের পছন্দ করেন—ভালোবাসেন।

বস্তুত উদ্ধৃত আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলা মু'মিন লোক সমষ্টিকে সম্বোধন করেছেন, কোন ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে নয়। অতএব এই সম্বোধনের পর যে যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, তা সেই ঈমানদার লোক-সমষ্টির প্রতি এবং তা পালন করতে হবে সেই লোক-সমষ্টিকে সমষ্টিগতভাবে—কোন ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে নয়। এ পর্যায়ের আরও কয়েকটি আয়াতের উল্লেখ করা যাচ্ছেঃ

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (البقرة: ١٩٥)

এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পথে বিনিয়োগ কর।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (ال عمران: ١٠٤)

তোমাদের মধ্য থেকে অবশ্যই এক জন-সমষ্টি বের হয়ে আসতে হবে, যারা সার্বিক কল্যাণের দিকে সতত আহ্বান জানাতে থাকবে এবং ভালো-শরীয়াতসম্মত কাজের আদেশ করতে ও অন্যায়-মন্দ তথা শরীয়াতবিরোধী কাজ করতে নিষেধ করতে থাকবে।

وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ (المائدة: ٣٥)

এবং তোমরা তাঁর পথে জিহাদ কর।

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ (الحج: ٧٨)

এবং তোমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে জিহাদ কর যেমনটা জিহাদ তাঁর ব্যাপারে করা কর্তব্য।

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ (البقرة: ١٧٩)

এবং কিসাসে তোমাদের জন্য জীবন নিহিত।

وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ (الطلاق: ٢)

এবং তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য স্বাক্ষ্য দাঁড় করো।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (ال عمران: ١٠٣)

এবং তোমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্‌র রজ্জু ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না।

اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ (الشورى: ١٣)

তোমরা সকলে দ্বীন কায়েম এবং এ ব্যাপারে তোমরা পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যেও না।

এ কয়টি এবং এ ধরনের আরও বহু সংখ্যক আয়াত থেকে স্পষ্ট-অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, দ্বীন-ইসলাম মূলতই এক সামষ্টিক জীবন বিধান। আল্লাহ্ তা সামষ্টিক আদর্শরূপে মু'মিন সমষ্টির উপরই পালন করা কর্তব্য করে দিয়েছেন; ঠিক যেমন বহু ব্যক্তিগত কাজের দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তিগণের উপর অর্পণ করেছেন। দ্বীন কায়েম করার দায়িত্ব মুসলিম লোক-সমষ্টিই পালন করতে পারে। তাদের সমন্বয়ে যে সমাজ-সমষ্টি গড়ে উঠে, আল্লাহ্‌র আদেশসমূহ পালন করা সেই সমষ্টিরই কর্তব্য, তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যকের জন্য এখানে কোন বিশেষত্ব নেই, নেই কোন তারতম্য।

সমষ্টিকে সম্বোধন করার দরুন অর্পিত দায়িত্ব পালন সেই সমষ্টিরই কর্তব্য, যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির উপর আরোপিত কর্তব্য-দায়িত্ব সেই ব্যক্তিগণকেই ব্যক্তিগতভাবে পালন করতে হবে।

এই ব্যক্তিগণের সমন্বয়েই সমষ্টি গড়ে উঠে। ব্যক্তিগণের উপর অর্পিত কর্তব্য দায়িত্ব ব্যক্তিগণকে সরাসরি ফরয হিসেবেই পালন করতে হবে। আর সমাজ-সমষ্টির উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যক্তির ভূমিকা হচ্ছে সমষ্টির একজন হিসেবে এবং তা ফরযে কিফায়া। সমষ্টির কোন এক ব্যক্তি যদি তা পালন করে, তাহলে গোটা সমাজ-সমষ্টিরই পালন করা হয়ে যাবে। কিন্তু কোন এক ব্যক্তিও যদি তা পালন না করে, তাহলে গোটা সমাজ-সমষ্টিই সেজন্য দায়ী হবে। কেননা সে হুকুম পালন করার দায়িত্ব সমাজ-সমষ্টির উপরই অর্পিত হয়েছিল।

সমাজ-সমষ্টির উপর কর্তব্য পালনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে সেই সব কাজের, যা সমাজ-সমষ্টির পক্ষেই পালন করা সম্ভব, ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্যক্তির পক্ষে তা পালন করা সম্ভব নয়। সেই সামষ্টিক কর্তব্যসমূহ পালন করার জন্য সমাজ তার মধ্য থেকে এক বা কতিপয় লোককে নিযুক্ত করতে পারে। সেই নিযুক্ত এক বা একাধিক লোক সে দায়িত্ব পালন তখনই করতে পারে, যদি তা করার কর্তৃত্ব (Authority) সমাজ-সমষ্টিই দেয়। এভাবেই সমাজ-সমষ্টির দায়িত্ব পালনের জন্য সমাজ-সমর্থিত একটি সরকার—তথা প্রশাসনিক সংস্থা গড়ে তোলা ইসলামের কর্ম সম্পাদনের স্থায়ী নিয়ম। এ সংস্থাই ইসলামী আদর্শভিত্তিক সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলা বাস্তবায়িত করবে এবং সমাজ-সমষ্টির উপর অর্পিত দায়িত্ব-কর্তব্যসমূহও যথাযথভাবে পালন করবে। সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য এটাই হচ্ছে একমাত্র কার্যকর পন্থা। সমাজ-সমষ্টির কল্যাণ ও তার সার্বিক উন্নয়ন সাধন এরূপ একটি সংস্থা গড়ে তোলা ছাড়া কোন ক্রমেই সম্ভব হতে পারে না। এরূপ একটি সংস্থা কার্যকর না থাকলে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যেমন চরম অরাজকতা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবল হয়ে উঠা অনিবার্য, তেমনি বৈদেশিক শক্তির আগ্রাসন প্রতিরোধ ও স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্পূর্ণ অসম্ভবই থেকে যাবে, আর এর কোন একটিও ইসলামের কাম্য নয়। বরং ইসলাম তীব্রভাবে এই অবস্থাকে প্রতিরোধ করতে বলে।

এ দীর্ঘ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা থেকে আমরা এই তত্ত্ব উদ্ধার করতে পারি যে, জন-সমষ্টিই হচ্ছে প্রশাসনিক ক্ষমতার উৎস। অবশ্য নিরঙ্কুশ উৎস নয়। তা উৎস শুধু আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ ও ইসলামী আইন-কানুন জারিকরণের আওতায়। ইসলামে জনগণই সরকার ও প্রশাসনিক সংস্থা গড়ে তোলা, প্রশাসক নিয়োগ ও নির্বাচনের জন্য দায়িত্বশীল। জনগণকে কল্যাণের দিকে পরিচালনায় নেতৃত্ব দান এ সংস্থার পক্ষেই সম্ভব। এ সংস্থাই আল্লাহর শরীয়াতী বিধানকে সামষ্টিক ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করবে। কেননা আল্লাহর সম্বোধনসমূহে এই সমাজ-সমষ্টি—জনগণ-ই—সম্বোধিত। কিন্তু তারা সকলে ব্যক্তিগতভাবে এ দায়িত্ব পালন করতে পারে না বলেই তাদের সকলের পক্ষ থেকে কে বা কারা এ দায়িত্ব পালন করবে, তা নির্ধারণ করা তাদেরই কর্তব্য। কুরআনের আয়াত তুলে যেমন দেখানো হয়েছে, চোরের হাত কাটা, ব্যভিচারীকে দোররা মারা, সীমালংঘনকারীকে সীমার মধ্যে থাকতে বাধ্য করা, আগ্রাসন প্রতিরোধ করা ও দ্বীনী নিয়ম-শৃঙ্খলা-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা—প্রভৃতির আদেশ কি মুসলিম সমষ্টির উপর কর্তব্য করা হয়নি?

তাহলে স্পষ্ট হলো যে, ইসলামের ইসলামী সমাজ-সমষ্টির গুরুত্ব স্বীকৃত। সেই সমাজ-সমষ্টিরই কর্তব্য এমন এক সরকার—প্রশাসনিক সংস্থা—গড়ে

তোলা, যা সেই সমাজ-সমষ্টির পক্ষ থেকে তার অর্পিত ক্ষমতা বলে এই সামষ্টিক কর্তব্যসমূহ পালন করবে। কেননা ইসলাম এই কর্তব্যসমূহকে সামষ্টিক কর্তব্য রূপেই ফরয করেছেন এবং এই কাজগুলি করা কেবলমাত্র একটি সমাজ-সমষ্টির পক্ষেই সম্ভবপর।

বস্তুত একটি সরকার প্রশাসন-সংস্থা—যা জীবনের বিভিন্ন দিকের গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব-কর্তব্য সমূহ তার প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাদির মাধ্যমে সুসম্পন্ন করবে, একান্তভাবে দায়িত্ব সহকারে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্লাহ্র আইনসমূহ যথাযথভাবে কার্যকর করবে—ব্যতীত না ইসলামী জীবন চলতে পারে, না ইসলামী সমাজ।

ইসলাম তার সামষ্টিক নিয়ম-বিধান ও আইন-কানুন কার্যকর করতে চাইবে অথচ সে কাজ সম্পন্ন করার জন্য অপরিহার্য যন্ত্র কাঠামো সরকার বা প্রশাসনিক সংস্থা গড়ে তুলতে চাইবে না, আবার জনগণের অধিকার রক্ষার, সম্পর্ক সংরক্ষণের ও জনগণের দাবিসমূহ আদায়ের বড় বড় ওয়াদা প্রতিশ্রুতি দেবে, তা কি কল্পনা করা যায়?

ইসলামের দৃষ্টিতে উম্মত—মুসলিম জনগণ—এভাবেই প্রশাসনিক কর্তৃত্বের উৎস। প্রশাসনিক দায়িত্বশীল নির্বাচন এজন্যই মুসলিম উম্মতের অধিকার ও কর্তব্য—কর্তব্য ও অধিকার।

বিবেক-বুদ্ধির দৃষ্টিতে সরকার গঠন

ইসলামী শরীয়াতে মানুষের সহজ-সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি কুরআন, সুন্নাত ও ইজমা'র পরে একটি অন্যতম উৎসরূপে স্বীকৃত। যেসব ক্ষেত্রে এই বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগের অবকাশ রয়েছে, সেখানে তা শরীয়াতের ইমামগণ ব্যাপকভাবে ও গুরুত্ব সহকারে প্রয়োগ করেছেন। এখানে এই দৃষ্টিতে আমাদের বক্তব্যঃ

সুস্থ সহজ বিবেক-বুদ্ধি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করছে যে, জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সরকার ও প্রশাসনিক সংস্থা গড়ে তোলা একান্তই কর্তব্য। কেননা তা না হলে মানুষের জীবনে কোন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করাই সম্ভব নয়। আর মানব-সমাজের শৃঙ্খলা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রাখা যে একান্তই কর্তব্য, তাতে একবিন্দু সন্দেহের অবকাশ নেই।

মানুষের মধ্যে সামাজিক শৃঙ্খলা স্থাপন, তার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ও স্বয়ং মানব-জীবনের সংরক্ষণ ও স্থিতির জন্যই আবশ্যক। সেজন্য চষ্টা-সাধনা ও কষ্ট স্বীকার সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের জন্যই কর্তব্য। কেননা মানুষ এইরূপ

একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ সমাজ-পরিবেশেই নিশ্চিত ও নিরাপত্তাপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে, পারে তার কাম্য কল্যাণ ও উৎকর্ষ-উন্নতি অর্জন করতে।

এ কারণে আমরা দেখতে পাই, দুনিয়ায় এমন বহু জাতি রয়েছে যারা কোন দ্বীন বা শরীয়াতের অনুসরী না হলেও তারা নিজেদের সামাজিক শৃঙ্খলা দৃঢ়তার সাথে স্থাপন করেছে।

এ দৃষ্টিতে আমরা সহজেই বলতে পারি যে, সামাজিক-সামষ্টিক নিয়ম-শৃঙ্খলা স্থাপন স্বাভাবিক বিবেক বুদ্ধিরই ঐকান্তিক দাবি। মানুষ কোন দ্বীন বা শরীয়াত পালন না করলেও এই কর্তব্যের কথা কেউ-ই অস্বীকার করতে পারে না।

আর সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যে একান্তই প্রয়োজন, তা-ও সর্বতোভাবে অনস্বীকার্য। এমন একটি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক সমাজে অবশ্যই থাকতে হবে, যা সেই সমাজের জনগণের সার্বিক সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে দিনরাত একান্তভাবে নিয়োজিত ও কর্মরত থাকবে। শুধু তাই নয়, সামাজিক-সামষ্টিক নিয়ম-শৃঙ্খলা বিধান, সংরক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিও থাকতে হবে, যার মধ্যে এই দায়িত্বশীলতার জন্য জবাবদিহির তীব্র অনুভূতিও থাকতে হবে। এ কারণে মানব-সমাজের ইতিহাসে এমন কোন অধ্যায়ের সন্ধান পাওয়া যায় না, সেখানে এইরূপ দায়িত্বশীল বলতে কেউ কোথাও নেই। সভ্য ও আধুনিক সমাজের তো কোন প্রশ্নই উঠে না। প্রাচীন আদিম অসভ্য বর্বর সমাজেও এইরূপ দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে আমরা দেখি সমাজ প্রধান বা গোত্র সরদারকে। গোটা সমাজ বা গোত্র যেমন তার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে, তেমনি সেই সমাজ ও গোত্রের—কবীলার—সার্বিক সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য তাকেই কাজ করত হয়, সে কাজ যথাযথরূপে সম্পন্ন হলো কি না, সেজন্য তাকে সেই সমাজ বা গোত্রের জনগণের নিকট জবাবদিহিও করতে হয়।

বৃহত্তর ও আধুনিক সম্প্রসারিত জীবন-প্রেক্ষিতে এই দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্বই আত্মপ্রকাশ করেছে সরকার বা প্রশাসনিক সংস্থা রূপে। এইরূপ একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা ও তার সদা কার্যকরতা ব্যতীত কোন সমাজের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। ইসলাম তাই এরূপ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করার উপর যথেষ্ট তাকীদ পেশ করেছে। এরূপ একটি সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন জীবনই মানুষের জন্য সম্ভব বলে ইসলাম বিশ্বাস করে। এরূপ একটি জীবনেই সম্ভব ইসলামী আদর্শের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ও পালন-অনুসরণ। এরূপ একটি জীবনেই আশা করা যায়,

মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ। এক কথায় মানুষের সার্বিক কল্যাণ এরূপ একটি সংস্থাধীন জীবন ছাড়া কল্পনাও করা যায় না।

নবী করীম (স)-এর পরবর্তী মুসলিম জীবন

নবী করীম (স)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কিরাম—মুসলিম সমাজ—একটি নতুন সরকার-সংস্থা গড়ে তোলার অপরিহার্য প্রয়োজনের কথা তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন। কেননা নবী করীম (স) জীবদ্দশায় মুসলমানদের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন. প্রশাসক ছিলেন. আইনের মাধ্যম ছিলেন, প্রধান বিচারপতি ছিলেন, আদর্শিক নেতা ও পরিচালক ছিলেন। তিনি ইন্তেকাল করলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত একটি সংস্থা ও ব্যক্তিত্ব ছাড়া মুসলিম জনগণের জীবন চলতেই পারে না। তাই অনতিবিলম্বে—এমনকি রাসূলে করীম (স)-এর কাফন-দাফনেরও পূর্বে এ কাজ করার প্রয়োজনীয়তা সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন বলেই একত্রিত হয়ে নিজেদের মধ্য থেকে একজন প্রশাসক, প্রশাসন-পরিচালন-সংরক্ষণ ইত্যাদি যাবতীয় কাজের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব দানকারী একজন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সর্ববাদীসম্মতভাবেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে মুসলমানদের প্রথম খলীফা নির্বাচিত করেছিলেন।

সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর এই কর্ম পদ্ধতিতে একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে রাসূলে করীম (স)-এর কাফন-দাফনের চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে নিজেদের প্রশাসনিক কাঠামো ও ব্যবস্থাকে কার্যকর করা।

জনগণ তাদের ধন-মালের জন্য দায়িত্বশীল (আল্লাহর খলীফা ও আমানতদার হিসেবে)

ইসলামী ফিকহ্‌র একটি মৌল-নীতি হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব ধন-মালের জন্য দায়িত্বশীল।[১] বস্তুত মানুষ যখন তার ধন-মালের জন্য দায়িত্বশীল, তখন অনিবার্যভাবে তার নিজের জন্যও দায়িত্বশীল হবে। তাইলে কোন ধন-মালের উপর তার মালিকের অনুমতি ছাড়া কোনরূপ হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকারই অন্য কারোর থাকতে পারে না। আর অন্য কেউ যদি কারোর ধন-মালের উপর কর্তৃত্ব করতে না-ই পারে, তাইলে কারোর নিজ সত্তা ও

১. এই পর্যায়ে কোন কোন মহল রাসূলে করীম (স)-এর একটি কথা হিসেবে প্রচার করেঃ الناس مسلطون على اموالهم 'মানুষ তার ধন-মালের উপর কর্তৃত্বশীল।' কিন্তু এর সনদ কিরূপ এবং সিহাহ্ সিত্তার কোন গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে কি না, তা আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না। —গ্রন্থকার

ব্যক্তিত্বের উপর অন্য লোকদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার কোন অধিকার যে দিতে পারে না, তা আরও বলিষ্ঠভাবে বলা যায়। কোন লোক কারোর স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না, কারোর অনুমতি ব্যতীত তার শক্তি-সামর্থ্য ও মান-মর্যাদার উপর কেউ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবে—কেউ নিজের মর্জী চালাবে, তা কোন ক্রমেই জায়েয হতে পারে না।—এ হচ্ছে মানুষ সম্পর্কে একদিকের কথা।

আর অপর দিকের কথা হচ্ছে, কোনরূপ সামাজিক-সামষ্টিক সংস্থা বা প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে হলে অন্য লোকদের স্বভাব ও শরীয়াতসম্মত অধিকার, আযাদী ও ধন-মালের উপর হস্তক্ষেপ-নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি করা একান্তই অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

এ দুটি কাজ পরস্পর বিরোধী। অথচ এই পরস্পর কাজ দুটি একত্রিত করা না গেলে কোন সামাজিক-সামষ্টিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা কখনই এবং কোনক্রমেই সম্ভব হতে পারে না। আর এই উদ্দেশ্যেই সরকার—তথা প্রশাসনিক সংস্থা গড়ে তুলতে হয়। এই প্রশাসনিক সংস্থা গড়ে তোলার কাজটি সম্পন্ন হবে জনগণের ধন-মালের ও স্বাধীনতার উপর তাদেরই অনুমতিক্রমে হস্তক্ষেপ করার মাধ্যমে। আর সে হস্তক্ষেপের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি পাওয়া যেতে পারে প্রশাসনিক দায়িত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির নির্বাচনে জনগণের ভোটদানের মাধ্যমে। এই ভোটদান কার্যত প্রমাণ করছে যে, সে তার ধন-মাল ও স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করার সুযোগ অন্য কাউকে দেয়ার এই পন্থা ও নীতিকে পূর্ণভাবে সমর্থন করে এবং সে একজনকে ভোট দিয়ে তার পক্ষে সেই কাজ করার জন্য অনুমতি প্রদান করছে।

আরও স্পষ্ট কথায় বললে বলতে হয়, মানব সমাজে যে প্রশাসন ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত করা হবে, তাতে অবশ্যই জনগণের ধন-মাল ও চিন্তা-বিশ্বাসের উপর একটা কর্তৃত্ব অবশ্যই চালাতে হয়। সে ব্যবস্থায় শুধু বিভিন্ন প্রকারের কর আদায় করা ও আমদানি-রফতানি নিয়ন্ত্রণ করাই একমাত্র কাজ হবে না, তা সে সবের উপর নানা রূপ বাধ্যবাধকতাও আরোপ করবে, তাতে তার স্বাধীনতাকে অনেকটা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করা হবে, সম্পর্ক ভিন্নভাবে স্থাপন করা হবে, যুদ্ধের ময়দানে সেনাবাহিনী প্রেরণ করতে হবে এবং সাধারণ লোকদেরকে যুদ্ধ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত করা হবে। এ ধরনের আরও যেসব কাজ জনগণের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচিত হবে, তা সবই করা হবে। এরূপ একটি প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা বিবেক-বুদ্ধি-বিবেচনা ও শরীয়াতের তাকীদ অনুযায়ী একান্তই কর্তব্য হয়ে পড়ে। আর সেজন্য একটি শক্তিসম্পন্ন সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো কায়েম

করা ছাড়া অন্য কোন উপায়ই থাকতে পারে না। যদিও তা ইসলাম মানুষকে তার নিজের ও তার ধন-মালের উপর যে কর্তৃত্ব দিয়েছে, তার সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে। এই সাংঘর্ষিকতা বিদূরিত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে, জনগণকে আল্লাহ্‌র খলীফা ধরে নিয়ে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব প্রয়োগের খিলাফতী-অধিকার স্বীকার করে জনগণের মর্জী ও সমর্থন-অনুমোদনের ভিত্তিতে এমন একটি প্রশাসনিক সংস্থা গড়ে তোলা। এই সংস্থা যেসব কাজই করবে, তাতে জনগণের সমর্থন ও অনুমোদন আছে বলেই মনে করা যাবে এবং এভাবে তা সামষ্টিকভাবে আল্লাহ্‌র খিলাফতের বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে।

প্রশাসনিক ক্ষমতা—সার্বভৌমত্ব—প্রশাসকের নিকট আমানত

পূর্বোদ্ধৃত বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, একটি সরকার গঠন ও সেজন্য সর্বোচ্চ প্রশাসক নির্বাচন জনগণের একটা সামষ্টিক অধিকার। জনগণই একজন সর্বোচ্চ প্রশাসক নিযুক্ত করবে নিজেদের মর্জীমত এবং যখন ইচ্ছা হবে তা সেই জনগণই তার নিকট থেকে কেড়ে নেবে। এই কথার তাৎপর্য হচ্ছে, প্রশাসনিক ক্ষমতা—প্রয়োগীয় সার্বভৌমত্ব—সর্বোচ্চ প্রশাসকের দেয়া একটি আমানত। জনগণই এ আমানত তার নিকট রাখে কিন্তু সে আমানতের খিয়ানত করে প্রশাসন যদি জনগণের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহলে সেই জনগণই তার নিকট থেকে এ আমানত কেড়ে নেবার অধিকার রাখে।

এই কথা কুরআন মজীদের কতিপয় আয়াত দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আমানত সমূহ—দায়িত্বপূর্ণ কাজের পদসমূহ—সে সবের যোগ্য লোকদেরকে দাও। আর (পারস্পরিক বিবাদ কালে) তোমরা যখন লোকদের মধ্যে ফয়সালা করবে, তখন (আল্লাহ্‌র আদেশ এই) যে, তোমরা অবশ্যই সুবিচার করবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিশ্চয়ই অতীব উত্তম নীতির কথা বলছেন। আর আল্লাহ্ বস্তুতই সর্বশ্রোতা, সর্বদর্শী।

তিনি আরও বলেছেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ ....خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: ٥٩)

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যকার সামষ্টিক দায়িত্ব সম্পন্ন লোকদেরও। পরে তোমরা যদি কোন বিষয়ে পারস্পরিক মতবিরোধে লিপ্ত হও, তাহলে সে বিষয়টি আল্লাহ্‌ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। (কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে মীমাংসা করে নাও) যদি তোমরা আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক। জেনে রাখো, এই নীতিই সর্বোত্তম, সর্বাধিক কল্যাণময় এবং পরিণতির দিক দিয়ে অতীব ভালো।

বস্তুত প্রশাসনিক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের ব্যাপার। এটা গড়ে তোলার অধিকার ঈমানদার জনগণের নিকট পবিত্র আমানত। এ আমানত নিশ্চয়ই সেই লোকদের নিকট সমর্পণ করতে হবে যারা তা যথাযথভাবে পালন করবে ও আমানতের হক্‌ আদায় করার যোগ্যতার অধিকারী। যারা সে যোগ্যতার অধিকারী নয়, তাদের নিকট এ আমানত কখনই অর্পণ করা উচিত নয়। আর যোগ্য ও অধিকারী মনে করে আমানত অর্পণের পর তা যথাযথ আদায় করতে অযোগ্যতার—দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রমাণ দিলে জনগণই সে আমানত ফিরিয়ে নেবে।

ঈমানদার লোকেরা প্রশাসনিক সংস্থা গড়ে তুলবে, সংস্থার প্রধানের আনুগত্যও করবে। কিন্তু সে আনুগত্য কখনই শর্তহীন হবে না। নিঃশর্ত আনুগত্য করতে হবে শুধু আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের। তা ছাড়া অন্যদের আনুগত্য হবে এই শর্তে যে, ১. সে বা তারা নিজে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের আনুগত্য করে চলবে। ২. তারা জনগণকে এমন কাজের আনুগত্য করার নির্দেশ দেবে যা করলে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের আনুগত্য হয়ে যায় এবং ৩. এমন কোন কাজের হুকুম দিবে না, যা করলে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের নাফরমানী হয়।

প্রথমোল্লিখিত আয়াতে 'তোমাদেরকে আদেশ করেছেন' বলে প্রশাসকদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা এরপরই 'তোমরা যখন লোকদের মধ্যে ফয়সালা করবে' বলে তাদের প্রতিই হুকুম জারি করা হয়েছে। কাজেই নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে, এখানে 'আমানত' বলে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব বোঝানো হয়েছে। এর পরই আনুগত্যের আদেশ দেয়ায়ও সেই হুকুমাত—প্রশাসনিক কর্তৃত্বকেই নির্দেশ করা হয়েছে। কাজেই 'আমানত' বলতে হুকুমাত—তথা প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

দ্বিতীয়োক্ত আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, এই আমানতের আসল অধিকারী হচ্ছে ঈমানদার জনগণ। অতএব হুকুমাত বা প্রশাসনিক কর্তৃত্ব সেই জনগণের নিকট থেকেই পেতে হবে। জনগণকে এ আমানত স্বীয় আল্লাহ্‌ তা'আলাই

দিয়েছেন, যদিও সে হুকুমাত মূলত আল্লাহর। কেননা হুকুমাতের জন্য যে সার্বভৌমত্ব অপরিহার্য, তা আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই হতে পারে না। মানুষের নিকট শুধু প্রয়োগীয় সার্বভৌমত্ব আসে আল্লাহর নিকট থেকে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, সার্বভৌমত্ব দু'ধরনের। একটি প্রকৃত ও মৌলিক যা একান্তভাবে আল্লাহর। আর দ্বিতীয় অধীন, প্রদত্ত, অর্পিত। এ দুটি সার্বভৌমত্ব ইসলামী হুকুমাতে একসাথে কাজ করে। এ দুটির মধ্যে কখনই বিরোধ বাঁধে না। কাজেই আমানতের ধারক হচ্ছে মুসলিম জনগণ। আর সে আমানতের সার্বভৌমত্বের আসল মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা) তাঁর একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে বলেছিলেনঃ

إِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ وَلٰكِنَّهُ فِى عُنُقِكَ أَمَانَةٌ وَأَنْتَ مُسْتَرْعًى لِمَا فَوْقَكَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْتَاتَ فِى رَعِيَّةٍ (نهج البلاغة الرسالة رقم ٥)

তোমার কাজ ও কর্তৃত্ব তোমার জন্য কোন স্বাদের খাদ্য নয়। বরং তা তোমার ঘাড়ের উপর একটি ভারী আমানত। তোমার উপরস্থের জন্য তুমি প্রহরার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি। তুমি এই প্রহরার কাজে কোনরূপ অন্যায় করতে পার না।

তিনি আরও বলেছেনঃ

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَمْرَكُمْ هٰذَا لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ حَقٌّ إِلَّا مَنْ أَمَّرْتُمْ وَإِنَّهُ لَيْسَ لِى دُونَكُمْ إِلَّا مَفَاتِيحُ مَالِكُمْ مَعِى (الكامل لابن اثير ج ٣ ص ١٩٣)

হে জনগণ! তোমাদের এই রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কিছু করার অধিকার কেবল তারই হতে পারে যাকে তোমরা নিযুক্ত করবে। আর খলীফা হিসেবে আমার কোন ক্ষমতা নেই। আছে শুধু এই যে, তোমাদের যে মাল-সম্পদ আমার নিকট রয়েছে, তার চাবিগুলি আমার নিকট রক্ষিত।

হযরত আলী (রা)-র আর একটি উক্তিঃ

حَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَأَنْ يُؤَدِّيَ الْأَمَانَةَ فَإِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ فَحَقٌّ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَأَنْ يُطِيعُوهُ وَأَنْ يُجِيبُوهُ إِذَا دَعَا (الاموال لابى عبيد ج ٢ ص ٣٨٨)

ইমাম-রাষ্ট্রনায়কের অধিকার হচ্ছে এতটুকু মাত্র যে, সে আল্লাহর নাযিল করা বিধানের ভিত্তিতে শাসনকার্য চালাবে। সে যদি তা করে, তাহলে

জনগণের উপর তার এই অধিকার হবে যে, তারা তার কথা শুনবে ও তার আনুগত্য করবে এবং যখন ডাকবে তখন তারা সে ডাকে সাড়া দেবে।

এ আয়াতসমূহ এবং অন্যান্য উক্তি গভীরভাবে চিন্তা-বিবেচনা করলে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারা যায়, শাসক-প্রশাসক নির্বাচন করা মুসলিম উম্মতের অধিকার ও কর্তব্য। অবশ্য তা করতে হবে শরীয়াতের স্থায়ী নিয়ম বিধান অনুযায়ী। অন্তত সরকার যে মুসলিম উম্মতের ইচ্ছা ও মর্জীর ভিত্তিতে গঠিত হতে হবে, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই।

তবে শাসক-প্রশাসক নির্বাচনের এ অধিকার পাশ্চাত্যের ধর্মহীন গণতান্ত্রিক পন্থার মত নিশ্চয়ই নয়, তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতি সম্পন্ন, ভিন্নতর লক্ষ্য সমৃদ্ধ। ইসলামে শাসক নির্বাচন করা হয় বিশেষ কতগুলি গুণের ভিত্তিতে, বিশেষ কতগুলি শর্তের অধীন। এগুলির উল্লেখ পরে করা হবে। কিন্তু পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই ধরনের অবশ্য পালনীয় কোন শর্ত নেই, নেই বিশেষ কোন গুণের অধিকারী হওয়ার অনিবার্য শর্ত।

তাছাড়া পাশ্চাত্যের ধর্মহীন গণতান্ত্রিক পন্থায় শাসক জনগণের অধীন হয়ে থাকে। কল্যাণ ও সত্যের অনুসারী হতে হয় না। কেননা তথায় জনগণই ভোটের একমাত্র অধিকারী। তাই নির্বাচিত শাসককে সেই জনগণের অনুসরণ করে চলতে হয় সব সময়, অন্যথায় পরবর্তী নির্বাচনে তার নির্বাচিত হওয়ার আশা সুদূরপরাহত। তাই একবার নির্বাচিত হয়ে নির্ভেজাল ও সার্বিক কল্যাণের জন্য করা ও সর্বক্ষেত্রে প্রকৃত সত্যের অনুসরণের পরিবর্তে ন্যায়ভাবে হোক, কি অন্যায়ভাবে, ভোটদাতাদের সন্তুষ্ট করার কাজেই তাকে চব্বিশ ঘন্টা চিন্তিত ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়।

এর ফলে তাকে জনগণের বিচিত্র ধরনের কামনা-বাসনার চরিতার্থতা করতে হয় ও তাদের অধীন হয়ে থাকতে হয়। কোন সময়ই সে নিরপেক্ষ সত্যের অনুসরণ করে চলার সাহস পায় না।

পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণ নিজেদের আত্মীয়তা, পরিচিতি-বন্ধুত্ব ও আঞ্চলিক-বৈষয়িক স্বার্থ দেখে ভোট প্রয়োগ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে যোগ্যতা ও চরিত্রের দিক দিয়ে কে ভোট পাওয়ার যোগ্য, সেই বিচার-বিবেচনা তারা সাধারণত করে না। ফলে সমাজের সর্বোত্তম আদর্শবাদী ও চরীত্রবান ব্যক্তিদের নির্বাচিত হওয়া প্রায়ই সম্ভব হয় না। আর তার পরিণামে কোন দিনই আদর্শবাদী চরিত্রের ন্যায় ও সত্যের একান্ত অনুসারী সরকার গঠিত হতে পারে না। অতএব এইরূপ নির্বাচনে সাধারণত সমাজের অত্যাচারী লোকেরই শাসক হয়ে বসার

সম্ভাবনা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। এই দিকের লক্ষ্য রেখেই আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিম উম্মতকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেনঃ

وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ (هود: ١١٣)

তোমরা এই জালিমদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না। নতুবা তোমরা জাহান্নামের আওতার মধ্যে পড়ে যাবে। তখন তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে কোন বন্ধু পৃষ্ঠপোষক পাবে না যে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র (আযাব) থেকে রক্ষা করতে পারে, কোন দিক থেকে কোন সাহায্যও তোমরা পাবে না।

ইসলামী হুকুমাতের শাসক-প্রশাসকের গুণাবলী

[ইসলামে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের গুরুত্ব—জরুরী গুণাবলীঃ ঈমান, রাষ্ট্রীয় দায়িত্বসমূহ উত্তমভাবে পালনের যোগ্যতা প্রতিভা, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তার সর্বাগ্রসর, ন্যায়পরতা, নিরপেক্ষতা ও সুবিচার, পুরুষ হওয়া, আইন জ্ঞানে দক্ষতা পারদর্শিতা, স্বাধীনতা, জন্মসূত্রে পবিত্রতা—মানবিক ও উন্নতমানের চরিত্র।]

ইসলামে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের গুরুত্ব

মুসলিম উম্মতের জীবনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ও বিপদজ্জনক ব্যাপারাদিতে সুষ্ঠু সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপরই জনগণের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য একান্তভাবে নির্ভর করে। এই কারণে ইসলামের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের ব্যাপারটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও ফয়সালাকারী বিষয়। তাই মুসলিম সমাজকে তাদের সামষ্টিক দায়িত্ব সুষ্ঠুরূপে পালনের জন্য একজন শাসক-প্রশাসক নিযুক্ত করা একান্তই কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর একজন 'ইমাম' বা রাষ্ট্রনায়ক নিযুক্ত করা শরীয়াত ও সাহাবায়ে কিরামের আমল 'ওয়াজিব' (ফরয) প্রমাণ করেছে। রাসূলে করীম (স)-এর ইন্তেকালের পর সর্বপ্রথম কাজ হিসেবে সাহাবায়ে কিরাম (রা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে খলীফা নির্বাচিত করে এই কাজের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে।

এই কারণে মুসলিম উম্মার ইতিহাসে এমন কোন সময় বা যুগ অতিবাহিত হয়নি, যখন তাদের ইমাম বা সর্বোচ্চ শাসক কেউ ছিল না। আল্লামা জুরজানী এই প্রেক্ষিতেই দাবি করেছেনঃ

إِنَّ نَصْبَ الْإِمَامِ مِنْ أَتَمِّ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْظَمِ مَقَاصِدِ الدِّينِ.

'ইমাম' বা রাষ্ট্রনায়ক নিয়োগ মুসলমানদের কল্যাণ সাধনের পূর্ণতম ব্যবস্থা এবং দ্বীন-ইসলামের সর্বোচ্চ লক্ষ্যের সর্বাধিক মাত্রার বাস্তবায়ন।

আল্লামা নসফী আহ্‌লিস্‌-সুন্নাত-ওয়াল-জামায়াতের আকীদা হিসেবে লিখেছেনঃ

وَالْمُسْلِمِينَ لَابُدَّلَهُمْ مِنْ إِمَامٍ يَقُومُ بِتَنْفِيذِ أَحْكَامِهِمْ وَإِقَامَةِ حُدُودِهِمْ وَسَدِّ ثُغُورِهِمْ وَتَجْهِيزِ جُيُوشِهِمْ وَأَخْذِ صَدَقَاتِهِمْ وَقَهْرِ الْمُتَغَلِّبَةِ وَالْمُتَلَصِّصَةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَإِقَامَةِ الْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ وَقَطْعِ الْمُنَازَعَاتِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَبُولِ الشَّهَادَةِ الْقَائِمَةِ عَلَى

الْحُقُوقِ وَتَزْوِيجِ الصِّغَارِ وَالصَّغَائِرِ الَّذِينَ لَا أَوْلِيَاءَ لَهُمْ وَقِسْمَةِ الْغَنَائِمِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي لَا يَتَوَلَّاهَا آحَادُ الْأُمَّةِ

মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য একজন ইমাম—রাষ্ট্রনায়ক—অবশ্যই থাকতে হবে—থাকা অপরিহার্য। সে আইন-কানুনসমূহ কার্যকর করবে, শরীয়াত-নির্দিষ্ট শাস্তিসমূহ জারি করবে, বিপদ-আপদের সকল দিক বন্ধ করবে, সেনাবাহিনীকে সুসজ্জিত ও সদা-প্রস্তুত করে রাখবে শত্রুর আগ্রাসন বন্ধের লক্ষ্যে। লোকদের নিকট থেকে যাকাত-সাদাকাত ইত্যাদি গ্রহণ ও বন্টন করবে, বিদ্রোহী দুষ্কৃতিকারী, চোর-ঘুষখোর ও ডাকাত-ছিনতাইকারীদের কঠিন শাসনে দমন করবে। জুম'আ ও ঈদের নামাযসমূহ কায়েম ও তাতে ইমামতি করবে; লোকদের অধিকার প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য গ্রহণ করবে (বিচার বিভাগ চালু করবে)। অভিভাবকহীন দুর্বল-অক্ষম বালক-বালিকাদের বিবাহের ব্যবস্থা করবে, জাতীয় সম্পদ জনগণের মধ্যে বন্টন করবে। আর এই ধরনের বহু কাজই সে আঞ্জাম দেবে, যা কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে আঞ্জাম দিতে পারে না।[১]

ইমাম—রাষ্ট্রপ্রধানদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের এই তালিকাই স্পষ্টভাবে বলে দেয় যে; মুসলিম উম্মতের সুষ্ঠু জীবনের জন্য যেমন রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন একজন ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের। অন্যথায় এই জরুরী কার্যসমূহ কখনই আঞ্জাম পেতে পারে না। আর এই গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী আঞ্জাম দেয়ার জন্য নিযুক্ত রাষ্ট্রপ্রধান সেই ব্যক্তিই হতে পারে, যার মধ্যে জরুরী গুণাবলী পুরামাত্রায় অবশ্যই বর্তমান থাকবে। রাষ্ট্রপ্রধানের সেই গুণাবলী থাকা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার জন্য জরুরী শর্ত। সেই শর্তানুরূপ গুণাবলী সম্পন্ন রাষ্ট্রপ্রধান না হলে জাতীয় নেতৃত্ব সম্পূর্ণ রূপে বিপথগামী হওয়া, ইনসাফ ও ন্যায়পরতার সরল সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে। আর তারই পরিণতি গোটা উম্মতের চরম গুমরাহী, ব্যাপক অকল্যাণ ও মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হওয়া অবধারিত হয়ে পড়বে। তখন রাষ্ট্রনেতা গোটা উম্মতের চরম গুমরাহীর প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং কিয়ামতের দিন মুসলিম উম্মত এই ধরণের রাষ্ট্রনেতাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট অভিযোগ করবে এই বলেঃ

رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ (الاعراف: ٣٨)

হে পরওয়ারদিগার, এই লোকেরাই আমাদেরকে দ্বীন-ইসলাম থেকে গুমরাহ করেছিল। অতএব তুমি এদেরকে জাহান্নামের দ্বিগুণ আযাবে নিক্ষেপ কর।

১। الاسلام لسعيد حوى ج: ٢، ص: ١٢٧
شرح عقائد النسفى مع ترجمه اردو ص: ٣٢٨، طبع امداديه داكا

বলবেঃ

رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا - رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا (الاحزاب ٦٧-٦٨)

হে আমাদের রব্ব! আমরা আমাদের সরদার—বড় বড় নেতাদের অনুসরণ করেছিলাম। ফলে ওরা আমাদেরকে আসল পথ থেকে বিভ্রান্ত করেছে। হে আমাদের রব্ব! তুমি আজ ওদেরকে দ্বিগুণ আযাব দাও। আর ওদের উপর বড় রকমের অভিশাপ বর্ষণ কর।

দুটি আয়াত দুইটি ভিন্ন ভিন্ন সূরা ও ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতের হলেও মূল বক্তব্য অভিন্ন। আর তা হচ্ছে গুমরাহ নেতৃত্বের মারাত্মক কুফল। রাষ্ট্রনেতা যদি ইসলামী আদর্শবাদী ও ইসলামের বাস্তব অনুসারী না হয়, তা যদি হয় ইসলাম বিরোধী মতাদর্শে বিশ্বাসী ও ইসলাম পরিপন্থী চরিত্রে ভূষিত, তাহলে তার অধীনে ইসলামী ও চরিত্রবান জীবন-যাপন করা কখনই সম্ভবপর হতে পারে না। তার পরিণতি হচ্ছে অধীনস্থ জনগণের চরম গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতা। এর কুফল যে সর্বগ্রাসী ও মারাত্মক, তার বড় প্রমাণ, এই নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আল্লাহর প্রতি ঈমানদার লোকেরা কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র নিকট প্রচণ্ড অভিযোগ পেশ করবে। বলবে, হে আল্লাহ্! আমরা তো তোমার বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু এই নেতা বা নেতারা আমাদের তার সুযোগই দেয়নি, ওরা আমাদেরকে গুমরাহ করেছে, ভিন্নতর পথে চলতে বাধ্য করেছে।

জরুরী গুণাবলী

এই কারণে কুরআনের দৃষ্টিতে সকল পর্যায়ের নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআন যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পেশ করেছে, তাতে বিশেষভাবে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের জন্য কতগুলি জরুরী গুণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। সেই গুণসমূহ যার মধ্যে পাওয়া যাবে, ইসলামী রাষ্ট্রের নেতা বা প্রধান তাকেই বানানো যেতে পারে। এখানে এ পর্যায়ের কতিপয় উচ্চতর গুণের উল্লেখ করে তার ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করছি।

১. ঈমান

দ্বীন-ইসলামের প্রতি গভীর দৃঢ় ও পূর্ণাঙ্গ ঈমান হচ্ছে সর্বপ্রথম জরুরী গুণ। মহান আল্লাহ্ তা'আলা এই দ্বীন মানুষের সার্বিক জীবনের জন্য সর্বশেষ নবী-রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে নাযিল করেছেন। তা-ই হচ্ছে

মানুষের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ব্যক্তি-জীবন ও সামষ্টিক-রাষ্ট্রীয় জীবন—জীবনের ও রাষ্ট্রের সকল দিক ও বিভাগ এই বিধান অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে। আর রাষ্ট্রপ্রধানকে তার পূর্ণ শক্তি দিয়ে এই বিধানকে পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব পালন করতে হবে। দ্বীন-ইসলামই সর্বোত্তম নির্ভুল, মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার একমাত্র সমাধানকারী ও সর্বাধিক কল্যাণ দানকারী বিধানরূপে ঐকান্তিক ঈমান থাকতে হবে। আর এক কথায় এক এককক ও অনন্য আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান, আল্লাহ্‌র শরীয়াতের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস।

এই শর্তের কারণে কোন কাফির ব্যক্তি মুসলিম জনগণের নেতৃত্ব ও প্রশাসকত্ব লাভ করতে পারে না। বিবেক-বুদ্ধির দিক দিয়েও এই ঈমানের শর্ত হওয়া জরুরী বিবেচিত হবে। কেননা ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শবাদী—আদর্শভিত্তিক—আদর্শ অনুসারী রাষ্ট্র। যে লোক সে আদর্শের প্রতি বিশ্বাসী নয়,তার দ্বারা সে আদর্শের অনুসরণ ও বাস্তবায়ন কখনই সম্ভবপর হতে পারে না। এজন্য ইসলামী জীবন-বিধানের প্রতি যথার্থ বিশ্বাসী নয়—এমন কোন ব্যক্তির মুসলিম জনগণের শাসক হওয়ার যোগ্যতা নেই, অধিকারও নেই। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেনঃ

وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا (النساء: ١٤١)

আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন লোকদের উপর কাফির লোকদের কর্তৃত্ব করার কোন পথ-ই রাখেন নি।

২. রাষ্ট্রীয় দায়িত্বসমূহ উত্তমভাবে পালনের যোগ্যতা, প্রতিভা

প্রশাসনিক কর্তব্য ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সূচারুরূপে পালনের জন্য তার স্বভাবগত যোগ্যতা একান্তই অপরিহার্য। নেতৃত্ব দান ও প্রশাসনিক কর্তৃত্বের জন্য মৌলিক শর্ত হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালনের সর্বোচ্চ মানের যোগ্যতা। কেননা মানুষের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় শাসকদের অযোগ্যতা ও অনুপযুক্ততা বিশ্ব জাতিসমূহের—বিশেষ করে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের—ক্ষেত্রে ব্যাপক ও মারাত্মক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে, জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়েছে চরম দুর্গতি ও দুর্ভোগ।

প্রশাসকের এই গুণ থাকার শর্তটির গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। তা প্রমাণের জন্য কোন দলীল পেশ করার প্রয়োজন পড়ে না। নেতৃত্ব স্বতঃই এ শর্তের অপরিহার্যতা প্রমাণ করে। রাসূলে করীম (স) নিজে এ শর্তের প্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

لاَ تَصْلِحُ الْاِمَامَةُ اِلاَّ لِرَجُلٍ فِيهِ ثَلاَثُ خِصَالٍ:

١. وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي اللّٰهِ

٢. وَحِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ غَضَبَهُ

٣. وَحُسْنُ الْوِلاَيَةِ عَلٰى مَنْ يَّلِيْ حَتّٰى يَكُوْنَ كَالْوَلَدِ (وفى رواية كالاب،

সামাজিক-রাজনৈতিক নেতৃত্ব দান কেবল মাত্র পুরুষদের পক্ষেই সম্ভব। তার জন্যও তিনটি শর্ত রয়েছেঃ এমন সততা-ন্যায়পরতা-আল্লাহ্ পরস্তি যা তাকে আল্লাহ্র নাফরমানীর কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং ধৈর্যস্থৈর্য, যেন তদ্দারা সে স্বীয় ক্রোধ দমন করতে পারে। যাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে তাদের উপর উত্তম নেতৃত্ব দান, যেন তারা সবাই তার সন্তান-তুল্য হয়ে যায়।

ইসলাম তো এই শর্তও করেছে যে, প্রশাসককে প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অন্যদের তুলনায় অধিক যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে।

হযরত আলী (রা) বলেছেনঃ

লোকদের উপর নেতৃত্ব দানের অধিক অধিকারী হবে সেই ব্যক্তি, যে তাদের সকলের তুলনায় অধিক দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও অধিক শক্তিশালী হবে। আল্লাহ্র বিধান সম্পর্কে অন্যদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ও বিদ্বান, কেউ গণ্ডগোল করলে তাকে অভিযুক্ত করবে, তাতে দমিত না হলে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র কার্যক্রম গ্রহণ করবে।[১]

৩. রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তায় সর্বাগ্রসর

নিছক প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা ও উত্তম নেতৃত্বের গুণাবলীই ইসলামের দৃষ্টিতে নেতৃত্বের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তায় নেতাকে অন্যান্য সকলের তুলনায় অনেক বেশী অগ্রসর হতে হবে! তাহলেই তার পক্ষে জনগণের প্রকৃত কল্যাণ সম্পর্কে অধিক বেশী জ্ঞানী হয়ে কাজ করা সম্ভব হবে। মানুষের অভাব-অনটন ও প্রয়োজন সম্পর্কে বেশী অবহিতি লাভ তার পক্ষে সহজ হবে। ফলে কোন জাতীয় বিষয়ে তার মত ভুল হবে না, কোন সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ হবে না। তার কোন বিষয়ে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকখানি কম থাকবে। আর ইসলামী সমাজ তখন অতীব উন্নতমানের নেতৃত্ব পেয়ে অধিকতর ধন্য হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারবে।

এই সব কারণে মুসলিম উম্মতের সর্বোচ্চ প্রশাসন সম্পর্কে একথা নির্দিষ্ট হয়ে আছে যে, তার সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অতীব উন্নতমানের হওয়া

১. نهج البلاغة – الخطبة ١٧٢

বাঞ্ছনীয়। তাহলেই তার পক্ষে মুসলিম উম্মতকে সঠিক ও নির্ভুল নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব হবে এবং কালের অগ্রগতির সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে জনগণকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়া সহজতর হবে।

এজন্য তাকে সাম্প্রতিককালের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থা ও উত্থান পতন পর্যায়ে উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। তাহলেই তার পক্ষে নিজ জাতিকে আন্তর্জাতিক ঘাত-প্রতিঘাতের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা সম্ভবপর হবে। কেননা বর্তমান দুনিয়ায় যে কোন সময়ের প্রেক্ষিতে কোন দেশ বা সমাজই অন্য নিরপেক্ষ হয়ে থাকতে পারে না। চতুর্দিকের সার্বিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রত্যেকটি জাতি-জনগোষ্ঠীকে নিজস্ব লক্ষ্য পথে চলতে হয়। আজানা-অচেনা পথে চলা যেমন মারাত্মক পরিণতি নিয়ে আসতে পারে, তেমনি সেই চলায় গতিশীলতার সৃষ্টি করা কখনই সম্ভব হয় না। আর রাষ্ট্র পরিচালনা বাস্তবিকই কোন ছেলেখেলা নয়, নয় হাস্য কৌতুকের ব্যাপার। না জেনে না বুঝে না দেখে চলতে গেলে রূঢ় বাস্তবতার কঠিন আঘাতে গোটা জাতির চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া কখনই আশংকামুক্ত হতে পারে না।

ন্যায়পরতা, নিরপেক্ষতা ও সুবিচার

রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পর সর্বোচ্চ রাষ্ট্রনেতাকে অপর যে গুণে অধিক গুণান্বিত হতে হবে, তা হচ্ছে সুবিচার, ন্যায়পরতা ও নিরপেক্ষতার গুণ। অবশ্য সর্বপ্রকার গুনাহ ও নাফরমানী থেকে তো তাকে দূরে থাকতেই হবে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সুবিচার ও ন্যায়পরতা উচ্চতর মহত্তর গুণের অধিকারী না হলে তার পক্ষে স্বীয় দায়িত্ব পূর্ণ সততার সাথে পালন করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি জনগণের সত্যিকার অর্থে কোন কল্যাণ সাধনও অসম্ভব। বস্তুত সুবিচার ন্যায়পরতা এক মানসিক অবস্থা বিশেষ। তা ব্যক্তিকে সর্বপ্রকারের গুনাহ থেকে যেমন দূরে রাখে, তেমনি জাতীয় পর্যায়ের কার্যাবলীতে খিয়ানত-বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যা-প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ ও জুলুম-শোষণ-নির্যাতনমূলক কার্যক্রম থেকেও মুক্ত ও পবিত্র থাকতে উদ্বুদ্ধ করে।

অতএব কোন ফাসিক—আল্লাহর বিধান লংঘনকারী ব্যক্তিকে মুসলিম উম্মতের সর্বোচ্চ—শুধু সর্বোচ্চ নয়—কোন পর্যায়ের শাসকরূপে নিয়োগ করা ইসলামের মানব কল্যাণমূলক আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সূরা হুদ-এর পূর্বোদ্ধৃত ১১৩ আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা যে জালিম লোকদের প্রতি ঝুঁকে পড়তে—আনুগত্য স্বীকার করতে—স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন তা এই কারণে। তিনি আরও স্পষ্ট ভাষায় বলেছেনঃ

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا (الكهف: ٢٨)

যে লোকের দিল আল্লাহ্র স্মরণশূন্য—আল্লাহ্র আনুগত্যমূলক ভাবধার-াহীন—এবং স্বীয় বন্ধন-নিয়ন্ত্রণহীন কামনা-বাসনার অনুসারী, আর এ কারণে যার কাজকর্ম বাড়াবাড়িপূর্ণ তুমি তার অনুসরণ কখনই করবে না।

এরূপ চরিত্রের লোকদের আনুগত্য-অধীনতা-অনুসরণ যে চরম গুমরাহীর কারণ, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কিয়ামতের দিন এরূপ লোকদের অনুসরণকারীরা আল্লাহ্র নিকট যে ফরিয়াদ করবে, তার উল্লেখ করে কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا (الاحزاب: ٦٧)

দ্বীন-ইসলাম অমান্যকারী—কাফির—লোকেরা (কিয়ামতের দিন) বলবেঃ হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আমরা তো দুনিয়ায় আমাদের সরদার, নেতা ও আমাদের অপেক্ষা বড় লোকদেরই আনুগত্য করে চলেছি। ফলে তারা আমাদেরকে (তোমার আনুগত্যের) পথ থেকে গুমরাহ্ করে নিয়েছে।

সাধারণভাবে সমাজে যেসব লোক কর্তা, নেতা ও মাতব্বর-সরদার হয়ে থাকে, নির্বিচারে ও অন্ধভাবে তাদের আনুগত্য স্বীকার করাই এই গুমরাহীর মূলীভূত কারণ।

তারা বলবেঃ তা না করে আমরা যদি সর্বাবস্থায় কেবল আল্লাহ্ ও রাসূলেরই আনুগত্য করতাম, তাহলে আজকে—কিয়ামতের দিন—জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে ও তথায় চিরদিন অবস্থানের ঘোষণা শুনতে বাধ্য হতাম না।

يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا (الاحزاب: ٦٦)

তারা বলবেঃ হায়, আমরা যদি আল্লাহ্র আনুগত্য করতাম, আনুগত্য করতাম রাসূলের!

কিন্তু আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি শুধু গুমরাহ সরদার-মাতব্বর-নেতৃস্থানীয় ও বড় বড় লোকদের আনুগত্য স্বীকার করার কারণে। কিয়ামতের দিন তারা তাদের দুনিয়ার নেতাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়বে এবং আল্লাহ্র নিকট নিজেদের এই মর্মান্তিক পরিণতির জন্য তাদের অনুসৃত এই নেতাদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করে বলবেঃ

رَبَّنَا اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا (الاحزاب: ٦٨)

হে পরওয়ারদিগার! তুমি ওদেরকে দ্বিগুণ আযাব দাও এবং ওদের উপর বড় ধরনের অভিশাপ বর্ষণ কর।

এসব আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে একথা সুস্পষ্ট ও অকাট্য যে, ফাসিক-ফাজির—আল্লাহ্দ্রোহী—আল্লাহ্র নাফরমান পাপী-পথভ্রষ্ট লোকদের—তারা সামাজিকতার দিক দিয়ে যত বড় প্রভাবশালী ও ধনশালীই হোক—নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মুসলিম উম্মতের কখনই মেনে নেয়া উচিত নয়। তাদের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে বা থাকলে তা সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করা মুসলিম উম্মতের দ্বীনী ও রাজনৈতিক দায়িত্ব।

মোটকথা, আল্লাহ্র ভয়ে ভীত নয়, তাঁর শরীয়াতের অনুগত নয়—এমন কোন ব্যক্তির নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব মুসলিম উম্মতের কখনই মেনে নেয়া ও বরদাশত করা উচিত নয়।

মুসলিম জনগণের নেতা এমন ব্যক্তি কখনই হতে পারে না যেঃ

১. কৃপণ—কেননা সে তো তার যাবতীয় ধন-সম্পদ পেটুকের মত খেয়ে শেষ করবে।

২. মূর্খ—কেননা সে তার মূর্খতার দ্বারা সমস্ত মানুষকে গুমরাহ করবে।

৩. নির্দয়-অত্যাচারী—কেননা সে তার নির্দয়তা ও অত্যাচারে জনগণকে জর্জরিত ও অতিষ্ঠ করে তুলবে।

৪. অন্য রাষ্ট্রের ভিন্নতর আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট—কেননা এরূপ ব্যক্তি কোন সমাজের সর্বোচ্চ ক্ষমতা লাভ করলে সে সমাজের স্বাধীনতা বিদেশী শক্তির নিকট বিক্রয় করে দেবে। স্বাধীন জাতিকে পরাধীন বানিয়ে দেবে।

৫. ঘুষখোর-দূর্নীতিপরায়ণ—এরূপ চরিত্রের লোক শাসক-প্রশাসক হলে সে বিচার কার্যে ও দেশ শাসনে জনগণের অধিকার ন্যায়সঙ্গতভাবে আদায় করতে পারবে না। আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমাসমূহ যথাযথভাবে রক্ষা করতে পারবে না।

৬. রাসূলের সুন্নাতকে অমান্য-উপেক্ষাকারী—কেননা এরূপ ব্যক্তি জনগণকে কখনই কল্যাণের দিকে নিয়ে যেতে পারবে না।

এই কারণে মুসলিম উম্মতের নেতা ও প্রশাসককে অবশ্যই আত্ম-সংযমশীল, ইসলামী শিক্ষায় পূর্ণ শিক্ষিত এবং পূর্ণ মাত্রায় ইসলামী চরিত্রে চরিত্রবান হতে হবে। ইসলামের বিধান কার্যত অনুসরণকারী ও বাস্তবভাবে প্রবর্তনকারী হতে হবে। নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ

يَوْمٌ وَاحِدٌ مِّنْ سُلْطَانٍ عَادِلٍ خَيْرٌ مِّنْ مَّطَرٍ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا وَّحَدٌّ يُقَامُ فِى الْاَرْضِ اَزْكٰى مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ (المستدرك للحاكم ج ٣ ص ٢١٦)

সুবিচারক ন্যায়বাদী শাসকের অধীন একটি দিন চল্লিশ দিনের বৃষ্টিপাতের কল্যাণের চেয়েও অধিক উত্তম এবং পৃথিবীতে আল্লাহ্ নির্ধারিত একটি শাস্তি কার্যকর হওয়া এক বছরের নফল ইবাদতের তুলনায় অধিক পরিশুদ্ধতা সৃষ্টিকারী।

তিনি আরও বলেছেনঃ

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْغَضُ النَّاسِ لِلّٰهِ وَأَبْعَدُهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ (جامع الاصول ج: ٤ ص ٥٥ اخرجه الترمذى)

কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় ও আসন গ্রহণের দিক দিয়ে তাঁর সর্বাধিক নিকটবর্তী ব্যক্তি হবে সুবিচারক নেতা ও শাসক এবং সেদিন আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক ঘৃণ্য ও আসন গ্রহণের দিক দিয়ে অধিক দূরবর্তী হবে অন্যায়কারী-অত্যাচারী নেতা বা শাসক।

তাঁর এই হাদীসটিও স্মরণীয়ঃ

إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ عَلٰى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمٰنِ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِيْ حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا (جامع الاصول ج ٤ ص ٥٣ اخرجه مسلم)

কিয়ামতের দিন সুবিচারকারী ন্যায়বাদী শাসকরা আল্লাহ্ রহমানের ডান দিকে নূর-এর উচ্চাসনে আসীন হবে—আল্লহ্র দুটি দিক-ই ডান—তারা সেই লোক, যারা তাদের শাসন কার্যে ও বিচার-আচারে তাদের জনগণ ও বন্ধুদের মধ্যে ন্যায়বিচার ও নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠিত করবে।

এই শেষোক্ত হাদীসটি যদিও বিচারকার্য সম্পর্কীয়, তবু তা সাধারণ অর্থে দেশ শাসন ও নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। কেননা এই কাজটি বিচার বিভাগীয় কাজের মূল হোতা এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কেননা রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ দায়িত্ব যে ধরনের লোকের হাতে থাকবে, তার প্রশাসনের অধীন বিচার বিভাগীয় কার্যও সেই ধরনেরই হবে, তা নিঃসন্দেহে-ই বলা যায়। এই কারণে সর্বোচ্চ প্রশাসকের মধ্যে এই গুণ সর্বাধিক মাত্রায় থাকা সবকিছুর তুলনায় অনেক বেশী প্রয়োজন।

নামাযের ইমামতির ক্ষেত্রেও এই ন্যায়পরতা ও সুবিচারের শর্ত আরোপ করা হয়েছে, অথচ নামায ইসলামী জীবন-বিধানের একটি কাজ মাত্র—যদিও অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ—নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমিত। তাই গোটা ইসলামী দেশের বিপুল সংখ্যক মুসলিম জনগণের সর্বোচ্চ শাসককে সবচেয়ে বেশী ন্যায়বাদী, নিরপেক্ষ, সুবিচারক ও ইসলামী আদর্শের অবিচল অনুসারী হওয়া সর্বাধিক

গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কেননা গোটা উম্মতের জীবন-মরণের মূল চাবি-কাঠি তার হাতেই নিবদ্ধ।

৫. পুরুষ হওয়া

মুসলিম উম্মতের সর্বোচ্চ শাসক-প্রশাসককে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে। ইসলামী জীবন-বিধানে ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এ এক জরুরী শর্ত। ইসলাম এ শর্ত আরোপ করে নারীদের সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার কিছুমাত্র লাঘব করেনি, নারীর প্রতি প্রকাশ করেনি কোন হীনতা বা ছোটত্ব। নারীর স্বভাবগত যোগ্যতা ভাবধারা ও অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নারীদের প্রকৃতিগত বিশেষত্বই এ পার্থক্য সৃষ্টির মৌল কারণ। রাষ্ট্রপ্রধান বা মুসলিম উম্মতের সর্বোচ্চ শাসককে যেসব কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হয়, দূরূহ সামষ্টিক সমস্যাবলীর সমাধান করতে হয়, বহু লোককে কর্মে নিযুক্ত করতে হয়, কাজ আদায় করতে হয়, বহু দেশী-বিদেশীদের সাথে কথোপকথন চালাতে হয়—তা করার জন্য যে স্বভাবগত দক্ষতা, যোগ্যতা ও সর্বাবস্থায় প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন তা নারীর নিকট কখনই আশা করা যায় না, স্বাভাবিকভাবেই তা নারীর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

কেননা একথা সর্বজনস্বীকৃতব্য যে, নারী পুরুষ অপেক্ষা অধিক স্নেহপ্রবণ, বিনম্র হৃদয়, আবেগ-সংবেদনশীলতার মূর্ত প্রতীক। কঠিনতা-কঠোরতা ও অনমণীয়তা তার প্রকৃতি-পরিপন্থী। এই কারণে ইসলাম নারীকে সকল প্রকারের কঠিন-কঠোর পরিশ্রমের কাজ থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। কেননা ইসলামের স্থায়ী শাশ্বত নিয়মই হচ্ছে কারোর উপর এমন কাজের দায়িত্ব না চাপানো, যা করা তার পক্ষে স্বভাবতই কঠিন বা দুষ্কর ও কষ্টদায়ক কিংবা সাধ্যের অতীত। এ ধরনের কাজের দায়িত্ব এ কারণেই কেবল পুরুষদের উপর অর্পণ করা হয়েছে। কেননা এ ধরনের কাজের যোগ্যতা কেবল পুরুষদেরই থাকা সম্ভব। পুরুষরা জন্মগতভাবেই শক্তি-সামর্থ্য সম্পন্ন, দুর্দান্ত ও দুর্ধর্ষ। সামষ্টিক নেতৃত্ব কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় কঠিন দায়িত্ব পালন নারীদের অপেক্ষা পুরুষদেরই সাধ্যায়ত্ত।

নারীদের স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল কাজ হচ্ছে মাতৃত্ব। সন্তান গর্ভে ধারণ, সন্তান প্রসব, লালন-পালন নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুরূহ ও কষ্টসাধ্য কাজ। এ কাজ যে অবিচল ধৈর্য-সহ্য শক্তি ও অসীম-গভীর স্নেহ ও মায়া মমতার প্রয়োজন, তা পুরুষের তুলনায় নারীদেরই রয়েছে অনেক বেশী মাত্রায়। এই কারণেই এ কাজ কেবল নারীদের। এ কাজে পুরুষদের কোন অংশ নেই। নারী-পুরুষের প্রকৃতি ও স্বভাবগত পার্থক্য অনুসারেই বিশাল জীবন-ক্ষেত্রের এই কর্ম বন্টন অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়েছে। মানব বংশের ধারা অব্যাহত রাখার

জন্য নারীকেই প্রধান ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। পুরুষের ভূমিকা গুরুত্বহীন না হলেও তা পরোক্ষ এবং বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের। পুরুষ বীজ বপন করেই খালাস। সে বীজ ধারণ, সংরক্ষণ, লালন, অংকুরের বিকাশ সাধন ও পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপী একটি মহীরুহ সৃষ্টির সমস্ত কাজ নারীকেই করতে হয়। আর তা করার জন্য যে দৈহিক প্রস্তুতি একান্তই অপরিহার্য, তা নারীদেহেই বিরাজিত তার জন্ম মুহূর্ত থেকেই। এর কোন একটি কাজ করার দৈহিক প্রস্তুতি পুরুষের নেই। কেননা প্রকৃতিগতভাবেই এ কাজ পুরুষের নয়, এ কাজ একমাত্র নারীর-ই করণীয়।

কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে নারী অত্যন্ত তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন ও সংবেদনশীল মানুষ। এইজন্য অলংকার ও প্রসাধন সামগ্রী নারীদের জন্য, পুরুষদের জন্য নয়। তাই ঝগড়া-বিবাদ, বিতর্ক ও যুদ্ধ-বিগ্রহে অগ্রবর্তী ভূমিকা পুরুষকেই পালন করতে হয়, নারী এ ক্ষেত্রে শুধু অক্ষমই নয়, ব্যর্থ-ও। তাই কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

أَوَ مَن يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (الزخروف: ١٨)

নারীরা তো সেই মানুষ, যারা অলংকারে প্রতিপালিত হয়। আর তারা তর্ক-বিতর্কে—দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষের সাথে মুকাবিলা করায় নিজেদের বক্তব্য পূর্ণমাত্রায় স্পষ্ট করে বলত অক্ষম।[১]

অলংকার ও সৌন্দর্য-উপকরণাদির প্রতি নারীদের স্বাভাবিক ঝোঁক প্রবণতা। তারা বাক-বিতণ্ডা ও শক্তির প্রতিযোগিতায় অনগ্রসর।

কুরআনে ঘোষিত নীতিতে এ স্বাভাবিক অবস্থারই প্রতিফলন। প্রতিপক্ষ সাধারণত প্রবল ও দুর্ধর্ষই হয়ে থাকে, তা যে কোন ক্ষেত্রেই হোক। রাষ্ট্রীয় ও সামষ্টিক পর্যায়ের প্রতিপক্ষের দুর্ধর্ষতা প্রশ্নাতীত। অথচ নারী সমাজ স্বভাবতই এই ক্ষেত্রে অক্ষমতার পরিচয় দিয়ে থাকে তাদের প্রকৃতিগত অক্ষমতার কারণেই। পক্ষান্তরে পুরুষরা তাদের স্বাভাবিক পৌরুষের কারণে এ ক্ষেত্রে খুবই পারঙ্গম। এ কারণে ইসলাম বিচারকার্য, বিবাদ-মীমাংসা ও বাক-বিতণ্ডার কোন দায়িত্ব নারীর উপর অর্পণ করেনি। কেননা এ কাজটি-ই নেতৃত্ব ও রাষ্ট্র পরিচালনা পর্যায়ের। এ ক্ষেত্রে যে বিপরীত দিকের চাপ অনিবার্য তার প্রতিরোধ নারীর সাধ্যাতীত। তবে ব্যতিক্রম কখনই নীতি নির্ধারণের ভিত্তি হতে পারে না।

---

১. মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা সন্তান সাব্যস্ত করত। তারই প্রতিবাদে কুরআনে এই কথাটি বলা হয়েছে যে, এ তো খুব ভালো বন্টন—তোমরা নিজেদের জন্য পুত্র সন্তান সাব্যস্ত কর আর আল্লাহ্‌র ভাগে ফেল কন্যা সন্তান, যাদের অবস্থা এই......।

হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর সারা রাষ্ট্রীয় জীবনে এই পর্যায়ের কোন দায়িত্ব কখনই কোন নারীর উপর অর্পণ করেন নি, কোন কোন নারীর মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে কিছু না-কিছু মাত্রার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও। শুধু তাই নয়, সমগ্র মুসলিম শাসন আমলে—উমাইয়্যা-আব্বাসীয়-মোগল-তুর্কী-ওসমানীয় বা আন্দালুসিয়ার শাসনের ইতিহাসে এর ব্যতিক্রম কোথাও দেখা যাবে না। যদিও খিলাফতে রাশেদার পরে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ পুরাপুরি ও যথাযথভাবে অনুসৃত হয়নি।[১]

রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

لَا يَفْلِحُ قَوْمٌ وَلِيَتْهُمْ اِمْرَأَةٌ (كتاب اداب القاضى: ص ٢٣٠)

যে জনগোষ্ঠীর প্রধান কর্ত্রী হচ্ছে নারী, তারা কখনই কল্যাণ পেতে পারে না।

এই বর্ণনাটির আর একটি ভাষা হচ্ছেঃ

لَنْ يَفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً (ترمذى، نسائى، جامع الاصول)

সে জনগোষ্ঠী কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারে না, যারা একজন নারীকে নিজেদের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব সম্পন্ন বানিয়েছে।

বর্ণনাটির অপর একটি ভাষা হচ্ছেঃ

لَا يَفْلِحُ قَوْمٌ اَسْنَدُوْا اَمْرَهُمْ اِلَى اِمْرَأَةٍ

(الملل و الاهواء ج: ٤، ص: ٤٤، كنز العمال ج: ٦، ص: ١١)

যে জনগণ তাদের সামষ্টিক দায়িত্ব কোন মেয়েলোকের নিকট সোপর্দ করেছে, তারা কোনক্রমেই সাফল্য লাভ করতে পারে না।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এ পর্যায়ের যে বর্ণনাটি উদ্ধৃত হয়েছে, তার ভাষা এইঃ

---

১. নারী বিচার বিভাগে নিযুক্ত হতে ও বিচারকার্য সম্পাদন করতে পারে কিনা, এ বিষয়ে ইসলামী মনীষীগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। প্রখ্যাত ফিকহ্‌বিদ ইবনে কুদামা তাঁর 'আল-মুগনী গ্রন্থে লিখেছেনঃ সর্বোচ্চ নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বা দেশ শাসনের দায়িত্ব পালনে নারী যোগ্য নয়। নবী করীম (স)-এর শাসনামলে, খুলাফায়ে রাশেদীন বা পরবর্তী যুগে কোন নারীকে এই ধরনের কাজে নিযুক্ত করা হয়নি। শায়খ তূসী বলেছেন, নারী বিচারকার্যে নিযুক্তি পেতে পারে না। ইমাম শাফিঈরও সেই মত। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেছেন, যেসব ব্যাপারে নারী সাক্ষী হতে পারে, সে সব ব্যাপারে বিচারকও হতে পারে। তা হদ্ ও কিসাস ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রেই হতে পারে। ইবনে জরীর তাবারীও এই মতই লিখেছেন। কেননা নারীও ইজতিহাদের যোগ্যতার অধিকারী হতে পারে। আর বিচারকার্যে তারই প্রয়োজন বেশী।

إِذَا كَانَ أُمَرَاءُ كُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلاَءَ كُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظُهُورِهَا (ترمذى، كتاب الفتن)

তোমাদের সামষ্টিক কার্যাবলীর কর্তৃত্ব যখন তোমাদের মধ্যকার অধিক দুষ্ট ও খারাপ লোকদের হাতে চলে যাবে, তোমাদের সমাজের ধনীরা যখন হবে কৃপণ এবং তোমাদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব কর্তৃত্ব নারীদের নিকট ন্যস্ত হবে, তখন পৃথিবীর উপরিভাগের তুলনায় অভ্যন্তর ভাগই তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর হবে (জীবনের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয় হবে)।

এসব কারণে নারীদের জন্য আযান ও নামাযের ইকামতও বলা জরুরী করা হয়নি। নারীদের জন্য ইসলাম যে সম্মান ও মর্যাদা নির্দিষ্ট করেছে, তাতে এসব কাজের দায়িত্ব তাদের জন্য সঙ্গতিসম্পন্ন হতে পারে না। বস্তুত ইসলামের পরিবার সংস্থায় সার্বিক নেতৃত্ব যেমন পুরুষের, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বেও তেমনি পুরুষদেরই অগ্রবর্তিতা। এসব নীতি কুরআনের এ আয়াতেরই পরিণতিঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ (النساء: ٣٤)

৬. আইন-জ্ঞানে দক্ষতা, পারদর্শিতা

ইসলামী হুকুমাত যেহেতু আল্লাহ্‌র আইন-বিধান ভিত্তিক, জনগণের উপর আল্লাহ্‌র আইন কার্যকর করণেরই অপর নাম, তাই রাষ্ট্রপ্রধান ও সর্বোচ্চ শাসককে অবশ্যই ইসলামী আইন-বিধানে যথেষ্ট মাত্রায় দক্ষ ও পারদর্শী হতে হবে। অন্যথায় রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারী, স্বৈরতান্ত্রিক ও জালিম হওয়ার আশংকা শতকরা এক'শ ভাগ। কেননা আল্লাহ্‌র দেয়া আইন যখন তার জানা থাকবে না, তখন সে নিজে ইচ্ছুক হলেও তার পক্ষে আল্লাহ্‌র আইনের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করা এবং রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কার্যাবলীতে শরীয়াতের অনুসরণ করা কার্যত তার পক্ষে সম্ভব হবে না। তখন সে নিজ ইচ্ছামত সবকিছু করতে শুরু করবে। তখন সে হয়ত নিজের মনমত কোন নীতি নির্ধারণ করে ইসলামী আইনের নাম দিয়ে তা-ই চালাতে থাকবে। এইরূপ অবস্থায় রাষ্ট্র ও মুসলিম জনগণ—উভয়ের মারাত্মক অবস্থা দেখা দেয়া অবধারিত।

৭. স্বাধীনতা

মুসলিম উম্মার নেতৃত্বে অবশ্যই এমন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যেতে পারে না, যার গ্রীবা দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দী। তাকে অবশ্যই মুক্ত ও স্বাধীন হতে হবে।

তাহলেই সে সকল মানুষকে দাসত্বের লাঞ্ছিত শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করতে সক্ষম হবে।

বর্তমান জগতে প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা মূলত স্বাধীন মানুষকে মানুষের দাসানুদাস বানাবারই ব্যবস্থা। এ পর্যায়ে পাশ্চাত্যের ধর্মহীন গণতন্ত্র আর কমিউনিজম-সমাজতন্ত্র অভিন্ন ভূমিকাই পালন করেছে। এসব রাষ্ট্র ব্যবস্থা দুনিয়ার যেখানে যেখানেই প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর—তা বৃটিশ বা আমেরিকান সমাজে হোক; কিংবা চীন ও রাশিয়া এবং সে সবের পক্ষপুটে আশ্রিত সমাজেই হোক; সর্বত্রই মানুষ মানুষের দাস। এসব দেশের শাসন ব্যবস্থা শুধু নিজ দেশের কোটি কোটি নিরীহ স্বাধীন মানুষকে দাসানুদাস বানিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, প্রতিবেশী স্বাধীন সমাজের মানুষের উপর এই দাসত্বের অভিশাপ চাপিয়ে দিতে একবিন্দু কুণ্ঠিত হয় না। সত্যি কথা হচ্ছে, এসব সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ও সমাজ মানবতার মুক্তির জন্য গালভরা বুলি যতই বলে ও প্রচার করে বেড়াক না কেন, শ্লোগানে ভুলিয়ে-ভালিয়ে স্বাধীন মানুষকে স্বৈর শাসনের জগদ্দল পাথরের তলায় ফেলে নির্মমভাবে নিষ্পেষিত করাই হচ্ছে এসব দেশ ও সমাজের বৈদেশিক নীতি। এ নীতি দুর্বল জাতিসমূহকে রাজনৈতিক দাসত্ব শৃঙ্খলেই বন্দী করে না, সেই সাথে—আর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিকভাবে তা সম্ভব না হলে—অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দী করে।

কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও মানবিক আদর্শসমূহের মধ্যে একমাত্র ইসলাম-ই বিশ্বমানবতার মুক্তিসনদ হয়ে এসেছে মহান আল্লাহ্‌র নিকট থেকে। ইসলামের মৌলিক ও প্রাথমিক ঘোষণাই হচ্ছে—মানুষ মুক্ত ও স্বাধীন, মানুষ তারই মত অন্য মানুষের—এই বিশ্ব প্রকৃতির কোন কিছুরই দাসত্ব মেনে নিতে পারে না। সব কিছুর সকল প্রকারের দাসত্বকে স্পষ্ট ও প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করে একমাত্র মহান বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবুল করবে, কেবলমাত্র তাঁরই ঐকান্তিক দাস ও গোলাম হয়ে জীবন-যাপন করবে। বস্তুত যে লোক তা করতে সক্ষম হবে তার পক্ষেই সম্ভব হবে অন্য সব কিছুর গোলামী থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করা। আর যে তা পারবে না, তাকে কত শক্তির দাসত্ব করতে হবে, তার কোন ইয়ত্তাই নেই। কুরআন মজীদে বিশ্বমানবতার জন্য এই মুক্তির বাণী উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। বলা হয়েছেঃ

يَآ اَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ
بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ (ال عمران: ٦٤)

হে কিতাবধারী লোকেরা! তোমরা সকলে এমন একটি মহাবাণী গ্রহণে এগিয়ে এসো, যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে অভিন্নভাবে সত্য ও গ্রহণীয়।

আর তা হচ্ছে, আমরা কেউ-ই এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোরই দাসত্ব স্বীকার করব না, তাঁর সাথে কোন কিছুকেই শরীক বানাব না এবং সেই আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আমরা পরস্পরকেও রব্ব্-প্রভু সার্বভৌম-সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী—মেনে নেব না।

ইসলাম বাহক বিশ্বনবী হযতর মুহাম্মাদ (স) দুনিয়ায় এসেছিলেন-ই বিশ্বমানবতাকে মানুষের দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে। হযরত আলী (রা)-র এ উক্তিটি এ পর্যায়ে স্মরণীয়ঃ

بَعَثَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةِ عِبَادِهِ اِلٰى عِبَادَتِهِ وَ مِنْ عُهُوْدِهِ عِبَادِهِ اِلٰى عِبَادِهِ وَ مِنْ طَاعَةِ عِبَادِهِ اِلٰى طَاعَتِهِ وَ مِنْ وِلَايَتِهِ عِبَادِهِ اِلٰى وِ لَايَتِهِ ـ

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে বলেছিলেন এ উদ্দেশ্যে যে, তিনি তাঁর বান্দাগণকে তাঁর বান্দাগণের ইবাদাত-দাসত্ব থেকে মুক্ত করে তাঁর (আল্লাহ্‌র) দাসত্ব করার দিকে নিয়ে আসবেন, তাঁর বান্দাগণের সাথে কৃত চুক্তি-প্রতিশ্রুতির বাধ্যবাধকতা থেকে তাঁর (আল্লাহ্‌র) চুক্তি পালনের দিকে এবং তাঁর বান্দাগণের আনুগত্য-অধীনতা থেকে মুক্ত করে তাঁর (আল্লাহ্‌র) আনুগত্য-অধীনতার দিকে নিয়ে আসবেন।

যাবতীয় অ-খোদা শক্তির দাসত্ব-আনুগত্যের বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য ইসলামের এ আহ্বান নির্বিশেষে সমস্ত বিশ্বমানবতার প্রতি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে এবং কেবলমাত্র ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্য সকলকে তাকীদ করা হয়েছে। মানবতাকে মানুষের দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার এ ব্যাপারটি কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি এ মহান উদ্দেশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা না করার জন্য কুরআন মুসলিম জন শক্তিকে তিরস্কার করেছে। প্রশ্ন তুলেছেঃ

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا (النساء: ٧٥)

তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করছ না কেন? অথচ অবস্থা হচ্ছে এই যে, পুরুষ-নারী-শিশু—এই দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা ফরিয়াদ করছে যে, হে আমাদের পরওয়ারদিগার, এই জালিমদের দেশ থেকে আমাদেরকে মুক্তি দাও।

অন্য কথায়, মজলুম মানবতার মুক্তির জন্য যুদ্ধ ঘোষণা আল্লাহ্‌র পথে কৃত যুদ্ধ এবং তা করা প্রত্যেক মুসলিম শক্তিরই কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন না করলে

আল্লাহ্র নিকট তিরস্কৃত হওয়া অবধারিত। এ আয়াতে মজলুম লোকদের মুক্তিদানের জন্য যুদ্ধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে এজন্য যে, তারা মানুষের দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দী। আর এজন্যই তারা মজলুম। জালিমরা এই দুর্বল লোকদেরকে দাসানুদাস বানিয়ে তাদের উপর নির্মমভাবে অত্যাচার ও জুলুম চালাচ্ছে।

মোটকথা, ইসলাম মানুষের দাসত্ব বরদাশ্‌ত্‌ করতে প্রস্তুত নয়। দুনিয়ার যেখানেই মানুষ মানুষের দাস হয়ে জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে, ইসলামী শক্তির কর্তব্য হচ্ছে, তাদের সার্বিক মুক্তির জন্য প্রয়োজন হলে সশস্ত্র যুদ্ধ করতে হবে। মানবতাকে যারা নিজেদের অধীন বানিয়ে নিতান্তই গোলামের ন্যায় জীবন যাপন করতে বাধ্য করছে, তারাই ইসলামের দুশমন। কেননা তারা স্বাধীনতার প্রতিপক্ষ। কাজেই তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করতে হবে যতক্ষণ না তারা অস্ত্র সংবরণ করছে, পরাজয় বরণ করছে এবং দাস মানুষদেরকে মুক্ত ও স্বাধীন করে দিচ্ছে।[১]

এ আলোচনা থেকে একথাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যে লোক দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দী—গোলাম, তার পক্ষে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। সে তো মজলুম, অসহায়। তার নিজের মুক্তি সাধনই তার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব।

৮. জন্মসূত্রে পবিত্রতা

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে অবশ্যই 'হালাল জাদাহ'—পবিত্রজাত হতে হবে। এরূপ শর্ত করার মূলে কতিপয় স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান হচ্ছে ব্যভিচারের পথ বন্ধ করা। কেননা অবৈধ জন্মের ব্যক্তি তার সন্তানদের চিরন্তন ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করবে—অন্তত নৈতিকতার দিক দিয়ে। ব্যভিচার প্রসূত ব্যক্তিদের যদি মুসলিম উম্মার উচ্চতর নেতৃত্বের আসনে আসীন হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়, তাহলে গোটা উম্মতের পক্ষেই লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের সম্মুখে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো সেই জনগোষ্ঠীর পক্ষ সম্ভব হবে না। বিশেষ করে সে জনগোষ্ঠী বিশ্ববাসীর সম্মুখে মুসলিম পরিচিতি লাভ থেকে অবশ্যই বঞ্চিত হবে। কেননা যে ইসলাম ব্যভিচারকে একটি অতি বড় (কবীরা) গুনাহ বলে দুনিয়াবাসীর নিকট ঘোষণা করছে এবং বিশ্ব জনগণকে তা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাচ্ছে, সেই ইসলামে বিশ্বাসী হওয়ার দাবিদার উম্মতের প্রধান ব্যক্তিই হচ্ছে ব্যভিচারের ফসল। আর সেই

১. পরাজিত শত্রুপক্ষের যেসব লোক যুদ্ধবন্দী হয়ে ইসলামী শক্তির হাতে আসবে, তাদের সম্পর্কে ইসলামের নীতি ভিন্নতর প্রসঙ্গে আলোচিতব্য।

জনগণ মুসলিম হয়েও সেই ব্যক্তির অধীনতা ও নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে, তারই নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। বস্তুত এর চাইতে লজ্জাকর ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না।

ব্যভিচারপ্রসূত ব্যক্তি হচ্ছে হারাম পথে যৌন উত্তেজনা চরিতার্থ করার জন্য নিষ্কাশিত শুক্রকীটের ফসল। এর মনস্তাত্ত্বিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া তার নিজের মনস্তত্ত্বে ও চরিত্রে প্রতিফলিত হওয়া খুবই সম্ভব। তার নিজের পক্ষেও যৌন উত্তেজনার বল্গাহারা অশ্বের দাপটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

ব্যভিচার প্রসূত ব্যক্তির পিতা-মাতা উভয়ই স্বাভাবিকতার আইন লঙ্ঘন করেছে, আল্লাহ্র সাথে কৃত চুক্তি বেপরোয়াভাবে ভঙ্গ করেছে। এর অনুভূতি তাদের মন-মানসিকতাকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে থাকতে পারে। তার তীব্র কুপ্রভাব শুক্রকীটের মাধ্যমে স্বভাবগত উত্তরাধিকার নিয়মে তার নিজের মধ্যেও সংক্রমিত হতে পারে। আর সেও জন্মগত দোষের কারণে আইন লঙ্ঘনকারী ও চুক্তি ভঙ্গকারী হয়ে গড়ে উঠে থাকতে পারে। পিতা-মাতার বা তাদের একজনের স্বাভাব প্রকৃতি ও চরিত্র সন্তানের মধ্যে সংক্রমিত হওয়া এমন এক বৈজ্ঞানিক সত্য, যা কেউ-ই অস্বীকার করতে পারে না। অতএব এইরূপ ব্যক্তির হাতে মুসলিম উম্মতের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের লাগাম কখনই সঁপে দেয়া যায় না।

মানবিক ও উন্নতমানের চরিত্র

এসব ব্যক্তিগত গুণ ছাড়াও ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে অবশ্যই উন্নত মানের মানবিক ও ইসলামী চারিত্রিক গুণে ভুষিত হতে হবে। কুরআন মজীদে এই গুণসমূহের সমন্বিত গুণ—তাকওয়ার—কথা বলা হয়েছেঃ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ (الحجرات: ١٣)

আল্লাহ্র নিকট তোমাদের মধ্য থেকে সর্বাধিক সম্মানিত(সম্মানার্হ) ব্যক্তি সে, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক তাকওয়া সম্পন্ন।

এছাড়া হাদীসের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তিকেই উচ্চতর পদের জন্য প্রার্থী হওয়া ও ক্ষমতা লাভের জন্য লোভ করা, লালায়িত হওয়া ও নিজস্বভাবে চেষ্টা চালানোও স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। কেননা তাতে ব্যক্তির কোন সদিচ্ছার পরিচয় পাওয়া যায় না, মনে হয়, সে উচ্চ পদ বা ক্ষমতা লাভ করে নিশ্চয়ই নিজস্ব কোন বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধার করতে বা কোন অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চায়। বিশেষ করে— পূর্বেই যেমন বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি—এই উচ্চতর পদ ও ক্ষমতা মূলত একটি আমানত। এ আমানত যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বসাধারণের প্রতি, তেমনি সর্বসাধারণ থেকে বিশেষ ব্যক্তির প্রতি। তাই যে-লোক নিজ থেকে তা পাওয়ার

জন্য উদ্যোগী ও সচেষ্ট হবে, সে নিজেকে ক্ষমতালোভী হিসেবে চিত্রিত করবে। আর ইসলামী সমাজে ক্ষমতা লোভীর কোন স্থান— কোন মর্যাদা থাকতে পারে না। বরং তা করে সে স্বীয় অযোগ্যতারই প্রমাণ উপস্থিত করে। তাই রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ

انا والله لا نولى هذا العمل احدا سأله اواحدا حرض عليه ـ

আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আমি এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে এমন কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করব না, যে তা পাওয়ার জন্য প্রার্থী হবে, অথবা এমন কাউকেও নয়, যে তা পাওয়ার জন্য লালায়িত হবে।

হাদীসটি হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবেই দেখতে পেয়েছিলেনঃ তাঁরই চাচার বংশের দুই ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাদের একজন বললঃ

يا رسول الله امرنا على بعض ما ولاك الله عزوجل ـ

হে রাসূল! আল্লাহ্ আপনাকে যে বিরাট কাজের দায়িত্বশীল বানিয়েছেন তার মধ্যের কোন কোন কাজে আমাদেরকে নিযুক্ত করুন।

অপরজনও অনুরূপ দাবি-ই পেশ করল। তখন নবী করীম (স) উভয়কে লক্ষ্য করেই উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি ঘোষণা করেছিলেন।

আবদুর রহমান ইবনে সামুরাতা বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها من غير مسئلة اعنت عليها وان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها ـ

হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরাতা! তুমি নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব পেতে চেও না। কেননা তা পেতে চাওয়া ছাড়াই যদি তোমাকে তা দেয়া হয়, তাহলে সে দায়িত্ব পালনে তোমাকে সাহায্য করা হবে। আর চাওয়ার পর যদি দেয়া হয়, তাহলে তোমাকে সেই কাজে অসহায় করে ছেড়ে দেয়া হবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেনঃ

انكم ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيمة ـ

তোমরা হয়ত দায়িত্ব-কতৃত্বশীল পদ পাওয়ার জন্য লালায়িত হবে। আর তা-ই কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য লজ্জার কারণ হয়ে দেখা দেবে।

যে-লোক বাস্তবিকই এই কঠিন দায়িত্ব পালনে অক্ষম, দুর্বল, তাকে তা গ্রহণ করতে নিষেধ করাই শ্রেয়। হযরত আবূ যর গিফারী(রা)-কে লক্ষ্য করে যখন তিনি বলেছিলেনঃ আমাকে কোন পদে নিযুক্ত করবেন না? রাসূলে করীম (স) এই কারণেই বলেছিলেন;

إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا إِمَامَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ خِزْىٌ وَّنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِىْ عَلَيْهِ فِيْهَا ـ

হে আবূ যর, তুমি দুর্বল ব্যক্তি, আর একাজ এক গুরুত্বপূর্ণ আমানত বিশেষ। এ কারণে তা তোমার জন্য কিয়ামতের দিন লজ্জা ও অপমান-লাঞ্ছনার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। অবশ্য যে তা গ্রহণ করে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে, তার জন্য তা হবে না।

একটি হাদীসে রাসূলে করীম (স)-এর উক্তিঃ

الامام الضعيف عن الحق ملعون (ابويعلى) .

যে রাষ্ট্রনেতা দুর্বল, দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে অক্ষম,সে যদি এতদসত্ত্বেও রাষ্ট্রনেতা হয়েই থাকে তবে সে অভিশপ্ত।

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের নির্বাচন, দায়িত্ব ও ক্ষমতা

[রাষ্ট্রপ্রধানকে নির্বাচিত হতে হবে—পদপ্রার্থী খিয়ানতকারী—মুসলিম জনগণ রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করবে—রাষ্ট্রপ্রধানের অভিষেক, ক্ষমতা-ইখতিয়ার ও অধিকার—ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য—রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য—রাষ্ট্রপ্রধানের অধিকার।]

রাষ্ট্রপ্রধানকে নির্বাচিত হতে হবে

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে অবশ্যই নির্বাচিত হতে হবে। কোন লোক নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান বানিয়ে নিলে বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার দাবি করলেই কেউ রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে না, তাকে রাষ্ট্রপ্রধান বলে মেনে নেয়া যেতে পারে না। মসজিদের নিযুক্ত ইমাম—যার প্রতি নামাযীগণ আস্থা রেখে তারই ইমামতিতে নিয়মিত নামায পড়ে আসছে—কে গায়ের জোরে সরিয়ে দিয়ে কেউ ইমাম হয়ে দাঁড়ালে তার এ ইমামত জায়েয নয়, জায়েয নয় তার ইমামতিতে নামায পড়া। ঠিক তেমনি জনমতের ভিত্তিতে ও সমর্থনে কর্মরত কোন রাষ্ট্রপ্রধানকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে বা জোরের বলে সরিয়ে দিয়ে কেউ যদি রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে বসে, তাহলে তার এই রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া যেমন সম্পূর্ণ হারাম, তাকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মেনে নেয়া ও তার শাসনকে সমর্থন জানানোও ঠিক তেমনই হারাম।

রাসূলে করীম (স)-এর পর চারজন খলীফা—খুলাফায়ে রাশেদুন—জনগণের মতের ও সমর্থনের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রপ্রধান—খলীফা—নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁদের একজনও এই পদের দাবিদার ছিলেন না, পদ পাওয়ার জন্য চেষ্টাকারী ছিলেন না, তার কামনা-বাসনাও তাঁদের মনে কখনও জাগেনি। সেই সময়ের ব্যবস্থাপনা ও যোগাযোগগত অবস্থার প্রেক্ষিতে যতটা সম্ভব ছিল জনগণের মত ও সমর্থন-ই ছিল খলীফা নির্বাচনের প্রধান উপায়।

পদপ্রার্থী খিয়ানতকারী

কেননা রাষ্ট্রপ্রধান সমগ্র জনগণের সামষ্টিক কাজের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল, জাতীয় ধন-সম্পদের উপর কর্তৃত্ব চালানোর অধিকারী। কোন লোককে এই পদে অধিষ্ঠিত হতে হলে তা শুধু তার পক্ষেই সম্ভব, যার প্রতি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আস্থা ও বিশ্বাস থাকবে। আসলে এটা শাসক ও শাসিত—আমানতদার ও

আমানত অর্পণকারীদের মধ্যকার একটি চুক্তির ব্যাপার। এ চুক্তি উভয় পক্ষের স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা, আগ্রহ ও বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সম্পাদিত হতে পারে। যার প্রতি পূর্বাহ্নে এই ইচ্ছা, আগ্রহ ও আস্থা পাওয়া যায়নি বা জানা যায়নি, আছে বলে প্রকাশ হয়নি, তার কোন অধিকার থাকতে পারে না একমাত্র নিজের ইচ্ছায় এই পদ দখল করে বসার। এ জন্যই রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ إِخْوَنَكُمْ عِنْدَنَا مَنْ طَلَبَهُ ـ

তোমাদের মধ্য থেকে যে লোক এই দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ পদ পাওয়ার জন্য নিজ থেকে আগ্রহী হবে—পেতে চাইবে, চেষ্টা করবে, সে আমাদের মতে তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে খিয়ানতকারী ব্যক্তি।

এর অর্থ, প্রথমত সে এই পদ চেয়েই খিয়ানতকারীর অপরাধে অপরাধী হয়েছে। আর দ্বিতীয়, সে যেভাবে স্ব-ইচ্ছায়-স্বচেষ্টায় এই পদ দখল করেছে, তাতে সে এই বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ আমানতের হক্ আদায় করতে, রাষ্ট্র পরিচালন ও জাতীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয়-ব্যবহারে জনগণের বিশ্বাস রক্ষা করতে সক্ষম হবে না। সে জাতীয় শক্তি ও সম্পদে বিশ্বাস ভঙ্গের কাজ করবেই। তার নিজস্বভাবে প্রার্থী হওয়াই তার অকাট্য প্রমাণ। স্পষ্ট মনে হচ্ছে, সে এ পদের কঠিন ও গুরুদায়িত্বের কথা অনুভবই করতে পারেনি। সে এটাকে নেহাত ছেলে-খেলা মনে করেছে। অতএব খলীফা-রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্তিতে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায়ই হতে হবে প্রধান অবলম্বন।

আর এই জনমতের ভিত্তিতে যখন একজন নির্বাচিত হচ্ছে, জনগণ তার নেতৃত্বাধীন প্রতিবাদহীন জীবন যাপন করছে, তখন জোরপূর্বক তাকে পদচ্যুত করে যে লোক ক্ষমতা কেড়ে নেয় একমাত্র নিজস্ব পরিকল্পনার ভিত্তিতে, ইসলামের দৃষ্টিতে সে ডাকাত, পরস্বাপহরণকারী, ছিনতাইকারী, ক্ষমতা লোভী, নিকৃষ্টতম ব্যক্তি। এরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতে মুসলিম জনগণের কর্তব্যের কথা রাসূলে করীম (স) বলেছেন এ ভাষায়ঃ

مَنْ اَتَاكُمْ وَاَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلٰى رَجُلٍ وَّاحِدٍ يُرِيدُ اَنْ يَّشُقَّ عَصَاكُمْ اَوْيُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ ـ

তোমরা যখন কোন ব্যক্তির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ, তখন যদি কেউ তোমাদের নিকট সেই নেতৃত্ব দখল করার উদ্দেশ্যে আসে এবং সে তোমাদের শক্তিকে প্রতিহত করতে চায় ও তোমাদের ঐক্যবদ্ধ সমাজকে ছিন্ন ভিন্ন করতে সচেষ্ট হয়, তাহলে তোমরা তাকে হত্যা কর।

মুসলিম জাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও জ্ঞানী (the greatest among the men of learning in the world of Islam) ইবনে সীনা (৯৮০-১০৩৭) লিখেছেনঃ

The legislature must then decree in his law that if someone seccedes and lays claim to the Caliphate by virtue of power or wealth. Then it becomes the duty of every citizen to fight and kill him. If the citizens are incapable of doing so.then they disobey God and commit an act of unbelief

(Ibn Sena, Healing Metaphysics in Learner and Mahdi op cit pp 104-105 and The political Economy of the Islamic State p-18-19)

বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান—মুসলিম উম্মতের সর্বোচ্চ নেতা হওয়ার যোগ্য কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি, যার মনোভাব হবে প্রথম নির্বাচিত খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (র)-এর মনোভাবের মত। রাসূলে করীম (স)-এর ইন্তেকালের পর তিনি খলীফা নির্বাচিত হয়ে যে ভাষণসমূহ দিয়েছিলেন, তন্মধ্যে একটি ভাষণে তিনি তা অকপটে ব্যক্ত করেছিলেন। বলেছিলেনঃ

يايها الناس ان كنتم ظننتم انى اخذت خلافتكم رغبة فيها اوارادة استئثارا عليكم وعلى المسلمين فلا والذى نفسى بيده ما اخذتها رغبة فيها ولا استئثارا عليكم ولا على احد من المسلمين ولا حرصت عليها يوما ولا ليلة قط ولا سالت الله سرا ولا علانية ولقد تقلدت امرا عظيما لا طاقة لى به الا ان يعين الله ولوددت انها الى اى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يعدل فيها فهى اليكم رد ولا بيعة لكم عندى فادفعوا لمن تحبونه فانما انا رجل منكم (الاسلام - سعيد حوى ج ٢، ص ١٢٩)

হে জনগণ! তোমরা যদি ধারণা করে থাক যে, আমি নিজ আগ্রহের ভিত্তিতে তোমাদের এই খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি, অথবা ইচ্ছা করে, নিজেকে তোমাদের ও অন্যান্য সব মুসলমানদের উপর প্রাধান্য প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, তাহলে মনে রাখবে, এ কথা কিছুমাত্র সত্য নয়। যাঁর হাতে আমার প্রাণ-জীবন, সেই আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আমি তা নিজ আগ্রহে গ্রহণ করিনি, নিজেকে তোমাদের বা কোন একজন মুসলমানের তুলনায় বড় মনে করে—বড় করে তোলার উদ্দেশ্যে তা গ্রহণ করিনি। আমি কখ্খনই তা পাওয়ার লোভ করিনি—না কোন দিনে, না রাতে। এজন্য আল্লাহ্‌র নিকটও কখনও প্রার্থনা করিনি, না গোপনে, না প্রকাশ্যে। আসলে একটা অনেক বড়

বোঝা বহনের জন্য আমাকে বাধ্য করা হচ্ছে। যা বহন করার কোন সাধ্যই আমার নেই। তবে একমাত্র ভরসা আল্লাহ যদি সাহায্য করেন। আমি বরং মনে মনে কামনা করছি, এ দায়িত্ব রাসূলে করীম (স)-এর অপর কোন সাহাবীর উপর অর্পিত হোক, তিনি এ কাজে ন্যায়পরতা অবলম্বন করবেন। তাহলে এই খিলাফত তোমাদের নিকটই ফেরত যাবে, তখন আমার হাতে করা এই বায়'আত তোমাদের উপর বাধ্যতাপূর্ণ থাকবে না। তোমরা তা তখন তোমাদের পছন্দ করা কোন লোকের উপর অর্পণ করবে। আর আমি তোমাদের মধ্যেরই একজন সাধারণ মানুষ হয়েই থাকব।

তিনি রাসূলে করীম (স)-এর মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেনঃ

هَلْ مِنْ كَارِهٍ فَاقِيلُهُ - ثَلاَثًا يَقُولُ ذٰلِكَ

তোমাদের মধ্যে আমার খিলাফত অপছন্দ করে এমন কেউ আছে কি? ....

থাকলে আমি তার সাথে কথা বলে তা দূর করতে চেষ্টা করব।

পর পর তিনবার এই কথাটি বললেন।

তখন হযরত আলী(রা)-ও দাঁড়িয়ে বললেনঃ

لاَ وَاللّٰهِ لاَنُقِيلُكَ وَلاَ نَسْتَقِيلُكَ مَنْ ذَالَّذِى يُؤَخِّرُكَ وَقَدْ قَدَّمَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الاسلام- سعيد حوى ج ٢ ص ١٢١)

না, আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আমরা আপনাকে এ দায়িত্ব থেকে সরে যেতে দেব না, কাউকে তা করতেও দেব না। স্বয়ং রাসূলে করীম (স)-ই আপনাকে অগ্রবর্তী করেছেন। আপনাকে পেছনে ফেলতে পারে এমন কে কোথায় আছে?

মুসলিম জনগণ রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচন করবে

বস্তুত এ-ই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগের মৌলিক দর্শন। মুসলিম জনগণই তাকে নিজেদের সন্তুষ্টি ও স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা-উদ্যোগের ভিত্তিতে নিয়োগ করবে। এ ছাড়া কারোর রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার বা নিয়োগের অপর কোন পন্থা থাকতে পারে না। এই পন্থা ছাড়া অপর কোন ভাবে—উপায়ে বা পন্থায় রাষ্ট্রপ্রধানের পদে আসীন হওয়ার কোন অধিকারই কারোর থাকতে পার না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিম উম্মতের কার্য সম্পাদনের স্থায়ী-নীতি হিসেবে ঘোষণা করেছেনঃ

وَأَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ (الشورى: ٣٨)

মুসলিম জনগণের সামষ্টিক ব্যাপারাদি পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতেই সম্পন্ন হয়ে থাকে।

আয়াতটির তাৎপর্য হচ্ছে, মুসলিম জনগণের জাতীয় ও সামষ্টিক কোন কাজ-ই কোন এক ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী সম্পন্ন হয় না। কোন এক ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা ও কল্পনার ভিত্তিতে কোন নীতি-আদর্শ, পন্থা বা দফা—যা-ই নির্ধারণ করুক, তা মুসলিম জনগণ মানতে বাধ্য নয়। কেননা তারা তো সেই লোক, যারা রাব্বুল আলামীনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁরই অধীনতা মেনে নিয়েছে। আর সেই আল্লাহরই অধীনতা -আনুগত্য স্বীকার করে তারা সালাত কায়েম করে (আয়াতটির প্রথম অংশ)। কাজেই আল্লাহ্ যেসব সামষ্টিক ব্যাপারে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কোন বিধান দেন নি, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার ও দায়িত্ব আল্লাহ্ নিজেই তাদের উপর অর্পণ করেছেন—সে সব ব্যাপারে মুসলিম জনগণ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, যাতে মুসলিম জনগণের সুচিন্তিত ও স্বতঃস্ফূর্ত মতের প্রতিফলন ঘটবে। আর তাদের রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগ যে তাদের সামষ্টিক কার্যাবলীর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, তাতে কারোরই একবিন্দু সন্দেহ থাকতে পারে না। অতএব সে কাজ জনমতের ভিত্তিতেই সুসম্পন্ন হতে হবে।

রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনে জনমতের অংশ গ্রহণ কুরআনী বিধান অনুযায়ী অপরিহার্য। স্বৈরতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক পার্থক্যের এ একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই কারণে নবী করীম (স) ঘোষণা করেছেনঃ

مَنْ بَايَعَ اَمِيْرًا عَنْ غَيْرِ مَشْوَرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَا بَيْعَةَ لَهُ وَلَا الَّذِى بَايَعَهُ

(مسند احمد)

মুসলিম জনগণের সাথে পরামর্শ না করে—তাদের মত জেনে না নিয়ে কেউ কাউকে নেতা হিসেবে বায়'আত করলে বা মেনে নিলে তা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

কিন্তু বাস্তবে তা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? ..... এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, একটি দেশের পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ-নারী—সকল নাগরিকই হবে ভোটদাতা। সারাটি দেশ হবে একটি মাত্র নির্বাচনী এলাকা (Constituency)। নির্দিষ্ট দিনে প্রত্যেক ভোটদাতা নিজ ইচ্ছা ও পছন্দমত কাজের গুরুত্ব ও দায়িত্বের বিরাটত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করার তীব্র অনুভূতি সহকারে—ভোট প্রদান করবে। কেউ প্রার্থী নেই, কোন ক্যানভাসার নেই। ভোটের জন্য কারোর

প্রলোভন বা ভয়-ভীতির সম্মুখীন হতে হবে না কোন ভোটদাতাকে! এর ফলে সারা দেশে যার পক্ষে সর্বাধিক ভোট পড়বে, সে-ই রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হলো বলে ঘোষিত হবে।

কোন দেশে বিশেষ অবস্থার কারণে এইরূপ হওয়া সম্ভব মনে না করা হলে প্রথমে জাতীয় সংসদের পার্লামেন্টের নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত করে তাদের ভোটে দুই বা ততোধিক নামের একটা প্যানেল তৈরী করা যেতে পারে এবং তারই মধ্য থেকে কোন একজনকে ভোট দেয়ার অবাধ সুযোগ সর্বসাধারণ ভোট দাতাদের দেয়া যেতে পারে। এ ভাবে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনেও জনমতের প্রতিফলন হবে বলে তাকে ইসলামসম্মত মনে করায় কোনই অসুবিধা থাকতে পারে না। বিশেষ করে যখন তা ইসলামের সুস্পষ্ট মানদন্ডের ভিত্তিতে এবং আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহির অনুভূতি সহকারে ইসলামের সীমার মধ্যে থেকে করা হবে।

রাষ্ট্রপ্রধানের অভিষেক, ক্ষমতা-ইখতিয়ার ও অধিকার

ইসলামে আনুগত্য স্বীকারের প্রতীক স্বরূপ হাতে হাত দিয়ে বায়'আত গ্রহণের রীতি প্রথম দিন থেকেই কার্যকর হয়ে এসেছে। স্বয়ং রাসূলে করীম (স)ই এই পদ্ধতি চালু করেছেন। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম বায়'আত অনুষ্ঠিত হয় মক্কায়। হিজরতের পূর্বে মদীনার কতিপয় আনসার দ্বীন-ইসলাম কবুল করলে এই বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়। তা 'বায়'আতে আকাবা' বা আকাবা'র বায়'আত নামে পরিচিত। মিনা অঞ্চলের একটি নির্জন পর্বত গুহায় গভীর রাতে একান্ত গোপনে এ কাজটি করা হয়। সে বায়'আত হয়েছিল আনন্দ-খুশী দুর্বলতা-অবসন্নতা অভাব-অনটন ও সচ্ছলতা-উভয় প্রকারের অবস্থায়ই রাসূলে করীমের আনুগত্য করার এবং দ্বীনের জন্য অর্থ ব্যয় করা, ভালো কাজের আদেশ করা ও মন্দ কাজ না করা—করতে নিষেধ করা এবং আল্লাহ্‌র—আল্লাহ্‌র দ্বীন রক্ষা ও প্রচার-প্রতিষ্ঠায় সকল প্রকারের ভয়-ভীতির উর্ধ্বে উঠে বুক উঁচু করে দাঁড়িয়ে যাওয়ার উপর। আনসারগণ প্রতিশ্রুতি দিয়ে এ দায়িত্বের বোঝা নিজেদের স্বন্ধে গ্রহণ করেছিলেন।

রাসূলে করীম (স.)-কে দ্বীন-প্রতিষ্ঠার কঠিন সংগ্রামে সাহায্য সহযোগিতা করা এবং নিজেদের ও আপন স্ত্রী-পরিজনের ন্যায় তাঁকেও রক্ষণাবেক্ষণ করার এ বায়'আত-ই ইসলামে রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের প্রথম ভিত্তি রচনা করেছিল। অতঃপর খুলাফায়ে রাশেদুনের ক্ষেত্রে এই বায়'আতকে পুরাপুরি ব্যবহার করা হয়েছে। এ বায়'আতের পরই রাষ্ট্রপ্রধান তার দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হয়েছে এবং জনগণের জন্য তাঁর আনুগত্য করা সর্বাধিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাষ্ট্রীয় আনুগত্য স্বীকারের জন্য হাতে হাত দিয়ে এই বায়'আত করা একটি সুন্নত হিসেবে গণ্য হলেও তা কোন্ চিরন্তন আদর্শ বা পদ্ধতি রূপে অনুসৃত হবে, শরীয়াতের দৃষ্টিতে তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আধুনিক কালে ব্যালটের মাধ্যমেও এ বায়'আতের কাজ সুসম্পন্ন হতে পারে এবং সর্বাধিক সংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত ব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত হতে পারে।

পূর্বে যেমন বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব দ্বিবিধঃ ইসলাম কায়েম ও কার্যকর করা এবং দ্বিতীয় সমস্ত রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ইসলামের আদর্শ ও রীতি-নীতি অনুযায়ী আঞ্জাম দেয়া। অবশ্য রাষ্ট্রপ্রধানকে শু'রার পরামর্শ গ্রহণ এবং মজলিসে শু'রার সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে থেকেই কাজ করতে হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ওহী গ্রহণকারী স্বয়ং নবী করীম (স)-কে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন।

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ (ال عمران: ٥٩)

এবং হে নবী! তুমি তাদের সঙ্গে (মুসলিম জনগণের সঙ্গে) যাবতীয় সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরামর্শ কর।

বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা একটি পরামর্শভিত্তিক বিধান। লোকদের সাথে পরামর্শ করে তারপরই রাষ্ট্রীয় কাজ আঞ্জাম দেয়া যেতে পারে। এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (স)-এর ঘোষণা অবশ্যই স্মরণীয়ঃ

وَاَمْرُكُمْ شُوْرٰى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ بَطْنِهٖ (ترمذى)

তোমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদি পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হলে তোমাদের জীবন মৃত্যুর তুলনায় শ্রেয়।

রাসূলে করীম (স)-এর প্রতি এই নির্দেশ যে আয়াতটিতে দেয়া হয়েছে, তার শুরুতে বলা হয়েছেঃ তুমি আল্লাহ্র রহমতে অত্যন্ত নরম দিল। তুমি যদি রূঢ়-কর্কশ পাষাণ-হৃদয় হতে তাহলে লোকেরা তোমার চারপাশ থেকে সরে যেত। অতএব তুমি তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন কর এবং তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা কর। অতঃপর বলা হয়েছেঃ আর জাতীয়-সামষ্টিক ব্যাপারাদিতে তাদের সাথে পরামর্শ কর। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—সমাজের লোকদের সাথে সামষ্টিকভাবে পরামর্শ করা ইসলামী সমাজের একটা বিশেষ বিশেষত্ব। এ বিশেষত্ব না থাকলে ইসলামী সমাজ হতে পারে না। অতএব ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানকে পরামর্শ করতে হবে, জনমত জানতে হবে এবং সম্মুখবর্তী সামষ্টিক ব্যাপারে জনগণ নির্বাচিত মজলিসে শু'রা যে বিষয়ে যে পরামর্শ দেবে, রাষ্ট্রপ্রধান তা অগ্রাহ্য করতে পারবে না।

এই পর্যায়ে দু'টি মত স্পষ্ট। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছেঃ

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔

তুমি যখন কোন কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করবে, তখন আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ নির্ভরতা গ্রহণ করে সে কাজটি করে ফেল।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই সংকল্প করা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ কি পরামর্শ গ্রহণ বা শু'রার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তিতে হবে কিংবা শু'রার সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে বা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করেই সিদ্ধান্ত বা সংকল্প গ্রহণের অধিকার রাষ্ট্র প্রধানের রয়েছে?

কিছু সংখ্যক মনীষীর মত—শু'রার সিদ্ধান্ত ছাড়াও রাষ্ট্রপ্রধানের নিজস্ব বিচার-বিবেচনা ও কল্যাণ চিন্তার ভিত্তিতে একান্ত নিজস্বভাবে সংকল্প ও পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধান শু'রার পরামর্শ বা সিদ্ধান্তের অধীন নয় এবং সে তা মেনে নিতে একান্তভাবে বাধ্যও নয়। এমন নয় যে, শু'রার সিদ্ধান্তের সামান্য বিরুদ্ধতা করারও তার ইখতিয়ার থাকবে না। সে পরামর্শ নেবে; কিন্তু প্রকৃত সিদ্ধান্ত ও সংকল্প গ্রহণের অধিকার রাষ্ট্রপ্রধানের এবং তার এটা কর্তব্যও।

কিন্তু এ মতের একটি মারাত্মক দিক হচ্ছে, এরূপ ইখতিয়ার ও অধিকার থাকলে রাষ্ট্রপ্রধানের স্বৈরতান্ত্রিক ভূমিকা অবলম্বন অনিবার্য পরিণতি কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র-দর্শনে এই ভূমিকা অবলম্বনের কোন অবকাশ নেই।

তাই অন্যান্য মনীষীদের মত হচ্ছে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও কার্যত পদক্ষেপ গ্রহণ রাষ্ট্রপ্রধানেরই কাজ এবং দায়িত্ব। তবে তাকে তা করতে হবে মজলিসে শু'রার পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে, তা বাদ দিয়ে বা এড়িয়ে গিয়ে নয়।

(فتح القدير للشوكانى)

ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব, কর্তব্য

ইসলামী রাষ্ট্র রাষ্ট্রের সমস্ত জনগণের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করে। জনগণের বৈষয়িক জীবনকে সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার এবং তাদের পরকালীন জীবনে মুক্তি ও সাফল্যের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব হিসেবে দু'টি কথার উল্লেখ করেছেন। একটি হচ্ছে, দ্বীন-ইসলামকে পূর্ণরূপে কার্যকর ও সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা। ইসলামের আইন বিধান যথাযথভাবে কার্যকর করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, ইসলামের রীতি-নীতি অনুযায়ী গোটা রাষ্ট্রকে পরিচালিত করা। এক কথায় বলা যায় দ্বীন-ইসলামকে বাস্তবায়িত করাই রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ কারণে ফিকাহ্‌বিদগণ ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন এই ভাষায়ঃ

اِنَّهَا رِيَاسَةٌ عَامَّةٌ فِى اُمُورِ الدِّيْنِ وَالدُّنيَا نِيَابَةً عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ইসলামী রাষ্ট্র হচ্ছে দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় ব্যাপারের দিকে সাধারণ নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব।

আর রাষ্ট্রপ্রধানের পরিচিতিস্বরূপ বলা হয়েছেঃ

اَنَّهَا خِلاَفَةُ الرَّسُوْلِ فِىْ اِقَامَةِ الدِّيْنِ وَحِفْظِ حَوْزَةِ الْمِلَّةِ بِحَيْثُ يَجِبُ اِتِّبَاعُهُ عَلٰى كَافَّةِ الاُمَّةِ (المواقف ص٢٠٣، المسامره ج ٢ ص ١٤١)

দ্বীন কায়েম করা ও মুসলিম মিল্লাতের আদর্শ ও মান রক্ষা করার কাজে রাসূলের প্রতিনিধিত্ব করা—এ কারণেই তার অনুসরণ করা সমগ্র উম্মতের কর্তব্য

আল্লামা মাওয়ার্দী ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

اِنَّهَا مَوضُوعَةٌ لِخِلاَفَةِ النُّبوَّةِ فِىْ حِرَاسَةِ الدِّيْنِ وَسِيَاسَةِ الدُّنيَا

(الاحكام السلطانيه ص ٣)

দ্বীনের পাহারাদারী, সংরক্ষণ ও দুনিয়ার সুষ্ঠু পরিচালনে নবুয়্যাতের প্রতিনিধিত্ব করার উদ্দেশ্যেই তা প্রতিষ্ঠিত।

আর আল্লামা ইবনে খালদূন সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

اِنَّهَا حَمْلُ الْكَافَّةِ عَلٰى مُقْتَضَى النَّظْرِ الشَّرْعِيِّ فِىْ مَصَالِحِهِمُ الاُخْرَوِيَّةِ وَالدُّنيَوِيَّةِ الرَّاجِعَةِ اِلَيْهَا اِذْ اَحْوَالُ الدُّنيَا تَرْجِعُ كُلُّهَا عِنْدَ الشَّارِعِ اِلٰى اِعْتِبَارِهَا بِمَصَالِحِ الاٰخِرَةِ فَهِىَ فِى الْحَقِيْقَةِ خِلاَفَةٌ عَنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ فِىْ حِرَاسَةِ الدِّيْنِ وَسِيَاسَةِ الدُّنيَا بِه (مقدمه ابن خلدون ص ١٨٠)

জনগণের পরকালীন ও বৈষয়িক কল্যাণ—যার পরিণতি সেই পরকাল—শরীয়াতের দাবি অনুযায়ী—সাধনের সর্বাত্মক দায়িত্ব গ্রহণ। কেননা শরীয়াত দাতার দৃষ্টিতে দুনিয়ার সমস্ত অবস্থা প্রকৃত পক্ষেই পরকালের কল্যাণের দৃষ্টিতে সম্পন্ন হতে হবে। তাই তা হচ্ছে দ্বীনের সংরক্ষণ ও দ্বীনের সাহায্যে বিশ্বব্যবস্থা সংগঠন ও পরিচালনে শরীয়াতদাতার প্রতিনিধিত্ব।

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য যেমন বিরাট তেমনি মহান। তাই দুইটি কারণে রাষ্ট্রপ্রধান তার এই পদের অযোগ্য প্রমাণিত হয়।

একটি তার ব্যক্তিগত সততা-বিশ্বস্ততা ক্ষুন্ন হওয়া। আর দ্বিতীয়টি, তার দৈহিক বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগত ত্রুটি ও অক্ষমতা।

ব্যক্তিগত সততা ও বিশ্বস্ততা ক্ষুন্ন হওয়ার অর্থ রাষ্ট্রপ্রধানের 'ফাসিক'—শরীয়াতের সীমালংঘনকারী প্রমাণিত হওয়া। এর দু'টি দিক। একটি লালসা-কামনা চরিতার্থ করা। আর দ্বিতীয়টির সম্পর্ক তার ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয়ের উদ্রেক।

প্রথমটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গজনিত ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট। আর তা হচ্ছে তার কোন হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া, শরীয়াতে ঘৃণিত-নিষিদ্ধ কাজে জড়িত হয়ে পড়া। যৌন-লালসার দ্বারা চালিত হয়ে কোন জঘন্য কাজ করা। যেমন যিনা-ব্যভিচার, মদ্যপান, সীমাতিরিক্ত ক্রোধ। এ চরিত্রগত দোষ থাকলে তার পক্ষে ইসলামী রাষ্টের রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত হওয়ার পর এই ধরনের অপরাধ করলে সে যেমন নিজেকে উক্ত পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য প্রমাণ করে, তেমনি সেই উচ্চতর পদটিরও করে চরম অপমান।

দ্বিতীয় প্রকারের সীমালংঘনমূলক কাজের সম্পর্ক আকীদা-বিশ্বাসের সাথে। আকীদা-বিশ্বাসে 'ফিস্‌ক' দেখা দিলে তা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা শরীয়াত লংঘনের মতই অপরাধ। অতঃপর সে রাষ্ট্রপ্রধান পদে নিযুক্ত থাকার অধিকার হারিয়ে ফেলে। কেননা আকীদায় 'ফিস্‌ক' দেখা দিলে তা কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া অসম্ভব নয়।

এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি হচ্ছে হযরত উবাদাতা ইবনুস্‌ সামিত (রা) বর্ণিত একটি হাদীস। তিনি বলেছেনঃ

بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِىْ مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَاَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَاَنْ لَّاَنُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهٗ اِلَّا اَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَّاحًا عِنْدَكُمْ فِيْهِ مِنَ اللّٰهِ بُرْهَانٌ (الاسلام- سعيد حوى ج ٢ ص ١٥٣)

আমরা রাসূলে করীম (স)-এর নিকট বায়'আত করেছি, আমাদের আনন্দ অসন্তুষ্টি, কঠিনতা বিপদ ও সুবিধা ও আমাদের স্বার্থ—সর্বাবস্থায়ই আমরা শুনব ও মানব—অনুগত থাকব। আর দায়িত্বশীলের সাথে কোন ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ করব না। তবে এমন কুফরি যদি দেখতে পাই যা স্পষ্ট ও প্রকাশ্য—সর্বজনবিদিত এবং যা'র কুফর হওয়ার অকাট্য দলীল আল্লাহ্‌র নিকট থেকে থাকবে, তাহলে শুনা ও মানা—আনুগত্যের উক্ত শপথ কার্যকর নয়।

রাষ্ট্রপ্রধানের এ রূপ চারিত্রিক পতনের দরুন তাকে পদচ্যুত করা কিংবা তার আনুগত্য করতে অস্বীকার করার অধিকার মুসলিম জনগণের সংরক্ষিত বলে বহু ফিকহ্‌বিদ মত প্রকাশ করেছেন।

দৈহিক আঙ্গিক ত্রুটি ও অক্ষমতা পর্যায়ে ইন্দ্রিয়নিচয়ের অক্ষমতাও গণ্য। দায়িত্ব পালনে আঙ্গিক অসামর্থ্য বা পংগুত্ব এ পদের পথে মারাত্মক ধরনের বাধা। (ঐ)

রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলামী ফিকহ্‌বিদ মনীষীদের ব্যাখ্যানুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপঃ

১. দ্বীন-ইসলাম সংরক্ষণ মুসলিম উম্মতের আদর্শ ও ঐতিহ্য অনুযায়ী, সময়োপযোগী ব্যাখ্যা সহকারে;

২. বিবদমান পক্ষসমূহের উপর আল্লাহ্‌র আইন কার্যকরকরণ, ঝগড়া বিবাদ ইসলামী আইন অনুযায়ী মীমাংসা করার ব্যবস্থাকরণ;

৩. প্রত্যেকটি নাগরিকের বৈধ দখলী স্বত্ব জবরদখল বা বেআইনী দখল থেকে রক্ষা করা, উদ্ধার করা, যেন প্রত্যেকে নিজ দখলের উপর স্বীয় কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারে, তারা কোন বেআইনী বাধা-প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হয় ও নিশ্চিন্ত নিরাপত্তাপূর্ণ জীবন যাপন সকলের পক্ষেই সম্ভব হয়। এক কথায় শান্তি-শৃঙ্খলা (Law and order) স্থাপন ও সংরক্ষণ;

৪. শরীয়াত ঘোষিত 'হদ্দ' ও 'কিসাস' কার্যকরকরণের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করা, যেন আল্লাহ্‌র হারাম ঘোষিত কোন কাজ হতে না পারে, সকলের অধিকার সকল প্রকারের আঘাত ও লুটতরাজ থেকে পূর্ণরূপে রক্ষা পেতে পারে। কোন লোকই স্বীয় ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়। (দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন—দুর্বলকে শক্তিশালী করা ও সবলদেরে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করা—সকল নাগরিককে সমান মর্যাদা ও অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করাও এর মধ্যে গণ্য);

৫. সকল প্রকার বহিরাক্রমণ থেকে দেশের প্রতিটি ইঞ্চি পরিমাণ স্থানও রক্ষা করা। সে জন্য প্রবল প্রতিরোধে শক্তি গড়ে তোলা যেন কোন শক্তিই— সে যত বড় শক্তিশালী এবং সৈন্যবল ও অস্ত্রবলে যত বলীয়ানই হোক—দেশের প্রতি চোখ তুলে তাকাবারও সাহস না পায়। এক কথায় বৈদেশিক আক্রমণের থেকে দেশকে ও দেশের জনগণ ও তাদের মাল-সম্পদ, জান-প্রাণ ও মান-ইযযত রক্ষা করা এবং এজন্য প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন ও সামর্থ্য সংগ্রহ করা;

৬. ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা। অবশ্য প্রথমে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দান ও জিযিয়ার বিনিময়ে বশ্যতা স্বীকারের প্রস্তাব পেশের পর সবশেষ উপায় হিসেবে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ইসলামী শরীয়াতের এটাই স্থায়ী বিধান;

৭. কর, খাজনা ও অন্যান্য সরকারী পাওনা সঠিকরূপে আদায় করার ব্যবস্থা করা। তা শরীয়াতের স্থায়ী নীতি অনুযায়ী হতে হবে এবং এ ব্যাপারে কোনরূপ নির্দয়তার প্রশ্রয় দেয়া চলবে না;

৮. বায়তুলমাল সংরক্ষণ। তা থেকে যাকে যা দেয়ার তার পরিমাণ নির্ধারণ ও যথাযথ দিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা, তাতে বাড়াবাড়ি না করা, অপচয় না করা, আর পাওনা পরিমাণেও হ্রাস-বৃদ্ধি না করা, যথাসময়ে দিয়ে দেয়া—বিলম্ব না করা;

৯. দায়িত্বশীল কর্মচারী নিয়োগ করা, তাদের কাজের সুযোগ করে দেয়া, তাদের নিকট থেকে কাজ বুঝে নেয়া—তাদের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করা;

১০. সমস্ত জাতীয় ও সামষ্টিক ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হওয়া, পরিস্থিতি অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ ও তদানুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ, যেমন সার্বিকভাবে গোটা উম্মত রক্ষা পায় এবং মিল্লাত সংরক্ষিত থাকে।

আল্লামা আল-গার্‌রা তাঁর 'আল-আহকামুস্ সুলতানীয়া' গ্রন্থের ১১ পৃষ্ঠায় এবং আল্লামা মাওয়ার্দী তাঁর 'আল-আহকামুস্-সুলতানীয়া' গ্রন্থের ১৫ পৃষ্ঠায় এই কথাগুলি উদ্ধৃত করেছেন। আমি মনে করি, মনীষীগণ এর কোন একটি কথাও কল্পনা করে লিখেন নি; বরং কুরআন মজীদের আয়াত থেকেই তা নিঃসৃত। এ পর্যায়ের দু'টি আয়াত আমি এখানে উদ্ধৃত করছিঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ـ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ـ يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا (النور: ٥٥)

তোমাদের মধ্য থেকে যারাই ঈমান আনবে ও ঈমান অনুযায়ী নেক আমল করবে, তাদের জন্য আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে, তাদেরকে তিনি পৃথিবীতে খলীফা—রাষ্ট্র পরিচালক—বানাবেন যেমন করে তাদের পূর্ববর্তীদের তিনি খলীফা বানিয়েছিলেন এবং যেন তাদের জন্য তাঁর পছন্দ করা দ্বীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাদের ভয়-ভীতি-আশঙ্কার পর পূর্ণ নির্ভীকতা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারেন। এই লোকেরা কেবলমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করবে, তাঁর সাথে একবিন্দু জিনিসকেও শরীক করবে না।

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র খিলাফত—ইসলামী রাষ্ট্রের মৌল উদ্দেশ্যই হচ্ছে দ্বীন ইসলামকে সুদৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা, দ্বীনকে পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়িত করা, দ্বীনের মান-মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং সেখানকার জনগণের জীবনকে সকল প্রকারের ভয়-ভীতি ও বিপদ আশঙ্কা থেকে সম্পূর্ণরূপে

মুক্ত করে স্বাধীন নির্বিঘ্ন জীবন যাপনের নির্ভরযোগ্য সুযোগ করে দেয়া। বস্তুত দুনিয়ার প্রত্যেক দেশের আপামর জনগণের তা-ই তো কাম্য এবং তা সবকিছুই পূর্ণ মাত্রায় বাস্তবায়িত হতে পারে কেবলমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। আর এ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানই এইসব কাজ করার জন্য প্রধান দায়িত্বশীল।

আর দ্বিতীয় আয়াতঃ

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ـ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ (انفال: ٦٠)

এবং তোমরা শত্রুপক্ষের মুকাবিলা করার লক্ষ্যে যথাসাধ্য শক্তি ও যানবাহন সংগ্রহ ও প্রস্তুত কর। তদ্দ্বারা তোমরা আল্লাহ্‌র দুশমনদের ভীত-সন্ত্রস্ত করবে—তোমাদের নিজেদের শত্রুদেরও। এদের ছাড়া আরও অনেক শত্রু আছে যাদের তোমরা জান না, আল্লাহ্ তাদের জানেন।

উভয় আয়াতে বলা কথা ও কাজ যদিও সামষ্টিকভাবে মুসলিম উম্মতের জন্য, কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধানই যেহেতু মুসলিম উম্মতের প্রতিনিধি, সকলের পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল, তাই রাষ্ট্রপ্রধানকেই এ কাজসমূহ করতে হবে।

কুরআনের ঘোষণা হলো

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ (البقره: ١٩٤)

রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

انما جعل الراعى عضداللضعفاء وحجاز للاقوياء ليدفعو القوى عن الظلم ويعينوا الضعيف على الحق كتاب النبى صلعم الى الولاة ـ

(منهاج الصالحين: ٧٢١)

'ইমাম' রাষ্ট্রপ্রধান সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ ....(مسلم)

রাষ্ট্রপ্রধান মিথ্যাবাদী বা কাফির হলে তার আনুগত্য করা যাবে না।

কুরআনের নির্দেশঃ

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (القلم: ٨-٩)

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ـ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (الاحزاب)

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا....... وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (الكهف: ٢٨)

রাষ্ট্রপ্রধানের অধিকার

রাষ্ট্রপ্রধান তার উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালন করলে তার দুইটি প্রধান অধিকার অবশ্য স্বীকৃতব্য হয়ে পড়েঃ একটি, জনগণের উপর তার অধিকার এবং দ্বিতীয়টি, জনগণের ধন-মালে তার অধিকার। বলা বাহুল্য, এ অধিকার ব্যক্তিগতভাবে নয়, কেবলমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বসমূহ পালনার্থে।

১. জনগণের উপর রাষ্ট্রপ্রধানের অধিকার হচ্ছে, জনগণ তাকে মান্য করবে, তার আনুগত্য স্বীকার করবে। এ অধিকার নিশ্চয়ই নিরংকুশ ও শর্তহীন নয়। এ অধিকার তার নিজের আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের আইন-বিধানের সীমার মধ্যে থেকে তাকে মেনে চলতে জনগণকে বলার মধ্যে সীমিত। এর বাইরে কারোরই কোন আনুগত্য থাকতে পারে না।

২. রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার গৃহীত নীতি বা সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বিরোধ হওয়া সম্ভব। জনগণ তার সাথে মতবিরোধ করতে পারে, করার অধিকার স্বয়ং আল্লাহ্ই তাদেরকে দিয়েছেন। এ অধিকার হরণ করে নেয়ার কোন অধিকার রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার—কারোরই নেই এবং মতবিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা হতে রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের ইচ্ছানুযায়ী নয়, বরং তা হবে আল্লাহ্ ও রাসূল অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাতের ভিত্তিতে, যা মেনে নিতে উভয় পক্ষ সমানভাবে বাধ্য। রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের আনুগত্যের সীমা রাসূলে করীম (স) নির্ধারিত করে দিয়েছেন। বলেছেনঃ

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে কারোরই আনুগত্য করা যায় না। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোর আনুগত্য করা যেতে পারে ততক্ষণ এবং সেসব কাজে, যতক্ষণ এবং যেসব কাজে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী হবে না।

ইসলামী হুকুমাতের বিভিন্ন বিভাগ

[তিনটি বিভাগ—আইন প্রণয়ন বিভাগ—মজলিসে শু'রা—শু'রা সদস্যদের যোগ্যতার মান—নির্বাহী বিভাগ—নির্বাহী সরকারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব—আমর বিল মা'রুফ ও নিহী আনিল মুনকার নির্বাহী সংস্থারই দায়িত্ব—সরকার সংস্থার দায়িত্ব—রাসূলে করীম (স)-এর যুগের প্রশাসনিক দায়িত্বশীলদের প্রশিক্ষণ—প্রশাসনিক দায়িত্বে নিযুক্ত লোকদের জরুরী গুণাবলী—বিচার বিভাগ—জনগণের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টির কারণ—বিচার বিভাগের লক্ষ্য অর্জনের পন্থা—বিচারকের যোগ্যতা-কর্মক্ষমতা ও বিচার কার্যের উপযুক্ততা—অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বিচারকের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা—বিচার-নীতির পূর্ণ সংরক্ষণ—সাক্ষ্যদান।]

তিনটি বিভাগ

দুনিয়ার সাধারণ সরকারসমূহের ন্যায় ইসলামী হুকুমতেরও তিনটি প্রধান বিভাগ রয়েছে। এই তিনটি বিভাগের ভারসাম্যপূর্ণ সক্রিয়তা ও সমন্বয়ের মাধ্যমেই গড়ে উঠে একটি পূর্ণাঙ্গ সরকার ব্যবস্থা।

এ তিনটি বিভাগেরই প্রত্যেকটির একটি নিজস্ব দায়দায়িত্ব, ক্ষমতা ও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

সাধারণত দাবি করা হয়, একটি সরকার ব্যবস্থা এরূপ তিনটি ভাগে বিভক্ত করার কাজটি আধুনিক পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উদ্ভাবন ও অবদান। কিন্তু ঐতিহাসিক ও বাস্তবতার বিচারে এ দাবি সম্পূর্ণ মূল্যহীন। কেননা আধুনিক পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান বড়জোর বিগত শতাব্দীর ব্যাপার। কিন্তু দেড় হাজার বছর পূর্বে ইসলাম ইসলামী হুকুমতের সেই প্রথম প্রতিষ্ঠালগ্নেই রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীকে এই তিনটি বিভাগে বিভক্ত করেছে। কুরআন মজীদ ও রাসূলের সুন্নাতেই এ বিভক্তি স্পষ্টভাবে বিধৃত।

আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ যে সব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে, দেড় হাজার বছর পূর্বে প্রথম প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রও প্রায় সেই সব দায়িত্বই পালন করেছে। অবশ্য বলা যেতে পারে, তার প্রেক্ষিত ভিন্নতর ছিল এবং তার আয়তনও ছিল সীমিত। রাষ্ট্রসমূহকে নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য দায়িত্ব ও জবাবদিহির বিভক্তি যেমন অপরিহার্য, তেমনি তার কার্যকরতার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য।

প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে এই বিভক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখেই কাজ করতে হয়েছে তার সমগ্র রাষ্ট্রীয় জীবনে।

যদিও তার স্বতন্ত্র নামকরণ করা হয়নি এবং সেজন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রাসাদে ভিন্ন ভিন্ন দপ্তরও খোলা হয়নি।

ইসলামী রাষ্ট্রকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে দায়িত্ব পালনের জন্য কার্যাবলীকে অবশ্যই নিম্নলিখিত তিনটি ভাগে ভাগ করে নিতে হবেঃ

১. আইন বিভাগ
২. নির্বাহী বিভাগ এবং
৩. বিচার বিভাগ

অতঃপর এর প্রত্যেকটি বিভাগ পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা যাচ্ছে।

আইন-প্রণয়ন বিভাগ

পূর্বেই চূড়ান্তভাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, ইসলামে আইনদাতা (Law-giver) হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। সে আইন তাঁরই মনোনীত প্রতিনিধি রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি ওহীর মাধ্যমে নাযিল হয়েছে। তিনি যে আইন নিজে পালন করেছেন, জনগণকে শুনিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন ও প্রচার করেছেন, প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আল্লাহ্র নির্দেশ, অনুমতি ও শিক্ষানুযায়ী উপবিধি (By-laws) তৈয়ার করেছেন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে তা কার্যকর করেছেন, জনগণের উপর জারি করেছেন। কাজেই ইসলামে আইন প্রণয়নের (Legislation) কোন ধারণা নেই। রাসূলে করীম (স)-এর যুগে বা তারপরে খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলেও তা ছিল না। আজকের দিনেও তার কোন অবকাশ নেই। যার প্রয়োজন আছে, তা হচ্ছে, আল্লাহ্র দেয়া আইন-আদেশকে রাসূলে করীম (স) প্রদত্ত ব্যাখ্যা এবং খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলে তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সূক্ষ্ম অধ্যয়ন, অনুধাবন, অনুসরণ ও কার্যকরণ— সমসাময়িক সমাজ পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে।

পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আল্লাহ্ বা রাসূলের কোন অস্তিত্ব বা কার্যকরতা স্বীকৃত নয়। তাতে মানুষই মানুষের জন্য আইন রচনা করে। তথায় আইন রচনার জন্য যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়, তা পার্লামেন্ট (Parliament) নামে পরিচিত। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আল্লাহ্র দেয়া আইন পর্যায়ে মানুষের যতটুকু এবং যা কিছু করণীয়, তা করবার জন্য একটি সংস্থা অবশ্যই গঠিত হবে। ইসলামী পরিভাষা হিসেবে কাজের প্রকৃতির দৃষ্টিতে তার নাম 'মজলিসে শু'রা' হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

কেননা ইসলামী রাষ্ট্রে মৌলিকভাবে কোন আইন প্রণয়নের কাজ নেই। আছে রাসূলে করীম (স)-এর সুন্নাতের আলোকে আল্লাহ্র আইনসমূহকে সন্ধান করা,

ধারাবদ্ধ (Codify বা Codification) করা এবং আইন কার্যককরণের পদ্ধতি ও প্রেক্ষিত রচনা করা। বলা যায়, ইসলামী আইনের কার্যকর হওয়ার চারটি পর্যায়ঃ

১. আইন রচনা—আল্লাহ্‌র কাজ;
২. আইন সন্ধান, ধারাবদ্ধকরণ ও প্রেক্ষিত নির্ধারণ—মজলিসে শু'রার কাজ;
৩. আইন কার্যকরকরণ (নির্বাহী পর্যায়ের আইন)—নির্বাহী কর্মকর্তার; এবং
৪. আইনের ভিত্তিতে পারস্পরিক নিষ্পত্তি ও অপরাধীকে দণ্ডদান—বিচার বিভাগের কাজ।

কুরআন মজীদের আয়াত ও রাসূলে করীম (স)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ পর্যায়ে আমাদের আলোচ্য মজলিসে শু'রা।

মজলিসে শু'রা

কুরআনের ঘোষণানুযায়ী সমগ্র জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে পরামর্শ দেয়ার, রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের সমস্ত দায়িত্ব মসলিশে শু'রাকেই বহন করতে হবে। অতএব রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন ও নিয়োগের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে 'মজলিশে শু'রা' গঠন। আর এই মজলিস যে মুসলিম জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ভোট দানের মাধ্যমেই গঠন করতে হবে—মজলিসে শু'রা গঠনের অপেক্ষা উত্তম পন্থা আর কিছু হতে পারে না—তা অনস্বীকার্য। যদিও শু'রার সদস্য নির্বাচিত হওয়ার এবং জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরামর্শদানের দায়িত্ব ও অধিকার দেশের প্রত্যেকটি বয়স্ক নাগরিকেরই। কিন্তু সকলে একত্রিত হয়েই তো আর শু'রার দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। তাই সকলের স্বাধীন-স্বতঃস্ফূর্ত ভোট দানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য সারা দেশ থেকে নির্বাচিত করতে হবে। আর তা করা হলেই আইন নির্ধারণ ও ধারাবদ্ধকরণে জনমতের প্রতিফলন সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর হবে। জনগণ যেহেতু স্বাধীন ও স্বেচ্ছামূলক অধিকারের ভিত্তিতে ইসলামী আদর্শে উত্তীর্ণ ব্যক্তিকেই সর্বাধিক সংখ্যক ভোট দিয়ে মসলিসে শু'রার সদস্য নির্বাচন করবে তাই আশা করা যায় যে, একদিকে নির্বাচিত সদস্যরা মসলিসে জনমতেরই প্রকাশ ঘটাবে এবং অপরদিকে নির্বাচকমণ্ডলী তাদের নির্বাচিত শু'রা সদস্যের মতামতের সাথে একাত্ম থাকবে। উপরন্তু তারা নিজেরা যদি কোন বিশেষ বিষয় শু'রার আলোচ্য সূচীর অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজনীয় মনে করে, তাহলে তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে তা খুব সহজেই করতে পারবে।

শু'রা সদস্যদের যোগ্যতার মান

অবশ্য ইসলাম শু'রা সদস্য হওয়ার যোগ্যতার একটা মান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে এবং শু'রা সদস্যদের নির্বাচকমণ্ডলীকে নির্বাচনকালে সেই মানকে রক্ষা

করেই তাদের ভোট প্রয়োগ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, আঞ্চলিকতা বা অন্য কোন বস্তুগত বা বৈষয়িক দিককে কোন রূপ গুরুত্ব দেয়া মজলিসে শু'রা গঠনের মহান উদ্দেশ্য ক্ষুণ্ন ও বিনষ্ট করারই শামিল।

শু'রা সদস্য নির্বাচনে ইসলামের ঈমানী ও নৈতিক মান ছাড়াও জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নের দিকটিকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। এ ব্যাপারে কোনরূপ উপেক্ষা প্রদর্শন জাতীয় লক্ষ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

কুরআনের আলোকে মজলিসে শু'রার সদস্যদের অবশ্যই ইসলামী জীবন বিধান ও আইন-কানুন সম্পর্কে পূর্ণ অবিহিত হতে হবে। জনগণের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠাবান কল্যাণকামী হতে হবে। বিশ্বস্ত, আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহির তীব্র অনুভূতি সম্পন্ন, আমানতদার ও দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে। অন্যথায় তাদের দ্বারা জাতীয় আদর্শ যেমন ব্যাহত হবে, তেমনি ক্ষুণ্ন হবে সার্বিক কল্যাণ এবং সারা দেশে ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার এবং জাতি ও রাষ্ট্রের কঠিন বিপদে পড়ে যাওয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।

কুরআনের দৃষ্টিতে বেতন বা মজুরীর বিনিময়ে শ্রমিক বা কর্মচারীকে কাজে লাগাতে গেলে সেই মজুরী কর্মচারীকেও শক্তি ও কর্মক্ষমতা সম্পন্ন এবং সর্বোপরি বিশ্বস্ত হওয়া কুরআনের দৃষ্টিতে কাম্য। তাই কুরআনে বলা হয়েছেঃ

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (القصص: ٢٦)

তুমি যাকে কোন কাজে মজুরীর বিনিময়ে নিযুক্ত করবে, তার শক্তিশালী ও যোগ্যতা সম্পন্ন এবং অতীব বিশ্বস্ত আমানতদার হওয়াই সর্বোত্তম।

কাজেই রাষ্ট্রপ্রধানের ন্যায় মজলিসে শু'রার সদস্যেরও অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন ও বিশ্বস্ত হওয়াই ইসলামের দৃষ্টিতে কাম্য।

সবচেয়ে বড় কথা, মজলিসে শু'রার উপর অর্পিত দায়িত্ব হচ্ছে, কুরআন ও সুন্নাহ্র ভিত্তিতে ইসলামী আইন বের করা ও ধারা হিসেবে সজ্জিত করা। এজন্য শু'রা সদস্যদের—অন্তত তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্যদের যে কুরআন-সুন্নাহ পারদর্শী হতে হবে তাতে কোনই সন্দেহের অবকাশ নেই। এ পর্যায়ে আল্লাহ্র নির্দেশ হচ্ছেঃ

فَاسْئَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (النحل: ٤٣)

তোমরা নিজেরা যদি না-ই জানো, তাহলে যারা জানে, তাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর।

অর্থাৎ যারা জানে না তারা যারা জানে তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করে নেবে। এই 'যারা জানে' বলতে পূর্ববর্তী আহ্লি কিতাবের আলিমদের বোঝানো হয়েছে মনে করা যেতে পারে। তবে তা আয়াতটির নাযিল হওয়ার প্রেক্ষিতের দৃষ্টিতেই মাত্র। কিন্তু কুরআনের কোন আয়াতেই যেমন তার নাযিল হওয়ার প্রেক্ষিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না, তেমনি এ আয়াতটিও। তাই এ নির্দেশ সাধারণভাবে একটি স্থায়ী বিধান হিসেবেই গ্রহণীয়।

মজলিসে শু'রার মর্যাদাই হচ্ছে এই যে, তার নিকট যাবতীয় বিষয়ে ইসলামী আইন চাওয়া হচ্ছে। তাকে নিযুক্তই করা হয়েছে জাতীয়, সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদিতে ইসলামী আইন দেয়ার জন্য। আর ইসলামী আইনের একমাত্র উৎস যেহেতু কুরআন ও সুন্নাহ, তাই শু'রার সদস্যদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ্তে মৌলিকভাবে ইজতিহাদী যোগ্যতা সম্পন্ন জ্ঞানী হতে হবে। অন্যথায় তাদের দ্বারা দায়িত্ব পালন কোনক্রমেই সম্ভব হতে পারে না। আয়াতের 'আহলিয্-যিক্র' অর্থ 'আহলিল ইলম' —কুরআন সুন্নাহ্র ইলম এর অধিকারী।

এই পর্যায়ে নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটিও গভীরভাবে বিবেচনার দাবি রাখে। ইরশাদ হয়েছেঃ

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (النساء ٨٣)

লোকদের নিকট শান্তি বা ভীতির কোন খবর এলেই তারা তা চতুর্দিকে প্রচার করে দেয়। অথচ বিষয়টি যদি রাসূল ও দায়িত্বশীলদের নিকট পৌঁছিয়ে দিত, তাহলে যারা তার নিগূঢ় তত্ত্ব বের করার কাজে নিয়োজিত তারা তার মর্ম জেনে নিত। আর আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া যদি তোমাদের উপর না হতো, তাহলে তোমরা অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত আর সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে।

আয়াতটি যদিও মদীনার সমাজে মুনাফিকদের শক্রতামূলক কর্মতৎপরতার প্রেক্ষিতে এবং তাদের কাজের দোষ বলা হয়েছে। কিন্তু আয়াতটির মোটামুটি বক্তব্যের মধ্যেই আমাদের আলোচ্য বিষয় পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব নিহিত রয়েছে।

তা হচ্ছে, মুসলিম সমাজের সম্মুখে শান্তি বা সুখের কোন খবর এলেই তা নিজ থেকে প্রচার করতে শুরু করে না দিয়ে বরং বিষয়টি রাসূলে করীম (স) ও

তাঁর নিয়োজিত বিভিন্ন ব্যক্তির কারোর নিকট পৌঁছিয়ে দেয়াই কর্তব্য। তাহলে সেই খবরের মধ্যে নিহিত সূক্ষ্ম তত্ত্ব তাঁরা বের করতে সক্ষম হতেন।

আয়াতে ব্যবহৃত يَسْتَنْبِطُوْنَهُ থেকেই اِسْتِنْبَاط শব্দটি এসেছে এবং তার অর্থ গবেষণা করে নিগূঢ় তত্ত্ব বের করা। ইসলামী আইন জানার জন্য এই 'ইস্তিনবাত'—নিগূঢ় তত্ত্ব বের করার পদ্ধতি গ্রহণ অপরিহার্য। আর তা সম্ভব কেবলমাত্র সেই লোকদের পক্ষে, যারা ইসলামী জ্ঞান-গবেষণায় বিশেষ পারদর্শী, যারা কুরআন-হাদীস-রাসূলে করীম (স)-এর জীবনের ঘটনাবলীর উত্থান-পতন, চড়াই-উতরাই ও আবর্তন-বিবর্তন সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী এবং যারা আইনের প্রকৃতি ও প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিফহাল। রাসূলে করীম (স) কুরআন ও সুন্নাতের শিক্ষাদানের মাধ্যমে এ কাজের যোগ্যতা সম্পন্ন বিপুল সংখ্যক লোক তৈরী করেছিলেন। রাসূলে করীম (স)-এর সময়ে ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন দিকে এবং কাফিরদের সাথে যুদ্ধের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ ধরনের লোক নিয়োজিত হয়েছিলেন। তাই ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিসে শু'রায়ও এ ধরনের যোগ্যতা সম্পন্ন যথেষ্ট সংখ্যক লোক থাকতে হবে, যারা কুরআন-সুন্নাহ্ সামনে নিয়ে গভীর সূক্ষ্ম গবেষণা চালিয়ে প্রয়োজনীয় আইন বের (استنباط) করতে সক্ষম।[১] অন্যথায় নিত্য পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় নিত্যনব সংঘটিত ঘটনা ও ব্যাপারাদিতে ইসলামসম্মত আইন ধারাবদ্ধ করা মজলিসে শু'রার পক্ষে সম্ভব হবে না।

এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে অন্তত কিছু সংখ্যক লোককে উচ্চতর দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের জন্য বের হয়ে আসবার—প্রয়োজন হলে বিদেশে গমন করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। বলেছেনঃ

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ (التوبه : ١٢٢)

জনগণের মধ্যের প্রত্যেকটি গোষ্ঠী থেকে কিছু সংখ্যক লোক কেন বের হয়ে যায় না দ্বীন সম্পর্কে গভীর সূক্ষ্ম জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে এবং এই উদ্দেশ্যে যে, তারা ফিরে এসে তাদেরকে সতর্ক করবে? তাহলে আশা করা যায় যে, তারা সতর্ক হবে।

জনগণকে দ্বীনি বিষয়াদি দিয়ে সাবধান করার জন্য দ্বীন সম্পর্কে গভীর সূক্ষ্ম জ্ঞান প্রথমেই অর্জন করতে হবে। তাহলেই তারা এই সাবধান করা কাজটি

---

১. সাইয়েদ কুতুব শহীদ এই আয়াতাংশের তাফসীর লিখেছেনঃ

أمرانهم المؤمنين لعلم حقيقته القادرون على استنباط هذه الحقيقة

(فى ظلال القران ج: ٥، ص: ١٧٢)

যোগ্যতা সহকারে করতে পারবে এবং তাদের এ সাবধান বাণী শুনে জনগণ হেদায়েত লাভ করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

মজলিসে শু'রাকে যেহেতু কুরআন-সুন্নাহ্‌র আইন বের করতে হবে ও তার ভিত্তিতে গোটা দেশ, রাষ্ট্র ও সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে, তাই কুরআন-সুন্নাহতে বিশেষ পারদর্শিতা সম্পন্ন লোক তাতে অবশ্যই থাকতে হবে। সুনানে আবূ দাউদ-এ এই হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে। রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

اَجْمِعُوا الْعَالِمِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاجْعَلُوْهُ شُوْرٰى وَلَا تَقْضُوْا فِيْهِ بِرَأْىِ وَاحِدٍ ـ

তোমরা কুরআন সুন্নাহ্‌তে পারদর্শী মু'মিন লোকদের একত্রিত কর। অতঃপর তাদের সমন্বয়ে শু'রা গঠন কর। তবে তাদের কোন একজনের মতের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত করে ফেলবে না।

একজনের মতে সিদ্ধান্ত করে ফেলতে নিষেধ করার অর্থ, প্রত্যেকটি বিষয়ে শু'রার অধিবেশনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা-পর্যালোচনা করে—প্রত্যেক সদস্যকে তাতে অংশ গ্রহণ ও মত প্রকাশের—ভিন্নমতের—সমালোচনা করার ও তার ত্রুটি দেখাবার অবাধ সুযোগ দেয়ার পর এমনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, যা সর্ববাদীসম্মত—অন্ততঃ বেশী সংখ্যক লোকের মতের ভিত্তিক হবে।

নির্বাহী বিভাগ (Executive)

মজলিসে শু'রা বা পার্লামেন্টে ধারাবদ্ধ আইন পাস হয়ে যাওয়ার পর আধুনিক নিয়মে তাতে রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মতিসূচক স্বাক্ষর হতে হয়। তা না হওয়া পর্যন্ত কোন আইন 'আইন' নাম অভিহিত ও নির্বাহী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কার্যকর হতে পারে না। রাষ্ট্রপ্রধানের স্বাক্ষর হওয়ার পরই নির্বাহী কর্মকর্তাদের দ্বারা সারাদেশে তা কার্যকর হবে। তাই নির্বাহী বিভাগ বা আইন-প্রয়োগকারী "অথোরিটি' (Authority) আধুনিক কালের প্রত্যেকটি সরকার প্রতিষ্ঠানের একটি অপরিহার্য এবং সম্ভবত সবচাইতে বেশী গুরুত্বসম্পন্ন বিভাগ।

আধুনিক কালের প্রশাসনিক কাঠামোতে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার হলে প্রেসিডেন্ট ও তার মন্ত্রীসভা (Cabinet), আর পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার হলে প্রধান মন্ত্রী ও তার মন্ত্রীদের সমন্বয়েই এ নির্বাহী যন্ত্র গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে প্রাদেশিক কর্মকর্তা আর 'ইউনিটারী সরকার' হলে বিভাগীয় ও জিলা—প্রভৃতি প্রশাসনিক বিভাগসমূহের কর্মকর্তারা নির্বাহী সরকার যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ। আর বাস্তবতার দৃষ্টিতে এ সরকারই হয়ে থাকে একটি দেশের শাসক ও প্রশাসক।

নির্বাহী সরকারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

বস্তুত আল্লাহ্‌র কুরআন ও রাসূলে করীম (স)-এর সুন্নাত মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক ও ব্যবহারিক জীবনে বাস্তবভাবে প্রয়োগ ও অনুসরণের জন্য। মজলিসে শু'রা যে চিন্তা-গবেষণা—'ইস্তিনবাত' করে, পারস্পরিক আলোচনা পর্যালোচনা করে যে আইনসমূহ ধারাবদ্ধ করে দিয়েছে, তারও চরম লক্ষ্য তাই। এই কারণে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের প্রয়োগ ক্ষমতার অধিকারী একটা যন্ত্র এই আইনসমূহ যথাযথভাবে কার্যকরকরণের জন্য অবশ্যই দায়িত্ব থাকতে হবে। অন্যথায় সব কিছুই নিষ্ফল ও অর্থহীন।

আইনকে অন্ধ নির্বিচার রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে শুধু জারি করাই তো একমাত্র কাজ নয়, ইসলামের দিক দিয়ে আসল লক্ষ্য হচ্ছে, সে আইনের ভিত্তিতে ব্যক্তি সমাজ ও পরিবার গঠন এবং লালন। সে জন্য পূর্ণ সতর্কতা, সহনশীলতা, ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতার সাথে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করা একান্ত প্রয়োজন। তাহলেই সেই আদর্শ ব্যক্তি, আদর্শ পরিবার ও আদর্শ সমাজ গড়ে উঠতে পারে, যা গড়ার জন্য দুনিয়ায় ইসলামের আগমন। এইরূপ গঠনমূলক কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করাবার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে ইরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ- (العصر)

> সমস্ত মানুষ নিঃসন্দেহে চরম ধ্বংস ও বিরাট ক্ষতির মধ্যে নিপতিত। তা থেকে রক্ষা পেতে পারে কেবল তারাই, যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে, পরম সত্য ও কল্যাণের উপদেশ ও পরামর্শ একজন অপরজনকে দিয়েছে এবং দ্বীন পালনে চরম ধৈর্য ধারণের জন্য পরস্পরকে উৎসাহিত করেছে।

বস্তুত ইসলাম যেমন ব্যক্তির অন্তর দিয়ে ঈমান আনার ব্যাপার, তেমনি ব্যক্তির নিজের জীবনে ও কর্মে তা পালন করার ব্যাপার। কিন্তু ইসলাম শুধু এতটুকু-ও নয়—তা প্রশাসনিক আইন-ও। অতএব তা সরকারের প্রশাসনিক যন্ত্রের বলে অবশ্যই কার্যকর হতে হবে। আর এ কাজের জন্য প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। আল্লাহ্‌র আইন জারি ও যথাযথভাবে কার্যকরকরণে কোনরূপ অনীহা উপেক্ষা বা দুর্বলতা দেখাবার অধিকার কারোরই থাকতে পারে না। বরং এ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক যন্ত্রকে অত্যন্ত শক্ত ও অনমনীয় হতে হবে। কুরআন মজীদে এই শক্তিকেই 'লৌহ' (Iron) বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ (الحديد: ٢٥)

> নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের রাসূলগণকে পাঠিয়েছি অকাট্য দলীল প্রমাণ সহকারে এবং তাদের সঙ্গে কিতাব ও মানদণ্ড নাযিল করেছি, যেন জনগণ ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর নাযিল করেছি লৌহ। তাতে বিপুল শক্তি যেমন নিহিত, তেমনি জনগণের জন্য অশেষ কল্যাণও।

আয়াতে 'আল-হাদীদ' 'লৌহ' বলে প্রশাসনিক শক্তিকেই বুঝিয়েছে, যার কাজ হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব—আইনকে মানদণ্ডের ভারসাম্য সহকারে জারি করা। এ আইন জারি করার শক্তি যেমন 'লৌহ'-এর ন্যায় অনমনীয়, তেমনি তা জারির ক্ষেত্রে বাস্তবভাবে সেই অনমনীয়তা অবশ্যই অবলম্বনীয়। এ ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র দুর্বলতা দেখানো কুরআনের ভাষায় প্রশাসনিক শক্তিকে 'লৌহ' বলার পক্ষে চরম অবমাননাকর। 'লৌহ' স্বভাবতই অমোঘ। তাই তাকেই এ ব্যাপারে সেই অমোঘতাই রক্ষা করতে হবে।

প্রশাসনিক দুর্বলতা গোটা রাষ্ট্রকেই দুর্বল করে। জনগণের মনে রাষ্ট্র শক্তির প্রতি আনুগত্যমূলক ভাবধারা নিঃশেষ করে দেয়। এ কারণে আল্লাহ্‌র আইন জারি ও কার্যকরকরণের একবিন্দু নম্রতা, দুর্বলতা কিংবা দয়া-সহানুভূতি প্রদর্শন তো দূরের কথা—তার উদ্রেক হওয়াও কুরআনের স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ। ব্যভিচারীদ্বয়ের দণ্ড কার্যকর প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (النور: ٢)

> সেই দুইজনকে আল্লাহ্‌র আইনের দণ্ড দানের ব্যাপারে তোমাদেরকে যেন কোনরূপ দয়া-অনুগ্রহ পেয়ে না বসে—যদিও তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হও।

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, প্রশাসনিক শক্তিকে আল্লাহ্‌র আইন জারি করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র আইন জারি ও কার্যকরকরণে কোন রূপ দয়া প্রদর্শন করা যাবে না, দয়ার উদ্রেক হওয়া ঈমানের পরিপন্থী। দয়া দেখানো হলে প্রমাণিত হবে যে, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান নেই। কেননা তা থাকলে এক্ষেত্রে দয়া প্রদর্শন বা এ ব্যাপারে তাদের মনে কোনরূপ দয়ার উদ্রেক হওয়াও সম্ভব হতো না।

প্রশাসনিক কর্মদক্ষতার প্রতীক ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ (স)। তিনি যেমন আল্লাহ্‌র আইন কার্যকরকরণের কোনরূপ দুর্বলতা দেখান নি, তেমনি সে ক্ষেত্রে তিনি কোনরূপ সুপারিশ গ্রহণ করতেও স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করেছেন। শুধু অস্বীকার নয়, আল্লাহ্‌র আইন জারি করার ব্যাপারে সুপারিশের কথা শুনে তীব্র ভাষায় তার প্রতিবাদ করেছেন।

মাখজুমী বংশের একটি মেয়েলোক চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হয়। রাসূলে করীম (স)-এর অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি উসামা ইবনে জায়দ (রা)—তাঁর নিকট দণ্ডদানের ব্যাপারে সুপরিশ করার ইচ্ছা করেছিলেন। নবী করীম (স) তাঁর কথা শুনে অত্যন্ত ধমকের সুরে বললেনঃ

اتشفع فِى حَدٍّ مِّن حدود اللّٰهِ ؟

আল্লাহ্ ঘোষিত একটি দণ্ড কার্যকরকরণের ক্ষেত্রে তুমি সুপারিশ করছ?

অতঃপর তিনি মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দান প্রসঙ্গে বললেনঃ

اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا هلكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ اَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ (مسلم)

হে জনগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়ে গেছে শুধু এই কারণে যে, তাদের মধ্য থেকে কোন অভিজাত ব্যক্তি চুরি করলে তাকে তারা অব্যাহতি দিত। আর কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তার উপর দণ্ড কার্যকর করত।

আল্লাহ্র নির্দেশঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ - وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (ال عمران: ١٠٤)

তোমাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক অবশ্য অবশ্যই এই কাজে নিযুক্ত ও রত থাকতে হবে, যারা সব সময় কল্যাণের দিকে আহবান জানাবেন, শরীয়াতসম্মত কাজ করার আদেশ করতে ও শরীয়াত পরিপন্থী কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখতে থাকবে।

বস্তুত এ আয়াতে যে কাজের কথা বলা হয়েছে, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক সংস্থার দায়িত্বই হচ্ছে সেই কাজ করা। শরীয়াতসম্মত কাজের আদেশ ও শরীয়াত পরিপন্থী কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব সরকারের এ বিভাগ-ই পালন করবে।

আল্লাহ্র আইন-বিধান প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই সমাজের উপর কার্যকর করতে হবে। 'হদ্দ' সমূহ জারি করতে হবে। এ কাজ যেমন একান্ত জরুরী, তেমনি তা প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই—নির্বাহী শক্তির সাহায্যেই আঞ্জাম দিতে হবে। এ কাজের দায়িত্ব তো আর সাধারণ মানুষের উপর ছেড়ে দেয়া যায় না, সাধারণ মানুষকে কোন প্রকারেই সুযোগ দেয়া যায় না আইন

হাতে লওয়ার। অন্যথায় চরম অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয়া অবধারিত। মানুষের উপর নির্বিচার জুলুম হওয়া, মানুষের মর্যাদা বিনষ্ট হওয়া এবং মানুষের মানবিক অধিকারও হরণ হওয়া নিশ্চিত। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ও নির্বাহী সংস্থা এ জন্যই একটি অপরিহার্য বিভাগ। এই বিভাগটিই হবে এ কাজের একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তৃত্বশীল।

বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার, ইসলামের রাষ্ট্রীয় বিধানে এই ব্যবস্থা একেবারে শুরু থেকে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের কোন স্বঘোষিত কোন প্রাচ্যবিদ (Orientalist) হওয়ার দাবিদার ইসলামের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ তুলবার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে যে, ইসলাম শুধু ওয়ায-নসীহতের বিধান দেয়, তাতে প্রশাসনিক নির্বাহী সংস্থা (Executive) বলতে কিছু নেই। আর সেই কারণে ইসলাম রাষ্ট্রীয় বিধান হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আমরা বলব, এহেন স্বঘোষিত প্রাচ্যবিদ ইসলামী জীবন বিধান ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ ও মূর্খ। তারা যদি সরাসরি কুরআন ও সুন্নাত অধ্যয়ন করত, তাহলে তাদের মনে একটা মারাত্মক ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারত না এবং ইসলামের বিরুদ্ধে এরূপ মিথ্যা অভিযোগ তোলা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হতো না। আমাদের স্পষ্ট দাবিই হচ্ছে, ইসলাম পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র ব্যবস্থা—তার প্রয়োজনীয় সব সংস্থা অবকাঠামো পুরাপুরিভাবে উপস্থাপিত করেছে, তার কোথাও একবিন্দু ফাঁক নেই।

ইসলামে স্পষ্টভাবেই প্রশাসনিক সংস্থা—নির্বাহী ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ ও আইন নির্ধারক মজলিসে শু'রা—আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান উপস্থাপিত এ তিনটি বিভাগই পুরাপুরি বর্তমান। কেননা ইসলামী আদর্শ তো সর্বতোভাবে বাস্তবায়িত হওয়ার বিধান। আর তা এ বিভাগসমূহের সক্রিয়তার মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে। ইসলাম বিশ্বমানবতার জন্য যে কল্যাণ নিয়ে এসেছে, তা এসব বিভাগ ও সংস্থার পূর্ণাঙ্গ কার্যকরতার মাধ্যমেই তো জনগণের নিকট পৌঁছাতে সক্ষম হতে পারে।

উপরন্তু কুরআন মজীদের উপরোদ্ধৃত আয়াতে যে 'আল্-তাকুম-মিনকুম উম্মাতুন' 'তোমাদের মধ্যে এমন লোক সমষ্টি অবশ্যই থাকতে হবে' বলে যে 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার'—ন্যায় ও আইনসম্মত কার্যাবলীর কার্যকর করা ও আইন বিরোধী কার্যবলী করতে ও হতে না দেয়ার যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে, তা তো এই প্রশাসনিক সংস্থার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হতে পারে।

'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার' নির্বাহী সংস্থারই দায়িত্ব

সূক্ষ্ম দৃষ্টিমান ব্যক্তিবর্গ অবশ্যই দেখবেন এবং স্বীকার করবেন যে, 'আমর বিল-মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার'-এর নিয়মাবলী, তার সমস্যা ও শর্তসমূহ পূরণের জন্য একটি সংস্থা অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে। এই সংস্থাই হচ্ছে কার্যত ইসলামী রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ (Executive Department)। ইসলামের আইনসমূহ বলবৎ করা, প্রয়োগ করা (Enforced)-র জন্য দায়িত্বশীল। আইন বিভাগ কর্তৃক সাব্যস্ত করা আইন ও বিচার বিভাগের রায়সমূহ যথাযথভাবে কার্যকর করা এই সংস্থাটি ব্যতীত কখনই সম্ভব হতে পারে না। আর তা হতে না পারলে দ্বীন-ইসলামের গোটা ব্যবস্থাই অর্থহীন, নিষ্ফল, অকার্যকর এবং অবাস্তব। তাই ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজে আল্লাহর আইনসমূহ কার্যকর করার পূর্ণ দায়িত্ব এ বিভাগটির উপর অর্পিত।

বস্তুত এ দায়িত্বটি মূলত ইসলাম কর্তৃক উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত। এ এক অভিনব ও মৌলিক ব্যবস্থা। ইসলাম পূর্বকালীন মানব রচিত বিধান-ব্যবস্থায় এর কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। জনগণের মধ্যে কল্যাণের ও ভালো ভালো কাজের ব্যাপক প্রচলন করার দায়িত্ব ইসলাম জনগণের উপর অর্পণ করেছে। মানুষকে সমস্ত প্রকারের আইন-বিরোধী অন্যায় ও পাপের কাজ থেকে বিরত রাখার কাজ-ও সেই-জনগণকেই আঞ্জাম দিতে হবে। সমাজে কি হচ্ছে—ভালো কি মন্দ, ক্ষতিকর কি কল্যাণকর, আইন পালন কিংবা আইন লংঘন—সে দিকে জনগণকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। জনগণ এ ব্যাপারে নির্বাক-নিষ্ক্রিয় ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে কিছুতেই থাকতে পারে না।

দ্বীন-ইসলাম এই বিষয়টিকে সমাজ-দর্শন পর্যায়ে গণ্য করে তারই ভিত্তিতে এ দায়িত্বের কথা বলেছে। ইসলামের সমাজ-দর্শন হচ্ছে—মানুষ সমাজেরই একটি অংশ ও অঙ্গ। সমাজ বিচ্ছিন্ন মানব জীবন অকল্পনীয়। একই পরিবেশে বসবাসকারী মানুষের পরিণতি অভিন্ন হতে বাধ্য। সমাজের কোথাও যদি কল্যাণ কিছু থাকে, তবে সে কল্যাণ গোটা সমাজেই পরিব্যাপ্ত হবে। কল্যাণকারী সেই এক ব্যক্তির মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে না। পক্ষান্তরে সমাজে যদি মন্দ থাকে, তা হলে সমাজের একটি ব্যক্তিও সে মন্দ ও অকল্যাণ থেকে রক্ষা পেতে পারে না, তার প্রভাব সেই মন্দকারী পর্যন্ত সীমিত হয়ে থাকতে পারে না। এ কারণে সমাজের ব্যক্তিগণের মন-মানসিকতা ও আচরণ চরিত্র অভিন্ন হওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে একান্তই বাঞ্ছনীয়। গোটা জনসমষ্টির সামগ্রিক কল্যাণের জন্যই ব্যক্তিদের থাকতে হবে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা।

নবী করীম (স) এই ব্যাপারটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তিনি এ বিষয়ের সূক্ষ্ম জটিলতাকে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন।

তিনি বলেছেন, একটি সমাজের লোক সমুদ্রগামী এক জাহাজের আরোহীদের মত। এই জাহাজ যদি কোন বিপদে পড়ে তা হলে সে বিপদ কোন একজন আরোহীর জন্যই হবে না, জাহাজের সমস্ত আরোহীর জন্যই হবে সে বিপদ। এই অবস্থায় আরোহীদের কোন একজনকে যদি সেই জাহাজের তলদেশ ছিদ্র করার সুযোগ দেয়া হয়, তাহলে গোটা জাহাজই ডুবে যাবে। নিমজ্জিত হবে সমস্ত আরোহী। একই সমাজের লোকদের অভিন্ন পরিণতির এ এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

সমাজের কোন ব্যক্তি যদি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে তাহলে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানোর কোন অধিকারই তার থাকা উচিত নয়। কেননা তাহলে সমাজের অন্যান্য মানুষেরও সেই রোগে আক্রান্ত হওয়ার অনেক বেশী আশঙ্কা। কাজেই সমাজ-সমষ্টির সার্বিক কল্যাণের দৃষ্টিতেও তার গতিবিধিকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, তাকে অন্য লোকদের সংস্পর্শ হতে অবশ্যই দূরে রাখতে হবে।

এ সব দৃষ্টান্তের আলোকে 'আমর বিল-মা'রূফ ও নিহী আনিল মুনকার' কথাটির গভীর তাৎপর্য অনুধাবন করা যায় এবং তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য হয়ে উঠে। অতএব সমাজে বেশী বেশী কল্যাণের ব্যাপক প্রসারতা বিধান এবং বেশী বেশী অন্যায় প্রতিরোধের শক্তিশালী ব্যবস্থা অবশ্যই থাকতে হবে। দ্বীন-ইসলামের কার্যকরতা ও আল্লাহ্ অর্পিত দায়িত্ব পালনের অব্যাহত ধারাবাহিকতার জন্য 'আম্‌র বিল মা'রূফ ও নিহী আনিল মুনকার'-এর দায়িত্বশীল সংস্থার অপরিহার্যতা একান্তই অনস্বীকার্য।

এই কারণে কুরআন মজীদ ও সুন্নাতে রাসূলে এ বিষয়ের উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। অবশ্য একটি আয়াত এর বিপরীত ধারণার সৃষ্টি হওয়ার কারণ হতে পারত—যদি সঙ্গে সঙ্গেই তার ভুল ব্যাখ্যার পথ বন্ধ করে দেয়া না হতো। আয়াতটি এইঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ـ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ اِلَى اللّٰهِ
مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (المائدة-١٠٥)

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা নিজেদেরই কথা চিন্তা কর, অপর কেউ যদি পথভ্রষ্ট হয়ও তা হলে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না যদি তোমরা নিজেরা হেদায়েত প্রাপ্ত হয়ে থাকতে পার। তোমাদের সকলকেই আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন তোমরা দুনিয়ায় কি কি কাজ করছিলে।

আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ এই হয় যে, ব্যক্তি নিজে যদি ইসলামের উপর অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তাহলে 'আম্‌র বিল্ মা'রূফ ও নিহী আনিল

মুনকার' করার কোন দায়িত্বই তার উপর থাকবে না, সে সেই দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকবে। তা না করলে তাকে পাকড়াও করা হবে না, তাকে সেজন্য জবাবদিহিও করতে হবে না।

কিন্তু এ অর্থ ঠিক নয়। আল্লাহ্‌র বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং তা যে আল্লাহ্‌র মূল বক্তব্যের বিপরীত তা হাদীস থেকেই নিঃসন্দেহে জানা যায়। তাই প্রসঙ্গত বলা যায়, কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা হাদীসের আলোকেই পেতে হবে। হাদীসকে বাদ দিয়ে কুরআনের সঠিক-নির্ভুল তাফসীর করা বা জানা সম্ভব নয়।

আবূ দাউদ ও তিরমিযী প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ভাষণ প্রসঙ্গে বললেনঃ 'তোমরা কুরআনের এ আয়াতটি পাট কর'; কিন্তু তার অর্থ মূল বক্তব্যের বিপরীত গ্রহণ কর। আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছিঃ

إِنَّ النَّـــاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ ـ

লোকেরা যখন জালিমকে জুলুম করতে দেখে, তখন যদি তারা সেই জালিমকে না ধরে ও জুলুম থেকে তাকে বিরত না রাখে, তাহলে খুবই আশঙ্কা রয়েছে, আল্লাহ্ তাঁর নিকট থেকে পাঠানো আযাবে তাদের সকলকেই গ্রাস করবেন।

আবূ ঈসা তিরমিযী এ হাদীসটি উদ্ধৃত করে লিখেছেনঃ

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

এ হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে উত্তম ও সহীহ।[১]

উক্ত আয়াতের তাফসীরে সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। সে আলোচনার সারনির্যাস আমরা এখানে তুলে দিচ্ছিঃ

এ আয়াতটি মুসলিম উম্মত ও অমুসলিম কাফির সমাজের মধ্যে দায়িত্বশীলতার দিক দিয়ে পার্থক্য রচনাকারী। সেই সাথে মুসলিম জনগণের পরস্পরের প্রতি কল্যাণ কামনা ও অসীয়ত-নসীহতের দায়-দায়িত্বের কথা ঘোষণাকারী। কেননা তারা সকলে মিলে এক অভিন্ন উম্মত।

আয়াতের প্রথম অংশের বক্তব্য হচ্ছে, মুসলমানরা অন্যদের থেকে ভিন্নতর এক জনসমষ্টি। তারা নিজেরা পরস্পরের প্রতি কঠিন দায়িত্বশীল। অতএব তোমরা নিজেরা নিজেদের সকলের সম্পর্কে অবশ্য চিন্তা-ভাবনা করতে বাধ্য

---

১. الجامع لاحكام القران للقرطبى ج: ٦، ص: ٢٤٣-٢٥٣

তোমাদের সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে হবে, পরস্পরের প্রতি যে কর্তব্য রয়েছে তা পালন করতে হবে। অবশ্য অন্যরা—মুসলিম সমাজ বহির্ভূত লোকেরা—যদি পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, আর তোমরা হেদায়েতের পথে অবিচল থাক, তাহলে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। অন্য লোকদের গুমরাহীর কোন শাস্তি তোমাদের ভোগ করতে হবে না—যদি তোমরা নিজেরা ঠিক থাক। এদের সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না, হতে পারে না কোনরূপ বন্ধুত্ব।

এ অর্থে মুসলিম উম্মত ও অন্যান্য মুসলিম জাতিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের রূপ নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে। মুসলিম উম্মত হিজবুল্লাহ—আল্লাহ্‌র দল, আর অন্যরা শয়তানের দল। এ দুয়ের মাঝে আকীদা বিশ্বাসের দিক দিয়ে কোনই একাত্মতা ও অভিন্নতা হতে পারে না।

এর অর্থ হল মুসলিম উম্মতের সদস্যদের পরস্পরের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হতে হবে, পরস্পরের প্রতি কঠিন দায়িত্বও পালন করতে হবে। কিন্তু তাই বলে বিশ্বমানবকে আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র দ্বীনের দিকে আহবান জানানোর কঠিন দায়িত্ব থেকে মুসলিম উম্মত কখনই নিষ্কৃতি পেতে পাবে না। তাকে প্রথমত কোথাও দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং অতঃপর নির্বিশেষে সমস্ত মানবতাকে আল্লাহ্‌র দ্বীনের দিকে আহবান জানাতে হবে। সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা চালাতে হবে তাদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার বানানোর জন্য। এ জন্য তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই দায়িত্বশীল এবং তা না করলে তাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকট কঠিনভাবে জবাবদিহি করতে হবে। অন্য কথায়, মুসলিম উম্মতকে প্রথমে নিজেদের মধ্যে 'আমর বিল মা'রূফ ও নিহী আনিল মুনকার'-এর দায়িত্ব পালন করতে হবে। পরে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে সমগ্র বিশ্বমানবতার প্রতি। প্রথম পালনীয় কাজ হচ্ছে 'আমর বিল-মা'রুফ'—আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করা, আল্লাহ্‌র শরীয়াতকে প্রশাসনিক কর্তৃত্বের সাহায্যে কার্যকর করা। আর 'নিহী আনিল মুনকার' হচ্ছে জাহিলিয়াতকে নির্মূল করা, আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও আইন-বিধান অমান্য করাকে প্রতিরুদ্ধ করা। কেননা জাহিলিয়াতের শাসন তাগুতের শাসন, আল্লাহ্‌র শাসনের পক্ষে অতি বড় চ্যালেঞ্জ, আল্লাহ্‌র আইন-বিধান লংঘনের ক্ষমার অযোগ্য ধৃষ্টতা। মুসলিম উম্মত প্রথমত নিজেদের জন্য দায়িত্বশীল, তার পরে দায়িত্বশীল গোটা বিশ্বমানবতার জন্য।

কাজেই উক্ত আয়াত থেকে একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, মুসলিম উম্মত বুঝি 'আম্‌র বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার'-এর জন্য দায়িত্বশীল নয়। এ কথা কেউ মনে করলে তা হবে আয়াতের আসল বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ গ্রহণ। আর শুধু হেদায়েত প্রাপ্ত হলেই বুঝি মুসলিম উম্মত রেহাই

পেয়ে যাবে, তাকে ইসলামী শরীয়াতকে রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে কার্যকর ও বাস্তবায়িত করতে হবে না—এমন ধারণা গ্রহণ-ও এ আয়াতের সম্পূর্ণ বিপরীত তাৎপর্য গ্রহণ।

মোটকথা, এ আয়াত ব্যক্তিকে অন্যায়-অসত্য, জুলুমের প্রতিরোধ করার দায়িত্ব থেকে বিন্দুমাত্র মুক্তি দেয়নি, তাগূতী শাসন-প্রশাসন উৎখাত করে আল্লাহ্‌র শাসন ও খিলাফতের প্রশাসন কায়েম করার কর্তব্য থেকে নিষ্কৃতি দেয়নি। কেননা তাগূতী শাসন আল্লাহ্‌র 'ইলাহ' হওয়াকেই অস্বীকার করে, আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বকেই চ্যালেঞ্জ করে মানুষকে আল্লাহ্‌র শরীয়াতের পরিবর্তে নিজের আইন-আদেশের দাসানুদাস বানায়। এ এমন একটা 'মুনকার', যা কোন ঈমানদার ব্যক্তিই বরদাশত করতে পারে না, বরদাশত করা উচিত নয়। এরূপ অবস্থায় গোটা উম্মত যদি হেদায়েত প্রাপ্ত হয়ও তবু তাদের এ হেদায়েত প্রাপ্তি কোন কাজেই আসবে না।

আল্লাহ্ তা'আলার শোকর, উপরোক্ত আয়াতের ভুল অর্থ গ্রহণের কারণে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছিল, তা প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা) রাসূলে করীম (স)-এর স্পষ্ট হাদীসের ভিত্তিতেই নস্যাৎ করে দিয়েছেন এবং আয়াতের যথার্থ অর্থ জনগণকে জানিয়ে দিয়েছেন। আমাদের একালের কোন কোন দুর্বলমনা ও দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি এ আয়াতকে ভুল মতের দলিল হিসেবে পেশ করে জনগণকে 'আমর বিল মা'রূফ' ও নিহী আনিল মুনকার'-এর দায়িত্ববিমুখ বানিয়ে দিতে চেয়েছে, তাদের এ অপচেষ্টাও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে।

না, কখনই তা হতে পারে না। আল্লাহ্‌র এই দ্বীন 'জিহাদ' ব্যতীত কখনই কায়েম হতে পারে না। মুসলিম সমাজ কখনই সংশোধনপ্রাপ্ত হতে পারে না অন্যায়ের প্রতিরোধ ও ন্যায়ের বাস্তব প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে। এই দ্বীনের জন্য একদল লোককে অবশ্যই এ কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে। তারা মানুষকে অন্যায় পথ থেকে বিরত রাখবে। প্রথমে ওয়ায-নসীহতের সাহায্যে। আর তা ব্যর্থ হলে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কর্তৃত্বের সাহায্যে। তাহলেই মানুষ মানুষের নিকৃষ্ট গোলামী থেকে মুক্তি পেতে পারবে। পারবে একান্তভাবে মহান আল্লাহ্‌র বান্দা হয়ে জীবন যাপন করতে। আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র রাজত্ব কায়েম করতে। এজন্য আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব যারা কেড়ে নিয়ে নিজেদের সার্বভৌমত্ব জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, সে সার্বভৌমত্বকে কেড়ে আনতে হবে, সর্বত্র জারি করতে হবে কেবল মাত্র আল্লাহর প্রভুত্ব, কার্যকর করে তুলতে হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র আইন।

'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার'-এর কাজ প্রথমে প্রচার ও সমঝ-বুঝ পর্যায়েই করতে হবে একথা ঠিক। কিন্তু তা ব্যর্থ হলে সে জন্য শক্তির প্রয়োগ করতে হবে নির্দ্বিধায়।[১]

অবশ্য এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, অন্যরা কি করে না করে-সে চিন্তার পূর্বে নিজে হেদায়েতের পথে আছে কিনা সেই চিন্তা প্রত্যেক ব্যক্তিকে সর্বাগ্রে করতে হবে। কেননা ব্যক্তি নিজেই যদি হেদায়েতপ্রাপ্ত না হলো, তাহলে অন্যদের হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়া না হওয়ার চিন্তা করার কোন অধিকারই তার থাকতে পারে না। আর সংশোধনের কাজ সর্বপ্রথম নিজেকে দিয়েই শুরু করতে হবে, তার পরই অন্যদের হেদায়েতের প্রশ্ন উঠে।

হযরত আলী (রা)-র এ কথাটি এই প্রেক্ষিতে খুবই যথার্থঃ

مَنْ نَّصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ اِمَامًا فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيْمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيْمِ غَيْرِهِ وَلْيَكُنْ تَادِيْبُهُ بِسِيْرَتِهِ قَبْلَ تَادِيْبِهِ بِلِسَانِهِ وَمُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَمُؤَدِّبُهَا اَحَقُّ بِالْاِجْلَالِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَمُؤَدِّبِهِمْ ـ

যে লোক নিজেকে লোকদের নেতার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবে, তার কর্তব্য, অপরকে শিক্ষাদানের পূর্বে সে যেন নিজেকে শিক্ষাদানের কাজ শুরু করে। এবং তার মুখের কথা-বক্তৃতা দ্বারা লোকদেরকে সদাচার শিক্ষাদানের পূর্বে সে যেন নিজের আচরণ ও চরিত্র দ্বারা লোকদের শিক্ষাদান করে। বস্তুত যে লোক নিজের শিক্ষক, নিজেকে সদাচারের শিক্ষাদাতা, অন্য লোকদেরকে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দেয়ার দিক দিয়ে সে-ই বেশী অগ্রাধিকার পাওয়ার অধিকারী।

এক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় হচ্ছে কুরআনের সেই আয়াত, যা তিনি মদীনার ইয়াহুদীদের প্রতি নাযিল করেছিলেন। তা হচ্ছেঃ

اَتَامُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ (البقرة: ٤٤)

তোমরা লোকদেরকে 'বির' সর্বপ্রকারের শুভ কাজের আদেশ কর, অথচ তোমরা এদিক দিয়ে নিজেদেরকে ভুলে যাও?

আল্লামা আ-লূসী লিখেছেনঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনানুযায়ী আয়াতটি মদীনার ইয়াহুদী আলিমদের আচরণ সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। তারা গোপনে গোপনে লোকদেরকে বলত মুহাম্মাদ (স)-কে মেনে নিতে, তাঁকে অনুসরণ করতে। কিন্তু তারা নিজেরা তাঁকে মানতও না, অনুসরণও করত না অথবা তারা সাধারণ মানুষকে দান-সাদকা করতে উপদেশ দিত, কিন্তু তারা

১. في ظلال القرآن ج:٧، ص: ٥٩-٦١

নিজেরা তা করত না। আল্লামা সুদ্দী বলেছেনঃ তারা লোকদেরকে আল্লাহ্র আনুগত্য করার জন্য নসীহত করত, আল্লাহ্র নাফরমানী করতে নিষেধ করত, কিন্তু তারা আল্লাহ্র আনুগত্য না করে তাঁর নাফরমানী-ই করত বেশী বেশী করে।

তাদের এই বৈপরীত্যপূর্ণ চরিত্র ও আচার-আচরণের উপরই এই কঠোর শাসনমূলক ও আপত্তি জ্ঞাপন প্রশ্ন। তার অর্থ অন্যদেরকে ভালো ভালো ও পূণ্যময় কাজ করতে বলা ও উপদেশ দেয়া—নিজেদের তার কিছুই না করা একটা ঘৃণ্য নির্লজ্জতা, একটা অতিবড় জঘন্য অপরাধ। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে 'বির' সর্বপ্রকারের শুভ কাজ করার উপদেশ দেয়া ও লোকদেরকে সে কাজে অনুপ্রাণিত করা নিঃসন্দেহে অতীব উত্তম কাজ বরং কর্তব্য। কিন্তু আপত্তির বিষয় হলো এই দিক দিয়ে নিজেকে ভুলে যাওয়া—নিজে সেই কাজসমূহ না করাটাই আপত্তির বিষয়।[১]

বস্তুত যে সমাজ নৈতিকতার দিক দিয়ে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে গেছে, বিকৃতি ও বিপথগামিতা মানুষকে পেয়ে বসেছে, সেই সমাজে যদি সংশোধনমূলক কার্যক্রম করার সংকল্প গ্রহণ করা হয়, তাহলে নিজেকে দিয়েই সে কাজের সূচনা করতে হবে। সেই মুহূর্তে অন্যরা কে কি করছে তা দেখা চলবে না। কেননা তা দেখতে গেলে কারোর পক্ষেই সম্ভব হবে না নিজেকে পর্যন্ত সংশোধন করা। তখন অন্ততঃ কোন ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষে এই কথা বলার কোন অধিকার থাকতে পারে না—গোটা সমাজই যখন বেঈমানীতে ডুবে গেছে, তখন একা আমার পক্ষে ঈমানদারী রক্ষা করা কি করে সম্ভব হতে পারে? এরূপ মানসিকতাই আল্লাহ্র নিকট আপত্তির কারণ। কথাটি আরও খোলাসা করার জন্য রাসূলে করীম (স)-এর সেই প্রখ্যাত হাদীসটিও এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, যার ভাষা হচ্ছে এইঃ

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ....

ইসলাম নেহায়েতই অপরিচিত অসহায় অবস্থায় সূচিত হয়েছিল। খুব শীগগীরই ইসলাম সেই অবস্থায় ফিরে যাবে। তবে তখনকার সেই 'গুরাবা' অপরিচিত লোকদের জন্য সুসংবাদ, ধন্যবাদ।

এই কথা শুনে সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ

يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَنِ الْغُرَبَاءُ۔

'গুরাবা' বলে আপনি কোন্ লোকদেরকে বুঝিয়েছেন হে আল্লাহ্র রাসূল?

---

১. روح المعنى للالوسى ج:١، ص: ٢٤٨

জবাবে বললেনঃ

اَلَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ اِذَا اَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ سُنَّتِىْ (جامع الاصول ج ١٠ ص ٢١٢، ترمذى)

তারা হচ্ছে সেই লোক, যারা জনগণ যখন আমার সুন্নাত থেকে বিচ্যুত হয় তখন সংশোধনমূলক কাজ করে।

আল্লাহ্র পথে জিহাদের তুলনায়ও এই 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার'-এর কাজ অনেক সময় অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় বরং এটাই হচ্ছে জিহাদের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ। আর রাসূলে করীম (স)-এর কথাঃ

اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ۔

অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে স্পষ্ট সত্য কথা বলা উত্তম জিহাদ।

ও তো সেই প্রাথমিক পর্যায়ের 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার'-এর কাজই।

হযরত আলী (রা)-র কথাঃ

وَمَا اَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عِنْدَ الْاَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ اِلَّا كَنَفْثَةٍ فِىْ بَحْرٍ لُجِّىٍّ (نهج البلاغة)

সমস্ত রকমের নেক ও শুভ কাজও আল্লাহ্র পথে জিহাদ 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার' কাজের তুলনায় মহাসমুদ্র থেকে এক ফোটা পানি গ্রহণের সমান।

কেননা 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার' কাজটি মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী কার্যক্রম। তা ব্যক্তিগতভাবে করা হোক, কি সামষ্টিকভাবে। আর 'জিহাদ' (প্রচলিত অর্থে) হচ্ছে বৈদেশিক আগ্রাসনের প্রতিরোধ। প্রথমটি দ্বিতীয়টির আগেই সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা যে সমাজ অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে ভাঙ্গন ও বিপর্যয়ের মধ্যে, তার পক্ষে বহিঃশত্রুর মুকাবিলা করা সম্ভব হয় না।

কাজেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করা জুলুমের প্রতিরোধ করার কাজ সর্বপ্রথম মুসলমানদের নিজেদের মধ্যেই ব্যাপকভাবে কার্যকর হতে হবে। কুরআন মজীদের একটি আয়াত এ কথাটি আরও স্পষ্ট করে বলেছে। আয়াতটি এইঃ

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ۔ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ۔ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا (النساء: ١٤٠)

আল্লাহ্ এই কিতাবে তোমাদেরকে পূর্বেই এই হুকুম দিয়েছেন যে, তোমরা যেখানেই আল্লাহ্র আয়াতের বিরুদ্ধে কুফরির কথা বলতে এবং তার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে শুনবে, সেখানে (তাদের সাথে) তোমরা আদৌ বসবে না—যতক্ষণ না তারা অন্য কোন কথায় লিপ্ত হয়। তোমরাও যদি তাই কর, তাহলে তোমরাও তাদের মতই হবে। নিশ্চয়ই জানবে, আল্লাহ্ মুনাফিক ও কাফিরদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন।

এ আয়াত স্পষ্ট করে বলছে, আল্লাহ্র কালাম, কালামের কোন আয়াত—আল্লাহ্র কোন হুকুম-বিধানের বিরুদ্ধতা করা বা তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা আল্লাহ্দ্রোহী কাফিরদেরই কাজ. একবিন্দু ঈমান যার মধ্যে আছে, তার পক্ষে এ কাজ করা তো দূরের কথা, তা করতে দেখলে বা শুনতে পেলে যারা তা করে তাদের সাথে একত্রে বসা বা সম্পর্ক রক্ষা করাও সম্ভব হতে পারে না। করা—ঈমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কেউ যদি তা করে তাহলে বুঝতে হবে, তার ঈমান নেই, সে-ও সেই কাফিরদের মতই হয়ে গেছে।

সাধারণত লক্ষ করা যায়, কোন একজন লোকই হয়ত ইসলাম বা কুরআনের কোন স্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধতা, কিংবা তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করল, আর তার চারপাশের অন্যান্য লোক তা শুনে চুপ চাপ থাকল, কোন প্রতিবাদ করল না। এইরূপ জঘন্য কথা শুনে হজম করে ফেলল, তা হলে তার মধ্যে ঈমানের একবিন্দুও আছে, তার কোন প্রমাণই পাওয়া যেতে পারে না।

হযরত আলী (রা) বলেছেন, কুরআন মজীদে হযরত সালেহর মু'জিজা হিসেবে যে উষ্ট্রীকে দেয়া হয়েছিল, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বলে দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা এই উষ্ট্রীর উপর কোনরূপ অত্যাচার করবে না। অত্যাচার করা হয়েছিল, কিন্তু সকলে করেনি, করেছিল মাত্র এক ব্যক্তি, আর অন্যরা তাতে একমত ছিল। তাই আল্লাহ্ যে আযাব দিয়েছিলেন, তা কেবল সেই এক ব্যক্তির উপরই নয়, সমস্ত মানুষই সে আযাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

বস্তুত সমাজে দুষ্কৃতি ও অনাচার সকলেই হয়ত করে না, করে মুষ্টিমেয় লোক। কিন্তু তার পরিণামে যে আযাব আসে, তা থেকে কেউ-ই রেহাই পায় না। কেননা সেই অন্যান্য সকল লোক—যারা নিজেরা অনাচার করেনি বটে, কিন্তু কতিপয় লোকের অনাচারকে তারা নীরবে সহ্য করেছে বলেই এই পরিণতি তাদেরও ভাগ্যলিপি হয়েছে।

তাই সমাজের লোকদের সামষ্টিক কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত পরহেযগারী কিছু মাত্র রক্ষাকবচ হতে পারে না। সমাজকেও সকল প্রকার অন্যায় অনাচার থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

তবে আমাদের এ পর্যায়ের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে বলতে হচ্ছে, 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার'-এর দায়িত্ব পালনের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রে নির্বাহী দায়িত্বশীল একটি বিভাগ অবশ্যই থাকতে হবে। এ বিভাগের প্রধান দায়িত্বই হবে এই কাজ করা। তা যেমন ব্যক্তিগণের মধ্যে করতে হবে, তেমনি করতে হবে সামাজিক-সামষ্টিকভাবেও। এই দায়িত্বের দুটি দিক রয়েছেঃ (১) ব্যক্তিগত দায়িত্ব, (২) সাধারণ ও সামষ্টিক দায়িত্ব।

কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে চিন্তা করলে বুঝতে পারা যায়, এই কাজের নিগূঢ় সত্যতা ও প্রয়োজনীয় শর্ত অভিন্ন নয়। কুরআন মজীদে কখনও এ কাজের দায়িত্ব সমাজ-সমষ্টির উপর অর্পিত হয়েছে বলে মনে হয়। অর্থাৎ মুসলিম উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই এ কাজ করার দায়িত্ব পালন করতে হবে। আবার কখনও মনে হয়, সমাজকে সামষ্টিকভাবেই এ কাজ করতে হবে। প্রথমোক্ত কাজের ইঙ্গিত পাওয়া যায় ও আয়াত কয়টি থেকেঃ

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ـ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيعُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ ـ أُولٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبه: ٧١)

মু'মিন পুরুষ মেয়েলোক পরস্পরের কল্যাণকামী—অভিভাবক। তারা 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার' করে, তারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগতা করে। এরা সেই লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ্ অবশ্যই রহমত করবেন। আর আল্লাহ্ তো সর্বজয়ী-মহাবিজ্ঞানী।

اَلتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرّٰكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْاٰمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ ـ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (التوبه: ١١٢)

তারা তওবাকারী-ইবাদতকারী-হাম্দকারী, যমীনে পরিভ্রমণকারী, রুকূ'কারী-সিজদাকারী, ভালো কাজের আদেশকারী, মন্দ কাজ থেকে নিষেধকারী, আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা রক্ষাকারী—হে নবী! তুমি এই মু'মিন বান্দাগণকে সুসংবাদ দাও।

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ (ال عمران: ١١٠)

তোমরাই হচ্ছ সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী। তোমাদেরকে জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই গড়ে তোলা হয়েছে। তোমরাই ভালো কাজের আদেশ কর ও মন্দ

কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখ আর তোমরা সব সময়ই আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল।

এ তিনটিই এবং এ ধরনের আরও অন্যান্য আয়াতে মুসলিম সমষ্টিকে সাধারণভাবেই সম্বোধন করে অন্যান্য কাজের সাথে সাথে 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার'-এর কাজ করার কথা বলা হয়েছে। স্পষ্ট মনে হচ্ছে, এ কাজ ইসলামী সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি—প্রত্যেক নারী ও পুরুষকেই করতে হবে।

এ ছাড়া অপর কিছু আয়াতে মুসলিম সমাজ সমষ্টিকে সম্বোধন করেছে। তা থেকে নিঃসন্দেহে মনে হয়, এ দায়িত্ব মুসলমানদের মধ্য থেকেই একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর উপর অর্পণ করা হয়েছে, যাদের উম্মত বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেনঃ

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (ال عمران: ١٠٤)

হে মুসলিমগণ! তোমাদের মধ্য থেকে একটা জনগোষ্ঠী—কতিপয় ঐক্যবদ্ধ মানুষ—এমন অবশ্যই বের হয়ে আসতে ও নিয়োজিত থাকতেই হবে, যারা সার্বিক কল্যাণের দিকে আহবান জানাতে থাকবে এবং ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করার জন্য সর্বক্ষণ নিযুক্ত থাকবে। বস্তুত এরাই হচ্ছে সফলকাম।

আয়াতে একটি উম্মতকে 'আমর বিল-মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার' করার কাজে নিয়োজিত থাকার কথা বলা হয়েছে। আর 'উম্মত' বলতে তো এমন কিছু লোক সমষ্টি বোঝায়, যারা আকীদা-বিশ্বাসে এবং চিন্তা ও কর্মে অভিন্ন। কোন কোন আয়াতে মাত্র এক ব্যক্তিকেও 'উম্মত' বলা হয়েছে। যথাঃ

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا ۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (النحل: ١٢٠)

বস্তুত ইবরাহীম নিজস্বভাবেই একটি গোটা 'উম্মত'—জনসমষ্টি—ছিল। ছিল আল্লাহ্‌র আদেশানুগত, একমুখী, আল্লাহ্‌র জন্য একনিষ্ঠ। সে কখনই মুশরিকদের মধ্যের কেউ ছিল না।

এ আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ) এক ব্যক্তিকেই 'উম্মত' বলা হয়েছে। বোঝানো হয়েছে এমন এক ব্যক্তিকে, যিনি বিপুল কল্যাণের মিলন-কেন্দ্র। ইবনে ওহাব ও ইবনুল কাসেম ইমাম মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) একদা বলেছেনঃ

يرحم الله معاذا! كان امة قانتا

আল্লাহ হযরত মায়াযকে রহম করুন! তিনি একান্ত আল্লাহ অনুগত এক ব্যক্তি-সমষ্টি ছিলেন।

উপস্থিত একজন বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা তো হযরত ইবরাহীম (আ)-কে এই শব্দে অভিহিত করেছেন (যে শব্দে আপনি হযরত মায়াযকে অভিহিত করলেন)? জবাবে তিনি বলেনঃ

ان الامة الذى يعلم الناس الخير وان القانت هو المطيع -

উম্মত তো সে-ই যে লোকদেরকে মহাকল্যাণের জ্ঞান শিক্ষা দেয়। আর 'কানেত' অর্থ হচ্ছে অনুগত।[১]

ইমাম জা'ফর সাদেক (র) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলঃ 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার' করা সমস্ত উম্মতের প্রতি ওয়াজিব? বললেনঃ না।....কেননা তা এমন ব্যক্তির কাজ, যে শক্তিশালী, সকলেই মানে এবং 'মা'রূফ'ও 'মুনকার' সম্পর্কে যথার্থ আলিম। কোন দুর্বল ব্যক্তির জন্য একাজ নয়।[২]

বস্তুত 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার' কাজটি কোন ছেলেখেলা নয়। নেহাত দাওয়াতখুরী, ওয়ায নসিহত ও পীর-মুরীদীর ব্যাপারও নয়, তা অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ। এ কাজের জন্য রাষ্ট্রশক্তির সমর্থন ও সহযোগিতা একান্ত অপরিহার্য। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেনঃ

الذين ان مكنهم فى الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور (الحج: ٤١)

তারা সেই লোক, যাদেরকে আমরা যদি পৃথিবীতে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করি তাহলে তারা 'সালাত' কায়েম করবে, যাকাত আদায় ও বন্টন করবে এবং 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার' করবে। অবশ্য সর্ব বিষয়ের শেষ পরিণতি তো আল্লাহ্রই জন্য।

এ আয়াত স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার'-এর কাজ যথার্থভাবে করার জন্য শক্তি-সামর্থ্য প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির প্রয়োজন, যা কেবল রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থনের মাধ্যমেই পাওয়া যেতে পারে। আয়াতের শুরুর শব্দটিতে রাষ্ট্রের প্রধান নায়ক বুঝিয়েছে। আর পরবর্তী

১. الجامع لاحكام القران للقرطبى ج:١٠، ص:١٩٨

২. معالم الحكومة الاسلامية ص: ٣٢٤

শব্দসমূহ রাষ্ট্রপ্রধানের অধীন সরকারী শাসক-প্রশাসক ও কর্মচারীদের বুঝিয়েছে, যাদের হাতে নির্বাহী শক্তি (Executive power) থাকে। অন্যথায় শুধু মৌখিক ওয়ায-নসীহতই হতে পারে, কোন 'আমর'—আদেশ এবং কোন 'নিহী'—নিষেধ বাস্তবভাবে কার্যকর ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আর তা কার্যকর ও বাস্তবায়িত না হতে পারলে তা নিতান্তই ব্যর্থ ও অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু তাই বলে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অপেক্ষায় ফেলে রাখতে হবে এবং যদ্দিন ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম না হচ্ছে তদ্দিন তা করা হবে না, এমন ধারণা পোষণও ঠিক নয়। সত্য কথা হচ্ছে, এ কাজ করতেই হবে। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার পর এ কাজ করতে হবে রাষ্ট্রীয়ভাবে। আর ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা-পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া না গেলেও—এমন কি তার প্রবল বিরুদ্ধতা থাকলেও তা উপেক্ষা করেই এই কাজ করতে হবে। করতে হবে সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করার লক্ষ্যে, যা প্রতিষ্টিত হওয়ার পর এই কাজ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসেবেই করবে। আর তা কায়েম না হওয়া পর্যন্ত তা কায়েম করার লক্ষ্যেই তা করতে হবে, করে যেতে হবে এবং সকল বাঁধা প্রতিবন্ধকতাকে অগ্রাহ্য ও উপেক্ষা করেই তা করতে থাকতে হবে। করতে হবে সকল সময়, সকল অবস্থায়। তখন এই কাজ মৌখিক দাওয়াত হিসেবেই করতে হবে। এই মৌখিক দাওয়াতকে দু পর্যায়ে ভাগ করা যায়ঃ

প্রথম পর্যায়ে এ কাজ করবে এমন প্রত্যেক মুসলমানই, যার ইসলামের বুনিয়াদী ও জরুরী বিষয়াদি—তার হালাল ও হারাম সম্পর্কে মৌলিক ও মোটামুটি ইল্‌ম রয়েছে। এ কাজ হবে ব্যক্তিগতভাবেই।

আর দ্বিতীয় পর্যায়ে তা হবে দলবদ্ধভাবে। এই দল হতে হবে এমন সব লোকের সমন্বয়ে যারা দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে গভীর ও ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেছে, এজন্য সময় শ্রম নিয়োগ করেছে। তারা দ্বীন সম্পর্কে কেবল মোটামুটিভাবেই জানবে না, বরং তার বিস্তারিত ও খুটিনাটি বিষয়েও ভালভাবে ও গভীর সূক্ষ্মভাবে জানবে। এ কথাই আল্লাহ্‌র এ আয়াতটি থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেঃ

وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ـ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (التوبه: ١٢٢)

ঈমানদার লোকদের সকলেরই বের হয়ে পড়া জরুরী ছিল না। কিন্তু এরূপ কেন হলো না যে, তাদের প্রত্যেক জনগোষ্ঠী থেকে কিছু সংখ্যক লোক বের হয়ে আসত ও দ্বীন সম্পর্কে গভীর সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ করত এবং তাদের নিকট

ফিরে এসে নিজ নিজ এলাকার লোকজনকে পরকালের ব্যাপারে সতর্ক করে তুলবে, তাতে আশা করা যায়, তারা হয়ত সতর্ক হয়ে যাবে।

'ইলম' অর্জনের জন্য বেরিয়ে পড়া যে ওয়াজিব, এ আয়াতটি তারই দলীল। মদীনা থেকে দূরে দূরে অবস্থানকারী লোকেরা এক সাথে নিজেদের ঘরবাড়ী ত্যাগ করে সকলেই রাসূলের নিকট দ্বীন শিক্ষা লাভের জন্য চলে যাবে, তা আল্লাহ্‌র পছন্দ নয়। শুধু তা-ই নয়, বাস্তবে তা অনেক সময় সম্ভবও হয় না। তাই আল্লাহ্ বললেন, সকলেই নয়, প্রত্যেক এলাকার লোকজনের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক রাসূলে করীম (স)-এর নিকট গিয়ে অবস্থান করতে পারে এবং তাঁর নিকট থেকে দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করতে পারে। জ্ঞান অর্জন শেষ হলে তারা নিজেদের লোকজনের নিকট ফিরে এসে তাদেরকে দ্বীনের শিক্ষা দান করবে।

কি শিক্ষা লাভের জন্য তারা বেরিয়ে পড়বে? কুরআন বলেছেঃ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ দ্বীন সম্পর্কে 'তাফাক্কুহ্— تَفَقُّه লাভ করার জন্য। এই 'তাফাক্কুহ্ বলতে কি বোঝায়? শব্দটি 'ফিক হুন'— فِقْه থেকে নির্গত। এর অর্থঃ সমঝ বুঝ, গভীর সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং তৎলব্ধ দৃঢ় প্রত্যয়, যা জনগণকে সতর্ক করার জন্য—অন্য কথায় দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে লোকদের মধ্যে চিন্তা বিবেচনা বিচার-বুদ্ধি ও সমঝ-বুঝ সৃষ্টি করে তাদেরকে পরকালীন দুঃখময় পরিণতি থেকে বাঁচার জন্য এখন-ই—এই দুনিয়ায় সতর্ক জীবন যাপনের জন্য প্রস্তুত করা। আর সেজন্য এ কাজ যারা করবে তাদের নিজেদেরকেই সর্বাগ্রে এই গুণ ও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। অন্যথায় তারা তাদের জন্য প্রস্তাবিত দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে না।

এই ইলম অর্জন করার গুরুত্ব বোঝাবার জন্য রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (عن انس بن مالك)

ইল্‌ম সন্ধান—ইলম লাভ করতে চাওয়া—সেজন্য চেষ্টা ও সাধনা করা প্রতিটি মুসলিমের জন্যই ফরয।

এই কাজের ফযীলত পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত বহু সংখ্যক সহীহ্ হাদীস গ্রন্থসমূহ উদ্ধৃত হয়েছে।

এই ইল্‌ম অন্য লোকদের শিক্ষাদান করার ফযীলত পর্যায়ে ইমাম দারেমী তাঁর গ্রন্থে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেনঃ

বনি-ইসরাঈল বংশে দুই ব্যক্তি ছিল। একজন ছিল দ্বীনের আলিম, সে ফরয নামায পড়ে বসে যেত ও লোকদেরকে দ্বীনের কল্যাণের শিক্ষা দান করত। আর অপর জন ফরয নামায পড়া ছাড়া দিনের বেলা নফল রোযা রাখত, রাতে না

ঘুমিয়ে নফল ইবাদত করত।—হে রাসূল, আপনি বলুন, এই দুই জনার মধ্যে কোন্ জন অতি ভালো?

জবাবে রাসূলে করীম (স) বললেনঃ

فَضْلُ الْعَالِمِ الَّذِىْ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِىْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ كَفَضْلِىْ عَلَى اَدْنَاكُمْ .

যে আলিম ফরয নামায রীতিমত আদায় করে লোকদিগকে দ্বীনের কল্যাণ শিক্ষা দানের জন্য বসে যায়, সে সেই ইবাদাতকারী ব্যক্তির তুলনায় অনেক ভালো, যে দিনে নফল রোযা রাখে ও রাতে ইবাদাত করে—এই ভালো ঠিক তেমনি, যেমন তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির তুলনায় আমি ভাল।

অপর এক হাদীসের প্রথম অংশ হচ্ছেঃ

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ (مسلم)

আল্লাহ্ যাকে কল্যাণ দিতে চান, তাকে দ্বীনের সমঝ-বুঝ ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী বানান।[১]

'আম্‌র বিল মা'রূফ'ও 'নিহী আনিল মুনকার' কাজটিকে এ ভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যায় যে, এ কাজ মোটামুটি সহজ, সেজন্য খুব বেশী প্রস্তুতির প্রয়োজন পড়ে না। খুব শক্তি-সামর্থ্য বা যোগ্যতারও তেমন আবশ্যকতা থাকে না। কেননা এ পর্যায়ের কাজ এতটুকু যে, মুখে বলতে হবে, লোকদের হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করতে ও তা পালন করার জন্য প্রস্তুত করতে চাইতে হবে।

আর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ যথেষ্ট প্রস্তুতি শক্তি-সামর্থ্য ও কর্তৃত্ব প্রতিপত্তির উপর নির্ভরশীল।

প্রথম পর্যায়ের কাজ সম্পর্কে হযরত আলী (রা) বলেছেনঃ

مَنْ تَرَكَ اِنْكَارَ الْمُنْكَرِ بِقَلْبِهٖ وَلِسَانِهٖ فَهُوَ مَيِّتٌ بَيْنَ الْاَحْيَاءِ (معالم الحكومة الاسلامية ص ٣٢٥)

দিল্ ও মুখ দিয়ে অন্যায় ও পাপের প্রতিবাদ করার কাজকে যে লোক ত্যাগ করল, সে জীবিত লোকদের সমাজে এক মৃত মানুষ।

এ পর্যায়ের কাজ করা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির পক্ষেই অতিব সহজ। কেননা মুখ দিল ও চেহারাকে অতিক্রম করে না। এ কাজ শাসক-শাসিত, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব মানুষের পক্ষে করাই সম্ভব এবং সহজ।

১. এই দীর্ঘ আলোচনা الجامع لاحكام القرآن ج ٤، ص: ٢٩٤-٢٩٦ থেকে গৃহীত।

আর দ্বিতীয় পর্যায়ের 'আম্‌ল বিল মারূফ' 'নিহী আনিল মুনকার'-এর কাজ করা ফরয রূপে গণ্য। তা দ্বীন কায়েমের সহায়ক এবং পথ-ঘাটে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং জালিমের হাত থেকে মজলুমকে রক্ষা করার পথ উন্মুক্ত করে। সভ্যতার প্রতিষ্ঠা ও স্থিতির জন্য তা অপরিহার্য এবং শত্রুর প্রতিরোধ—তার উপর দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের একমাত্র পথ। আর তা শক্তি, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ভিন্ন হতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত লুকমান (আ)-এর তাঁর পূত্রের প্রতি নসীহত প্রসঙ্গে অন্যান্য কথার সঙ্গে এ কথাটিরও উল্লেখ করেছেনঃ

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا أَصَابَكَ ـ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

(لقمان: ١٨)

ভালো কাজের আদেশ কর এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ কর। আর তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধারণ কর। মনে রেখো, এ নিশ্চয়ই অত্যন্ত উচুঁদরের সাহসিকতা ও বীরত্বের কাজ।

'আম্‌র বিল-মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার'-এর নির্দেশের পরই ধৈর্য অবলম্বন করতে বলা হয়েছে সেই বিপদে, যা তোমার উপর ঘনিয়ে আসবে। এ থেকে বোঝা যায়, এ কাজটাই এমন যে, এর ফলে এই কাজ যারাই করবে তাদের উপর বিপদ ঘনিয়ে আসা যেমন কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়, তেমনি নয় কিছু মাত্র অসম্ভবও। অন্যথায় এখানে ধৈর্য ধারনের নির্দেশ দেয়ার কোন সঙ্গতি থাকে না।

'আম্‌র বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার'-এর কাজ যে অত্যন্ত বড়, অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সে জন্য বিরাট সাহসিকতা ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন তা এ থেকেই বোঝা যায়।

আবুল আব্বাস আল-মুবরাদ বলেছেনঃ বনী-ইসরাইলীদের নিকট নবী এলেন তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয়ার জন্য। কিন্তু লোকেরা নবীগণকে হত্যা করলে পরে তাদের মধ্য থেকেই কিছু সংখ্যক মু'মিন লোক দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁরা লোকদেরকে ইসলাম পালনের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তাদেরকেও লোকেরা হত্যা করল। তাদের সম্পর্কে কুরআনে এই আয়াতটি নাযিল হয়েছেঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ـ أُولٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِينَ (ال عمران: ٢١-٢٢)

যারা আল্লাহ্‌র আয়াত অমান্য করে, নবীগণকে অন্যায়-অকারণ হত্যা করে, এমনি তাদের পর জনগণের মধ্য থেকে যারা উঠে ইনসাফ ও সুবিচার করতে বলে তাদেরকেও হত্যা করে, এই লোকদেরকে কঠিন পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। এই লোকেরা হচ্ছে এমন, যাদের (নেক) আমল ইহ্‌কাল পরকাল সর্বত্রই সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর তাদের সাহায্যকারী কেউ-ই কোথাও নেই।

এ আয়াতদ্বয় স্পষ্ট করে বলছে যে, বনি ইসরাইলের লোকেরা অকারণ ও নিতান্ত অন্যায়ভাবে কেবল নবী-রাসূলগণকেই হত্যা করেনি; নবী বা রাসূলের পর তাঁদের উম্মতের মধ্য থেকে যারাই ইনসাফ সুবিচারের আহবান জানানো ও প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টা চালানোর জন্য উঠেছেন, তাঁদেরকেও তারা হত্যা করেছে।

নবী-রাসূলগণের কাজ আল্লাহর বন্দেগী কবুল করার আহ্‌বান জানানো। যারা এই আহ্‌বানকে অগ্রাহ্য করবে তারা কাফির। বনু-ইসরাইলীদের মধ্যকার এই কাফিররা দ্বীন, ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার আহ্‌বানকারী কাউকেই ক্ষমা করেনি, সহ্য করেনি। তাদেরকে দুনিয়া থেকেই চিরদিনের তরে বিদায় করে দিয়েছে তাদেরকে হত্যা করে। এই নবী-রাসূল ও তাঁদের পরে যারা উঠেছেন, তারা যে কাজ করতেন,তা 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার' ছাড়া তো আর কিছু নয়। কিন্তু এই কাজের জন্যও তাদেরকে শক্ত প্রতিরোধ, আক্রমণ-প্রতি-আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছে, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তাদের এই অপরাধে (?) জীবনটাকে পর্যন্ত অকাতরে বিলিয়ে দিতে হয়েছে।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, 'আম্‌র বিল-মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার' কাজটির প্রথম পর্যায় খুবই সহজ, নির্বিঘ্ন ও বিপদহীন। কিন্তু এ কাজ যখন তার যথাযথ দায়িত্ব পালন করে, সমালোচনা তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে, যখন শক্তি প্রয়োগে ইসলামের দুশমনদের নির্মূল করার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়, ঠিক তখনই হয় 'আমর বিল-মা'রূফ' ও 'নিহী-আনিল মুনকার' কাজটির চূড়ান্ত স্তর।

হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ (রা) একটি ভয়াবহ ও করুণ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন—নবী করীম (স) বলেছেনঃ

বনি ইসরাইলীরা দিনের প্রথম ভাগে মাত্র এক ঘন্টা সময়ের মধ্যে তেতাল্লিশ জন নবীকে হত্যা করেছিল। তারপর বনি ইসরাইলের দাসদের মধ্য থেকে একশ' বারোজন ব্যক্তি মাথা তুলে দাঁড়াল এবং তারা 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার' করতে লাগল। কিন্তু বনি ইসরাইলীরা সেই দিনের শেষ প্রহরেই সেই সমস্ত লোককে হত্যা করেছিল। উপরোদ্ধৃত আয়াতে তাদের কথাই বলা হয়েছে।'[১]

---

১. এই সব কথাই الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ج٤ ص٤٧ থেকে উদ্ধৃত।

কাজেই 'আমর বিল-মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার' কাজটি কিছুমাত্র সহজ-সরল ও জটিলতা, বাধা-প্রতিবন্ধকতাহীন নয়। এ কাজ শুরু করলে যারা তা পছন্দ করে না—তা হোক তা চায় না তারা বাধা দেবেই। যদি বাধা না দেয় আর সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নতার সাথে এ কাজ চলছে বলে দেখা যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে বুঝতে হবে, সমস্ত মানুষই তা গ্রহণ করেছে। এ কাজের সাথে তাদের কোন বিরোধই নেই। ফলে বিঘ্ন সৃষ্টির কোন কারণ ছিল না। আর জনগণ সকলেই যদি তা গ্রহণ না করে ও তার বিরুদ্ধতা না করে তাহলে দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে জানবে যে, যা হচ্ছে তা আর যা-ই হোক, কুরআন উপস্থাপিত 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার' নয়। তা অন্য কিছু।

বস্তুত 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার' রাষ্ট্রীয় পর্যায়েই করণীয়। কিন্তু যদ্দিন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তা করা যাচ্ছে না—অন্য কথায় ইসলামী হুকুম কায়েম হয়ে সে দায়িত্ব পালন শুরু করে না দিচ্ছে, তদ্দিনও এ কাজ করতে হবে। এমনভাবে করতে হবে যেন শেষ পর্যন্ত সে কাজ রাষ্ট্রীয়ভাবেই সম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু সেই অবস্থায় এই কাজ কঠিন বাধার সম্মুখীন হতে পারে। সেজন্য জীবন ও প্রাণ দেয়ার প্রয়োজনও হতে পারে। শুধু প্রয়োজন হতে পারে তাই নয়, ইসলামী হুকুমত এমনই এক বিস্ময়কর প্রকৃতি সমৃদ্ধ ব্যবস্থা যা বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য চেষ্টাকারীদের রক্ত প্রবাহিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অর্থাৎ শাহাদাত বরণ করতে প্রস্তুত লোকদের দ্বারাই ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হতে পারে। আর তা হয়ে গেলে তখন এ কাজটির দায়িত্ব প্রধানত প্রশাসনিক ও নির্বাহী শক্তি বা বিভাগের হাতে থাকবে বটে কিন্তু প্রতি মুহূর্তের, দিন-রাতের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ও ব্যাপারে 'আমর বিল-মারূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার'-এর কাজ ব্যক্তিগণের দ্বারা একান্তই ব্যক্তিগতভাবে ও সমাজের দ্বারা দলবদ্ধভাবেই আঞ্জাম পেতে হবে। কেননা এটা সর্বজনীন দ্বীনী ফরয। এ ফরয প্রত্যেক ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে তো অবশ্যই পালন করতে হবে। সমষ্টিগত বা রাষ্ট্রীয়ভাবে তা পালিত হওয়ার প্রশ্ন তো অনেক পরে। তার স্তর ও পর্যায়ও সর্বোপরি এবং চূড়ান্ত। তখন রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতাও নির্বাহী বিভাগের মাধ্যমে প্রধানত পালিত হবে।

এই ক্রমিক পর্যায়ে দায়িত্ব পালনের কথা ও তার মাত্রা একটি প্রখ্যাত ও প্রায় মানসম্মত হাদীসে স্পষ্ট করে উদ্ধৃত হয়েছে। নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

তোমাদের মধ্যের কেউ যখন কোন অন্যায় ও শরীয়াত পরিপন্থী কাজ হতে দেখবে, তখন হস্ত দ্বারা—শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে (ও ক্রমিক নিয়মে) তা

পরিবর্তন করতে চেষ্টা করা তার কর্তব্য। তা করতে সমর্থ না হলে মুখ দিয়ে তার বিরুদ্ধে বলতে (বা ভাষা-সাহিত্য প্রয়োগে লিখতে) হবে। আর তা করতেও অসমর্থ হলে দিল দিয়ে তার প্রতিবাদ করতে হবে (কিংবা তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে হবে ও তার বিনাশ কামনা করতে থাকতে হবে)।

স্মরণ রাখতে হবে, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন, ইনসাফ কায়েম, শত্রুর উপর থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ—সর্বোপরি জালিমকে তার জুলুম থেকে বিরত রাখা, কাউকে দ্বীনের সীমালংঘন করতে না দেয়া, মুসলিম জনগণের মধ্যে পূর্ণ ইনসাফ সহকারে বায়তুলমালের সম্পদ বন্টন, যাকাত-সাদাকাত আদায় ও ব্যয়—এক কথায় অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা বিধান ব্যক্তিগত বা নিছক মৌখিকভাবে 'আম্‌র বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার' করার দ্বারা সম্পন্ন হতেই পারে না, তা সম্পন্ন করতে হবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়। রাষ্ট্রশক্তির অমোঘতা ও অপ্রতিরোধ্যতার দ্বারা। কেননা সেজন্য প্রশাসনিক শক্তি ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতেই হবে। আর তা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যবস্থাধীনেই কার্যকর হওয়া সম্ভব।

হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা)-র পর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব যখন ইয়াযীদের হাতে এলো, তখন এই দীর্ঘ আলোচিত 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার'-এর কাজ বিপর্যস্ত হয়ে যাবে মনে করেই হযরত ইমাম হুসাইন (রা) তার বিরুদ্ধে প্রায় এককভাবে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাঁর প্রতিরোধ শক্তি যখন নিঃশেষ হয়ে আসছিল, তখন আল্লাহর নিকট দোয়া করেছিলেন এই ভাষায়ঃ

اللهم انك تعلم انه لم يكن الذى كان منا منافسة فى سلطان ولا النماس شئ من فضول الحطام ولكن لزد المعالم من دينك ونظهر الاصلاح فى بلادك فيا من المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك-

(معالم الحكومةالاسلامية ص ٣٢٨. نجها البلاغة. الخطبة: ١٢٧)

হে আমাদের মহান আল্লাহ! এই যা কিছু হয়েছে তা ক্ষমতা লাভের প্রতিযোগিতা করার জন্য ছিল না। চূর্ণ-বিভক্ত জিনিসের কোন একটি অংশ অর্জনেরও ছিল না কোন আকাঙ্ক্ষা। আসলে লক্ষ্য ছিল তোমার দ্বীনের নিদর্শনসমূহ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা, তোমার জমীনের শাসন-শৃঙ্খলার অবস্থা সংশোধন ও উন্নয়ন প্রকাশমান করা,যেন তোমার মজলুম বান্দাগণ শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করতে পারে এবং তোমার শরীয়াতের 'হদ্দ'সমূহ—যা বর্তমানে সম্পূর্ণ বন্ধ ও অকেজো করে রাখা হয়েছে—পুনঃ কার্যকর করা।

বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্রে নির্বাহী বিভাগ (Executive) সদা কার্যকর না থাকলে মজলুম মানুষেরা নিরাপত্তা পেতে পারে না, বেকার করে রাখা আল্লাহ্‌র 'হদ্দ' ও

দন্ডসমূহ কার্যকর ও বাস্তবায়িত হতে পারে না। সমাজে সাধারণ সংস্কারমূলক কার্যাদি সুসম্পন্ন হতে পারে না। আল্লাহ্‌র আইন বিধান—আদেশ নিষেধসমূহ কার্যকর হতে পারে না। কুরআনের ঘোষণানুযায়ী এই বিভাগটিই হচ্ছে 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার' বিভাগ। এই বিভাগটি অবশ্যই সরকারী পর্যায়ে সরকারী শক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এ কাজ কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে সম্পাদন করতে পারে না।

এই নির্বাহী বিভাগও নিছক মুখের কথা দ্বারা বা শুধু ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে এ কাজ করতে পারে না। এজন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কার্যকর প্রয়োগ একান্তই অপরিহার্য। এ বিভাগটিই হবে সেজন্য দায়িত্বশীল। নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটি থেকেও আমরা এ তত্ত্ব জানতে পারিঃ

وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ـ لَبِئْسَ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ لَوْ لَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ـ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ (المائده: ٦٢-٦٣)

তোমরা দেখতে পাও, এদের (ইয়াহুদী সমাজের) অনেক লোক-ই গুনাহ্, জুলুম, রাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে-কর্মে প্রবল প্রতিযোগিতা ও চেষ্টা-সাধনা করে যাচ্ছে। এরা নির্ভয়ে হারাম খাচ্ছে। বস্তুত এরা যা কিছু করে, তা অত্যন্ত খারাপ।

এদের মধ্যকার আলিম ও পীর-পুরোহিতগণ তাদেরকে এসব পাপের কথা ও কাজ হারাম মাল ভক্ষণ থেকে কেন বিরত রাখছে না।..........এরা যা কিছু কাজকর্ম করছে, তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত খারাপ।

কুরআন মজীদের এই ঘোষণাটি ঐতিহাসিকভাবে এতই সত্য যে, ইতিহাসের সাক্ষ্য ও কুরআনে উল্লিখিত ঘটনাবলীর সামঞ্জস্য দেখে বিপুলভাবে বিস্মিত হতে হয়। কুরআন মজীদে উল্লিখিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে নিঃসন্দেহে লক্ষ্য করা যায় যে, সমাজের লোকেরা যখনই আল্লাহর নাফরমানী কাজে লিপ্ত হয়েছে এবং তাদের মধ্যকার সাধারণ সুস্থ বুদ্ধির লোকেরা, আলিম ও পন্ডিত লোকেরা এবং সর্বোপরি শাসন কর্তৃপক্ষ জনগণকে সেই নাফরমানীর কাজ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেনি, লোকদেরকে বোঝায় নি কিংবা বাধা দেয়নি—জনগণ সেই নাফরমানীর কাজে ক্রমাগত এগিয়ে গিয়েছে ও গভীর ভাবে পাপ-পংকে নিপতিত হয়ে হাবুডুবু খেতে থেকেছে, তখনই সেই সমাজের উপর আল্লাহ্‌র কঠিন আযাব এসেছে এবং সে আযাবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে।

মোটকথা, কুরআন ও সুন্নাতে রাসূল (স) থেকে 'আম্‌র বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার' কাজের দুইটি প্রকার বা পর্যায় প্রমাণিত হয়। একটি

প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য পর্যায়ের আর অপরটি ক্ষমতাসীন প্রশাসনিক সংস্থার। এই দুই পর্যায়ের আয়াত ও হাদীসের মূল বক্তব্য সমস্ত সমাজ-সমষ্টির উপর এই দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার পক্ষে, আর অনেকগুলি আয়াত ও হাদীসের বক্তব্য একটি বিশেষ সংস্থার উপর এই দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার পক্ষে। প্রথমোক্ত আয়াত ও হাদীসের কথা হচ্ছে, এ দায়িত্ব সমাজের প্রত্যেক ব্যাক্তিকেই পালন করতে হবে। অর্থাৎ সকলকেই সে কাজ করতে হবে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ের আয়াত ও হাদীস প্রমাণ করে যে, এ দায়িত্ব সমষ্টিকে পালন করতে হবে তাদের পক্ষ থেকে নিয়োজিত এক জনসমষ্টি বা সংস্থাকে, যার পশ্চাতে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্বের পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন থাকবে।

প্রশ্ন হতে পারে, কুরআনে 'আম্‌র বিল-মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার' এর আদেশ এসেছে, প্রথমটির উদ্দেশ্য লোকদেরকে ভালো কাজ করতে বলা এবং দ্বিতীয়টির অর্থ লোকদেরকে উপদেশ দেয়া যে, তোমরা শরীয়াত বিরোধী কাজ করো না, কিন্তু তাতে শরীয়াতের আইন কার্যকর করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে বলে তো মনে হয় না। আর তা না হলে হত্যাকারীকে হত্যাপরাধের দন্ড দান কিংবা ব্যভিচারীকে দোর্‌রা মারা বা পাথর মেরে হত্যা করা—প্রভৃতি কুরআন-সুন্নাহ্‌র আইন বাস্তবায়িত হবে কি ভাবে?

এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, 'আম্‌র বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার' করার যে আদেশ শরীয়াতের দলীলে উদ্ধৃত হয়েছে, তার মধ্যেই কুরআন সুন্নাহ্‌র উক্ত আইন কার্যকর করার নির্দেশ ও ক্ষমতা দান রয়েছে। কেননা 'নিহী আনিল মুনকার'-এর অর্থ হচ্ছে, মানুষকে শরীয়াতের খেলাফ কাজ থেকে কার্যত বিরত রাখা—যেন 'মুন্‌কার' পর্যায়ের কোন কাজ-ই হতে না পারে। আর তা সম্ভব, যদি হত্যাকারী ও ব্যভিচারীকে কার্যত শরীয়াতের দন্ডে দন্ডিত করা হয়। কুরআনের আয়াতঃ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (البقرة: ١٧٩)

হে বুদ্ধিমান লোকেরা! কিসাসেই তোমাদের জীবন নিহিত। আশা করা যায় যে, তোমরা অবশ্যই বাঁচতে পারবে।

হত্যাকারীকে হত্যা করা যদিও আরও একটি প্রাণের সংহারকরণ, কিন্তু তা-ই সর্ব মানুষের জন্য পুনরুজ্জীবন—জীবনের নিরাপত্তার ভিত্তি। কিসাস قِصَاص -এর তা-ই লক্ষ্য। এই কারণেই আরবী ভাষায় একটি বচন প্রচলিত ছিলঃ. اَلْقَتْلُ اَنْفَى الْقَتْلَ 'হত্যা হত্যার প্রতিরোধক।'

মোদ্দা কথা, শরীয়াতের 'হদ্দ'—নির্দিষ্ট শাস্তিসমূহ কার্যকরকরণ যদিও একটি প্রাণের জন্য নেতিবাচক অবস্থা (Negation) কিন্তু তা-ই সমষ্টির জীবনের জন্য ইতিবাচক।

এই ব্যবস্থা 'আম্‌র বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার'-এর দুইটি প্রকার নির্ধারণ করে এবং সামষ্টিক পর্যায়ে 'আমর' ও 'নিহী'র দায়িত্বশীলের জন্য এমন কতিপয় জরুরী শর্তের উল্লেখ করা হয়েছে, যা ব্যাক্তিগতভাবে এই দায়িত্ব পালনকারীর জন্য করা হয়নি।

বস্তুত শরীয়াত কার্যকরকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীলতা। ইসলামী সমাজের প্রাথমিক দায়িত্বশীলেরা তা নিজেরা পালন করতেন তার কল্যাণের সাধারণত্ব ও সওয়াবের বিপুলতার কারণে। আর তাঁরা 'মা'রূফ'-এর আদেশ করতেন যখন তা পরিত্যক্ত হতে দেখতে পেতেন এবং 'নিহী আনিল মুনকার' করতেন যখন দেখা যেত যে, সমাজ ক্ষেত্রে মুন্‌কার ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনকল্যাণই হতো তার মূল চালিকা। এ পর্যায়েই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ - وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا (النساء: ١١٥)

লোকদের গোপন পরামর্শে প্রায়ই কোন কল্যাণ নিহিত থাকে না। অবশ্য গোপনে কেউ যদি অপর কাউকে দান-খয়রাতের উপদেশ দেয় কিংবা ভাল কাজের জন্য অথবা লোকদের পরস্পরের কাজ-কর্মের সংশোধন সূচিত করার লক্ষ্যে কাউকে কিছু বলে, তাহলে তা নিশ্চয়ই খুবই উত্তম কাজ। আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে-কেউ এই কাজ করবে, তাকে আমরা বড় শুভ প্রতিফল দিব।

এ আয়াতে نجوى অর্থ,ঃ ততোধিক লোকের গোপন কথা-বার্তা বা পরামর্শ করা। অন্যান্য তাফসীরকারের মতে نجوى হচ্ছেঃ

كلام الجماعة المنفردة او الاثنين سواء كان ذلك سرا او جهر

(فتح القدير ج ١ ص ٤٧٦)

বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকজন বা মাত্র দুই জনের পারস্পরিক কথা-বার্তা বলা—তা গোপনে হোক বা প্রকাশ্য।

এই কথাবার্তা বা পরামর্শ কোন দান বা অর্থনৈতিক কর্তব্য পালনের জন্য হোক বা কি কোন ভাল ও মঙ্গলময় কাজের জন্য হোক অথবা জনগণের পরস্পরের মধ্যে কল্যাণ বিধানের জন্য হোক তাতে অবশ্যই সার্বিক কল্যাণ নিহিত। অবশ্য তা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে হতে হবে।

রাষ্ট্রপ্রধান বা তার নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি জনগণের সাধারণ অবস্থা পর্যবেক্ষণ. তাদের সমস্যার সমাধান করা. তাদের বিপদ-আপদ দূর করা,

তাদের সার্বিক কল্যাণের ব্যবস্থা করা—তাদের খাদ্য-পানীয়, বাসস্থান ও পথ-ঘাট উন্নয়ন বা তাদেরকে ভালো ভালো কাজে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সকল প্রকারের অন্যায় ও পাপের কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা অবশ্যই করণীয়।

এ কাজের দায়িত্বশীলকে অবশ্যই মুসলিম, স্বাধীন (ক্রীতদাস নয়), পূর্ণবয়স্ক, সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী ও সুবিচারকারী-ন্যায়বাদী হতে হবে।[১]

কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এ কাজ করার জন্য এসব শর্তের কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

এসব শর্ত ও যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তাই 'আম্‌র বিল-মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার' কাজের দুইটি প্রকারে ও পর্যায়ে বিভক্ত করে দেয় সুস্পষ্টভাবে। আর তা হচ্ছেঃ ব্যক্তিগত পর্যায় ও সমষ্টিগত পর্যায়। প্রথমটি প্রত্যেকটি মুসলমানের কর্তব্য আর দ্বিতীয়টি সরকারী ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থার দায়িত্ব। ইসলামী সমাজে এ দুটি পর্যায়ের কাজই সর্বক্ষণ চালু থাকা একান্তই আবশ্যক।

সরকার সংস্থার দায়িত্ব

সামষ্টিক ও সরকারী পর্যায়ে 'আম্‌র বিল-মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার' কাজের দায়িত্ব ও ব্যবস্থাকে আরবী ভাষায় এক শব্দে বলা হয় الحسبة-অর্থাৎ নির্বাহী কর্তৃত্ব। এই পর্যায়ের দায়িত্ব পালনের জন্য হযরত আলী (রা) 'খলীফাতুল মুসলিমীন' হিসেবে তাঁর অধীন নিযুক্ত জনৈক প্রশাসককে লিখেছিলেনঃ

مِنَ الْحَقِّ عَلَيْكَ حِفْظُ نَفْسِكَ وَالْاِحْتِسَابُ عَلَى الرَّعْيَةِ بِجُهْدِكَ فَاِنَّ الَّذِىْ يَصِلُ اِلَيْكَ مِنْ ذٰلِكَ (اى من جانب الله) اَفْضَلُ مِنَ الَّذِىْ يَصِلُ بِكَ (اى من جانب الناس)

তোমার অন্যতম কর্তব্য ও দায়িত্ব হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করা এবং জনগণের অবস্থার উপর সজাগ-সতর্ক দৃষ্টি রাখা। এজন্য তোমাকে প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে হবে। জেনে রাখবে, এ কাজের ফলে তুমি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে যে সওয়াব পাবে, তা থেকে অনেক উত্তম, যা তুমি জনগণের নিকট থেকে পাবে।

এই পর্যায়ে ব্যক্তিগতভাবে—নফল কাজ হিসেবে—এই দায়িত্ব পালনকারী এবং সরকার নিয়োজিত সংস্থার দায়িত্ব পালনকারীর মধ্যে কয়েকটি দিক দিয়ে পার্থক্য করা যেতে পারে। যেমনঃ

---

১. معالم القربة فى احكام الحسبة الابن الاخوة ص: ٧

১. সরকার নিয়োজিত ব্যক্তি বা সংস্থার কর্তব্যই হলো এই কাজ করা। এটা রাষ্ট্রের অর্পিত দায়িত্ব হিসেবেই পালনীয়। তাদের ছাড়া অন্যদের পক্ষে এ কাজ 'ফরযে কিফায়া' পর্যায়ের।

২. সরকার নিয়োজিত ব্যক্তি বা সংস্থাকে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনেই সার্বক্ষণিকভাবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতে হবে। সে কাজ ছাড়া অপর কোন কাজে নিয়োজিত হওয়া বা সময় কিংবা কর্মশক্তি ব্যয় করার কোন অধিকার তার থাকতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য লোকদের পক্ষে এ কাজ ছাড়াও অন্যান্য কাজে অংশ গ্রহণে কোন বাধা নেই। কেননা তাদের জন্য তা 'নফল' পর্যায়ের।

৩. যে কাজকে বাধাদান তার কর্তব্য, সে কাজের প্রতি তার থাকতে হবে পরম শত্রুতা। সেজন্য প্রয়োজনমত শক্তি প্রয়োগও তার কর্তব্যভুক্ত। অন্যান্যদের জন্য তা নয়।

৪. সরকার নিয়োজিত ব্যক্তি বা সংস্থাকে এই কাজের জন্য যখনই এবং যেখান থেকেই ডাক আসবে তাতে মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করেই সাড়া দিতে হবে। অন্যান্যদের জন্য তা কর্তব্যভুক্ত নয়।

৫. তার অধিকার রয়েছে 'মুনকার' দমনের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যকারী নিয়োগ করার। কেননা তাকে তো কেবল এই কাজের জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে এবং যে-কোন ভাবে তাকে তা সম্পন্ন করতেই হবে। আর সেজন্য তাকে অবশ্যই শক্তিসম্পন্ন ও পরাক্রমশালী হতে হবে। অন্যন্যদের জন্য ততটা করা জরুরী নয়।

৬. প্রকাশ্যভাবে 'মুন্‌কার' কাজ সংঘটিত হয়ে থাকলে তাতে 'তা'জীর' করা—উপস্থিত ভাবে শাস্তি দান—করার অধিকার রয়েছে। তবে তাতে সীমালংঘনের কোন অধিকার তার নেই। কিন্তু অন্যান্য লোকদের পক্ষে 'তা'জীর' বা শাস্তিদানের—অন্য কথায় আইন হাতে লওয়ার কোন সুযোগ বা অধিকার থাকতে পারে না।

৭. সরকার নিয়োজিত ব্যক্তি বা সংস্থার বেতন-ভাতা বায়তুলমাল থেকে দিতে হবে। নফল কাজ হিসেবে যারা এই কাজ করবে, বায়তুলমাল থেকে তাদেরকে বেতন-ভাতা দেবার কোন ব্যবস্থা থাকতে পারে না।

সরকার নিয়োজিত ব্যক্তি বা সংস্থা এবং নফল কাজ হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে এই কর্তব্য পালনকারীর মধ্যে মোটামুটি এ-ই হচ্ছে পার্থক্যের বিভিন্ন দিক।[১]

---

১. معالم القربة فى احكام الحسبة ص: ١١

উপরে এই কথাগুলি কুরআন ও সুন্নাহ ঘোষিত বিধানের আলোকে-নিঃসৃত। আর এ সবই সাধারণভাবে সর্ব মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ। ইসলামী রাষ্ট্রনীতির মধ্যে এগুলি নিবিড় ও গুরুত্বপূর্ণ ভাবে অন্তর্ভুক্ত। এই প্রেক্ষিতে একথাও স্পষ্ট যে, সরকারী সংস্থার কাজ নিছক ওয়ায-নসীহতের সাহায্যে 'মুন্‌কার' প্রতিরোধ করা নয়, তাদের কর্তব্য, ওয়ায-নসীহতের পর্যায় অতিক্রম করে প্রয়োজনমত শক্তি নিয়োজিত করা। কেননা এ ছাড়া সামষ্টিকভাবে শান্তি শৃঙ্খলা (Law and order) স্থাপিত ও রক্ষিত হতে পারে না, পারে না জনগণের জান-মাল-ইযযত আবরু'র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। অথচ ইসলামী রাষ্ট্রের এটাই হচ্ছে অন্যতম প্রধান কাজ। শরীয়াত বিরোধী কাজকে কার্যত দমন ও প্রতিরোধ করা না হলে 'ইসলামী হুকুমাত' কায়েম করাই অর্থহীন ও নিষ্ফল চেষ্টা-প্রচেষ্টা মাত্র।

এই সংস্কার কার্যাবলীর একটি তালিকা এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে নমুনাস্বরূপ এ সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা দেয়ার জন্য মাত্রঃ

১. যাবতীয় হারাম যন্ত্রপাতি, মদ্যপান. জুয়াখেলা, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই. যিনা-ব্যভিচার, ধর্ষণ ইত্যাদির ব্যাপারে ব্যাপক সতর্ক দৃষ্টি রাখা, যেন এই ধরনের কোন কাজ সমাজে হতেই না পারে। এই কাজ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভুক্ত।

২. ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম-যিম্মী-নাগরিকদের সাধারণ সার্বিক অবস্থা এবং সেই সাথে তাদের কর্মতৎপরতার প্রতি তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি রাখা! তাদের অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তার দিক দিয়ে কোনরূপ অসুবিধা সৃষ্টি হতে না পারে, কোনরূপ অবিচার-জুলুম, অধিকার হরণ বা বঞ্চনা ঘটতে না পারে—সেই সাথে তারা কোনরূপ রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হতে না পারে, সে বিষয়ে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন। এই ব্যাপারও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েরই।

৩. সাধারণ জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্কতা রাখা। কোনরূপ সংক্রামক রোগ বা মহামারী দেখা দিলে অবিলম্বে তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ। বিশেষভাবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এই কাজ।

৪. ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লেন-দেনের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখা, যেন নিষিদ্ধ পন্থায় এসব কাজ হতে না পারে। সুদ-ঘুষের কোন কাজ হতে না পারে, সে দিকে লক্ষ্য রাখা। এ কাজ অর্থ মন্ত্রণালয়েরও অধীন থাকবে।

৫. সামাজিক ও নৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনরূপ বিপর্যয় দেখা দিতে না পারে—পূর্ব থেকেই সে ব্যাপারে সজাগতা অবলম্বন এবং কোথাও পারস্পরিক

ঝগড়া-ফাসাদ ও বিবাদ-বিসম্বাদ দেখা দিলে অনতিবিলম্বে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ, যেন বড় ধরনের কোন দুর্ঘটনা ঘটতে না পারে। এটি স্বরাষ্ট্র পর্যায়ের কাজ হলেও সামাজিক সংহতি ও সম্প্রীতি রক্ষার গুরুত্বের কারণে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় গড়ে তোলা যেতে পারে।

৬. জনগণের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির—বিশ্লেষণ করে খাদ্য-পানীয়-দ্রব্যাদি-পরিধেয় বস্ত্রাদির ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ কোনরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে না পড়ে, সেজন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ—কোন দিকে একবিন্দু অসুবিধা দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গেই তা দূর করা। এটা খাদ্য বিভাগের দায়িত্বভুক্ত। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা একান্তই কর্তব্য।

৭. যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সর্বতোভাবে নির্বিঘ্ন ও বাধা-প্রতিবন্ধকতা মুক্ত রাখা, যেন জনগণের যাতায়াত, সংবাদ আদান-প্রদান–প্রেরণ-গ্রহণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোনরূপ বিঘ্নতার সৃষ্টি হতে না পারে, পণ্যদ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি ও অভ্যন্তরীণ আগমন-নির্গমনে কোন অসুবিধা না হয়, তাও লক্ষ্য করতে হবে। বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের কোন দুর্নীতি বা ঠকবাজি চলতে দেয়া যাবে না।

৮. পরিমাপ যন্ত্র, নিক্তি, দাড়িপাল্লা, গজ-ফিতা, লিটার-মিটারের ক্ষেত্রে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চালু করতে হবে। এসব ক্ষেত্রেও যাতে করে শরীয়াতের সীমা-লঙ্ঘিত হতে না পারে, তা অবশ্যই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ও সদা কার্যকর নীতেতে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।

৯. শ্রমজীবীদের প্রতি মালিক বা মনিব পক্ষ থেকে কোনরূপ অবিচার, জুলুম বা পীড়ন না হয়, তা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য রাখতে হবে। শ্রমজীবীদের মধ্যে কোনরূপ শ্রেণী-পার্থক্য করা চলতে পারে না। পেশাজীবীদের কার্যে বিঘ্ন না ঘটে, প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অবভাব বা দুষ্প্রাপ্যতা দেখা না দেয়, তাতে কোনরূপ একচেটিয়া কর্তৃত্ব বা মজুদকরণ (Hoardins) না চলে তা গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে।

১০. শিক্ষাক্ষেত্রে কোন অচলাবস্থা দেখা না দেয়, শিক্ষকদের, ইমাম-মুয়ায্যিনদের বেতন-ভাতায় অসুবিধা না ঘটে, ছাত্র শিক্ষকদের পারস্পরিক সম্পর্কের পতন না ঘটে, শিক্ষক ও ইমামগণের স্বকাজের যোগ্যতা-অযোগ্যতা যথার্থভাবে যাচাই-পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতে থাকে, তার উপরও কড়া নজর রাখতে হবে।

১১. শিশু, বালক, স্ত্রীলোকদের অযত্ন, লালন-পালন-হিফাযতে কোনরূপ অসুবিধা দেখা দেয়া, কোনরূপ নীতিহীনতার অনুপ্রবেশ, অশিক্ষা-কু-শিক্ষার

প্রচলন হওয়া ইত্যাদি ক্ষতিকর দিকগুলির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে ও তার প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. সর্বোপরি গোটা সমাজ ও লোক সমষ্টির সার্বিকভাবে ইসলামী আদর্শ পালন ও অনুসরণে কোনরূপ বক্রতা না আসে, জনগণ জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত না হয়, কোন একজন মানুষও ন্যায্য ও সুবিচার পাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য না হয়, ন্যায়পরতা ও ইনসাফ সর্বাধিক গুরুত্ব পায়—সে ব্যাপারে পূর্ণ সজাগ থাকতে হবে। ইসলামী আইন ভঙ্গকারীরা সঙ্গে সঙ্গে বাধাগ্রস্থ হয়—এক্ষেত্রে কোনরূপ পৌন-পুনিকতার সুযোগ না ঘটে তার সুষ্ঠু ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে। অপরাধীকে উপস্থিত শাস্তি দিয়ে সর্বপ্রকারের অনাচার প্রতিরোধ করতে হবে। এই বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অবশ্যই বিশেষ যোগ্যতা ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণের অধিকারী হতে হবে। এ পর্যায়ে ইতিহাস দার্শনিক আল্লামা ইবনে খালদুন যা লিখেছেন, তার সারনির্যাস হচ্ছেঃ

> 'আল-হাস্‌বা' হিসাব-নিকাশ গ্রহণ বা পর্যবেক্ষণ বিভাগের কাজকর্মও একটা দ্বীনী মন্ত্রণা বা বিভাগ রূপে গণ্য হয়। আর তা দ্বীনের তাবলীগেরই একটি শাখা ছিল। এই কাজের জন্য যোগ্য লোক বাছাই করার দায়িত্ব খলীফাতুল মুসলিমীন-এরই ছিল। সে যাকে পছন্দ করত, এই কাজে নিযুক্ত করত। পরে সে স্বীয় সাহায্যকারী যোগাড় করে নিত। লোকদের খারাপ কার্যকলাপ ও দুষ্কৃতির উপর কড়া নজর রাখত, খোঁজ-খবর নিত। এ ধরনের কাজের খোঁজ পেলে জরুরী প্রশাসনিক—শাস্তিদান ও শিক্ষাদানের—পদক্ষেপ গ্রহণ করত। প্রত্যেকটি ব্যাপারে লোকদেরকে বাধ্য করত, যেন তারা সাধারণ শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার মত কোন কাজ না করে। যেমন পথ-ঘাটে ভিড় সৃষ্টি না করা, যানবাহনে ও ভারবাহী পশুর উপর অবাঞ্ছনীয় দুর্বহ বোঝা না চাপানো, যেসব ঘর-বাড়ী ধ্বসে পড়ার আশংকা, তা সে সবের মালিকরা নিজেরাই যেন ধ্বসিয়ে দেয়, যেন হঠাৎ করে ধ্বসে গিয়ে পথের লোকদের বিপদে না ফেলে। পাঠশালা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শিক্ষকরা বালক-বালিকা ও শিক্ষার্থীদের উপর প্রয়োজনাতিরিক্ত মারপিট না করে। মোটকথা, এই ধরনের কাজকর্মের দায়িত্ব এই মন্ত্রণালয়ের কাজ হতো। এই মন্ত্রণালয় অপেক্ষায় থাকতো না যে, এই ধরনের ঘটনাগুলি মামলা হিসেবে তাদের নিকট আসবে, তার পরে তারা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, বরং তারা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে এই ধরনের ব্যাপারাদির দেখাশুনা করত। এদিকে তারা কড়া দৃষ্টি রাখত। যা কিছুই তারা জানতে পারত, সে জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করত। সকল প্রকারের দাবি-দাওয়া শ্রবণ করার কোন দায়িত্ব

তাদের ছিল না। বরং তাদের অর্থনৈতিক লেনদেন ও ব্যবসায়-ময়দানে যেসব ভুল ও দুর্নীতির কাজকর্ম হতো—যেমন ওজনে—মাপে বেঈমানী ও চালবাজি করা, তা বন্ধ করা এই বিভাগের দায়িত্বভুক্ত ছিল। প্রাপ্য দিতে অস্বীকারকারী ও লুট-পাটকারীদের নিকট থেকে ঋণ আদায় করা ও আত্মসাৎ করা সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া এই বিভাগের কাজ ছিল। এসব কাজ এমন, যাতে কোনরূপ সাক্ষ্য-সাবুদের প্রয়োজন পড়ে না। বিশেষ ধরনের কোন 'রায়' জানাবারও দরকার হয় না। সাধারণভাবে সংঘটিতব্য ও নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারাদিই তাদের উপর সোপর্দ করা হতো এবং অতি সহজেই সিদ্ধান্ত ও করণীয় নির্ধারণ করা যেত। বিচার বিভাগের সাথে এ সবের কোন সম্পর্ক থাকত না। এসব কাজ সাধারণ প্রশাসনিকতার আওতার মধ্যে পড়ে।'..... ফলে এই বিভাগের কর্মকর্তারা বিচার বিভাগীয় কাজেরই সম্পূরক বা সহায়তাকারী হতো।[১]

সরকারী পর্যবেক্ষক-প্রশাসনিক সংস্থার যেসব দায়িত্বের কথা আল্লামা ইবনে খালদূন বলেছেন, তা প্রায় সবই সংস্কার-সংশোধন কাজ এবং সে জন্য ব্যাপক প্রশাসনিক ও নির্বাহী ব্যবস্থাপনার একান্তই প্রয়োজন। বর্তমান কালে এই ব্যাপক কাজ যথাযথ আঞ্জাম দেয়ার জন্য বিশেষ বিশেষ মন্ত্রণালয় গড়ে তোলা হয়ে থাকে। বর্তমান কালে এই কাজ যেমন ব্যাপক ও বিশাল, তেমনি যথেষ্ট মাত্রায় জটিলও। ইসলামী যুগে এজন্য তেমন ব্যাপক কোন ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হতো না, হয় নাই। তখন কিছু সংখ্যক লোককে এই দায়িত্বে নিযুক্ত করা হলেই এবং তাদের সামান্য তৎপরতায়ই লক্ষ্য অর্জিত হতে পারত। কেননা মানুষের মধ্যে আদর্শবাদিতা ও ঈমান প্রবল ও তরতাজা ছিল বলে সব দিকের পুঞ্জীভূত সব ক্লেদ-কালিমা ধুয়ে-মুছে পরিচ্ছন্ন করে দিত। সরকারী 'ইহ্‌তিহাস' বা 'আল-হাসবা' বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যেমন সেই ঈমান ও আদর্শবাদে শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত ছিলেন, তেমনি জনগণও ছিল সে আদর্শের প্রতি পূর্ণ ঈমানদার ও উদ্বুদ্ধ। হযরত উমর (রা) খলীফাতুল মুসলিমীন হিসেবেই লোকদের সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ وَاللهِ مَا أُرْسِلُ إِلَيْكُمْ عُمَّالاً لِيَضْرِبُوْا أَبْشَارَكُمْ وَلاَلِيَأْخُذُوْا مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنِّيْ أُرْسِلُهُمْ إِلَيْكُمْ لِيُعَلِّمُوْكُمْ دِيْنَكُمْ وَسُنَنَكُمْ فَمَنْ فُعِلَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ ذٰلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ فَوَ الَّذِيْ نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لاَ قُصَّنَّهُ مِنْهُ.

হে জনগণ! আমি তোমাদের নিকট যেসব কর্মচারী প্রেরণ করি, তা এজন্য নয় যে, তারা তোমাদের মারধোর করবে কিংবা তোমাদের ধন-মাল

১. মুকাদ্দমা ইবনে খালদূন (মৃ ৮০৮ হিঃ) পৃঃ ২২৫-২২৬।

লুটে-পুটে নেবে। বরং আমি তাদেরকে তোমাদের উপর নিয়োগ করে পাঠাই এই উদ্দেশ্যে যে, তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন—তোমাদের যাবতীয় রীতি-নীতি শিক্ষাদান করবে। তা সত্ত্বেও কোন কর্মচারী যদি উপরোক্ত ধরনের কোন সামান্য কাজও করে, তাহলে তা যেন আমার নিকট অবশ্যই পৌঁছানো হয়। যাঁর হাতে উমরের প্রাণ আমি তাঁরই কসম খেয়ে বলছি, আমি তার বিচার অবশ্যই করব।

অপর একটি বর্ণনায় তাঁর এই ভাষণের ভাষা এইরূপ উদ্ধৃত হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ لَمْ اَبْعَثْ عُمَّالِىْ عَلَيْكُمْ لِيُصِيْبُوْا مِنْ اَبْشَارِكُمْ وَلَا مِنْ اَمْوَالِكُمْ اِنَّمَابَعَثْتُهُمْ لِيَحْجِزُوْا بَيْنَكُمْ وَلِيَقْسِمُوْا فَيْئَكُمْ بَيْنَكُمْ فَمَنْ فَعَلَ بِهٖ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلْيَكُمْ

হে জনগণ! আমি আমার কর্মচারীদের তোমাদের উপর এজন্য নিযুক্ত করিনি যে, তারা তোমাদের উপর বিপদ টেনে আনবে কিংবা তোমাদের ধন-মাল জোরপূর্বক কেড়ে নেবে। বরং আমি তাদের এজন্য নিযুক্ত করেছি যে, তারা তোমাদের মধ্যকার বিবাদ-বিসম্বাদ বা ঝগড়া-ফাসাদ প্রতিরোধ করবে এবং সরকারী ধন ভাণ্ডার থেকে তোমাদের প্রাপ্য তোমাদের মধ্যে বন্টন করে দেবে। সে লোকেরা এ ছাড়া অন্য কিছু করে থাকলে দাঁড়িয়ে তার বর্ণনা দাও।[১]

হযরত আলী (রা) খলীফাতুল মুসলিমীন হিসেবে তাঁর নিযুক্ত মিসরের শাসনকর্তা মালিক আশতার নখ্য়ীকে বলেছিলেনঃ

اِنَّ شَرَّ وُزَرَائِكَ مَنْ كَانَ لِلْاَشْرَارِ قَبْلَكَ وَزِيْرًا وَمَنْ شَرَكَهُمْ فِى الْاٰثَامِ فَلَا يَكُوْنَنَّ لَكَ بِطَانَةً فَاِنَّهُمْ اَعْوَانُ الْاَثِمَةِ وَاَخْوَانُ الظَّلَمَةِ ـ

তোমার পরামর্শদাতা ও কর্মকর্তাদের মধ্যে খারাপ হচ্ছে তারা, যারা তোমার পূর্বে খারাপ লোকদের পরামর্শদাতা ও সহকারী ছিল এবং অন্যায় ও পাপের কাজে তাদের সাথে শরীক হয়েছিল। অতএব তাদের সঙ্গে তোমার কোন বন্ধুত্বের সম্পর্ক কখ্খনই হতে পারে না। কেননা তারা হচ্ছে অপরাধীদের সাহায্যকারী এবং জালিমদের ভাই।[২]

এ সব ঘোষণা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব পালনে পরামর্শ ও সহযোগিতা দান, সাধারণ শান্তি-শৃঙ্খলার সংরক্ষণ, আইন কার্যকরকরণ—সর্বোপরি জনগণকে সব সময়ই

---

১. الاسلام سعيد حوى ج:٢، ص: ١٦٥-١٦٦

২. نهج البلاغة الرسالة ٥٢ بحوالة الحكومة الاسلامية ص: ٢٢٨-٢٢٩

দ্বীন-ইসলামের আইন-বিধান ও নিয়ম-নীতি শিক্ষাদানের জন্য সহকারী ও কর্মচারী নিযুক্ত করতে হবে। তারা সরাসরিভাবে জনগণের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে, তাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবন ও কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করবে এবং যে পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী বিবেচিত হবে, তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করবে ও দেশের প্রধান দায়িত্বশীল—রাষ্ট্রপ্রধান—কে অবহিত করবে।

এই পর্যায়ে কুরআন-মজীদে উদ্ধৃত হয়েছে, হযরত মূসা (আ) মহান আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করেছেনঃ

وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ - هَارُوْنَ اَخِيْ - اشْدُدْبِهٖ اَزْرِيْ - وَاَشْرِكْهُ فِيْ اَمْرِيْ

(طه: ٢٩-٣٠-٣١-٣٢)

আর আমার জন্য আমার নিজের পরিবারের মধ্য থেকে একজন সহকর্মী নির্দিষ্ট করে দাও। অর্থাৎ হারুন, যে আমার ভাই (তাকে)। তার সাহায্যে আমার হস্ত মজবুত করে দাও এবং আমার কাজে তাকে শরীক বানিয়ে দাও।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-র এই দোয়া কবুল করেছিলেন। তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেনঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا (الفرقان: ٣٥)

এবং আমরা নিশ্চিতভাবেই মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার সাথে তার ভই হারুনকে 'অজীর' বানিয়ে দিয়েছি।

হযরত মূসা (আ)-র দোয়ায় এবং আল্লাহ্‌র নিজের ঘোষণায়—উভয় আয়াতেই وزير 'অজীর' শব্দটির ব্যবহার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। وزير শব্দটি وزر থেকে নির্গত। এর অর্থ, বোঝা। আর وزير অর্থ উপদেষ্টা, সর্বোচ্চ ক্ষমতাশীলের সাহায্যকারী প্রশাসনিক বোঝা ও দায়দায়িত্ব বহনকারী, তার সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষকতাকারী।[১] নবী করীম (স) নবুয়্যাত লাভের পর একটি ভাষণে বলেছিলেনঃ আরবের কোন যুবকই সেই লক্ষ্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি, যা আমি নিয়ে এসেছি। তোমাদের মধ্যে এমন কে কে আছে, যে এই পদের গুরুদায়িত্ব পালনে আমার ওয়াজীর হতে প্রস্তুত রয়েছে?[২] বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্রনীতিতে রাসূলে করীম (স)-এর এই দাবিই আমাদের জন্য আইনের ভিত্তি। হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা)-ই সর্ব প্রথম নবী করীম (স)-এর 'ওয়াজীর' হিসেবে মক্কায় তাঁর সব দায়িত্ব পালনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।[৩]

---

১. لغات القران اردو ج:٦ ، ص: ١١١-١٢٤

২. تاريخ الكامل لابن اثير ج: ٢، ص:٢٢

৩. ابن هشام ، روض الانف ج: ١، ص: ٢٥٨

রাষ্ট্রের—যে কোন কাজের—সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলের যে সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক এবং তার পক্ষ থেকে আইন কার্যকরকরণ ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনকারী লোক নিযুক্ত করা একান্তই প্রয়োজন, তা এ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে। ইসলাম এ প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেছে। নবী করীম (স) ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল হিসেবে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কাজের অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির উপর অর্পণ করেছেন, প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য প্রশাসনিক এলাকার বিভিন্ন অংশে দায়িত্বশীল নিয়োগ করেছেন। তবে তাঁর এই নিয়োগকৃত লোকেরা তাঁর 'ওয়াজীর' নামে অভিহিত হতেন না, আসলে তারা কেউ গভর্ণর ولى বা কেউ কর্মচারী العاملين রূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে। তাঁর সময়ের উপযোগী প্রশাসনিক সংস্থাই তিনি গড়ে তুলেছিলেন এ সব লোকের সমন্বয়ে। উত্তরকালে এলাকার সম্প্রসারণ ও প্রশাসনিক দায়িত্বের গুরুত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে এই প্রশাসনিক সংস্থার সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ সংঘটিত হয়েছে।

রাসূলে করীম (স)-এর যুগে প্রশাসনিক দায়িত্বশীলদের প্রশিক্ষণ

রাসূলে করীম (স) যখনই কোন সাহাবীকে কোন অঞ্চলের প্রশাসনিক দায়িত্বশীল নিযুক্ত করে পাঠাতেন, তখনই তাকে প্রকৃত ইসলামী আদর্শানুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা ও অন্যান্য প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন। এ পর্যায়ের কয়েকটি ঐতিহাসিক প্রশিক্ষণমূলক ভাষণের উল্লেখ করা যাচ্ছেঃ

নবী করীম (স) হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-কে ইয়ামেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য যাত্রা করার পূর্বেই তাকে নিম্নোদ্ধৃত দীর্ঘ ভাষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেনঃ

> হে মুয়ায! তুমি লোকদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাব—কুরআন-শিক্ষা দান করবে। তাদেরকে অতীব উত্তম ও পবিত্র নৈতিক চরিত্র ও আদব-কায়দা শেখাবে। লোকদেরকে তাদের বাসগৃহে অবস্থান করতে দেবে—যে ভালো লোক তাকেও এবং যে মন্দ লোক তাকেও। আর তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকর করবে, তাঁর আদেশ ও নিষেধসমূহ বাস্তবায়িত করবে, তা অনুসরণে তাদেরকে বাধ্য করবে। তাদের কাজকর্মে কোনরূপ অসুবিধার সৃষ্টি করবে না, কারোর ধন-মালের ব্যাপারেও কাউকে কাতর করে তুলবে না। কেননা তা তোমার কর্তৃত্বের অধীন নয়। সে ধন-মালও তোমার নয়। তাদের রেখে যাওয়া আমানত তাদের নিকট ফিরিয়ে দেবে, তার পরিমাণ কম হোক কি বেশী। জনগণের প্রতি দয়ার্দ্রতা, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতা দেখাবে—অবশ্য

সত্যের দাবিকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করে নয়। কেননা তা হলে লোকেরা অভিযোগ তুলবে যে, তুমি আল্লাহ্‌র হক্‌কে পরিহার করেছ। যেসব ব্যাপারে তুমি ভয় করবে যে, তোমার কর্মচারীর দোষত্রুটির বোঝা তোমার উপর আসবে, সেসব ব্যাপারে আগেই তাদের সতর্ক করে দেবে। অন্যথায় সব দোষ তোমার উপরই চাপানো হবে। জাহিলিয়াতের সমস্ত নিয়ম-নীতি, প্রথা-প্রচলন ও আনুষ্ঠানিকতা বন্ধ করে দেবে, চালু রাখবে শুধু তা যা ইসলাম প্রবর্তন বা সমর্থন করেছে।

ইসলামের প্রত্যেকটি কাজ ও ব্যাপারকে প্রকাশমান প্রকট ও বিজয়ী করে তুলবে—তা ক্ষুদ্র হোক, কি বৃহৎ। তবে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করবে সালাত কায়েমের ব্যাপারে। কেননা দ্বীন কবুল করার পর তা-ই হচ্ছে ইসলামের শির। লোকদেরকে তুমি নসীহত করবে আল্লাহ্‌র নামে—তাদের স্মরণ করিয়ে দেবে আল্লাহ্ ও পরকালকে। লোকদেরকে উপদেশ দান করতেই থাকবে, কেননা তা-ই মানুষকে আমল করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণের বড় হাতিয়ার, যে আমল আল্লাহ্ খুবই পছন্দ করেন। এছাড়া জনগণের মধ্যে শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ দানের দায়িত্বশীল লোকদেরকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাঠিয়ে দেবে! তুমি দাসত্ব করবে একমাত্র আল্লাহর—তাঁরই ইবাদতে আত্মনিয়োগকারী হবে। কেননা সকলকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে। আর এ সব কাজে তুমি কোন উৎপীড়কের উৎপীড়নকে বিন্দুমাত্র ভয় করবে না।

আমি নিজে তোমাকে অসীয়ত করছি আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলার ও সত্য কথা বলার,ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি পূরণের, আমানত ফিরিয়ে দেয়ার, খিয়ানত—আত্মসাৎ ও বিশ্বাস ভঙ্গ পরিহার করার, নম্র কথা বলার, সালাম দেয়ার, প্রতিবেশীর রক্ষণাবেক্ষণের, ইয়াতীমের প্রতি দয়া-অনুকম্পা প্রদর্শনের, নেক আমলের, কামনা-বাসনা খাটো করার, পরকালকে অধিক ভালোবাসার, বিচার-দিনের হিসাব-নিকাশকে বেশী ভয় করার, সর্বাবস্থায় ঈমান রক্ষা করার, কুরআন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করার, ক্রোধ হজম করার ও খিদমতের বাহু সকলের জন্য বিছিয়ে দেয়ার।

কোন মুসলিমকে গালাগাল করা থেকেও দূরে থাকবে। কোন ন্যায়বাদী ও সুবিচারকারী রাষ্ট্রীয় নেতাকে অমান্য করা কিংবা সত্যবাদীকে অসত্যবাদী মনে করার কাজ কখনই করবে না। মিথ্যাবাদীকেও সত্যবাদী বলে মানবে না। প্রতি মুহূর্তেই তুমি তোমার রব্ব্‌কে স্মরণ করবে, যখনই কোন গুনাহ হবে, সেজন্য তাঁর নিকট নতুন করে তওবা করবে। গোপনীয় গোপন রাখবে, প্রকাশ্যকে প্রকাশ্যভাবেই করবে।

হে মুয়ায! কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তোমার সাথে আমার আর কখনই সাক্ষাৎ হবে না এই কথা যদি আমি মনে না করতাম তাহলে তোমাকে এই দীর্ঘ 'অসীয়ত' করতাম না, সংক্ষিপ্ত কথা বলেই ছেড়ে দিতাম। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, সম্ভবত এ দুনিয়ায় তোমার সাথে আর কখনই আমার সাক্ষাৎ হবে না.......

শেষ কথা হিসেবে তুমি জানবে হে মুয়ায! তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়, যার সাথে আমার সাক্ষাৎ হবে ঠিক সেইরূপ অবস্থায়, যেরূপ সে আমার নিকট থেকে বলে গিয়েছিল।[১]

এমনিভাবে রাসূলে করীম (স) হযরত আমর ইবনুল আ'স (রা)-কে বনুল হারিস গোত্রের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। তাদেরকে দ্বীন-ইসলামের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে, রাসূলের সুন্নাত ও ইসলামের বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্ব নিদর্শনাদি শিক্ষাদানের জন্য। সেই সাথে যাকাত আদায়করণও তাঁর কর্তব্যভুক্ত ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁকে একখানি 'লিপি' তৈয়ার করিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে তাঁকে নিয়োগ দিয়েছিলেন এবং তাঁর ফরমানও লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন। সে 'লিপি'নামা ছিল এইঃ

মহান আল্লাহ্‌র নামে—যিনি অতীব দয়াবান ও অশেষ অনুগ্রহশীল 'এটা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে ঘোষণা পত্র'।

হে ঈমানদারগণ, তোমরা চুক্তিসমূহ যথাযথ পূর্ণ কর। মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র নবী—রাসূল—আমর ইবনে হাজ্‌মকে ইয়ামেন প্রেরণকালে তার জন্য লিখিত চুক্তিপত্র।

তিনি তাঁর সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করার নির্দেশ দিলেন। কেননা আল্লাহ্ তো তাদের সঙ্গে রয়েছেন, যারা তাঁকে ভয় করে চলে। আর যারা সকল কাজে সর্বোচ্চ মানের কল্যাণ ও দয়াশীলতা অবলম্বন করে।

তিনি তাঁকে নির্দেশ দিলেনঃ তিনি যেন গ্রহণ করেন সত্যের ভিত্তিতে—যেমন স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি যেন জনগণকে পরম কল্যাণের সুসংবাদ দেন এবং তা অবলম্বনের আদেশ করেন। তিনি যেন লোকদেরকে কুরআন শিক্ষা দেন, তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুধাবন করান, তার ব্যবহারিক আইন-কানুন জানান। পবিত্র অবস্থা ছাড়া কুরআন স্পর্শ করতে তিনি যেন লোকদেরকে নিষেধ করেন। যে কল্যাণ জনগণের জন্য এবং যা জনগণের কর্তব্য, তা সবই যেন তিনি তাদেরকে জানান। সত্য দ্বীনের ব্যাপারে তিনি

১. الحكومة الاسلامية ص: ٢٤٣ بحوالة تحف العقول ص: ٢٥-٢٦

যেন লোকদের সাথে নম্রতা রক্ষা করেন, আর জুলুম প্রতিরোধে তিনি সর্বাধিক কঠোরতা অবলম্বন করেন। কেননা আল্লাহ জুলুমকে তীব্রভাবে ঘৃণা ও অপছন্দ করেন। তা করতে তিনি নিষেধ করেছেন। বলেছেনঃ

اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ـ

জেনে রাখো, জালিমদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।

তিনি যেন লোকদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন, জান্নাত পাওয়ার উপযোগী আমল করতে উদ্বুদ্ধ করেন। লোকদেরকে যেন জাহান্নামের ভয় দেখান। জাহান্নামে যাওয়ার কাজ করতে নিষেধ করেন। তিনি যেন লোকদেরকে নতুন করে দ্বীন-ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন, হজ্জের নিয়ম-কানুন যেন জানিয়ে দেন, তার সুন্নত ফরয ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত করেন। এ ছাড়া আল্লাহ্ আর যা যা করতে বলেছেন, তা-ও যেন জানিয়ে দেন আর বড় হজ্জই হচ্ছে বড় হজ্জ, উমরা হচ্ছে ছোট হজ্জ।.......[১]

উদ্ধৃত দুইটি নিয়োগপত্র থেকে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, রাসূলে করীম (স) তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে যে লোককে—প্রয়োজনীয় কার্যসমূহের মধ্যে—যে কাজের যোগ্য মনে করতেন, তাঁকে সেই কাজে নিযুক্ত করতেন, সেই কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব-ও দিতেন। আর শুধু নিয়োগপত্র দিয়েই তাঁকে পাঠিয়ে দিতেন না, তাঁকে কাজ সম্পর্কে পূর্ণ প্রশিক্ষণও দিতেন। তাঁর কাজের প্রকৃতি কি, কি মনোভাব নিয়ে কাজ আঞ্জাম দিতে হবে, কি নিয়ম-নীতি তাঁকে মেনে চলতে হবে, জনগণের সাথে তাঁকে কিরূপ আচরণ গ্রহণ করতে হবে, সব কথা-ই তিনি তাঁকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতেন। আর এ ভাবেই তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে সমগ্র ইসলামী রাজ্যে একটি সুসংবদ্ধ প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন।

তিনি ডাক যোগাযোগ রক্ষার জন্যও দায়িত্বশীল কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাদের জন্যও তিনি তাদের কাজের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতেন। তখনকার সময় চিঠি-পত্রের আদান প্রদান সাধারণত সরকারী পর্যায়েই হতো এবং লোক মারফত সে পত্রাদি প্রেরণ করা হতো। এই কারণে তিনি এ পর্যায়ে নির্দেশ দিয়েছিলেনঃ

اِذَا اَبْرَدْتُمْ اِلَىَّ بَرِيْدًا فَابْرِدُوْهُ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الْاِسْمِ

তোমরা যখন আমার নিকট কোন পত্রবাহক পাঠাবে, তখন তোমরা অবশ্যই ভালো চেহারার ও ভালো নামের ব্যক্তিকে পাঠাবে।[২]

---

১. سيرة ابن هشام ج: ٤، ص: ٥٩٦

২. التراتيب الادارية ج: ١، ص: ٢٤٧

আর যে লোককে কোন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পত্র দিয়ে কোথাও পাঠাতেন, তখন তাকে উপদেশ দিতেনঃ

> তুমি যখন তাদের দেশে যাবে, তখন রাত্রি কালে তথায় প্রবেশ করবে না। বরং সকাল বেলায় প্রবেশ করবে। উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন করে প্রবেশ করবে। তার পূর্বে দু'রাক্‌য়াত নামায পড়ে নেবে। আর আল্লাহ্‌র নিকট সাফল্য ও শুভ গ্রহণের জন্য দোয়া করে নেবে, সে জন্য পূর্ণ মাত্রায় চেষ্টাও করবে। আর আমার পত্র ডান হাতে নিয়ে তাদের ডান হাতে তুলে দেবে।[১]

তিনি পাহারাদারও নিযুক্ত করতেন। বিশেষ করে রাত্রিকালে সন্দেহভাজন লোকজন দেখা গেলে তাদের উপর নজর রাখার জন্য বিশেষ লোক নিযুক্ত করতেন। পাহারাদার হিসেবে হযরত সায়াদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর নাম উল্লেখ্য। অনেক অস্বাভাবিক সময়েও তাঁর জন্য পাহারাদার নিযুক্ত থাকত। উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত সায়াদ ইবনে মুয়ায (রা) বদর যুদ্ধ কালে তাঁর পাহারাদার হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।[২]

তখন হাটে-বাজারে পণ্যদ্রব্য বহন করে নিয়ে আসা লোকদের নিকট থেকে সস্তায় পণ্য ক্রয়ের জন্য বাজার থেকে দূরে পথের পার্শ্বে লোকেরা দাঁড়িয়ে থাকত এবং পণ্য বহনকারীরা পথিপার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকা এই লোকদের নিকটই পণ্য বিক্রয় করে দিত। ফলে মূল বাজারের পণ্যের আমদানি পর্যাপ্ত পরিমাণে হতো না। রাসূলে করীম (স) এই কাজ করতে নিষেধের হুকুম দেয়ার জন্য হযরত সাঈদ ইবনে সাঈদ আল-আস (রা)-কে নিযুক্ত করেছিলেন।[৩]

রাসূলে করীম (স)-এর রাষ্ট্রীয় পত্রাদি লেখার জন্য বিশেষ বিশেষ লোক নিযুক্ত ছিল। কোন রাজা-বাদশাহ্, শাসনকর্তা, দলপতি বা কবীলা-প্রধানের নিকট তিনি যেসব পত্রাদি প্রেরণ করতেন, এই কাজে নিযুক্ত লোকেরা তা লিখত ও রাসূলে করীম (স)-এর মোহর লাগিয়ে তা প্রেরণ করত। যাদের প্রতি এ সব পত্র প্রেরণ করা হতো, তারা বিভিন্ন ভাষাভাষী হতো বলে বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞ লোকদের নিয়োগ করেছিলেন। আধুনিক সরকারী ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিতে তা ছিল একটি ছোট-খাটো সচিবালয়।[৪].

এ ভাবে রাসূলে করীম (স) তাঁর রাষ্ট্রীয় কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য বহু সংখ্যক সাহায্যকারী কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। যোগ্যতা অনুযায়ী এক-একজন বা একাধিক লোকের উপর এক-একটি কাজের দায়িত্ব অর্পিত হতো।

---

১. ২.এবং ৩ النظم الاسلامية نشهاتها وتطورها ص: ٢٩٤-٤٢٨

৪. التراتيب الادارية ج: ٢، ص: ٢٨٥

আর এই সকলের সমন্বয়েই তখনকার সময় ও প্রয়োজন উপযোগী এক পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক সংস্থা ও কর্তৃপক্ষ গড়ে তোলা হয়েছিল এবং তার দ্বারা যাবতীয় সরকারী সিদ্ধান্ত ও আদেশ-ফরমান কার্যকর করানো হতো। আল্লাহ্‌র দ্বীন পূর্ণ মাত্রায় কার্যকর ও বাস্তবায়িত করাই ছিল এ সবের চরম লক্ষ্য।

প্রশাসনিক দায়িত্বে নিযুক্ত লোকদের জরুরী গুণাবলী

বস্তুত প্রশাসনিক বিভাগ-ই রাষ্ট্রের প্রকৃত আদর্শ, রীতি-নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর করার প্রধান হাতিয়ার। এই বিভাগের পূর্ণ দক্ষতা ও কার্যকরতার উপর শুধু যে রাষ্ট্রীয় আদর্শের যথার্থ বাস্তবায়ন নির্ভরশীল তা-ই নয়, রাষ্ট্রের সাফল্য স্থিতিও এরই উপর নির্ভর করে। কেননা জনগণের সাথে এই বিভাগের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। জনগণের যাবতীয় সমস্যার সমাধান, প্রয়োজন পূরণ যেমন এই বিভাগের দায়িত্ব, তেমনি জনগণকে সঠিক পথে পরিচালন, আদর্শের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে কোন বিচ্যুতি বা লংঘন-উপেক্ষা দেখা গেলে তা থেকে তাদের বিরত রাখা ও তাদের সংশোধন ইত্যাদি যাবতীয় কাজ প্রশাসনিক বিভাগকেই আঞ্জাম দিতে হয়। গোটা দেশের সাধারণ শান্তি-শৃঙ্খলা (Law and order) রক্ষা করা ও জনগণের অধিকার আদায় করা এই বিভাগেরই কর্তব্যভুক্ত।

এই বিভাগের যাবতীয় কাজ যথার্থভাবে আঞ্জাম পাওয়া এই বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিশেষ গুণের উপর নির্ভরশীল। সেই গুণ না থাকলে তারা যেমন অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারে না, তেমনি জনগণের পক্ষেও একবিন্দু শান্তি, নিরাপত্তা ও অধিকার পাওয়া সম্ভবপর হতে পারে না।

এইখানে কতিপয় প্রয়োজনীয় গুণের উল্লেখ করা যাচ্ছেঃ

১. দক্ষতা ও বিশেষজ্ঞতাঃ যে লোককে যে কাজে নিযুক্ত করা হবে বা যে লোকের উপর যে কাজের দায়িত্ব অর্পিত হবে, সেই কাজটি নিখুঁতভাবে করার যোগ্যতাই যদি তার না থাকে, তাহলে সবকিছুই নিষ্ফল হয়ে যাওয়া অবধারিত। কুরআন মজীদ এই দিকে যে গুরুত্ব আরোপ করেছে, তা আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ থেকেই স্পষ্ট হয়ঃ

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (النحل: ٤٣)

তোমরা নিজেরা না জানলে জ্ঞানবান লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা কর।

এ নির্দেশে প্রত্যেকটি ব্যাপারে দক্ষ-অভিজ্ঞ লোকদের নিকট থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয় জ্ঞান গ্রহণের উৎসাহ দেয়া হয়েছে। কেননা নিজের জানা না থাকলে তো

সে তার উপর অর্পিত কাজ করতে সক্ষম হবে না। এই কারণেই নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ الرِّيَاسَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِأَهْلِهَا

কোন কাজের প্রধানত্ব কেবলমাত্র সেই ব্যক্তির জন্যই শোভন, যে তার যোগ্যতা রাখে।[১]

তিনি আরও বলেছেনঃ

مَنْ عَمِلَ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ اَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ .

যে লোক না জেনে-শুনে কাজ করে সে সে কাজটিকেই অনেক বেশী বিনষ্ট করে দেবে তার তুলনায় যে সে কাজের যোগ্যতা রাখে।

মূলত যে কাজ যার জানা নেই বা যা করার যার যোগ্যতা ও দক্ষতা নেই, তার উপর সেই সেই কাজের দায়িত্ব অর্পণ সেই কাজটিকেই বিনষ্ট ও বিপর্যস্ত করার নামান্তর। সেই কাজটির পরিণতি খারাপ হওয়ার নিশ্চিত ব্যবস্থা মাত্র। সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারেও এ কথার যৌক্তিকতা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। তাহলে সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর ক্ষেত্রে অযোগ্য লোককে নিয়োগ ও দায়িত্বভার অর্পণ কতখানি মারাত্মক ও সামষ্টিক বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে, তা ব্যাখ্যা করে ও যুক্তি দিয়ে বলার প্রয়োজন পড়ে না। এ কারণেই এই বচনটির গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকৃতব্যঃ

اَلْحِكْمَةُ هِيَ وَضْعُ الرَّجُلِ الْمُنَاسِبِ فِي الْمَكَانِ الْمُنَاسِبِ وَمِنَ الْحُمْقِ وَضْعُ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُنَاسِبِ فِي الْمَكَانِ غَيْرِ الْمُنَاسِبِ .

যোগ্য স্থানে যোগ্য লোক নিয়োগই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। আর যোগ্য স্থানে অযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ চরম নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়।

২. বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতাঃ কর্মের যোগ্যতা-দক্ষতার পর প্রয়োজনীয় বিশেষ গুণ হচ্ছে বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা, সরকারী দায়িত্বশীলের আমানতদার হওয়া। কেননা সরকারী পর্যায়ে যত অসুবিধা ও জন-জীবনে যত দুঃখ দুর্দশা ও অবিচারের কারণ ঘটে, তার বেশীর ভাগই হয় দায়িত্বশীল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবিশ্বস্ততা, অ-নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে—আমানতে খিয়ানত করার কারণে। তাদের মধ্যে উক্ত গুণ না থাকার দরুন কত সরকারী চিন্তা-ভাবনা পরিকল্পনা যে ব্যর্থ হয়ে যায়, আদর্শ বিচ্যুতি ঘটে এবং তার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া জনগণের উপর যে কত শোষণ নির্যাতনের

১. الحكومة الاسلامية ص: ٢٤٨

পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে, তা লিখে শেষ করা যায় না। এ কারণেই কুরআন মজীদ সকল প্রকারের কল্যাণের জন্য কেবলমাত্র যোগ্য ও বিশ্বস্ত কর্মচারীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বলেছেনঃ

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (القصص: ٢٦)

তোমার জন্য সর্বোত্তম কর্মচারী হতে পারে সেই ব্যক্তি, যে দক্ষ-শক্তিমান, বিশ্বস্ত।

মনে করা যেতে পারে, কথাটি বলেছিলেন হযরত মূসা (আ) মাদ্ইয়ান উপস্থিত যে দুইজন যুবতী বোনের জন্তুগুলিকে জনাকীর্ণ কূপ থেকে পানি খাইয়ে দিয়েছিলেন, তাদেরই একজন তাঁদের বৃদ্ধ পিতাকে লক্ষ্য করে। তাঁরা তাঁকে ঘরের কাজকর্ম ও ছাগল চরানোর কাজে 'মজুর' হিসেবে নিজেদের ঘরে রেখে দিতে চেয়েছিলেন। কুরআনে এর উল্লেখ আদৌ তাৎপর্যহীন নয়।

ঘর-গৃহস্থালী ও ছাগল চরানোর কাজে লোককে যদি দক্ষ, শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত হতে হয়—যা একটি বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে—তাহলে জাতীয়, সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় কাজে যোগ্যতাসম্পন্ন দক্ষ ও বিশ্বস্ত-নির্ভরযোগ্য লোক নিয়োগের গুরুত্ব যে কত বেশী, তা না বললেও চলে।

৩. দুনিয়া-বিমুখতা ও সততা-সচ্চরিত্রতাঃ দুনিয়া বিমুখ زهد, বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায়, যে বৈষয়িক সুখ-শান্তি অন্যায়ভাবে লাভ করার প্রতি আগ্রহী নয়, যে লোক অল্প পেলেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। সরকারী ও প্রশাসনিক দায়িত্বে এই গুণের লোকদের নিয়োগ করা হলে সরকার যন্ত্রে কোনরূপ ঘুণ প্রবেশ করতে পারে না। সে লোক পদাধিকারের সুযোগে দুর্নীতির মাধ্যমে যেমন অর্থোপার্জন করতে সচেষ্ট হবে না, তেমনি কোন অন্যায় সুযোগ গ্রহণ থেকেও পূর্ণ সতর্কতার সাথে দূরে সরে থাকবে। তার দ্বারা যেমন সরকারের কোনরূপ ক্ষতি সাধিত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না, তেমনি জনগণের অধিকার হরণ বা তাদেরকে জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়ার—তাদের অধিকার হরণের মত কোন কাজ হওয়ার সম্ভাবনাও নিঃশেষ হয়ে যাবে। সে উপস্থিত স্বার্থের জন্য কিছুমাত্র কাতর হবে না, দুর্নীতির আশ্রয় দিয়ে জনগণের পকেটেও হাত দেবেনা। এ পর্যায়ে হযরত আলী (রা)-র এ কথাটির গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্যঃ

إِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلٰى أَئِمَّةِ الْعَدْلِ أَنْ يُقَدِّرُوْا مَعِيْشَتَهُمْ عَلٰى قَدْرِ ضَعَفَةِ النَّاسِ كَيْلَا يَتَبَيَّغَ بِالْفَقِيْرِ فَقْرُهُ۔

ন্যায়বাদী রাষ্ট্র নেতাদের জন্য আল্লাহ্ ফরয করে দিয়েছেন যে, তারা যেন জনগণের দুর্বলতার অনুপাতে তাদের জীবিকার পরিমাণ নির্ধারণ করে।

তাহলে তারা তাদের দারিদ্র্যের সুযোগে কোন অন্যায় কাজ করে বসবে না।

শুধু তা-ই নয়, সরকারী দায়িত্বশীল লোকদের উচ্চতর ও পবিত্রতর নৈতিক চরিত্রের গুণে ভূষিত হওয়াও আবশ্যক। দুনিয়ার প্রতি লোভহীনতা কোন নেতিবাচক গুণ নয়। বরং তা হওয়া উচিত পুরামাত্রায় ইতিবাচক। তার মধ্যে ধৈর্য-স্থৈর্য ও সহনশীলতাও থাকতে হবে। পুরাপুরি ইসলামী আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ হওয়ার কারণেই হতে হবে এইসব মহৎ গুণের অধিকারী।

অন্যথায় জনগণ যেমন তাদের প্রতি একবিন্দু আস্থাশীল হবে না, তেমনি তারাও কোন কাজে জনগণের একবিন্দু সহযোগিতা পাবে না। আর সেই সহযোগিতা না হলে গোটা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও যৌক্তিই অর্থহীন হয়ে যাবে।

বিচার বিভাগ

বিচার কার্য ও জনগণের মধ্যকার পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসাকরণ দ্বীন-ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সাধারণভাবে সমস্ত মানব সমাজেই তা মানবতার সেবায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কেননা এ কার্যটি সুষ্ঠরূপে সুসম্পন্ন হওয়ার উপরই গোটা সমাজের নিরাপত্তা, সমাজের লোকদের মনে শান্তি স্বস্তি ও নিশ্চিন্ততা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। বস্তুত যে সমাজে বিচার নেই, জনগণের ফরিয়াদ পেশ করার কোন স্থান নেই এবং তার প্রতিকার করারও কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই, তা বন্য সমাজ হতে পারে, পাশবিক সমাজ হতে পারে, তা কখনই মানুষের বাসোপযোগী সমাজ হতে পারে না।

মানুষের জন্য শুধু বিচার নয়, সুবিচারের প্রয়োজন। ফরিয়াদ পেশ করার একটা স্থান থাকাই যথেষ্ট নয়, তা মনোযোগ সহকারে ও অনুকম্পাপূর্ণ অন্তর নিয়ে শুনবার এবং তার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও ইনসাফপূর্ণ প্রতিকারের কার্যকর ব্যবস্থা থাকাও একান্তই আবশ্যক। অন্যথায় মানুষের জীবন মানবোপযোগী জীবন হওয়ার ও সে সমাজ মানুষের মানবীয় মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব হতে পারে না।

এই দৃষ্টিতে বিশ্বের সমাজসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হলে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে যে, ইসলামী সমাজ দুনিয়ার সমাজসমূহের মধ্যে যেমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তেমনি তুলনাহীন।

ইসলামী সমাজে শুধু বিচার নেই, আছে সর্বতোভাবে ন্যায়সঙ্গত নিরপেক্ষ ও আদর্শভিত্তিক সুবিচার। এ সুবিচার ও ইনসাফ ইসলামী সমাজে মানুষকে দেয় পূর্ণ মানবীয় মর্যাদা নিয়ে বসবাস করার নির্বিঘ্ন সুযোগ। নিয়ে আসে পূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা, প্রতিষ্ঠিত করে স্থিতিশীলতা, প্রত্যেকটি নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করে

তার মানবীয় অধিকার ও মর্যাদা. মানবিক ও মৌলিক অধিকার, তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। পরিণামে গোটা সমাজই হয় সর্বদিক দিয়ে পুরাপুরিভাবে ভারসাম্যপূর্ণ।

বিচারের সাথে সুবিচারের সম্পর্ক গভীর ও ওতপ্রোত। বিচার যদি শুধু বিচার না পরিপূর্ণ সুবিচার হয়, তাহলেই সমগ্র সমাজ হতে পারে ন্যায়পরতায় পরিপূর্ণ। সমাজকে ভরে দিতে পারে অভিনব শান্তি-শৃঙ্খলা, সাহসিকতা ও কর্মোদ্দীপনায়। মানুষ তখন তার নিজের প্রাণ-মান, ধন-মাল ও ইয্যত-আবরুর দিক দিয়ে হতে পারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত। আর তার ফলে গোটা রাষ্ট্রই হতে পারে সমৃদ্ধিশালী ও কল্যাণময়। কিন্তু তা-ই যদি না হয়—যদি বিচারের নামে চলে জুলুম-শোষণ-নির্যাতন, সুবিচার বলতে কোথাও কিছু খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে চতুর্দিকে অরাজকতা উচ্ছৃঙ্খলতা, মারামারি, অপহরণ-ছিনতাই, হত্যা, নারী হরণ, বলাৎকার ও চুরি-ডাকাতি-লুণ্ঠন দেখা দেয়া অবধারিত। সমগ্র সমাজটাই হয় চরমভাবে বিপর্যস্ত। মানুষ তখন বেঁচে থেকে শান্তি পায় না। শান্তির জন্য যমীনের তলায় আশ্রয় নেবার জন্য মানুষ হয়ে উঠে উদগ্রীব। আর তার ফলে রাষ্ট্র তার সমস্ত মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। শাসনকার্য সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত ও বিঘ্নিত হয়ে পড়ে, সার্বভৌমত্ব হয়ে পড়ে বিপন্ন। আর শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত ধ্বংসই হয় পড়ে ললাট লেখন।

মোটকথা, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ন্যায়পরতা ও সুবিচার। ন্যায়পরতা ও সুবিচারহীন রাষ্ট্র 'ইসলামী' নামে অভিহিত হতে পারে না। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতেও তা 'রাষ্ট্র' নামে পরিচিত হওয়ার যোগ্য নয়। এক সাথে বসবাসকারী ব্যক্তিগণের উপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় প্রধানত নাগরিকদেরকে রাষ্ট্রের স্বীকৃত আদর্শের অনুসারী বানাবার লক্ষ্যে এবং তাদের মধ্যে স্বভাবতই যেসব মতপার্থক্য, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ও ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি হয়, তা দূর করে—তার মীমাংসা করে, জনমতকে একই আদর্শিক খাতে প্রবাহিত করে, সর্বদিক দিয়ে মিল-মিশ, আন্তরিকতা-সম্প্রীতি বহাল করে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে চালিত করার উদ্দেশ্যে। সম্মুখের দিকে চলার পথে সব বাধা-প্রতিবন্ধকতাকে দূর করা। আর তার-ই জন্য প্রয়োজন সমগ্র দেশে নিরপেক্ষ সুবিচার ও ন্যায়পরতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। এই কাজটির জন্যই বিচার বিভাগ অপরিহার্য।

জনগণের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টির কারণ

ব্যক্তিগণের একত্র সমাবেশ, সমন্বয় ও সংযোজনের পরিণতিই সমাজ এবং এই সমাজের জন্যই রাষ্ট্র। ব্যক্তিগণের মন-মেজাজ, চিন্তা-ভাবনা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য,

স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র অনেক সময় পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। এতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। মানুষের ইতিহাস এর অকাট্য সাক্ষী। এ অবস্থা নিত্যনৈমিত্তিক। প্রধানত দু'টি কারণেই তা দেখা দিয়ে থাকেঃ

১. ব্যক্তির স্বার্থপরতা-স্বার্থান্ধতা। ধন-মাল. অধিকার ও মর্যাদা লাভের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগণের মধ্যে যে স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা. তা-ই এই দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের মৌল কারণ। আর তা-ও ঘটে তখন. যখন ব্যক্তিগণ সামষ্টিক আদর্শ, লক্ষ্য ও আদর্শিক মানবিকতাকে ভুলে যায়। ফলে ব্যক্তিগণ নিজের স্বার্থ লাভ করেই নিরস্ত থাকে না, অন্যদের স্বার্থের উপর হস্তক্ষেপ করতেও দ্বিধা করে না। মানুষ মানসিকভাবে এমন এক পর্যায়েও পৌছে যায়, যখন নিজের স্বার্থ উদ্ধার হোক, আর নাই হোক, অন্যদের স্বার্থ বিনষ্ট করাই হয় তার প্রধান কাজ। ব্যক্তি তখন হারিয়ে ফেলে তার ঈমান, নৈতিকতা, লজ্জা-শরম। মানুষ তখন মানবাকৃতির হিংস্র পশুতেই পরিণত হয়ে যায়।

২. ব্যক্তিগণের স্বার্থের বৈপরীত্য বা সংঘাত নয়, অনেক সময় সত্য ও স্বার্থ নির্ধারণেই চরম মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারটিকেও 'অস্বাভাবিক' বলা যায় না। কেননা ব্যক্তি যেমন এক স্বতন্ত্র সত্তা, তার মন-মেজাজ, চিন্তা-ভবনায়ও সেই স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক। প্রত্যেকেই একটা স্বতন্ত্র ধারণা পোষণ করে, যার সাথে অন্যান্য ব্যক্তিদের ধারণা সামঞ্জস্য সম্পন্ন হবে, তা জোর করে বলা যায় না। আর তার ফলে মতপার্থক্যই সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। একজনের নিকট যা সত্য, অন্যজন তাকেই মনে করে সম্পূর্ণ মিথ্যা। একজনের মতের বিজয় অন্যজনের মতের চরম পরাজয়রূপে চিহ্নিত হয়ে যায়।

এমন পরিস্থিতি দেখা দেয়াও অস্বাভাবিক নয়—ইতিহাসে বহুবার দেখা দিয়েছে, যখন উভয় পক্ষই পূর্ণমাত্রার তাকওয়া পরহেযগারীর প্রতীক, উভয়েরই মনোভাব সম্পূর্ণ নির্মল, নির্দোষ! কিন্তু প্রকৃত মত কোথায় নিহিত, তা নির্ধারণে অক্ষম হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। আর তা-ই গোটা রাষ্ট্রের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, সর্বগ্রাসী ও সর্বধ্বংসী বিপদ টেনে আনে। তখন দুই পক্ষের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন জ্বলে উঠে। এর পরিণামে কত মানুষের যে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই।

ঠিক এই কারণে কুরআন মজীদ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ উপস্থাপিত করেছে। তার ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী আদর্শ রাষ্ট্র কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছে এবং সে রাষ্ট্রের অধীন যেমন একটি শক্তিশালী ও কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার নির্দেশ রয়েছে, তেমনি একটি পূর্ণাঙ্গ বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে

বিচার বিভাগ গড়ে তোলারও তাকীদ রয়েছে। এ পর্যায়ে আমি সর্বপ্রথম উল্লেখ করব সূরা 'আল-হাদীদ'-এর আয়াতঃ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (الحديد: ٢٥)

আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি (বাইয়্যেনাত) সহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও মানদণ্ড যেন লোকেরা ইনসাফ ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং লৌহও নাযিল করেছি। তাতে রয়েছে বিরাট-অমোঘ শক্তি এবং জনগণের জন্য বিপুল কল্যাণ। এ কাজ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেন আল্লাহ্ জানতে পারেন কে তাঁকে এবং তাঁর রাসূলগণের সাহায্যে এগিয়ে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই শক্তিমান, মহা পরাক্রমশালী দুর্জয়।

ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী কৃত এ আয়াতের তাফসীরকে সম্মুখে রাখলে বলা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতটি একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র প্রশাসন ও বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার কথা অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বলে দিয়েছেন।

ইসলামের বাহক ও প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন আল্লাহ্র রাসূলগণ। রাসূলগণকে তিনি কেন পাঠিয়েছেন, কি কি সামগ্রী দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং কি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পাঠিয়েছেন, তা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় ও ভঙ্গীতে এ আয়াতে বলা হয়েছে।

শুরুতে বলা হয়েছে, রাসূলগণকে 'বাইয়্যেনাত' (সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি) দিয়ে পাঠিয়েছেন। তাফসীর বিশেষজ্ঞগণের মতে তার অর্থঃ প্রকাশ্য মু'জিযা এবং অকাট্য দলীল প্রমাণ। অথবা এমন সব বলিষ্ঠ ও শক্তিদৃপ্ত কার্যাবলী, যা মানুষকে আল্লাহ্র আনুগত্য স্বীকার করার এবং অ-আল্লাহ্ থেকে বিমুখ বা ভিন্নমুখী হওয়ার আহবান জানায়। যদিও ইমাম রাযীর মতে প্রথম অর্থটিই অধিক সহীহ্। কেননা তাঁদের আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত হওয়ার বাস্তব প্রমাণই হচ্ছে মু'জিযা ও অকাট্য দলীল।

তার পরে বলা হয়েছে, রাসূলগণকে তিনি কিতাব ও মীযান দিয়েছেন। কিতাব বলতে নিশ্চয়ই জাবুর, তওরাত, ইন্জীল ও ফুরকান (কুরআন) বুঝিয়েছেন। যেমন তিনি তাঁর সর্বশেষ রাসূল (স)-কে দিয়েছেন কুরআন মজীদ।

কিন্তু 'মীযান' اَلْمِيزَان অর্থ কি? আভিধানিকরা এর শব্দার্থ বলেছেনঃ তুলাদণ্ড, দাড়ি-পাল্লা; যা দিয়ে কোন জিনিস ঠিক ঠিকভাবে ওজন করা হয়। আর

পরোক্ষ অর্থ হচ্ছে ন্যায়বিচার, সুবিচারের নীতি ও আইন। কুরআন মজীদে এ পর্যায়ের আরও দুটি আয়াত রয়েছে। একটিঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ (الشورى: ١٧)

আল্লাহ্ তো তিনিই যিনি পরম সত্যতা সহকারে কিতাব ও 'মীযান' নাযিল করেছেন।

আর দ্বিতীয়টিঃ

وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ (الرحمن: ٧)

এক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে আল-কিতাব, আল-মীযান ও আল-হাদীস (লৌহ)—এই তিনটির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি? কয়েকটি দিক দিয়েই বিষয়টি বিবেচ্য। প্রথম, শরীয়াত পালনের বাধ্যবাধকতা আরোপ দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীলঃ একটি, যা করা বাঞ্ছণীয় তা করা এবং দ্বিতীয়, যা না করা বা ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় তা না করা কিংবা তা ত্যাগ করা। প্রথমটি স্বতঃই লক্ষ্য। কেননা ত্যাগ করাই যদি স্বতঃই লক্ষ্য হতো, তা কারোরই সৃষ্টি না হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। সেই অনাদি কালেই তো—যখন সৃষ্টি করা হচ্ছিল—তা অর্জিত ছিল। আর যা করা বাঞ্ছনীয় তা করা নফসের সাথে সংশ্লিষ্ট হলে তা হবে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শরীর বা দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট হলে তা হবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ। আল্লাহ্র কিতাবই মনোলোকের সেই সব কাজ করার পথ দেখায়, হক্ ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়, সন্দেহ-সংশয় দূর করে অকাট্য বলিষ্ঠ যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা আর 'মীযান' দৈহিক বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা করণীয় কাজ বলে দেয়। সৃষ্টিকুলের পারস্পরিক কার্যাদিই হচ্ছে বড় বড় ও কষ্ট সাপেক্ষ শরীয়াতের বিধান। এ ক্ষেত্রে আল-মীযানই ন্যায়বিচার ও জুলুম-এর মধ্যে পার্থক্য করে দেয়, কোন্টা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি আর কোন্টা ত্রুটিপূর্ণ, তা নির্দেশ করে। আর লৌহের মধ্যে রয়েছে কঠিন কঠোর শক্তি। যে কাজ অবাঞ্ছনীয় তা থেকে মানুষকে বিরত রাখে। মোটকথা, আল-কিতাব মতাদর্শ ও তত্ত্বগত শক্তি বোঝায়, আল-মীযান কর্মগত শক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে। আর আল-হাদীদ (লৌহ) যা বাঞ্ছনীয় নয় সেই কাজ প্রতিহত ও প্রতিরোধ করে। আর মন ও আত্মা—অন্য কথায় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পর্যায়ের কল্যাণেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং তার প্রতি লক্ষ্য আরোপ করা সর্বাধিক প্রয়োজন, তার পরের স্থান হচ্ছে দৈহিক কাজের আর তার পরই বাঞ্ছনীয় নয় এমন কাজ বা ব্যাপারাদির প্রতিরোধের প্রশ্ন উঠে (প্রথম পর্যায়ের দুইটি ইতিবাচক এবং তৃতীয়টি নেতিবাচক)—এই দিকে লক্ষ্য রেখেই বিষয় তিনটির উল্লেখ সেই পরম্পরায় করা হয়েছে (অর্থাৎ প্রথমে আল-কিতাব, তারপরে আল-মীযান এবং শেষে আল-হাদীস-এর উল্লেখ হয়েছে)।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বিবেচ্য ব্যাপার, হয় সৃষ্টিকর্তার সাথে সংশ্লিষ্ট হবে—যার পথ এই আল কিতাব দেখায়—অথবা হবে সৃষ্টির সাথে। সৃষ্টির সাথে হলে তা দু ভাগে বিভক্ত হবে। বন্ধু-বান্ধব ও সমপর্যায়ের লোক হলে তাদের সাথে পূর্ণ সমতা রক্ষা করে কাজ করতে হবে এবং সেজন্য আল-মীযান—তুলাদণ্ড দরকার। আর তা শত্রুদের সাথে হলে সেজন্য প্রয়োজন তরবারী—যা লৌহ দ্বারা নির্মাণ করতে হয়।

তৃতীয় পর্যায়ে বিবেচ্য, জনগণ তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম, যারা অগ্রবর্তী তাদের সাথে আল-কিতাব অনুযায়ী কাজ করতে হবে। তারা ইনসাফ করবে, সকল প্রকার শোবাহ সন্দেহ পরিহার করে চলবে। দ্বিতীয়, মধ্যম ধরনের লোক, তারা নিজেরাও ইনসাফ করবে, তাদের উপরও ইনসাফ কার্যকর করা হবে। আর সে জন্য প্রয়োজন আল-মীযান তৃতীয় হবে জালিম লোক। তাদের উপর ইনসাফ কার্যকর করতে হবে। তাদের নিকট থেকে ইনসাফ পাওয়ার কোন আশা করা যায় না। তাই তাদের দমনের জন্য লৌহ–শক্তি ও অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার অপরিহার্য।

চতুর্থ পর্যায়ে বিবেচ্য, মানুষ যখন আধ্যাত্মিকতার দিকদিয়ে উচ্চতর মানে পৌঁছে যায়, তখন তারা আল্লাহ্র কিতাবকে ভিত্তি করে চলে, এই কিতাবের বিপরীত কোন কাজ করতেই তারা প্রস্তুত হয় না। অথবা মানুষ সেই পথের পথিক হবে। তখন তাকে নৈতিকতার বিধান—বাড়াবাড়ি ও প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়ার বিচ্যুতি থেকে বাঁচার জন্য আল-মীযান-এর প্রয়োজন। তাহলেই তারা সিরাতুল-মুস্তাকীম-এর উপর অবিচল থাকতে পারে। অথবা সে হবে পাপ পথের পথিক। তাহলে তাকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার জন্য শক্তি প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে পড়ে, যা লৌহ থেকে বোঝা যায়।

পঞ্চম, দ্বীন-ইসলাম যেমন কতিপয় মৌল নীতি পেশ করে, তেমনি খুটিনাটি বিষয়েও বিধান দেয়। মৌলনীতি তো আল-কিতাব থেকেই গ্রহণীয়। আর খুটিনাটি পর্যায়ের সে সব কাজই লক্ষ্য যাতে তাদের জন্য কল্যাণ ও ন্যায়পরতা নিহিত। আর তা 'আল-মীযান' দ্বারাই পাওয়া সম্ভব। তবে যারা দ্বীনের এই মৌলনীতি ও খুটিনাটি বিষয়াদি পালন করবে না, তাদের শায়েস্তা করার জন্য লৌহদণ্ড (শক্তি) প্রয়োগ জরুরী।

ষষ্ঠ পর্য্যায়ে আল-কিতাব বলতে ন্যায়বিচার ও ইনসাফের বিধান বোঝায়। আর আল-মীযান বলে বোঝানো হয়েছে লোকদেরকে সেই ইনসাফ ও সুবিচারপূর্ণ বিধান পালনের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। আর তা শাসকমণ্ডলীরই দায়িত্ব। যে সব লোক তা পালন করতে প্রস্তুত নয়, যারা বিদ্রোহ করে, তাদের দমন ও শাসনের জন্যই 'লৌহ' (শক্তি) প্রয়োগ অপরিহার্য।

এ থেকে একথাও স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ্র কিতাবের আলিম ও ধারকগণই হচ্ছেন সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী। তাদেরই দায়িত্ব 'আল-মীযান'—তুলাদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করা, যেন জনগণ ইনসাফ ও ন্যায়বিচার পেতে পারে। আর আল-কিতাবের বিধানকে পূর্ণ ন্যায়পরতা ও ইনসাফ সহকারে কার্যকর করার জন্যই প্রয়োজন লৌহ-এর অর্থাৎ শাসন শক্তির—রাষ্ট্রের। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একেই বলা হয়েছে Coercive power বাধ্যকারী শক্তি।

কিতাব নাযিল করার কথা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু 'মীযান' ও 'লৌহ' নাযিল করার তাৎপর্য কি? ইমাম রাযী লিখেছেন, এ দুটিকেও আল্লাহ্ তা'আলা আসমান থেকেই নাযিল করেছেন। হয় জিবরাঈল তা পৌছিয়েছেন, না হয় হযরত আদমই তা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, যখন তিনি জান্নাত থেকে দুনিয়ায় এসেছিলেন। আর তার অর্থ এ-ও হতে পারে যে, তিনি তা এ দুনিয়ায়ই উৎপন্ন করেছেন, ব্যবস্থা করেছেন। তবে বলা যেতে পারে, আদর্শগতভাবে আল-মীযান কুরআনের মতই আল্লাহ্র নিকট থেকে নাযিল হওয়া জিনিস, তা এসেছে দুনিয়ায় আল্লাহ্ সৃষ্ট লৌহশক্তি-রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে (সাধারণ আরবী কথনে এবং কুরআন মজীদে নাযিল হওয়া কথটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)।

এই তিনটিই আল-কিতাব, আল-মীযান ও আল-হাদীদ মানুষের আয়ত্তে নিয়ে আসার মুখ্য উদ্দেশ্য স্বরূপ। উদ্ধৃত্ত আয়াতে বলা হয়েছেঃ

لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ـ

যেন মানুষ সুবিচার ও ন্যায়পরতা নিয়ে দাঁড়াতে পারে (জীবন যাপন করতে পারে)।

এখানে القسط অর্থ প্রত্যেকের নিজ নিজ প্রাপ্য অংশ পেয়ে যাওয়া। প্রত্যেকটি মানুষকে তার প্রাপ্য দেয়াই ইনসাফ। আর তা না দেয়াই জুলুম। জুলুম উৎখাত করে ইনসাফ কায়েম করাই এ তিনটি জিনিসেরই লক্ষ্য। এ তিনটির মিলিত শক্তিই তা করতে সক্ষম। এই তিনটির মধ্যে নিহিত রয়েছে যেমন শক্তি ও ক্ষমতা, তেমনি বিশ্বমানবতার কল্যাণ। এ তিনটির মধ্যে কোন একটি এককভাবে হয় কিছুই করতে পারে না, না হয় জুলুম না-ইনসাফী তো করতে পারে। কিন্তু ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হতে পারে না।

ইমাম রাযীর মতে বিশ্বমানবের কল্যাণ চারটি মৌলিক জিনিসের মধ্যে নিহিত। তা হচ্ছেঃ কৃষি-শিল্প, বুনন শিল্প, গৃহ নির্মাণ ও সার্বভৌম রাষ্ট্রশক্তি। কেননা মানুষের সর্ব প্রথম প্রয়োজন খাদ্য। তা প্রায় সবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে

কৃষিজাত। তারপরই তার প্রয়োজন বস্ত্রের—গাত্রাবরণের। তা বয়নশিল্পের মাধ্যমেই প্রাপ্য। তৃতীয়ত মানুষ স্বভাবতই সামাজিক জীব বিধায় তাদের একত্রিত হয়ে বসবাস করা এবং প্রত্যেকেরই নিজ নিজ যোগ্যতানুযায়ী শ্রম ও কর্মে আত্মনিয়োগ করা কর্তব্য। এ ভাবেই প্রত্যেকেরই কর্মরত হওয়ায় সার্বিক কল্যাণ লাভ সম্ভব। এ জন্য এক সামষ্টিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন যা পরস্পরের মধ্যে সৃষ্ট ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘর্ষ প্রতিরোধকে পারস্পরিক মিল-মিশ ও সমন্বয়ের মধ্যে নিয়ে আসবে, যা কেবলমাত্র রাষ্ট্রশক্তির দ্বারাই সম্ভব। আর এই চারটি কাজেই লৌহ এক অপরিহার্য উপকরণ। চাষকার্য, বস্ত্রবয়ন ও গৃহ নির্মাণ—এ তিনটি কাজের জন্য লৌহের প্রয়োজন স্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত। আর রাষ্ট্রের কার্যকরতা ও লৌহ নির্মিত অস্ত্র-শস্ত্র—বর্তমানে যাকে বলা হয় আগ্নেয়াস্ত্র—তা যতই Sophisticated বা জটিলতর ও অত্যাধুনিকই হোক—লৌহ বা ইস্পাত ছাড়া হতে পারে না। লৌহ ব্যতীত অপর কোন ধাতুই—দুনিয়ায় বহু প্রকারেরই ধাতু রয়েছে—এসব কাজে ব্যবহার যোগ্য নয়। 'লৌহ' না হলে দুনিয়ার খাওয়া-পরা থেকে শুরু করে নিরাপদে বসবাস ও আত্মরক্ষা পর্যন্ত কোন কাজই সম্পন্ন হতে পারে না।

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্র সাহায্যের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্ জানতে চান, কে তাঁর ও রাসূলের সাহায্যে এগিয়ে আসছে। আল্লাহ্র সাহায্য অর্থ আল্লাহ্র দ্বীনের সাহায্য। দ্বীনের সাহায্য অর্থ দ্বীনকে বাস্তবায়িত, প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর করে তাকে লীন হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করা। আর রাসূলের সাহায্য হচ্ছে, রাসূলের আগমন যে দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, সেই লক্ষ্য অর্জনে তাঁর সাথে লৌহ শক্তি—আদর্শগত ও বস্তুগতকে পূর্ণ মাত্রায় প্রয়োগ করে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করা। বস্তুত আল্লাহ্র কিতাবের কার্যকরতা ও রাসূলের আগমন উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করা ও রাখার জন্য এই লৌহ শক্তির ব্যবহার একান্তই অপরিহার্য। বাস্তবায়িত করার জন্য জিহাদই হচ্ছে একমাত্র উপায়। জিহাদের জন্য অস্ত্র প্রয়োজন, আর সে অস্ত্র তো লৌহ দ্বারাই নির্মিত। আর তাকে বাস্তবায়িত রাখার—ইসলামী রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্যও—লৌহশক্তি ও লৌহনির্মিত অস্ত্র-শস্ত্র একান্তই জরুরী দরকার। এইগুলির ব্যবহার করেই আল্লাহ্র এবং তাঁর রাসূলের সাহায্য করা যেতে পারে, অন্য কোন ভাবে নয়।

আল্লাহ্র জানতে চাওয়ার অর্থ, বাস্তবে মানব সমাজে যুগে যুগে দেশে দেশে এই সাহায্য কর্ম অনুষ্ঠিত হতে দেখতে চাওয়া। কেননা আল্লাহ্র ইল্ম তো চিরন্তন, বাস্তব-অনুষ্ঠানের মুখাপেক্ষী নয়। তাঁর এই দেখতে চাওয়া নিত্য নতুন করে সংঘটিত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাই জিহাদ চিরকালীন।

মোটকথা, আল্লাহ্‌র রাসূল প্রেরণ, কিতাব ও মীযান নাযিল করা এবং লৌহ ধাতু ও লৌহশক্তি (রাষ্ট্র) সৃষ্টির মুখ্য ও চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব সমাজে ইনসাফ ও সুবিচারের প্রতিষ্ঠা।[১]

মওলানা সাইয়্যদ আবুল আ'লা মওদূদী 'এবং আমরা লৌহ্ নাযিল করেছি' আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ এখানে লৌহ অর্থ রাষ্ট্রীয় ও সামরিক শক্তি। মূল বক্তব্য হলো, আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায়পরতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার শুধুমাত্র একটি প্রকল্প পেশ করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই রাসূলগণকে প্রেরণ করেন নি বরং তা বাস্তবভাবে জারি ও কার্যকর করার চেষ্টা করা, সেজন্য প্রয়োজনীয় শক্তি-সামর্থ্য সংগ্রহ করা এবং সে কাজের প্রতিরোধকারী বা তার বিপর্যয় সৃষ্টিকারী শক্তিসমূহকে যথোপযুক্ত শাস্তি দান করার ব্যবস্থা করাও তাঁদের দায়িত্বভুক্ত।[২]

তাই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একটি বিচার বিভাগ গড়ে তোলা একান্তই জরুরী।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ (الانفال: ١)

অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও পরষ্পরের মধ্যে সঠিক প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোল এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর।

এ আয়াতটির নাযিল হওয়ার প্রসঙ্গ ভিন্নতর হলেও মৌলিকভাবে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য প্রয়াজনীয় প্রধান দুটি উপকরণের সাহায্যে আসল লক্ষ্য অর্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে পারস্পরিক সুস্থ নির্মল সম্পর্ক গড়ে তোলা। আর তা সম্ভব আল্লাহ্‌র ভয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে। আল্লাহ্‌র ভয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের ভিত্তিতেই সম্ভব ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া, যার চরম লক্ষ্য পারস্পরিক প্রীতি বন্ধুত্বের ও একনিষ্ঠতা-ঐকান্তিকতার সম্পর্ক গড়ে তোলা।[৩]

আর এ কাজের জন্যই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ অপরিহার্য। বিচারকার্য ও জনগণের মধ্যকার বিবাদ-বিসম্বাদ দূর করে পারস্পরিক মিল স্থাপন করার গুরুত্ব বোঝাবার জন্য হযরত আলী (রা) বলেছিলেনঃ

صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ اَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلٰوةِ وَالصِّيَامِ

---

১. تفسير كبير للرازى ج: ٢٩ص: ٢٤٠-٢٤٣

২. تفهيم القران ج:٥، ص:٣٢٢

৩. الجامع لاحكام القران ج:٧، ص: ٣٦٤

পারস্পরিক মিল-মিশ প্রীতি-বন্ধুত্ব বিবাদহীনতা সৃষ্টি করা সাধারণ নফল নামায-রোযার তুলনায় অনেক উত্তম।[১]

এ কারণেই ইসলামে বিবদমান পক্ষদ্বয়কে মীমাংসাকারী ও বিবাদ ফয়সালাকারী লোকদের নিকট যাওয়ার জন্য এবং তাদের বিচারের রায় ও ফয়সালা আন্তরিকতার সাথে মনে নেয়ার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। কেননা পারস্পরিক বিবাদ দূরীভূত হওয়ার এছাড়া আর কোন উপায় নেই। আর এ কারণে সাধারণভাবে প্রায় সর্বপ্রকার রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এবং বিশেষ করে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ (judiciary)-কে রাষ্ট্রে একটি অন্যতম জরুরী—তৃতীয়—বিভাগ রূপে নির্দেশ করা হয়েছে। কুরআন মজীদে এই বিচার বিভাগের ভিত্তি উপস্থাপিত হয়েছে এবং রাসূলে করীম (স) ও খুলাফায়ে রাশেদুন এ বিভাগটিকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় ও শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কুরআনের ঘোষণানুযায়ী বিচার-ফয়সালার প্রকৃত কর্তৃত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলারই, তিনিই হচ্ছেন আসল ফয়সালাকারী। ইরশাদ হয়েছেঃ

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (الانعام: ٥٧)

ফয়সালা করার সমগ্র ইখতিয়ার কেবলমাত্র আল্লাহ্র। তিনিই সত্য কথা বর্ণনা করেন এবং তিনি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা মানব সমাজের দৈনন্দিন ব্যাপারাদিতে ফয়সালা দেয়ার কাজ নিজে এসে করেন না, তাই তা করার জন্য একদিকে তিনি ফয়সালা করার বিধান দিয়েছেন, ফয়সালা করার দায়িত্ব তাঁর রাসূলের উপর অর্পণ করেছেন এবং তাঁর ফয়সালা সর্বান্তকরণে মেনে নেয়ার জন্য ঈমানদার জনগণকে স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেনঃ

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرٰكَ اللّٰهُ ۚ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (النساء: ١٠)

নিঃসন্দেহে আমরা—হে নবী!—তোমার প্রতি এই কিতাব—কুরআন—নাযিল করেছি এই উদ্দেশ্যে যে, তুমি লোকদের পরস্পরের মধ্যে বিচার ফয়সালা করবে আল্লাহ্র দেখানো নিয়মে এবং তুমি কখ্খনই খিয়ানতকারী লোকদের পক্ষপাতকারী হবে না।

নির্দেশ দিয়েছেনঃ

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (المائدة: ٤٢)

---

১. نهج البلاغة قسم الكتب ٤٧

তুমি যদি বিচার ফায়সালা কর—হে নবী!—তা'হলে তাদের মধ্যে পূর্ণ ইনসাফ সহকারে বিচার-ফায়সালা কর। কেননা ইনসাফকারী ও সুবিচারকারীদের আল্লাহ্ খুবই ভালোবাসেন।

বলেছেনঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ (المائده: ٤٨)

হে নবী! আমরা তোমার প্রতি এই কিতাব পরম সত্যতা সহকারে নাযিল করেছি, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যতা ঘোষণাকারী ও তার সংরক্ষক। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে আল্লাহ্র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা কর এবং তোমার নিকট আগত পরম সত্য থেকে বিমুখ হয়ে লোকদের ইচ্ছা-বাসনা কামনার অনুসরণ করো না।

শুধু তা-ই নয়, মুহাম্মাদ (স)-কে একজন বিচারক—ফয়সালাকারী—মীমাংসাকারী রূপে মেনে নেয়া এবং তাঁর ফয়সালাকে কুণ্ঠাহীন চিত্তে মেনে নেয়া ঈমানের অপরিহার্য শর্ত। তাই অত্যন্ত কঠোর ও বলিষ্ঠ ভাষায় বলা হয়েছেঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا (النساء: ٦٥)

না, তোমার রব্ব্-এর কসম, এই লোকেরা কখ্খনই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে—হে নবী—তোমাকে বিচারক ও মীমাংসাকারী মেনে না নেবে, অতঃপর তুমি যা ফয়সালা-ই করে দেবে সে ব্যাপারে তারা তাদের মনে কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্ধ না পাবে এবং সর্বান্তকরণে ও সম্পূর্ণভাবে মাথা পেতে না নেবে।

কেবল নবী-রসূলগণের-ই এ দায়ীত্ব নয়। আল্লাহ্র বিধানের ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে বিচার-ফয়সালা করার এবং এজন্য বিচার বিভাগ কায়েম করার দায়িত্ব নির্বিশেষে সকল ঈমানদার লোকেরই। ইরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۔ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۔ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا (النساء: ٥٨).

আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চিতভাবে তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আমানত সমূহ তাদের মালিক বা প্রকৃত যোগ্যদের নিকট যেন ফিরিয়ে বা পৌছিয়ে দেয়। আর তোমরা যখন জনগণের মধ্যে বিচার কার্য সম্পন্ন করবে

তখন যেন তোমরা পূর্ণ মাত্রায় ন্যায়পরতা সহকারে ফায়সালা কর ও রায় দান কর। বস্তুত আল্লাহ্ অতীব উত্তম বিষয়ে তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চিত জানবে,আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

মামলার বিচার কার্য সম্পাদনের সময় কোন পক্ষের প্রতি বিদ্বেষ যেন অবিচার করতে তোমাদেরকে বাধ্য না করে। এ পর্যায়ের নির্দেশ দান প্রসঙ্গে আল্লাহ্ অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বলেছেনঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَلَّا تَعْدِلُوا ـ اِعْدِلُوا ـ هُوَاَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ـ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (المائده: ٨)

কোন বিশেষ দলের প্রতি শত্রুতা-বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন এতদূর ক্ষুব্ধ আক্রোশ জর্জরিত করে না তোলে যে, (তার ফলে) তোমরা সুবিচার করা থেকে বিরত থেকে যাবে, তোমরা অবশ্যই ন্যায়বিচার করবে। বস্তুত তা আল্লাহ্ পরস্তির সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল। আর তোমরা সব সময়ই আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকবে। নিশ্চিত জানবে, তোমরা যা কিছুই কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে পুরাপুরিভাবে অবহিত রয়েছেন।

এ আয়াতে শুধু যে ন্যায়বিচার করতে বলা হয়েছে তা-ই নয়, এই পথে অন্তরে নিহিত কোন বিদ্বেষ বা শত্রুতাও যেন বাঁধা হয়ে না দাঁড়াতে পারে,সে কথাও স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে এবং বিশেষভাবে বিচারকার্যে আল্লাহ্‌কে ভয় করবার জন্য তাকীদ করা হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ্‌কে সত্যিকার ভাবে ভয় করলে কারোর পক্ষে অবিচার বা বিচারকার্যে জুলুমের প্রশ্রয় দান সম্ভব হতে পারে না।

শুধু বিচারকার্যেই ন্যায়পরায়নতা ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে বলেই কুরআন ক্ষান্ত হয়নি, জীবনের সকল ক্ষেত্রে অন্য লোকদের প্রতি যেমন নিজের প্রতিও তেমনি সুবিচার করার নির্দেশ দিয়েছে। এমন কি অন্য লোকদের সাথে কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রেও এই ন্যায়পরায়নতা অক্ষুন্ন ও অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ

وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبٰى (الانعام: ١٥٢)

তোমরা যখন কথাবার্তা বলবে , তখনও অবশ্যই ন্যায়বিচার করবে—যার সাথে বা যা'র সম্পর্কে কথা বলছ, সে নৈকট্য সম্পন্ন ব্যক্তি হলেও।

বস্তুত একজন কথা বলে, অন্যজন শুনে। হয় সরাসরি শ্রোতাকেই কোন কথা বলা হয়, না হয় অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে—যে হয়ত এই সময় সেখানে অনুপস্থিত—কোন কথা বলা হয় বা কোন মন্তব্য করা হয়। এই সময়ও প্রত্যেক

ব্যক্তিকে ন্যায়বাদী হতে হবে। কথা বলেও কারোর প্রতি অবিচার করা কুরআনের নিকট অনভিপ্রেত, অবাঞ্ছনীয়।

বলা নিষ্প্রয়োজন, নবী করীম(স) আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ সমূহকে পুরাপুরিভাবে অনুসরণ করেই ন্যাবিচারের তুলনাহীন নিদর্শন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যদিও তাঁর জীবদ্দশায় তিনি একাই ছিলেন যেমন রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান, প্রধান সেনাধ্যক্ষ, তেমনি প্রধান বিচারপতিও।[১] তিনি তাঁর রাষ্ট্রের দূরবর্তী অঞ্চলের জন্য বিচারপতি নিযুক্ত করে পাঠানোর সময় নিয়োগকৃত ব্যক্তিকে বিচারকার্য সংক্রান্ত কঠিন দায়িত্ব পালনের উপযোগী উপদেশ ও শিক্ষাদান করেই পাঠাতেন। যেমন, হযরত আলী (র) কে ইয়ামেনের বিচারপতি নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন, তখন হযরত আলী (র) বললেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি আমাকে একটি এলাকার বিচারপতি নিযুক্ত করে পাঠাচ্ছেন। অথচ আমার বয়স অল্প এবং বিচারকার্য সম্পর্কে আমার কোন অভিজ্ঞতাও নাই। তখন রাসূলে করীম (স) তাঁকে বলেছিলেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ سَيَهْدِىْ قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِىْ حَتّٰى تَسْمَعَ مِنَ الْاٰخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْاَوَّلِ فَإِنَّهُ اَحْرٰى اَنْ يَّتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ .

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমার দিলকে হেদায়েত দান করবেন, তোমার জিহ্বাকে দৃঢ়বাক করে দেবেন। বিবদমান দুই পক্ষ যখন তোমার সম্মুখে বসবে, তখন এক পক্ষের বক্তব্য শুনার পর অনুরূপভাবে দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য না-শুনা পর্যন্ত তুমি কখনই বিচারকার্য সম্পাদন করবে না—রায় দেবে না। এ ভাবে কারাই বিচার কার্য তোমার জন্য সহজসাধ্য ও সুস্পষ্ট করে তোলার খুব বেশী অনুকূল হয়ে দাঁড়াবে।

হযরত মুয়ায (রা)-কে বিচারপতি নিয়োগ করেও অনুরূপ প্রশিক্ষণই তিনি দিয়েছিলেন।

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, নবী করীম (স) কুরআনের হেদায়েত অনুযায়ী ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে বিচার বিভাগকে সুষ্ঠুরূপে গড়ে তুলেছিলেন। এ পর্যায়ে কুরআনের সবগুলি হেদায়েত ও বিধানকে তিনি নিজেই বাস্তবায়িত করে গেছেন এবং তার মাধ্যমে কুরআন ভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা কি করে কার্যকর করতে হয়, তার পন্থা ও পদ্ধতিও তিনি কিয়ামত পর্যন্তকার জন্য চিরভাস্বর করে রেখে গেছেন।

---

১. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থের ৫ম খন্ডের ৩২৬ পৃষ্ঠায় নবী করীম (স)-এর বিচার কার্য সমূহের বিবরণ একত্রিত করে উদ্ধৃত করেছেন। আর আল্লামা জজরী তার কিছু অংশ জামিউল উসূল গ্রন্থের ১ম খন্ডের ৫৬৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

কুরআন মজীদে সুবিচার ও ন্যায়পরতার উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তা বোঝা যায়, সুবিচার ও ন্যায়পরতার বিপরীত শব্দ . . জুলুম-এর উল্লেখ কুরআন মজীদে এক শতেরও বেশী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্য থেকে এখানে কতিপয় আয়াতের উল্লেখ করা যাচ্ছেঃ

بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (لقمان: ١١)

বরং জালিমরাই সুস্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত।

وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (الجاثيه: ١٩)

জালিম লোকেরা পরস্পরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক।

اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ (الانعام: ٢١)

জালিম লোকেরা কখনই কোন কল্যাণ পেতে পারে না।

اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ (الشورى: ٤٠)

আল্লাহ্ নিশ্চয়ই জালিম লোকদের ভালোবাসেন না ও পছন্দ করেন না।

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (الشورى: ٤٢)

শাস্তি পাওয়ার যোগ্য সেসব লোক, যারা জনগণের উপর জুলুম করে ও যমীনে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি—সীমালংঘনমূলক—কাজ করে। এদের জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে।

اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا (الكهف: ٨٧)

যে লোক জুলুম করেছে, অনতিবিলম্বে আমরা তাকে সেজন্য শাস্তি দেব। অতঃপর তাকে তার রব্ব-এর নিকট সোপর্দ করা হবে। তখন তিনি তাকে অত্যন্ত ঘৃণ্য ধরনের আযাব দেবেন।

এ আয়াতটি স্পষ্ট করে বলছে যে, জালিমকে অনতিবিলম্ব শাস্তিদান আল্লাহ্র স্থায়ী বিধান। আর এই শাস্তিই জালিমের জন্য চূড়ান্ত বা শেষ কিংবা একমাত্র শাস্তি নয়। এর পর-ও তাকে আল্লাহ্র নিকট থেকে জঘন্য ধরনের শাস্তি অবশ্যই পেতে হবে, যা পরকালে নিশ্চিতভাবেই হবে।

এভাবে কুরআন মজীদে 'জুলুম'-এর বিরুদ্ধে জনগণের মন-মানসিকতা গড়তে চেষ্টা করা হয়েছে এবং ইসলামী রাষ্ট্রই এই জুলুম-এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য —জুলুম-এর পথ বন্ধকরণের জন্য দায়ী। আর তা সম্ভব হতে পারে সর্বাত্মকভাবে সুবিচার কায়েম করার মাধ্যমে।

কুরআন মজীদে এই 'জুলুম' ظلم শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে. عدل শব্দ। عدل শব্দের অর্থ হচ্ছেঃ সমস্ত মানুষ মানবীয় অধিকারে সম্পূর্ণ রূপে সমান—অবশ্য সেই সব মানুষ যদি আইনের অনুসারী হয়। عدل -এর অর্থঃ প্রত্যেক ব্যক্তিই তার অধিকার পাবে—কেউ-ই নিজ অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না। কেউ যদি কারোর সেই অধিকার হরণ করে, তা'হলে 'জুলুম' হবে এবং তাকে তার শাস্তি অনিবার্যভাবে ভোগ করতে হবে।[১]

ইমাম রাগেব লিখেছেনঃ

العدل هو المساوات فى المكافات ـ

প্রতিশোধ প্রমাণে পরম সমতা রক্ষা করাই হচ্ছে 'আদল'—সুবিচার বা ন্যায়পরতা'।[২]

সাইয়্যেদ শরীফ লিখেছেনঃ

اَمْرُ التَّوَسُّطِ بَيْنَ طَرْفَيِ الْاِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيْطِ الخ

মাত্রাতিরিক্ততা বা বাড়াবাড়ি ও প্রয়োজন-অপেক্ষা কম মাত্রার মধ্যবর্তী একটি সমতাবিন্দু'।[৩]

আবুল বাকা হানাফী বলেছেনঃ عدل জুলুম-এর বিপরীত অর্থবোধক শব্দ عدل হচ্ছে, হক্কদারকে হক্ক দিয়ে দেয়া, আর যার হক্ক নয়, তার নিকট থেকে নিয়ে নেয়া।'[৪]

العدل اصله ضد الجور الخ

আল্লামা আইনী লিখেছেনঃ

العدل امتثال المامورات وبذل الحق الخ

'কাজে পরিণত করা কর্তব্য—এমন সব হুকুম পালন করাই হচ্ছে 'আদল'। 'হক্ক'কে সমর্থন করা-মেনে নেওয়া ও জুলুম খতম করাই 'আদল'।[৫]

ইসলামে যে বিচার বিভাগ গড়ে তোলার জন্য তাকীদ, তা রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকের অধিকার-নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার ও সমতার

১. مصباح الاخوان التخريج ايات الاحكام طبع قسطنطنية ص: ١٧٥

২. مفردات راغب ص: ٨٤-٨٨

৩. تعرفات سير شريف باب العين ص: ٩٨

৪. كليات العلام للبى البقا ١، ص: ٤٦٦

৫. عمدة القارى ج: ١٠

সংরক্ষক। বিচারকার্যে বিচার বিভাগই চূড়ান্ত মর্যাদার অধিকারী। আইন বা শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাদান এ বিভাগেরই কাজ। এ বিভাগই আইনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে রায়দানের অধিকারী। আইনের ভিত্তিতে প্রমাণিত অধিকার প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর করা এই বিভাগেরই দায়িত্ব। এ কারণে এ বিভাগকে বলা হয় قضا —এ বিভাগকে جزا وجزا 'প্রতিফল ও শাস্তিদান'ও এ বিভাগের কাজ বলে প্রতিফল ও শাস্তিদানের বিভাগ'ও বলা হয়। হযরত উমর (রা) খলীফা নির্বাচিত হয়ে বলেছিলেনঃ 'আমি প্রতিফল-শাস্তিদানের দায়িত্ব গ্রহণ করছি।'[১] হযরত উমর (রা)-এরই কথা

إِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَبَعَةٌ.

বিচার একটা কর্তব্য ও সুকঠিন-দৃঢ় দায়িত্ব এবং অবশ্য করণীয় একটি নিয়ম।

ইবনে হুম্মাম হানাফী বলেছেনঃ বিচার বিভাগ এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা বিরোধ-বিবাদের মামলাসমূহের ফয়সালা দেয়।[২]

সরখ্সী বলেছেনঃ পারস্পরিক বিবাদের মূল প্রকৃতি ও স্বরূপ অনুধাবন, পক্ষদ্বয়ের বক্তব্য শ্রবণ ও তাদের মর্ম অনুধাবন এবং সেই দৃষ্টিতে চূড়ান্ত রায় দানের নাম-ই হচ্ছে 'কাযা'—বিচার।'[৩]

সাইয়্যেদ শরীফ বলেছেনঃ দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে অবশ্য পূরণীয় হক্ককে মেনে নেয়া ও প্রমাণিত হক্ককে রায়ের মাধ্যমে প্রকাশ করাই হচ্ছে বিচারের মূল কথা।[৪]

কুরআন মজীদে 'কাযা'- قضا শব্দ এই অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ

فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ (المؤمن: ٧٨)

অতঃপর যখন আল্লাহ্‌র হুকুম এসে গেল, তখন পরম সত্যতা সহকারে ফয়সালা করে দেয়া হল।

إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا (الاحزاب: ٣٦)

যখন আল্লাহ্ এবং তার রাসূল কোন বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেন।

১. البداية والنهاية ابن كثير ج: ٢، ص: ١٦١

২. فتح القدير ادب القاضى ج: ٦، ص: ٣٥٦

৩. المبسوط ج:١٤، ص: ٤٠

৪. تعريفات سير شريف ص: ١١٨

وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (يونس: ٤٧)

এবং ফয়সালা করে দেয়া হয়েছে তাদের পরস্পরের মধ্যে পূর্ণ ইনসাফ সহকারে এবং তাদের উপর একবিন্দু জুলুম করা হবে না।

নবীর আগমনের পর এমন এক বিচার ব্যবস্থা কায়েম হয়ে যায়, যেখানে পূর্ণ সুবিচার ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই বিচার ব্যবস্থার দ্বারা কখনই কারোর উপর একবিন্দু জুলুম বা অবিচার করা হয় না। কেননা নবী তো পূর্ণ ইনসাফের বিধান লয়ে আসেন। আর নবীর নিয়ে আসা বিধানের ভিত্তিতে যে বিচার ব্যবস্থা কায়েম হয়, তার দ্বারা কোনরূপ অবিচারের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এই কথার দিকই এ আয়াতটিতে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।[১]

হাদীসেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। একটি হাদীসের অংশ مَنْ قَضٰى بِالْحِكْمَةِ যে লোক হিকমাত-বুদ্ধিমত্তা ও সুস্থ বিবেচনা সহকারে বিচার করল।[২]

إِنَّ الزُّبَيْرَ خَاصَمَ رَجُلًا فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

যুবায়র (রা) এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলেন। অতঃপর রাসূলে করীম (স) উভয়ের মধ্যে বিচার করে ফয়সালা করে দিলেন।[৩]

বিচার বিভাগের লক্ষ্য অর্জনের পন্থা

বিচার বিভাগ ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃত্ব কি করে তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারে এবং সমাজে সুবিচার ও পরিপূর্ণ ন্যায়পরতা কি করে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব, তা-ই হচ্ছে এ পর্যায়ে প্রধান আলোচ্য, যেন সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি স্বীয় জান-প্রাণ, ধন-সম্পদ ও ইয্যত-আবরুর পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করতে সক্ষম হয়, তারা কেউ-ই একবিন্দু জুলুম-পীড়নের শিকার না হয়, কেউ যেন তার সার্বিক নিরাপত্তায় একবিন্দু বিঘ্নের সম্মুখীন না হয়।

বিচার বিভাগের মৌলিক লক্ষ্য চারটি বিষয়ের সুষ্ঠু ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে পারেঃ

১. বিচারকের যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা এবং বিচারক হওয়ার উপযোগিতা;

২. বিচারকের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা, স্থিতিশীলতা, মুখাপেক্ষীহীনতা ও পূর্ণ স্বাধীনতা;

৩. সুবিচারের জন্য আবশ্যকীয় নিয়ম-কানুনের পূর্ণ কার্যকরতা; এবং

---

১. مفتاح القران فصل القاف مع الطاء ص:٥٣٩

২. عمدة القارى ج: ١١، ص:٢٧٦

৩. ঐ

৪. বিচারকের নিকট জনগণের অধিকারের সুস্পষ্ট ধারণা, কার্যসূচী এবং ন্যায়বিচার সংক্রান্ত রায়ের বাধা-বিঘ্নহীন কার্যকরতার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা বর্তমান থাকা।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এই সব কয়টি জিনিসের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে এ চারটি বিষয়েরই বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা যাচ্ছেঃ

১. বিচারকের যোগ্যতা-কর্মক্ষমতা ও বিচার কার্যের উপযুক্ততা

বিচার বিভাগ সমাজে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, যদি বিচারকের প্রকৃত যোগ্যতা-কর্মক্ষমতা ও সেজন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ততা বিচারকের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান থাকে, যদি বিচারকার্যের যোগ্যতার জন্য জরুরী শর্তসমূহ তার মধ্যে পুরাপুরি পাওয়া যায়।

ইসলাম বিচারকের কতিপয় গুণ ও শর্তের উল্লেখ করেছে, যা বিচারকের মধ্যে বর্তমান থাকা একান্তই আবশ্যক। বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে ইসলাম-ই সর্ব প্রথম এই গুণ ও শর্তের উল্লেখ করেছে। এর পূর্বে কোন সময়ই এর প্রতি একবিন্দু গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি।

গুণগুলি হচ্ছেঃ

১. পূর্ণবয়স্কতা
২. বিবেক-বুদ্ধির সুস্থতা
৩. ঈমানদার হওয়া
৪. মৌলিকভাবে ন্যায়নিষ্ঠতা ও পক্ষপাতহীনতা
৫. জন্মের পবিত্রতা
৬. আইন সম্পর্কে পূর্ণমাত্রার জ্ঞান ও বিচক্ষণতা
৭. বিচারকের পুরুষ হওয়া
৮. বিচারকের স্মরণশক্তির তীক্ষ্মতা, মেধা ও প্রতিভা।

কেননা বিচারক বিস্মৃতির শিকার হলে তার দ্বারা সঠিকভাবে বিচার কার্য সম্পাদন হতে পারে না।

রাসূলে করীম (স) বিচারকের পদের গুরুত্ব, তার মর্যাদা ও তার দায়িত্ব জবাবদিহির বিরাটত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোরতা আরোপ করেছেন।

তিনি বলেছেনঃ

اَلْقُضَاةُ ثَلٰثَةٌ وَّاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ فَاَمَّا الَّذِىْ فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ

الْحَقَّ قَضٰى بِهٖ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضٰى لِلنَّاسِ عَلٰى جَهْلِهٖ فَهُوَفِى النَّارِ ـ

বিচারকরা তিন ধরনের হয়। এক ধরনের বিচারক জান্নাতে যাবে, আর অপর দুই ধরনের বিচারক জাহান্নামে যেতে বাধ্য হবে। জান্নাতে যাবে সেই বিচারক, যে প্রকৃত সত্য অনুধাবন ও হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী বিচার করেছে। পক্ষান্তরে যে লোক প্রকৃত সত্য জানতে ও বুঝতে পেরেও বিচারকার্যে রায় দানে জুলুম করেছে, সে জাহান্নামে যাবে। আর যে বিচার মূর্খতা থাকা সত্ত্বেও লোকদের উপর বিচার চাপিয়ে দিয়েছে, তাকেও জাহান্নামে যেতে হবে।[১]

এই হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম জাফর সাদেক (র) বলেছেনঃ

চার ধরনের বিচারক দেখা যায়। তন্মধ্যে তিন ধরনের বিচারকই জাহান্নামে যাবে, আর মাত্র এক ধরনের বিচারক জান্নাতে যেতে পারবে। যে ব্যক্তি সজ্ঞানে অবিচার করে সে জাহান্নামে যাবে। যে ব্যক্তি না-জেনে অবিচার করে সে জাহান্নামে যাবে। যে ব্যক্তি না-জেনেও সঠিক বিচার করে, সেও জাহান্নামে যাবে। আর যে জেনে-শুনে-বুঝে সুবিচার করে, কেবলমাত্র সে-ই জান্নাতে যেতে পারবে।[২]

২. অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বিচারকের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা

একথা সর্বজনবিদিত যে, বিচারকের দায়িত্ব ও জবাবদিহি অত্যন্ত বড় ও কঠিন। এই দিক দিয়ে তার সাথে অপর কোন পদে অভিষিক্ত ব্যক্তিদের কোনই তুলনা হয় না। এ কারণে তার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য সবচাইতে বেশী প্রয়োজন। অন্যথায় তার পক্ষে দায়িত্ব পালন কিছুতেই সম্ভব নয়। তাকে যদি এইরূপ স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা দেয়া হয়, তাহলেই আশা করা যায়, যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে অনীহা বা বাধা-প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠা ও তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও অ-প্রভাবিত থাকা সম্ভব হবে। আর সে জন্য অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তার অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন থাকার ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে, যেন সে কখনই লোভের ফাঁদের শিকার হতে না পারে। ইসলাম এজন্য যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং ইসলামী হুকুমত বিচারকের জন্য বেতন-ভাতা হিসেবে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

---

১. جامع الاصول ج: ١٠، ص: ٥٤٥ نقلا عن ابى داؤد ،ابن ماجة عن بريدة

২. الحكومة الاسلامية ص: ٢٦٨

শুধু অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাই সুবিচার কার্য সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট নয়। মূলত বিচারকের সেজন্য সকল প্রকার বহিরাগত ও সরকারী বা রাষ্ট্রীয় প্রভাব থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া অপরিহার্য। বিচারকের বিচার কার্যের উপর কোন হস্তক্ষেপ করার—বিচারের নামে অবিচার করার জন্য কোনরূপ চাপ বা প্রলোভন প্রয়োগেরও অধিকার কারোরই থাকতে পারে না। এ জন্যই হযরত আলী (রা) খুলাফায়ে রাশেদুনের চতুর্থ খলীফা পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর তাঁর নিয়োগকৃত শাসনকর্তা মালিক আশ্‌তার নখ্‌য়ীকে লিখে পাঠিয়েছিলেনঃ

> বিচারককে তোমার নিকট এমন মর্যাদা দেবে, যা পাওয়ার লোভ তোমার বিশেষ লোকদের মধ্যে অপর কারোই মনে কখনই জাগবে না। তোমার নিকট এইরূপ মর্যাদা থাকলেই বিচারক লোকদের সকল প্রকার প্রভাব ও প্রলোভন থেকে রক্ষা পেতে পারবে। অতএব তুমি সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য নিবদ্ধ করবে।[১]

এর চরম লক্ষ্য হচ্ছে, বিচারক যেন সর্বতোভাবে বহিঃপ্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকে এবং কোনরূপ ভয়-ভীতি বা লোভের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকা অবস্থায়ই প্রত্যেকটি মামলার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিচার চালিয়ে যেতে পারে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (Freedom of Judiciary) বলতে বর্তমানে এই অবস্থাই বোঝায় এবং এজ্যনই রাষ্ট্রের অন্যান্য সর্বপ্রকারের কর্তৃত্ব থেকে—বিশেষ করে নির্বাহী সরকারের (Executive) প্রভাব থেকে তার সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও স্বাধীন থাকার দাবি সার্বজনীন দাবি হিসেবেই চিরকাল চিহ্নিত হয়ে এসেছে। কেননা জনগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, বিচার বিভাগ সর্বতোভাবে নির্বাহী সরকারের প্রভাবমুক্ত না থাকলে এবং এই বিভাগের ক্ষমতাব পরিধি অ-নিয়ন্ত্রিত ও অসংকুচিত না হলে জনগণ কখনই সুবিচার পাবে না, বরং তখন সরকার স্বৈরাচার হয়ে জনগণের অধিকার হরণ করবে, সে অধিকার ফিরে পাওয়ার আর কোন উপায়ই অবশিষ্ট থাকবে না। ঠিক এ কারণে বিচার বিভাগের পূর্ণ মাত্রার স্বাধীনতা জনগণের স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্রনীতিবিদগণ লিখেছেনঃ সরকারের প্রশাসন কর্তৃত্ব দুই ভাগে বিভক্ত। একটি ভাগ—বরং প্রথম ভাগ হচ্ছে দেশ শাসন, অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে, জনগণের সংশ্লিষ্ট জটিল সামষ্টিক বিষয়াদিতে স্পষ্ট-অকাট্য রায় দান, পথ নির্দেশনা ও পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদে বিচার কার্য সম্পাদন। রাসূলে করীম (স) এবং খুলাফায়ে

---

১. نهج البلاغة قسم الكتب رقم ٥٢

রাশেদুনের আমলে এই দুইটি পদ দুই শ্রেণীর লোকদের উপর অর্পিত ছিল। প্রথম কাজের জন্য যেমন প্রত্যেকটি অঞ্চলে শাসন কর্তা (وَالِى) নিযুক্ত ছিল. তেমনি দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য স্বতন্ত্রভাবে বিচারক (কাযী) নিযুক্ত হয়েছিল। অবশ্য কখনও কখনও এ উভয় ধরনের কাজের দায়িত্ব একই ব্যক্তিকেও দেয়া হয়েছে এবং একই ব্যক্তি প্রশাসক ও বিচারক—উভয় পদমর্যাদার দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে তখন তা দেয়া হয়েছে সেই একই ব্যক্তির উভয় দিকের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের বিশেষ যোগ্যতা থাকার কারণে। কিন্তু সাধারণত এইরূপ হতো না: বরং দুই কাজের দায়িত্বে দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তিকেই নিযুক্ত করা হতো।[১]

বিচার বিভাগের এই স্বাধীনতা ও সম্পূর্ণ নির্বাহী শক্তি প্রভাবমুক্ত থাকার কারণে রাষ্ট্রপ্রধানকেও প্রয়োজনে—বাদী কিংবা বিবাদী হয়ে বিচারকের নিকট উপস্থিত হতে হতো এবং তথায় তাকে প্রতিপক্ষের সাথে সমান ও সম্পূর্ণ অভিন্ন মর্যাদা পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হতো। তিনি নিজস্বভাবে যেমন কাউকে কোন অপরাধের জন্য দায়ী করে তাকে দণ্ডিত করতে পারেন না. তেমনি তাঁর নিজের ব্যাপারেও বিচারকের দ্বারস্থ হতে একান্তভাবে বাধ্য।

এই কারণেই হযরত আলী (রা) তাঁর বর্ম হারিয়ে যাওয়ার পর একজন ইয়াহুদীর (কিংবা খৃস্টান) নিকট তা দেখতে পেয়ে স্বীয় দাপট ব্যবহার করে তার নিকট থেকে তা কেড়ে নিতে পারেন নি। বরং সেজন্য তাঁকে বিচারপতি শুরাইর আদালতে হাযির হয়ে রীতিমত মামলা দায়ের করতে হয়েছিল। তিনি দাবি করেছিলেনঃ ওটি আমার বর্ম। আমি ওটি বিক্রয় করিনি, কাউকে দান-ও করিনি। তখন বিচারপতি অভিযুক্তকে তার বক্তব্য বলার নির্দেশ দিলেন। সে বললঃ এ আমার বর্ম। তবে আমি আমীরুল মু'মিনীনকে মিথ্যাবাদীও বলছি না। তখন বিচারপতি হযরত আলীর নিকট প্রমাণ চাইলেন। কিন্তু তিনি বললেনঃ আমার নিকট কোন প্রমাণ নেই। (অপর এক বর্ণনায় সাক্ষী হিসেবে তাঁর পুত্র ও ক্রীতদাসকে পেশ করা হলে বিচারপতি বললেন. পুত্রের সাক্ষ্য পিতার পক্ষে ও ক্রীতদাসের সাক্ষ্য তার মনিবের পক্ষে প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হতে পারে না।) তখন বিচারপতি বর্মটি অভিযুক্ত ব্যক্তিরই বলে রায় দিলেন। লোকটি বর্মটি হাতে নিয়ে রওয়ানা দিল। আর খলীফাতুল মুসলিমীন দুই চোখ মেলে তাকিয়েই থাকলেন, তাঁর করার কিছুই ছিল না।

কিন্তু লোকটি কিছু দূর যাওয়ার পরই ফিরে এসে বিচারপতিকে লক্ষ্য করে বললঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—এটাকেই বলে নবীর বিধান ও সেই বিধান ভিত্তিক

---

১. الحكومة الاسلامية منية الطالب ج١، ص ٢٢.

বিচার। এ বর্ম যে আমীরুল মু'মিনীনের, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আসলে আমিই মিথ্যা দাবি পেশ করেছিলাম।

৩. সুবিচারের জন্য আবশ্যকীয় নিয়ম-নীতির পূর্ণ কার্যকরতা

ইসলাম শুধু বিচারের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেনি। বিচারকের নির্দিষ্ট কয়েকটি গুণ থাকার শর্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি। বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য কতিপয় নিয়ম-নীতিও নির্দিষ্ট এবং কার্যকর করেছে। বিচারকের জন্য তা অবশ্যই পালনীয় করে দিয়েছে। অন্যথায় জুলুম ও অসাম্য-অবিচারের কলংক থেকে তার রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। সেই নিয়ম-নীতি যথাযথভাবে পালন করলে সুবিচার করা তার পক্ষে সম্ভব হতে পারে।

বিচারকের নিয়ম-নীতি দু'ধরনের। এক ধরনের নিয়ম-নীতি পছন্দনীয় এবং অপর ধরনের নিয়ম-নীতি অপছন্দনীয়। পছন্দনীয় নিয়ম-নীতি হচ্ছেঃ

ক. বিচারকের নিজস্ব ক্ষমতাধীন এমন এক-ব্যক্তিকে নিযুক্ত করতে হবে যে জনগণের যাবতীয় সমস্যা ও মামলা তার সম্মুখে একের পর এক পেশ করবে।

খ. বিচারকের আদালত এমন এক স্থানে হতে হবে, যেখানে সকল লোকের পক্ষেই উপস্থিত হওয়া খুবই সহজ হবে, উপস্থিত হতে কোন বাধার সম্মুখীন হতে হবে না।

গ. বিচারকের আদালত কক্ষ প্রশস্ত, প্রকাশমান ও সুপরিবেশ সম্পন্ন হতে হবে,যেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সেখানে বসা ও স্বীয় বক্তব্য পেশ করা সহজ হয়।

ঘ. আইনবিদদের এমন একটা সমষ্টি তার নিকট উপস্থিত থাকতে হবে, যেন বিচারক কোনরূপ ভুল করে বসলে তারা তাকে সংশোধন করে দিতে পারে। তা সত্ত্বেও যদি কোনরূপ ভুল হয়ে যায়, তা'হলে তার প্রতিকারের সুযোগ থাকা একান্তই বাঞ্ছনীয়।

ঙ. পক্ষদ্বয়ের মধ্যের কেউ সীমালংঘনমূলক কাজ করলে তাকে নম্রতা সহকারে বুঝিয়ে দিতে হবে ও তাকে ক্ষান্ত হতে বাধ্য করতে হবে।

আর অপছন্দনীয় নিয়ম-নীতি হচ্ছেঃ

ক. বিচারের সময় দ্বাররক্ষী নিয়োগ করা,

খ. ক্রুদ্ধ হয়ে রায় লেখা ও দেয়া,

গ. রায় লেখার সময় বিচারকের মন ক্ষুধা, পিপাসা, দুশ্চিন্তাগ্রস্ততা, অত্যধিক আনন্দ-স্ফূর্তি প্রভৃতিতে মশগুল থাকা উচিত নয়।

ঘ. খুব তাড়াহুড়া করে—গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা ও বিবেচনা না করে, উভয় পক্ষের বক্তব্য ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য সূক্ষ্মভাবে চুল-চেরা বিশ্লেষণ ও বিবেচনা না করে রায় দেয়াও অনুরূপ।

এ পর্যায়ে সবচেয়ে বেশী সতর্ক করা হয়েছে ঘুষের ব্যাপারে। কেননা ঘুষ সম্পূর্ণ হারাম। তা গ্রহণ করা যেমন হারাম, তেমনি তা দিয়ে অন্যায়ভাবে নিজের পক্ষে রায় লেখানোর উদ্দেশ্যে দেয়াও সম্পূর্ণ হারাম।

এসব নেতিবাচক কথা। সেই সাথে রয়েছে ইতিবাচক কিছু বাধ্যবাধকতা। এখানে তার মোট সাতটি বিষয়ের উল্লেখ করা হচ্ছেঃ

প্রথম—সালাম, সম্মান প্রদর্শন, আসন গ্রহণ, দৃষ্টিদান, কথাবার্তা বলা, লক্ষ্য আরোপ করা প্রভৃতির দিক দিয়ে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে পূর্ণ সমতা রক্ষা করতে হবে।

দ্বিতীয়—এক পক্ষকে অপর পক্ষের জন্য ক্ষতিকর বিষয়াদি পরামর্শ না দেয়া।

তৃতীয়—একজনের সাথে সাগ্রহে কথা বলা, যার দরুণ অপর পক্ষ নিজেকে অপমানিত ও অসহায় বোধ করতে বাধ্য হয়।

চতুর্থ—দুই পক্ষই যখন মামলায় প্রস্তুত হবে এবং বিচার্য বিষয়টিও হবে সুস্পষ্ট, তখন বিচার কার্য সম্পাদন করা কর্তব্য। তবে উভয়ের মধ্যে সন্ধি সমঝোতা করে দিতে চেষ্টা করা তখনও বাঞ্ছনীয়। তাতে উভয় পক্ষ অ-রাযী হলে নিশ্চয়ই বিচার করতে হবে। আর বিচার্য বিষয় যদি দুর্বোধ্য ও কঠিন হয়, তাহলে এ কাজটিকেই বিলম্বিত করবে। বিলম্বিত করার সীমা তখন পর্যন্ত প্রসারিত, যখন পর্যন্ত ব্যাপারটি স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে না উঠছে।

পঞ্চম—মামলা যে পরম্পরায় দাখিল হবে, বিচার সেই অনুযায়ী সমাধা করতে হবে।

ষষ্ঠ—বিবাদী যদি এমন কোন দাবি পেশ করে, যার ফলে বাদীর দাবি চূড়ান্ত হয়ে যায়, তাহলে তা অবশ্যই শুনতে হবে এবং বাদীর নিকট থেকে তার জবাবও জেনে নিতে হবে। প্রয়োজন হলে আবার শুরু থেকে মামলার শুনানী শুরু করতে হবে।

সপ্তম—বাদী পক্ষ বা বিবাদী নিজ নিজ দাবি প্রত্যাহার করলে মামলা খারিজ করে দেবে।

এই সব কথাই কুরআন বা রাসূলে করীম (স)-এর সুন্নাত থেকে প্রমাণিত। একটি হাদীসে রাসূলে করীম (স)-এর এই উক্তি বর্ণিত হয়েছেঃ

مَنِ ابْتُلِى بِالْقَضَاءِ فَلَا يَقْضِى وَهُوَ غَضْبَانُ۔

যে লোক বিচারক হওয়ার বিপদে পড়বে, সে যেন ক্রুদ্ধ অবস্থায় কখনই বিচারের কাজ না করে।[১]

তিনি বলেছেনঃ

إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ ـ

দুই ব্যক্তি যদি তোমার নিকট বিচার প্রার্থী হয়, তাহলে প্রথম জনের জন্য রায় দেয়ার পূর্বেই দ্বিতীয় জনের বক্তব্য শুনে নেবে। তুমি যদি সেরূপ কর তা হলে তোমার বিচার কার্য সুষ্ঠু ও সুস্পষ্ট হবে।

সাক্ষ্যদান

বিচারের ক্ষেত্রে সাক্ষ্যের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। সাক্ষী হলো বাদীর দাবির প্রমাণ এবং বিবাদীর পক্ষে বাদীর দাবি অস্বীকারের উপায়। বাদী যদি তার দাবি বিচারার্থে প্রমাণ করতে চায়, তাহলে তার দাবির পক্ষে সাক্ষ্য পেশ করত হবে এবং বিবাদী যদি সে দাবি থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়, তাহলে তাকেও সেজন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে। বিচার কাজে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ।

এই উভয় পক্ষের সাক্ষ্য দানে নিশ্চয়ই বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে। গোটা বিচারের ব্যাপারটিই এই সাক্ষীর সাক্ষ্যদানের উপর নির্ভরশীল। সাক্ষী যদি সত্য সাক্ষ্যদান করে তা হলে বিচারকার্য সত্য-ভিত্তিক হবে এবং যদি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তাহলে নিঃসন্দেহে অবিচার হবে।

ইসলামে এই ব্যাপারটিকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এই পর্যায়ে কুরআন মজীদে অত্যন্ত বলিষ্ট ভাষায় আহবান জানানো হয়েছে ঈমানদার লোকদের প্রতিঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ـ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا

(النساء: ١٣٤)

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা ন্যায়বিচারের জন্য শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যাও, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসেবে, যদিও সে সাক্ষ্য তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতা-মাতার ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে পড়ে। সে যদি ধনশীল হয় কিংবা দরিদ্র, তা হলে তো আল্লাহ্-ই তাদের জন্য অতীব উত্তম। অতএব তোমরা ন্যায়বিচার না করে নিজেদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না।

---

১. جامع الاصول ج ١٠، ص: ٥٤٩

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ (المائدة: ٨)

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়বিচারের সাক্ষ্যদাতা হিসেবে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যাও।

দুটো আয়াতেই সাক্ষ্যদাতাকে আল্লাহ্‌র জন্য ন্যায়বিচারের পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াবার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআনের দৃষ্টিতে মামলার সাক্ষীরা মূলত আল্লাহ্‌র সাক্ষী—কোন বিশেষ পক্ষের নয়। তাদের এই সাক্ষ্যদান হতে হবে ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে অর্থাৎ বিচারক ও সাক্ষ্যদাতা সকলেরই সম্মুখে একটি মাত্র লক্ষ্য থাকতে হবে আর তা হচ্ছে মামলার ন্যায়বিচার। অতএব তারা কোন বিশেষ পক্ষের স্বার্থ রক্ষার জন্য যেন কোন সাক্ষ্য না দেয় বা তারা যেন এমনভাবে সাক্ষ্য না দেয়, যার দরুন সুবিচার ও ন্যায়বিচার কখনই সম্ভব হতে পারে না। এইজন্য ইসলামে সাক্ষী কি রকমের লোক হতে হবে, সেই বিষয়ে কয়েকটি জরুরী শর্ত আরোপ করা হয়েছে। শর্তসমূহ এইঃ

১. সাক্ষীকে পূর্ণ বয়স্ক হতে হবে। অপ্রাপ্ত বয়স্কের কোন সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

২. পূর্ণ ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে, পাগল বা মতিচ্ছিন্ন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে না।

৩. সাক্ষীকে অবশ্যই আল্লাহ্‌ এবং তাঁর দ্বীনের প্রতি পূর্ণ ঈমানদার হতে হবে। বে-ঈমান লোকদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে না।

৪. সাক্ষীকে ন্যায়বাদী-ন্যায়পন্থী হতে হবে। চরিত্রহীন, অন্যায়কারী বা শরীয়াত লংঘনকারী ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করানো যেতে পারে না।

৫. সাক্ষীকে সর্বপ্রকার দুষ্কৃতির অভিযোগ থেকে মুক্ত হতে হবে। দুষ্কৃতির অভিযোগে পূর্বে অভিযুক্ত হয়েছে—এমন ব্যক্তির সাক্ষ্যে সন্দেহমুক্ত সত্য কখনই প্রমাণিত হতে পারে না।

'সাক্ষ্যদান' কে কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে الشهادة এর শাব্দিক অর্থ হলো 'উপস্থিতি'। অর্থাৎ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় যে-লোক উপস্থিত ছিল, যে লোক নিজ চক্ষে ঘটনা সংঘটিত হতে দেখেছে কিংবা প্রত্যক্ষভাবে ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরেছে—সে-ই পারে সাক্ষ্যদান করতে। এইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান যার রয়েছে, সে-ই সাক্ষ্য দেবে, সাক্ষ্যদানের অধিকার বা যোগ্যতা কেবল তারই হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে সাক্ষী ন্যায়বাদী ও ন্যায়পন্থী عادل হওয়া অতটাই জরুরী যতটা জরুরী স্বয়ং বিচারকের ন্যায়বাদী-ন্যায়পন্থী হওয়া। উপরোদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ে এ কথাই বলা হয়েছে। নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ 'সাক্ষী

যখন ঘটনাকে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত দেখতে পারে, তখন-ই যেন সাক্ষ্য দেয়। নতুবা সাক্ষ্যদানের দুঃসাহস যেন সে না করে'। 'অকাট্য-সুদৃঢ় বর্ণনা, যা আইনের বিচারালয়ে উপস্থিত হয়ে এমন ব্যাপারে দেয়া, যা বর্ণনাকারী স্পষ্টভাবে দেখেছে'—এটাই হচ্ছে সাক্ষ্যের সংজ্ঞা।

এভাবে ইসলামে সাক্ষ্যের উপর এতই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যার কোন দৃষ্টান্ত দুনিয়ার ইতিহাসে খুব কম-ই পাওয়া যায়। এজন্য সাক্ষ্যকে ন্যায়বাদী ও ন্যায়পন্থী হওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। তার অর্থ, সাক্ষ্য সত্যভিত্তিক হতে হবে, দৃঢ় প্রত্যয়পূর্ণ হতে হবে,কোনরূপ সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ থাকতে পারবে না। তা প্রত্যক্ষ ব্যাপার সম্পর্কে হবে, অন্যদের মুখে শোনা বিষয়ে নয়।[১] সাক্ষীকে গণনায় আইনের অনুরূপ হতে হবে। প্রত্যেক সাক্ষীকে বিচক্ষণ ও স্মরণশক্তিসম্পন্ন হতে হবে।[২] প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অন্যান্য যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সাক্ষ্য না দেয়া আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার অপরাধ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অনীহা। পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, দাস-মনিব প্রভৃতি লোকদের পরস্পরের পক্ষে সাক্ষ্যদান গ্রহণীয় নয়।[৩] সাক্ষ্যকে বিকৃত করা যেতে পারেনা। সাক্ষ্যদানে অস্বীকৃতি জানানোর কোন অধিকার নেই। সাক্ষ্য গোপন করা অতি বড় গুনাহ্—তা আইন বিরোধীও। সাক্ষীকে কেনা চলবে না। সাক্ষীদের সম্মান করতে হবে! কেননা তাদের দ্বারাই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সবই বিভিন্ন হাদীসের কথা।

ইসলাম সমস্ত মানুষের মধ্যে পূর্ণ সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠিত করেছে। আইনের দৃষ্টিতে—আইনের সম্মুখেও সকল লোক-ই সমান। বিচারকার্যেও লোকদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা যাবে না।

এই দৃষ্টিতে বর্তমান পাশ্চাত্য শাসন ও বিচার পদ্ধতি মানুষের উপর জুলুমের ধারক ও বাহক। বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন ধরনের বিচারালয় কায়েম করা ইসলামের দৃষ্টিতে জুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়। সকল শ্রেণীর মানুষের বিচার একই আইনের ভিত্তিতে একই আদালতে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ইসলাম বিচারক নিয়োগে যেসব শর্ত আরোপ করেছে, তা কেবল মাত্র পূর্ণ ঈমানদার, আল্লাহ্-ভীরু ও ন্যায়বাদী লোকদের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে। ন্যায়বাদী আল্লাহ্ ভীরু বিচারক দলীল-প্রমাণ ছাড়া কখনই নিজে ইচ্ছামত বিচার করে না। ফলে অনেক ভুল থেকেই সে রক্ষা পেয়ে যায়। বর্তমান কালে

---

১. عمدة القارى شرح البخارى ج: ٦. ص. ٢٢٢-٢٩٨

২. المبسوط ص: ١١٢

৩. المبسوط ص: ١٢١

বিচারকের সেসব গুণ অপরিহার্য মনে করা হয় না—পাশ্চাত্য বিচার দর্শনে সে ধারণাই অনুপস্থিত—ফলে বিচারের নামে চলছে নানাবিধ অবিচার।

হ্যাঁ, কোন বিচারালয়ে অবিচার হয়েছে বা বিচারে ভুল করা হয়েছে মনে হলে অবশ্যই অন্য কোন বিচারক দ্বারা সে মামলার পূনর্বিচার করানো যেতে পারে। এইজন্য বিশেষজ্ঞগণ লিখেছেনঃ

كُلُّ حُكْمٍ قَضَى بِهِ الْاَوَّلُ وَبَانَ لِلثَّانِىْ فِيْهِ خَطَاءٌ فَاِنَّهُ يَنْقُضُهُ ـ

প্রথম বিচারকের রায়ে ভুল প্রকাশিত হলে দ্বিতীয় বিচারক তা বাতিল করে দেবে।[১]

প্রথম বিচারক কোন জ্ঞানগত দলীলের বিরুদ্ধতা করে থাকলে, যাতে কোন ইজতিহাদের সুযোগ নেই কিংবা কোন ইজতিহাদী দলীলের বিরুদ্ধতা করে থাকলে—যার পর আর ইজতিহাদ চলে না, শুধু অসতর্কতার কারণেই ভুল করে থাকে, তাহলে সেই বিচার বাতিল করা যাবে অথবা পক্ষদ্বয় যদি নতুন করে দাবি উত্থাপন করার এবং অপর কোন বিচারকের রায় গ্রহণ করতে রাযী হয়, তখনও পূর্বের রায় বাতিল হয়ে যাবে। এছাড়া অন্য কোনভাবে বিচারের রায় বাতিল হতে পারে না।[২]

৪। ন্যায় বিচার সংক্রান্ত রায়ের বাধাবিঘ্নহীন কার্যকরতা

ইসলাম শুধু বিচার কার্যে ন্যায়পরতা ও নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণকেই নিশ্চিত করেনি। বিচারের রায়কে যথোচিতভাবে কার্যকর করার ক্ষেত্রেও নিশ্চয়তা বিধান করেছে। কোন বিষয়ে আদালত চূড়ান্তভাবে রায় দান করলে তার কার্যকরতা যাতে কেউ বানচাল করতে না পারে, সেজন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলঃ যে অপরাধের সুনির্দিষ্ট শাস্তি (হদ্দ) রয়েছে, তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হওয়ার পর অপরাধীর উপর তা অবশ্যই কার্যকর করতে হবে। অপরাধী শক্তিমান হোক কি দুর্বল, উঁচু বংশজাত সম্ভ্রান্ত হোক কি নীচু বংশজাত—অসম্ভ্রান্ত এবং সে পুরুষ হোক কি নারী, শাস্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় ঘটতে দেয়া যাবে না। এ ব্যাপারে কোনরূপ দুর্বলতা দেখানো কিংবা তা বিলম্বিতকরণ অথবা আল্লাহ্র নির্দেশ কার্যকর করণে কোন রূপ দয়া-মমতা প্রদর্শনের অধিকার কারো নেই।

ইসলামী শরীয়াত বিশেজ্ঞরা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, আল্লাহ্ নির্ধারিত শাস্তি (হদ্দ) কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোনরূপ শাফায়াত কিংবা সুপারিশ করা এবং সেই সুপারিশ গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হারাম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে

১. شرائع الاسلام كتاب القضاء
২. جوهر الكلام ج: ٤، ص: ٧٩

আমর ইবনুল আ'স (রা)-এর একটি বর্ণনা অনুসারে রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ

تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ (سنن ابى داؤد)

তোমরা আল্লাহ্র নির্ধারিত শাস্তি (হদ্দ) কার্যকর হওয়ার যোগ্য অপরাধ পারস্পরিক পর্যায়ে ক্ষমা করতে পার; কিন্তু এ ধরণের অপরাধের অভিযোগ আমার নিকট পেশ করা হলে তা অবশ্যই কার্যকর হবে।

এ পর্যায়ে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) রাসূলে করীম (স)-এর এই হাদীসটিও বর্ণনা করেছেনঃ

مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللّٰهِ فَقَدْ ضَادَّ اللّٰهَ فِي أَمْرِهِ (ابو داؤد)

আল্লাহ্ নির্ধারিত শাস্তিগুলোর মধ্যে কোন একটি শাস্তির পথে যদি কারো সুপারিশ বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সে আল্লাহ্র বিধান কার্যকর হওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল।

এ প্রসঙ্গে মাখযুমিয়া নাম্নী কুরাইশ মহিলার চুরি সংক্রান্ত ঘটনার কথা উল্লেখযোগ্য। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করছেন, মাখযুমিয়া চুরি করে ধরা পড়লে কুরাইশরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। রাসূলের নিকট এ ব্যাপারে কে সুপারিশ করবে তা নিয়ে আলোচনার পর স্থির হল যে, রাসূলের প্রিয় ব্যক্তি উসামা ছাড়া এই কাজ আর কারো দ্বারা সম্ভব নয়। উসামা এ ব্যাপারে রাসূলে করীম (স)-এর সাথে কথা বলায় তিনি ধমকের সুরে বললেনঃ

اَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللّٰهِ؟

আল্লাহ্র নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করণের ব্যাপারে তুমি সুপারিশ করছ?

এরপর তিনি উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করে বললেনঃ

হে জনগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এই নীতির অনুসারী ছিল যে, তাদের মধ্য থেকে কোন ভদ্র ব্যক্তি চুরি করলে এমনিই তাকে নিষ্কৃতি দিত। আর কোন হীন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তার উপর আল্লাহ্র নির্ধারিত শাস্তি (হদ্দ) কার্যকর করত। আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মাদ-তনয়া ফাতিমাও যদি চুরি করে, তাহলে মুহাম্মাদ তার হাত অবশ্যই কেটে ফেলবে।

ইসলামী আদালতের রায় তথা আল্লাহ্র নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করণে ইস-লামের দৃষ্টিভঙ্গি যতটা কঠোর, তা এ থেকেই অনুধাবন করা চলে।

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

[ইসলামী রাষ্ট্র বিশ্বরাষ্ট্র—জাতিসংঘের ব্যর্থতা—বিশ্বরাষ্ট্র গঠনে নতুন প্রস্তাব—বিশ্বরাষ্ট্রের জন্য বিশ্বমানবিক আদর্শ—বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা—ঈমান-ই হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ মানব সৃষ্টির নির্ভুল ভিত্তি—উম্মত ঐক্যবদ্ধ জাতিসত্তা গঠনের ইসলামী ভিত্তি—আইনের দৃষ্টিতে সাম্য—ন্যায়বিচারের পরিণতি সাম্য-ন্যায়পরতা ও সুবিচারের সুফল—সুবিচারের উপর ইসলামের গুরুত্বারোপ—সুবিচার প্রতিষ্ঠার রূপরেখা ।]

পূর্ববর্তী দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনায় ইসলামী রাষ্ট্রের যে রূপ ও সংগঠন প্রক্রিয়া প্রতিভাত হয়ে উঠেছে, সেই প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা দুনিয়ার অন্যান্য সমস্ত প্রাচীন ও নবীন রাষ্ট্র ও সরকারসমূহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। দুনিয়ার রাষ্ট্রসমূহ হয় রাজতান্ত্রিক, স্বৈরতান্ত্রিক, সাংবিধানিক, না হয় গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক। কিন্ত ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার এর কোন একটিরও মত নয়। তা সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র প্রকৃতির ও বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত।

ইসলামী রাষ্ট্রের এই মৌলিক বিশেষত্ব অনিবার্যভাবে সম্পূর্ণ ভিন্নতর লক্ষণ, গুণাবলী ও অবদান নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যা প্রত্যেকটি মানবীয় রাষ্ট্র ও সরকারের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় হলেও তা দুনিয়ার অপর কোন একটি রাষ্ট্রেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আমরা এখানে ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের কতিপয় বিশেষত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করছি।

ইসলামী রাষ্ট্র বিশ্বরাষ্ট্র

ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার বিশেষ কোন একটি দেশে বা ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হলেও তা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র হয় না বলে তা স্বভাবতই বিশ্বরাষ্ট্রের দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করে।

বস্তুত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রাথমিক পর্যায়ে দুনিয়ায় সংকীর্ণ ভৌগোলিক, ভাষাভিত্তিক ও বংশ বা বর্ণভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার ব্যাপক প্রচার ঘটে। বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন নামে ও পরিচয়ে এই মতাদর্শের প্রচারে নিমগ্ন হলেও সাথে সাথেই এর প্রতিবাদও শুরু হয়ে যায়। আর এই বিতর্কের গর্ভ থেকে সহসাই আত্মপ্রকাশ করে বিশ্বজনীন সাধারণ তন্ত্রের মতবাদ এবং এই মতবাদে এমন একটি বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য

প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত করা হয়, যা জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রসমূহের নির্যাতন-নিষ্পেষণ-নিগ্রহ-হত্যাযজ্ঞ—যা দুনিয়ার মানুষ দীর্ঘ দিন ধরে নির্মমভাবে ভোগ করে আসছে— থেকে বিশ্বমানবতাকে রক্ষা করবে।

বিশেষ করে বিগত দুইটি বিশ্বযুদ্ধে এই প্রয়োজনীয়তা অধিক তীব্র ও প্রকট হয়ে উঠেছে দুনিয়ার মানুষের নিকট। বর্তমানে এই চিন্তাটা অধিক সার্বজনীনতা লাভ করেছে। এ পক্ষের চিন্তাবিদগণ স্পষ্ট বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে, দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে যে ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক প্রাচীর দাঁড়িয়ে থেকে মানুষের মধ্যে বৈষম্যের প্রাচীর তুলেছে, তা-ই হচ্ছে মূলত জাতিসমূহের মধ্যকার হিংসা-বিদ্বেষ ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহের মৌল কারণ। এসব রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। আর তা রচিত হতে পারে বর্তমানের হিংস্র সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক রাষ্ট্রসমূহের ধ্বংসস্তূপের উপর। সেজন্য সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা, জীবন-দর্শন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে-চুরে এগুলোর মধ্যে যতটা সম্ভব বিশ্ব রাষ্ট্রীয় চরিত্র ও গুণাবলী জাগিয়ে দিতে হবে, যেন শেষ পর্যায়ে সমগ্র দুনিয়াকে একটি মাত্র রাষ্ট্রের পতাকাতলে নিয়ে আসা সম্ভব হয়।

মানুষ স্বভাবতই যুদ্ধকে ভয় করে! বিশেষ করে বিগত দুইটি বিশ্বযুদ্ধ সাধারণ মানুষের মনে এমন ভয় জাগিয়ে দিয়েছে যে, এখন যুদ্ধের নাম শুনলেই তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে।[১]

মানুষ যুদ্ধকে ঘৃণা করে। মানুষ চায় না—রাষ্ট্রকর্তাদের ইচ্ছামত নিরীহ মানুষের জীবন অকারণ বিপন্ন হোক, নিরীহ মানুষের রক্তে ধরিত্রীর ধুলি রঞ্জিত হোক। তাই যুদ্ধের মৌল কারণ যে হিংস্র ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ, তা-ই বর্তমানে মানুষের একটা অতীব হীন ও ঘৃণ্য মতাদর্শ রূপে চিহ্নিত, যদিও দুনিয়ার মানুষ জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা থেকে এখনও মুক্ত হতে পারেনি। এখনও দেশে দেশে যুদ্ধ চলছে। আঞ্চলিক বা স্থানীয়ভাবেও যুদ্ধ হচ্ছে এবং নিরীহ মানুষ ধ্বংস হচ্ছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর যুদ্ধের সর্বগ্রাসী ধ্বংসকারিতা ও নির্মম হত্যাযজ্ঞ সম্মুখে রেখে বিশ্বের ২২টি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিশ্ব-জাতি সংস্থা (League

১. বিগত দুটি বিশ্বযুদ্ধে কত কোটি কোটি নিরীহ মানুষ যে নিহত, আহত ও সর্বস্বান্ত হয়েছে, তার নির্ভুল হিসেব যদিও পাওয়া কখনই সম্ভব নয়, তবুও একটি হিসেব অনুযায়ী প্রথম মহাযুদ্ধেই ৯ মিলিয়ন মানুষ নিহত, ২২ মিলিয়ন মানুষ আহত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল এবং প্রায় দশ মিলিয়ন মানুষ হয়েছিল নিখোঁজ। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল প্রথমটির তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপক ও সাংঘাতিক। তাতে প্রায় ৩০ মিলিয়ন মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। আর ধন-সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি যে কি পরিমাণ হয়েছিল, তা অংকের ভাষায় বলা কোনক্রমেই সম্ভব হতে পারে না।

of Nations) নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলে। আরও অধিক রক্তপাত বন্ধ করাই তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলে প্রচারও করা হয়। তাছাড়া জাতিসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও ঝগড়া-বিবাদ যুদ্ধ ও রক্তপাত করে নয়—পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলার নীতিও ঘোষিত হয়। অস্ত্রের পরিবর্তে যুক্তি ও মানবিকতাকে ভিত্তি করে কাজ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা শুরু করে দেয়া হয়। কিন্তু এ সংস্থার সাংগঠনিক প্রকৃতিতেই যুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল। বহু কতগুলি দিক দিয়ে তার মধ্যে এমন ক্রটি থেকে যায়, যুদ্ধের জের নিঃশেষ করতে গিয়ে এমন ভাগ-বাটোয়ারা কার্যকর করা হয়, যার ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ একান্তই অনিবার্য হয়ে পড়ে। তার ফলে যুদ্ধের কারণ দূর করা ও যুদ্ধের প্রজ্বলিত আগুন নির্বাপিত করা এ সংস্থার পক্ষে সাধ্যাতীত হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত সর্বাধিক প্রচণ্ড রূপ নিয়ে জ্বলে উঠে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অগ্নিকুণ্ড। তুলনামূলকভাবে বিশ্বের জানা ইতিহাসের অতীত অধ্যায়সমূহে যত যুদ্ধ ও রক্তক্ষয় হয়েছে, তার চাইতে অনেক-অনেক বেশী রক্তপাত ও সম্পদ ধ্বংস হয় এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে।

আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালেই বিশ্ব জাতিসমূহের একটি নতুন বিশ্ব সংস্থা গড়ে তোলার চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়ে যায়। আরও অধিক বাস্তবতাকে ভিত্তি করে আরও অনেক বেশী সংখ্যক দেশ ও জাতিকে শামিল করে যে বিশ্ব সংস্থা পরবর্তীতে গঠিত হয়, তার নামকরণ হয় জাতিসংঘ (United Nation Organization)। ১৯৪৩ সনে—১৯৩৯ সনে শুরু হওয়া দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি—এই সংস্থার বীজ বপন করা হয়। অতঃপর দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং হচ্ছে বটে, নিরীহ মানুষের অকারণ রক্তপাত এখনও বন্ধ হয়ে যায়নি। তবে বর্তমান সময় পর্যন্ত—বিগত ৪০-৪৫ বছরের মধ্যে—কোন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়নি, যেমন পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।

জাতিসংঘ একটি সনদ ঘোষণা করেছে, যা 'জাতিসংঘ সনদ' নামে অভিহিত। বিশ্ব জাতিসমূহের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার জন্য গৃহীত উল্লিখিত দুইটি পদক্ষেপ মূলত সেই পথের দিকের পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হতে পারে, যে দিকে বিশ্বমানবকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইসলাম দেড় হাজার বছর ধরে দুনিয়ার মানুষের নিকট আকুল আহ্বান জানাচ্ছে।

ইসলামের আহ্বান ব্যক্তি ও সামষ্টিকভাবে গোটা বিশ্বমানবতার প্রতি। মানবতা তাদের পারস্পরিক সব পার্থক্য-তারতম্য, সব বিভেদ-বিবাদ সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাক এবং তাদের মধ্যে কাল্পনিকভাবে যেসব পার্থক্যের প্রাচীর দাঁড় করানো হয়েছে, তা নির্মূল হোক এবং নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ পরস্পর ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলুকে—তা-ই হচ্ছে ইসলামের কাম্য। সমস্ত মানুষকে এক ও অভিন্ন নীতি

ও আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করে একটি মাত্র রাষ্ট্রের পতাকাতলে সমবেত করাই ইসলামের লক্ষ্য। কেননা এছাড়া জাতিতে জাতিতে বিভক্ত এই মানবতাকে রক্ষা করা—মানুষের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন ও স্থায়ী করে তোলা অন্য কোনভাবেই সম্ভব হতে পরে না। অথচ যদি ইসলামের কাম্য ও লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করা হয়, তাহলে অকারণ যুদ্ধের দামামা বেজে উঠা এবং লক্ষ কোটি নিরীহ মানুষের রক্তের বন্যা বয়ে যাওয়ার কোন কারণই আর অবশিষ্ট থাকবে না।

জাতিসংঘের ব্যর্থতা

বর্তমান জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পশ্চাত্যের বড় বড় চিন্তাবিদ ও বিশ্ব রাজনীতিবিদগণ ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করতে শুরু করেছেন যে, বর্তমানে জাতিসংঘ যেমন করে এক 'বিশ্ব সংসদ'-এর রূপ ধারণ করেছে, বিশ্বের একক কেন্দ্র হওয়ার মর্যাদা পেয়েছে, তা-ই ক্রমশ বিশ্বমানবকে হিংস্র সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত করে একটি বিশ্বরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণে অধিকতর আগ্রহী ও উদ্যোগী করে তুলবে। ফলে ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী সমস্ত মানুষ পূর্ণ সমতা ও অভিন্নতা সহকারে বেঁচে থাকার সুযোগ লাভ করবে।

বিশ্বের বড় বড় চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদদের এই কামনা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত শুভ, তাতে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই, একথাও সত্য। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই কামনা বাস্তবায়িত করে তোলার সুস্থ ও স্বভাবসম্মত পন্থা কি হতে পারে?

বর্তমান জাতিসংঘই শেষ পর্যন্ত বিশ্বরাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করবে কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। বিষয়টি দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষও বটে। জাতিসংঘ বর্তমান ও সদা সক্রিয় থাকা অবস্থায়ও দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যে আঞ্চলিক বা স্থানীয় ভিত্তিতে হলেও যুদ্ধ ও রক্তপাত চলছে। এক অঞ্চলে কিছুকাল যুদ্ধ চলার পর হয়ত সে যুদ্ধ থেমেও গেছে, কি কোথাও তা বছরের পর বছর ধরে অব্যাহতভাবে চলছে, যুদ্ধ সম্ভাবনা সম্পূর্ণ বন্ধ করা জাতিসংঘের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাতে তার চরম ব্যর্থতা ও অক্ষমতাই প্রকট হয়ে উঠে। জাতিসংঘের এ ব্যর্থতার মূলে বহু কারণ—একথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। কারণসমূহের মধ্যে দুটি কারণ সর্বাধিক প্রকট বলে মনে হয়। তা হচ্ছেঃ ১. জাতিসংঘে কিংবা নিরাপত্তা পরিষদে বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের 'ভেটো' প্রয়োগ করার সুযোগ ও স্বীকৃতি এবং ২. জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত ও ঘোষণাকারী বাস্তবায়িত করার মত কোন শক্তি তার হাতে না থাকা।

জাতিসংঘ বর্তমান ও সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও আঞ্চলিক যুদ্ধসমূহের বন্ধ না হওয়ার মূলে বৃহৎ শক্তিসমূহের কারসাজি খুবই মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে। হয়

সে আঞ্চলিক যুদ্ধে কোন বৃহৎ রাষ্ট্র নিজেই প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িত অথবা সেই বৃহৎ রাষ্ট্রের স্বার্থে ও ইঙ্গিতেই সে আঞ্চলিক যুদ্ধ চলছে। ফলে সে যুদ্ধ বন্ধ হোক—তা সেই বৃহৎ রাষ্ট্রই চায় না। দুনিয়ার রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শক্তির ভারসাম্যও নষ্ট হয়ে গেছে এই পরাশক্তিসমূহের মানবতা পরিপন্থী নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে। ফলে বর্তমান জাতিসংঘটি কার্যত পরাশক্তিসমূহের ক্রীড়নক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বর্তমান জাতিসংঘের দ্বারা যেমন আঞ্চলিক যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়া এবং সমগ্র বিশ্বব্যাপী পরম শান্তি স্থাপিত হওয়ার কোন আশাই করা যায় না, তেমনি তা কোন দিন-ই বিশ্বরাষ্ট্র হওয়ার মর্যাদা লাভ করতে পারবে—এমন সম্ভবানাও সুদূর পরাহত মনে হয়।

সহজেই বোঝা যায়, বর্তমান 'জাতিসংঘ' জাতিসমূহের সংঘ। দুনিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তার সদস্যপদ গ্রহণ বা লাভ করেছে। ফলে জাতীয়তার স্বাতন্ত্র্য ও বিভিন্নতা মৌলিকভাবেই স্বীকৃত। আর বিগত শতাব্দী কালের বাস্তব অভিজ্ঞতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করছে, এই জাতীয়তাই হচ্ছে বিশ্বমানবতাকে বিভিন্ন সাংঘর্ষিক খণ্ডে বিভক্ত করার অত্যাধুনিক হাতিয়ার। জাতিসংঘের সভায় বিভিন্ন দেশ জাতি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা সমগ্র বিশ্বমানবতার প্রতিনিধি হিসেবে আসন গ্রহণ করে না, তথায় তারা প্রতিনিধিত্ব করে তাদের সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখায় বিভক্ত জাতি ও রাষ্ট্রের। জাতি ও রাষ্ট্র যখন বিভিন্ন, তখন তাদের স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গীও অনিবার্যভাবে বিভিন্ন। ফলে তথায় বিশ্ব সমস্যা সম্পর্কে যত আলোচনা ও বিতর্ক হোক, তা বিশ্বমানবের সামষ্টিক সমস্যা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয় না, হয় এক-একটি দেশে ও রাষ্ট্রের বিশেষ স্বার্থ, মর্যাদা ও অধিকারের দৃষ্টিতে। ফলে এতে আর কোন সন্দেহ-ই থাকছে না যে, বর্তমান জাতিসংঘই বিশ্বমানবতাকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করেই বিশ্বমানবের জন্য মহাক্ষতি ও বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে বিশ্ব প্রতিষ্ঠানের সংগঠন প্রকৃতিতেই বিভেদ ও বিদ্বেষের বীজ বপিত, তার দ্বারা সামষ্টিকভাবে বিশ্বমানবের সুকঠিন ও প্রাণন্তকর সমস্যাবলীর সঠিক সমাধান হওয়া কি রূপে সম্ভব হতে পারে? আর তা সম্ভব যে হতে পারে না, জাতিসংঘের বিগত চল্লিশ বছরকালীন নির্লজ্জ ব্যর্থতাই তার অকাট্য প্রমাণ। জাতিসংঘ বিশ্বমানবের তো দূরের কথা কোন দুইটি প্রতিবেশী জাতির পারস্পরিক বিরোধ, সংঘর্ষ ও যুদ্ধ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে বলে দাবি করা যেতে পারে কি?

বিশ্বরাষ্ট্র গঠনে নতুন প্রস্তাব

জাতিসংঘের এই লজ্জাকর ব্যর্থতা প্রত্যক্ষ করে কতিপয় বিশ্ব চিন্তাবিদ একটি বিশ্বরাষ্ট্র কায়েম করার প্রস্তাব করেছেন। সেই বিশ্বরাষ্ট্রের অধীন তিনটি প্রধান বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান থাকবেঃ

১. একটি মাত্র আইন পরিষদ
২. একটি মাত্র প্রশাসনিক বা নির্বাহী সংস্থা এবং
৩. একটি মাত্র বিচার বিভাগ—বিশ্ব আদালত।

তাঁদের বক্তব্যের সারনির্যাস হচ্ছে, স্থায়ী ও ব্যাপক বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কেবলমাত্র প্রস্তাব পাস ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং রাষ্ট্রসমূহের ওয়াদা প্রতিশ্রুতিই যথেষ্ট হতে পারে না। সেজন্য এমন একটি বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক, যার একটি মাত্র আইন পরিষদ থাকবে—যেখানে বিশ্বশান্তির পক্ষে অপরিহার্য আইন পাস হবে ও সিদ্ধান্ত গ্রহীত হবে, একটি মাত্র নির্বাহী বিভাগ থাকবে—তার অধীন থাকবে একটি বিশ্ব পুলিশ ও বিশ্ব সৈন্য বাহিনী, যার কাজ হবে। বিশ্বের কোথাও কোনরূপ সংঘর্ষ বাঁধলে সঙ্গে সঙ্গেই তথায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা এবং কার্যত সংঘর্ষ ও রক্তপাত হতে না দেয়া,—এরূপ একটি বাহিনী থাকলে খুবই আশা করা যায় যে, আঞ্চলিক ও স্থানীয় ভিত্তিতে সংঘটিত সংঘর্ষসমূহ সঙ্গে-সঙ্গেই প্রতিরুদ্ধে হয়ে যাবে এবং বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হওয়ার তেমন কোন কারণ অবশিষ্ট থাকবে না। আর একটি বিশ্ব আদালত থাকবে—যেখানে জাতিসমূহের পারস্পরিক বিবাদীয় বিষয় ও ব্যাপারাদির মীমাংসা হবে।

১. বিশ্ব পার্লামেন্টে প্রত্যেক দেশে ও জাতির প্রতিনিধি থাকবে, প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধিরই বক্তব্য পেশ করার ও ভোট দানের অধিকার থাকবে—তবে তা সবই হতে হবে সেই দেশের জনসংখ্যানুসারে। ফলে অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশ তুলনামূলকভাবে বেশী সংখ্যক আসন ও ভোটের অধিকার পাবে।

২. নিরাপত্তা পরিষদেও প্রত্যেকটি সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধি থাকতে হবে। বর্তমানের ন্যায় শুধুমাত্র পাঁচ শীর্ষ স্থানীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধি-ই নয়।

এই পরিষদই বিশ্ব-সংসদের সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর করার জন্য দায়ী হবে এবং সংসদের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে।

৩. বিশ্ব-সেনাবাহিনী হবে মূলত শান্তি বাহিনী, শান্তি স্থাপনকারী দল। তা অবশ্যই নিরাপত্তা পরিষদের অধীন থাকবে শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য।

৪. বিশ্ব-আদালত বিশ্ব-সংসদে গৃহীত আইন ও সিদ্ধান্তাবলী ব্যখ্যাদানের ও তার ভিত্তিতে জাতিসমূহের মামলার বিচার করার জন্য দায়িত্বশীল হবে।

বিশ্বরাষ্ট্রের জন্য বিশ্ব মানবিক আদর্শ

কিন্তু বিশ্বচিন্তাবিদ ও বিশ্বশান্তির পক্ষে লোকদের উপরোক্ত চিন্তা-ভাবনা ও আশাবাদ যতই যুক্তিসঙ্গত ও গভীর চিন্তা-ভাবনা নিঃসৃত হোক, এ চিন্তা বা

প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু? তা বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য যেসব মৌল উপাদান অপরিহার্য, তার কোনটিই তো কোথাও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। উক্তরূপ একটি বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন একটি বিশ্ব মানবিক আদর্শ, প্রয়োজন সেই বিশ্ব মানবিক আদর্শে অকৃত্রিম বিশ্বাস ও নিষ্ঠাবান চরিত্রবান নেতৃত্ব, যারা জাতীয়তা প্রীতি ও জাতীয় বিদ্বেষের উর্ধ্বে থেকে বিশ্বমানবিক আদর্শের ভিত্তিতে বিশ্বমানবকে নেতৃত্ব দিতে পারবে, যারা বিশ্বের সকল দেশের সকল জাতির আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনে সক্ষম হবে। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বে এমন কোন ব্যক্তিত্ব আছে কি, আছে কি এমন বিশ্বমানবিক আদর্শ, যা নির্বিশেষে বিশ্বের সমস্ত মানুষকে প্রকৃত ও সঠিক কল্যাণের দিকে পরিচালিত করবে?

পরিকল্পিত বিশ্বরাষ্ট্রের নেতৃত্ব ও পরিচালনা করতে পারে কেবল সেই সব ব্যক্তিত্ব, যারা মানুষকে মানুষ হিসেবেই ভালোবাসবে, তাদের কল্যাণ চাইবে। তারা বিশ্বের বিশেষ কোন জাতি প্রীতিতে অন্ধ হবে না, হবে না কোন পক্ষের অন্ধ সমর্থক।

কিন্তু বর্তমান দুনিয়ার সেরা রাষ্ট্রপ্রধান ও রাজনীতিকদের অবস্থা অত্যন্ত নৈরাস্যজনক। তেমনি বিশ্ব-আদর্শ হিসেবে বর্তমান দুনিয়ায় যে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র সুপরিচিত, তা-কখনই বিশ্বমানবিক আদর্শ হতে পারে না। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে শোষণ বঞ্চণা ও প্রতারণা অত্যন্ত প্রকট। আর সমাজতন্ত্রে মানুষের মনুষ্যত্ব ও মানবিক অধিকার সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত।

এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, কেবল মাত্র ইসলামই হতে পারে সেই বিশ্বমানবিক আদর্শ। কেননা পুঁজিবাদী গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের ন্যায় দ্বীন-ইসলাম মানবতার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী কোন চিন্তাবিদের রচিত নয়, তা রচিত সেই মহান সত্তার, যিনি সমগ্র বিশ্বলোকের স্রষ্টা—সমগ্র মানুষের-ও স্রষ্টা ও প্রতিপালক। কোন বিশেষ জাতি বা ব্যক্তির প্রতি তাঁর কোন প্রীতি বা বিদ্বেষ থাকতে পারে না—নেই। কেননা নির্বিশেষে সকল মানুষই তাঁর 'পরিবারভুক্ত'। সকলেরই জৈবিক ও আত্মিক প্রয়োজন পরিপূরণের ব্যবস্থা কেবলমাত্র তিনি-ই করেছেন। মানুষের জৈবিক প্রয়োজন পরিপূরণের জন্য তিনি এই অফুরন্ত উপায়-উপকরণের (Resources) ও সম্পদ (Wealth and power) সমাহার সৃষ্টি করেছেন এবং আত্মিক প্রয়োজন পূরণের জন্য তিনি তাঁর নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে—এবং সর্বশেষ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে বিশ্ব-মানবিক আদর্শ হিসেবে বানিয়েছেন পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান ইসলাম।

দ্বীন-ইসলাম একমাত্র বিশ্ব-স্রষ্টার রচিত বিধান বলেই বিশ্বের আবহমান কালের সমস্ত মানুষকে একজন প্রথম মানুষ আদম ও তাঁর স্ত্রী হাওয়ার

সন্তান—আদমের বংশধর বলে ঘোষণা করেছে. সকল মানুষের দেহে একই পিতা-মাতার রক্ত প্রবাহিত করেছে। মানুষে-মানুষে বর্ণ, বংশ, জাতীয়তা ও মানবিকতার দিক দিয়ে একবিন্দু পার্থক্য দ্বীন-ইসলামে স্বীকৃত নয়। কেউ নয় হীন নীচ, কেউ নয় অভিজাত বংশীয় —সকলেই মানুষ।

ইসলাম নির্বিশেষে সকল মানুষের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ হিসেবে নাযিল হওয়া এবং বিশ্বমানবিক ঐক্য অভিন্নতা বাস্তবায়িত করার জন্য প্রথম থেকেই সচেষ্ট। তার বড় প্রমাণ, ইসলাম কোন দিনই বিশেষ কোন জাতি, শ্রেণী বা বর্ণের ভিত্তিতে কোন আহ্বান জানায়নি। ইসলামের আহবান নির্বিশেষে সমস্ত মানবতার প্রতি—মানুষ হিসেবেই। দ্বীন-ইসলামের সর্বশেষ বাহক ও উপস্থাপক ও বিশেষ কোন জাতির পক্ষে ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে পেশ করেন নি। প্রথম দিন থেকেই তাঁর সম্বোধনঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا (الاعراف: ١٥٨)

হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্যই বিধান বাহক হয়ে এসেছি।

আর তাঁকে যে বিশ্বস্রষ্টা—বিশ্বপালক আল্লাহ্ তা'আলা পাঠিয়েছেন, তিনি তাঁরই সম্পর্কে ঘোষণা করেছেনঃ

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا (سبا: ٢٨)

হে রাসূল! আমরা তোমাকে সমগ্র মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি, অন্য কোন ভাবে নয়।

হিজরতের পর ষষ্ঠ ও সপ্তম বছরই তিনি তখনকার সময়ে নানা দেশে শাসন ও বাদশাহ-সম্রাটদের প্রতি প্রেরিত পত্রের মাধ্যমে ইসলাম কবুলের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। ফলে তিনি যে কোন আঞ্চলিক নবী ছিলেন না, ছিলেন বিশ্বনবী, তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়ে গেছে।

বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা

ইসলাম (একটি মাত্র) বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাওয়াত প্রথম দিন থেকে দিতে শুরু করেছে। সেজন্য মৌলিক ও ভিত্তিগত চিন্তা হিসেবে বিশ্বমানবের একত্ব, ঐক্য ও অভিন্নতা প্রমাণকারী বহু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপিত করেছে।

এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম উল্লেখ্য—সমস্ত মানুষের মৌলিক অভিন্নতা, বংশীয় সমতা ও একত্ব। ইসলাম উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে, দুনিয়ার সমস্ত মানুষ একই পিতা-মাতা—আদম ও হাওয়ার বংশধর। আদম ও হাওয়াই দুনিয়ায় সর্বপ্রথম মানব-মানবী। তাদের দুইজনকে মাটির মৌল উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।

মনুষ্যত্ব ও মানবীয় বিশেষত্বে সমস্ত মানুষ এক, সকলেরই পরিণতি সর্বতোভাবে এক। সকলকেই একমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র নিকট ফিরে যেতে হবে। এ-ই যখন পরম ও চূড়ান্ত সত্য, তখন বিভিন্ন বৈষয়িক ও বস্তুগত পার্থক্যের ভিত্তিতে মানুষকে বিভিন্ন জাতীয়তায় বিভক্ত করা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। বস্তুগত উপকরণের দিক দিয়েও মানুষের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা নিতান্তই অমানুষিক কর্মকাণ্ড ছাড়া আর কি হতে পারে? ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ পৃথিবীর কোন্ ভৌগোলিক সীমার মধ্যে, কোন্ বংশে, কোন্ বর্ণে বা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কোন্ শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করেছে, তা বিন্দুমাত্র গুরুত্ববহ নয়। এ সম্পর্কে কুর্‌আন মজীদের এ আয়াতটি বিশেষভাবে বিবেচ্যঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ـ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ (الحجرات: ١٣)

হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন মেয়ে লোক থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রভুক্ত বানিয়েছি শুধু এইজন্য, যেন তোমরা পরস্পরে পরিচিতি লাভ করতে পার। প্রকৃত কথা হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানার্হ সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহ্ ভীরু—আল্লাহ্ অনুগত।

বিশ্বরাষ্ট্র তো মানুষকে নিয়েই গড়তে হবে। আর মানুষকে নিয়ে বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন মানবীয় অভিন্নতা স্বীকৃত সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। কুরআন মজীদের উদ্ধৃত আয়াতটি সেই কাজ-ই করেছে। এ আয়াত অনুযায়ী মানুষের মৌলিক একত্ব ও অভিন্নতা চিরন্তন সত্য হিসেবে অবশ্য স্বীকৃতব্য। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, দুনিয়ার প্রচলন অনুযায়ী মানুষ বিভিন্ন বংশ-গোত্র ও ভৌগোলিক অঞ্চল ও বর্ণে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। কুরআন এই বিভক্তিকে অস্বীকার করেনি। বরং কুরআনের বক্তব্য হচ্ছে, এই পার্থক্যসমূহ স্বাভাবিক; কিন্তু তা যেমন মৌলিক পার্থক্য নয়, তেমনি তা এক বৈষয়িক ও ব্যবহারিক লক্ষ্যের জন্য নিবদ্ধ। আর তা হচ্ছে মানুষের পরস্পরের মধ্যে পরিচিতি লাভ। এই পরিচিতি লাভ কিছুমাত্র অপ্রয়োজনীয় নয়। কিন্তু তাই বলে সে পার্থক্যের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি করার অধিকার কারোরই থাকতে পারে না। মানুষের এই বাহ্যিক বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তাদের মৌলিক একত্ব ও অভিন্নতা অনস্বীকার্য।

বস্তুত বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে সমগ্র মানুষের মৌলিক একত্ব এবং কুরআন তা অকাট্য ও চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে—সমস্ত বিশ্বলোক যেমন এক আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, তেমনি সমস্ত মানুষের সৃষ্টিকর্তাও সেই এক মহান আল্লাহ্। অতএব তাদের সকলেরই জন্য আইন ও জীবন হতে পারে কেবলমাত্র তা-ই, যা সেই মহান আল্লাহ্ নিজে নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্য রচনা করে নাযিল করেছেন। আল্লাহ্ প্রদত্ত সেই আইন ও বিধান-ই হতে পারে সমস্ত মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির সাথে পূর্ণ মাত্রায় সামঞ্জস্যশীল। কেননা মানুষ যে বিশাল বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে বসবাসকারী, সেই বিশ্ব প্রকৃতি—তার প্রতিটি অণু পরমাণু এক আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত আইন-বিধানের অধীন ও অনুগত। এর কোন একটি জিনিসও আল্লাহ্‌র প্রাকৃতিক আইনের অধীনতা থেকে মুক্ত নয়। সবকিছুই ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, প্রতি মুহূর্তই নিরবচ্ছিন্নভাবে সে আইন মেনে চলছে। এরূপ অবস্থায় এই প্রকৃতিরই একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ এই মানুষ সেই আল্লাহ্‌র আইনের আনুগত্য না করে কিছুতেই থাকতে পারে না। বরং সে আইনের আনুগত্য করা এবং তার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলায়ই মানুষের জীবন নিহিত। সে আইনের লংঘনে মানুষের বস্তুগত মৃত্যু ও ধ্বংস যেমন অনিবার্য, তেমনি মানুষের নৈতিক জীবনের জন্য সেই আল্লাহ্‌রই নাযিল করা আইনের লংঘন তার নৈতিক জীবনের নিশ্চিত অপমৃত্যু, তাতে কোনই সংশয় থাকতে পারে না।

মানুষ এ দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য সারাটি দুনিয়ায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আল্লাহ্‌র অফুরন্ত ও অপরিমেয় জীবনোপকরণের প্রয়োজনীয় পরিমাণে নিরবচ্ছিন্ন প্রাপ্তের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু মানুষ বর্তমানে বিছিন্ন সাংঘর্ষিক জাতীয়তা ও রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত বলে নিজের পরিমণ্ডলেই সব প্রয়োজনীয় উপকরণ থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হচ্ছে। এই কারণে—দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্ট সর্বপ্রকারের প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণে ধন্য করে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ভিত্তিক রাষ্ট্রগুলির বেড়াজাল ছিন্ন ভিন্ন করে একটি মাত্র বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। বর্তমানে দুনিয়ার মানুষের অবস্থা এসব বৈষয়িক প্রতিবন্ধকতার কারণে চরমভাবে বিপর্যস্ত। কোথাও যদি ধন-ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য ও বন্যা প্রবাহ, অন্যত্র চলছে চরম শুষ্কতা, নিদারুণ অভাব-অনটন ও পীড়াদায়ক দারিদ্র্য। এক দেশে যদি খাদ্যের বিপুলতা, অন্য দেশে খাদ্যের চরম দুর্ভিক্ষ। ফলে লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষুধার প্রচণ্ড আঘাতে জর্জরিত, অসহায়ভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। আবার অন্যত্র সম্পদের প্রাচুর্য পাহাড় সৃষ্টি করেছে, কে তা ভোগ-ব্যবহার করবে—তা পাওয়া যায় না। ফলে অপচয় ও বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে মানুষ রসাতলে চলে যাচ্ছে।

বর্তমান বিশ্বে পাশ্চাত্যের বিভ্রান্ত দার্শনিক গুরুদের প্রদত্ত শিক্ষার প্রভাবে যে বংশীয় ও জাতীয় আভিজাত্য তথা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের আহবান চলছে, তা

এই মানুষের জন্য কিছুমাত্র কল্যাণকর বিবেচিত হতে পারে না। কৃত্রিম ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে মানুষকে যে বিভিন্ন পার্থক্যপূর্ণ শ্রেণীতে বিভক্ত করে রাখা হয়েছে, তা মানুষের মনুষ্যত্বকেই ক্ষত-বিক্ষত করছে, শ্রেণীসমূহের মধ্যে মারাত্মক সংঘর্ষ সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ ধ্বংসাত্মক আত্মকলহে জর্জরিত হয়ে নিঃশেষ ধ্বংস হয়ে যাক, তারা যেন কোনদিনই মানুষের অধিকার ও মর্যাদা লয়ে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সুযোগই না পায়।

এই মর্মান্তিক অবস্থার অবস্থিতি বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে প্রচণ্ড প্রতিবন্ধক যেমন, ঠিক তেমনি মানবতার অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে এই বিভিন্নতা ভেঙ্গে একাকার করে দিয়ে একটি বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা প্রকট করে তুলছে।

ঠিক এই কারণে বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ আহবায়ক বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)- বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেনঃ

لَافَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى اَعْجَمِيٍّ وَلَا لِاَعْجَمِيٍّ عَلٰى عَرَبِيٍّ اِلَّا بِالتَّقْوٰى -

কোন আরব ব্যক্তির কোন অনারব ব্যক্তির উপর—কোন অনারব ব্যক্তি কোন আরব ব্যক্তির উপর একবিন্দু শ্রেষ্ঠত্ব বা বিশিষ্টতা নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশিষ্টতা স্বীকৃত হতে পারে কেবলমাত্র তাকওয়ার ভিত্তিতে।[১]

বলেছেনঃ

كُلُّكُمْ مِنْ اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ -

তোমাদের সব মানুষই আদমের সন্তান। আর আদম তো মাটি থেকে সৃষ্ট।[২]

বলেছেনঃ

يَاَيُّهَاالنَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ اَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَفَاخُرَهَا بِاٰبَائِهَا اَلَا اِنَّكُمْ مِّنْ اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ طِيْنٍ -

হে মানুষ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের থেকে জাহিলিয়াতের আভিজাত্য গৌরব ও পূর্ণ বংশ নিয়ে অহংকারী ও বড়ত্বাভিমান দূর করে দিয়েছিলেন। তোমরা জেনে রাখবে, তোমরা সকল মানুষই আদমের সন্তান আর আদমকে তো মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।[৩]

---

১. معالم الحكومة الاسلامية ص:٢٩٢، سيرة ابن هشام ٢ ص:١٤

২. ঐ

৩. ঐ, পৃ. ৩১২।

ইরশাদ করেছেনঃ

اَلاَ اِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللّٰهِ عَبْدٌ اِتْقَاهُ اِنَّ النَّاسَ مِنْ عَهْدِ اٰدَمَ اِلٰى يَوْمِنَا هٰذَا مِثْلُ اَسْنَانِ الْمُشْطِ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِىٍّ عَلٰى عَجَمِىٍّ وَلاَ لِاَ حْمَرَ عَلٰى اَسْوَدَ اِلاَّ بِالتَّقْوٰى ـ

জেনে নাও, আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে সেই বান্দা, যে তাদের সকলের তুলনায় অধিক তাকওয়া সম্পন্ন। মানুষ আদমের সময় থেকে আজকের এই দিনটি পর্যন্ত চিরুনীর দাঁতগুলির ন্যায় সম্পূর্ণ সমান। যেমন আরব অনারবদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা উত্তম নয়, কৃষ্ণাঙ্গের উপর গৌরাঙ্গেরও কোন শ্রেষ্ঠত্ব বা আভিজাত্য নেই। যা কিছু শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য, তা কেবলমাত্র তাকওয়ার কারণে।

اِنَّمَا النَّاسُ رَجُلاَنِ ـ مُؤْمِنٌ تَقِىٌّ كَرِيْمٌ عَلَى اللّٰهِ اَوْفَاجِرٌ شَقِىٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللّٰهِ ـ

মানুষ গুণগতভাবে দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগের মানুষ ঈমানদার তাকওয়া সম্পন্ন ও ভদ্র উদার, আল্লাহ্‌র নিকট সম্মানার্হ। আর এক প্রকারের মানুষ হচ্ছে পাপ প্রবণ, ভাগ্যহীন দুষ্ট প্রকৃতির, আল্লাহ্‌র নিকট যার কোনই মর্যাদা নেই।

اَلاَ اِنَّ الْعَرَبِيَّةَ لَيْسَتْ بَابٍ وَوَالِدٍ وَلٰكِنَّهَا لِسَانٌ نَاطِقٌ فَمَنْ قَصَرَبِهِ عَمَلُهُ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ حَسَبُهُ (ابوداؤد)

জেনে রাখো, আরবত্ব বংশীয় ভাবে বা জন্মসূত্রে হয় না তা হচ্ছে বাকশক্তি সম্পন্ন বাণী। যার আমল ত্রুটিপূর্ণ, অক্ষম, সে বংশের জোরে সেই মর্যাদায় পৌছতে পারে না।

لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِاَقْوَامٍ اِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ اَوْلَيَكُوْنُنَّ اَهْوَنَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الْجُعَلاَنِ الَّتِىْ تَدْفَعُ بِاَنْفِهَا النَّتِنَ (ابوداؤد)

জাতীয়তা নিয়ে অহংকার করা লোকদের পরিহার করা উচিত। যেসব লোক তা করে, তারা জাহান্নামের কয়লা মাত্র। অন্যথায় তারা আল্লাহ্‌র নিকট সেই ভারবাহীদের চেয়েও হীন হয়ে যাবে, যারা নিজেদের নাক দ্বারা ময়লা দূর করে।

রাসূলে করীম (স)-এর এসব ঘোষণায় মানুষ সম্পর্কে যে মৌলিক ধারণা পেশ করা হয়েছে তা যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তেমনি মানুষ সম্পর্কে সুষ্ঠু চিন্তার সুষ্ঠু পদ্ধতিও। মানুষকে নিয়ে একটি বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের জন্য মানুষ সম্পর্কে যে মৌলিক ধারণা একান্ত অপরিহার্য, তা-ই রাসূলে করীম (স)-এর ভাষণে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে পেশ করা হয়েছে। সেজন্য সর্ব মানুষের এক ঐক্যবদ্ধ সমাজে

পরিণত হওয়ার পথে যত প্রতিবন্ধকতাই রয়েছে, রাসূলে করীম (স) ঘোষিত আদর্শ সেই সব কিছুকেই নস্যাৎ করে দিয়েছে। যেসব কারণে মানুষের পরস্পরে, যেসব কারণে ব্যক্তিগতভাবে বা দলগত কিংবা জাতিগতভাবে যুদ্ধ-সংঘর্ষ বাঁধে, আর যার ফলে কোটি কোটি নিরীহ মানুষের মহামূল্য রক্ত অকারণ প্রবাহিত হয়, তা সবই দূর করে দেয়ার ব্যবস্থা তাতে রয়েছে। রাসূলে করীম (স) ঘোষিত আদর্শ অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা হলে এক দিকে যেমন নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ আল্লাহ্ প্রদত্ত সমস্ত আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত নিয়ামতসমূহ পেয়ে ধন্য হতে পারে, তেমনি বিশ্বমানবের জন্য এক অভিন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থা—বিশ্বরাষ্ট্র—গঠনের পথও উন্মুক্ত হতে পারে।

ঈমানই হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ মানব সৃষ্টির নির্ভুল ভিত্তি

বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ সমাজ সৃষ্টি করা। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ মানব সমষ্টি গঠন কি করে সম্ভব, ব্যক্তিগণ এক এক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন স্বতন্ত্র সত্তা হওয়া সত্ত্বেও তারা এক ঐক্যবদ্ধ জাতিসত্তার অংশে পরিণত হতে পারে কিভাবে—অন্য কথায়, ইসলামী উম্মত গঠনের মৌল উপাদান কি কি, সে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কেননা মানুষ স্বভাবতই কাউকে আপন মনে করে, কাউকে মনে করে পর। কি কি কারণে মানুষ অপর মানুষকে আপন মনে করে তার বা তাদের সাথে একাত্ম হয়ে যায় এবং যাকে বা যাদেরকে আপন মনে করতে পারে না, তাদেরকে পর মনে করে, তাদের সাথে একাত্মতা সৃষ্টি করতে প্রস্তুত হয় না, এই পর্যায়ে তা বিশ্লেষণ করা একান্ত আবশ্যক।

মানুষে মানুষে একাত্ম হওয়ার জন্য সমাজ-বিজ্ঞানীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করে থাকেনঃ

১. এক দেশ, এক ভূ-খণ্ড বা এক ভৌগোলিক এককের মধ্যের লোক হওয়া;

২. রক্ত-সম্পর্ক, একই সম্প্রদায় বা একই জাতিভুক্ত লোক হওয়া;

৩. একই ভাষাভাষী হওয়া;

৪. একই ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অধিকারী হওয়া;

৫. স্বার্থ ও কল্যাণ লাভের ক্ষেত্রে অভিন্ন হওয়া।

এই বিষয়গুলি যখন কোথাও সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে একত্রিত হয়, তখনই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ পরস্পরের সাথে একাত্ম হয়ে যায়। এ দিক দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়া লোকগুলি পরস্পরকে আপন মনে করে এবং এর বাইরে অবস্থানকারী লোকদেরকে পর মনে করে। মনে করে ওরা ভিন্ন লোক, ওদের সাথে আমাদের

কোন সম্পর্ক নেই—একাত্মতা নেই। দুনিয়ার জাতীয়তাবাদী দল বা লোক সমষ্টিসমূহ এই সবের ভিত্তিতেই জাতীয়তাবাদী মনোভাব সৃষ্টি করেছে এবং এক-একটি জাতি গড়ে তুলেছে। জাতির লোকদেরকে অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর বানিয়ে নিয়েছে।

মোটকথা, উক্ত দিকগুলির ভিত্তিতে যে জনসমষ্টি এক ও অভিন্ন, তারা এই উম্মত (Nation) রূপে পরিচিত হয়েছে। আর যেসব এই দিক দিয়ে পরস্পর সামঞ্জস্যশীল নয়, তারা এদের থেকে ভিন্ন জাতিরূপে চিহ্নিত হয়েছে।

কিন্তু এই যে বিষয়গুলির দিক দিয়ে অভিন্নতার কারণে এক-একটি জাতি গড়ে উঠেছে এবং অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি সত্তারূপে চিহ্নিত হয়েছে, এই দিকগুলি মানুষের ইচ্ছা-বহির্ভূত। এ গুলির উপর মানুষের কোন হাত নেই। আর মানুষের ইচ্ছা ক্ষমতা-বহির্ভূত ভিত্তির উপর জাতি গঠন কখনই প্রকৃত জাতি গঠন হতে পারে না। এ দিকগুলির কারণে যারাই অভিন্ন, প্রকৃত অবস্থার দিক দিয়ে তারা অভিন্ন প্রমাণিত হতে পারে না।

এরপরও এমন অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে যেতে পারে, যেগুলি মানুষের ইখতিয়ারভুক্ত এবং সে কারণে তাদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য ও একাত্মতা না হয়ে মারাত্মক ধরনের বৈপরীত্য, তারতম্য ও বিভিন্নতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। উপরোল্লিখিত দিকগুলির ভিত্তিতে অভিন্ন বলে চিহ্নিত 'জাতিসত্তা' এসব পার্থক্য ও বিভিন্নতার কারণে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে।

বস্তুত ঐক্যবদ্ধ জাতিসত্তা গড়ে তোলার জন্য ব্যক্তিগণের মধ্যে এমন প্রকৃত ঐক্যভিত্তি থাকা একান্তই আবশ্যক, যা বিভিন্ন স্বতন্ত্র ব্যক্তিদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে—ভিন্ন ভিন্ন হতে দেয় না। আর সে ঐক্যভিত্তি তা-ই হতে পারে, যা মানুষের ইচ্ছা ও ইখতিয়ারভুক্ত। যার কারণে মানুষ অন্তরের তীব্র আকর্ষণে একটি কেন্দ্রবিন্দুতে পুরাপুরিভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়, পারস্পরিক সব বিভিন্নতা নিঃশেষ ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, যার দরুন মানুষ পরস্পরের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হয়ে উঠে। তখন মানুষ অপরের জন্য তাই কামনা করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দনীয় ও কল্যাণকর মনে করে। অপরের জন্য তাই অপছন্দ করে, যা নিজের জন্য ক্ষতিকর মনে করে। কিন্তু এই উচ্চতর মহান মানবীয় ভাবধারা জন্মস্থানের একত্ব, রক্ত, ভাষা, বর্ণ বা ইতিহাস-ঐতিহ্যের অভিন্নতার কারণে লাভ করা সম্ভব নয়। কেননা এগুলি এমন নয়, যা মানুষের মধ্যে প্রকৃত ঐক্য ও একাত্মতা গড়ে তুলতে সক্ষম।

অন্য কথায়, চিন্তা ও বিশ্বাস এবং আদর্শগত বিভিন্নতা—জীবনের লক্ষ্য ও অন্তরের কামনা-বাসনার দিকদিয়ে বিভিন্নতা থাকলে পরস্পর অবিচ্ছিন্ন ঐক্যে

পরস্পর মিলিত ও একত্রিত হতে পারে না। ফলে এমন জনসমষ্টি এক ঐক্যবদ্ধ জাতিসত্তার রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না, যারা চিন্তা-বিশ্বাস, আদর্শ, জীবন লক্ষ্য ও অন্তরের কামনা-বাসনার দিক দিয়ে এক ও অভিন্ন নয়।

ইচ্ছা ও ইখতিয়ার-বহির্ভূত বিষয়াদিতে ঐক্য ও একাত্মতা যতই দেখানো হোক, মানুষের মধ্যে প্রকৃত স্থায়ী ও দৃঢ় ঐক্যের ভিত্তি রচনা করতে পারে না। কেননা তাদের মধ্যে চিন্তা-বিশ্বাস, আদর্শ ও কামনা-বাসনার দিক দিয়ে চরম বৈপরীত্য থাকা তখনও খুবই সম্ভব।

মানুষের নিকট তার নিজের চিন্তা-বিশ্বাস ও নিজের সচেতনভাবে গৃহীত আদর্শকে ইচ্ছা ও ইখতিয়ার-বহির্ভূত বিষয়ে ঐক্যের তুলনায় অনেক বেশী পবিত্র ও অধিকতর সম্মানার্হ মনে করে। মানুষ নিজের আদর্শের জন্য জীবন ও ধন-মাল অকাতরে কুরবানী করতে পারে। ভিন্নতর আদর্শের ধারককে জন্মভূমি, বংশ, বর্ণ ও ভাষার দিক দিয়ে অভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও নিজের শত্রু মনে করতে পারে এবং স্বীয় চিন্তা-বিশ্বাস ও আদর্শ রক্ষার জন্য তার বিরুদ্ধে লড়াইও করতে পারে। তার সাথে মিলিত হয়ে কোন জাতি গঠন করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত না-ও হতে পারে। ফলে এই লোকদিগকে কোন ঐক্যের বন্ধনে বাঁধা যায় না, তাদের সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়ে তোলা সম্ভবপর হয় না।

একটি ভূ-খণ্ডে বা ভৌগোলিক অঞ্চলে জন্ম গ্রহণকারী, একই ধরনের জীবন যাত্রা নির্বাহকারী, একই বংশমূল থেকে উৎসারিত, ভাষা ও ইতিহাস-ঐতিহ্যে অভিন্ন ব্যক্তিরা আকীদা-বিশ্বাস এবং সচেতনভাবে গৃহীত মত, নীতি ও আদর্শের দিক দিয়ে পরস্পর বিভিন্ন হতে পারে। বলতে পারে, ব্যক্তির সার্বিক স্বাতন্ত্র্য ও ভিন্নতাই আসল ও মূল, তার বাইরে সমাজ-সমষ্টির কোন স্থান বা গুরুত্বই নেই। তখন মানুষ নিছক ব্যক্তিগত বৈষয়িক বস্তুগত স্বার্থের দরুন এমন স্বেচ্ছাচারিতা শুরু করে দিতে পারে, যার দরুন ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠতে পারে, বাইরের কোন শক্তি ব্যক্তিদের বিভ্রান্ত ও প্ররোচিত করে এই যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিতে পারে এ উদ্দেশ্যে যে, অতঃপর উভয় দিকের লোকদের নিকট যুদ্ধ সরঞ্জাম ও অস্ত্র-শস্ত্র দেদার বিক্রয় করার মহাসুযোগ পাওয়া যাবে। এরূপ অবস্থায় অখণ্ড জাতিসত্তা রূপে ঘোষিত এই জনসমষ্টির অস্তিত্বই বিনষ্ট ও বিলীন হয়ে যাওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

পক্ষান্তরে অন্য কিছু ব্যক্তি ভিন্নমতের বিশ্বাসী ও ধারক হয়ে সমাজ সমষ্টিকেই মূল ও আসল মনে করে তাকেই অগ্রাধিকার দিতে পারে। বলতে পারে, সমাজ বাঁচলেই ব্যক্তিও বাঁচবে। তাই ব্যক্তির উচিত সমাজ-সমষ্টির স্বার্থে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে উৎসর্গ করে দেয়া। তখন সমাজই বড় হয়ে দেখা দেবে, ব্যক্তি অত্যন্ত হীন ও নগণ্য হয়ে দাঁড়াবে।

চিন্তার এই মারাত্মক ধরণের বিভিন্নতা ও বৈপরীত্য সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে জন্মস্থানের–বংশের-রক্তের-ভাষা-ইতিহাস-ঐতিহ্যের অভিন্নতা কি একীভূত ও ঐক্যবদ্ধ এক জাতি গড়তে সক্ষম হতে পারে?

আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানীগণ জাতি গঠনের উপাদান হিসেবে যেগুলির কথা বলে—যা উপরে উদ্ধৃত হয়েছে—তা মানুষকে একই কেন্দ্রে একীভূত করার দিক দিয়ে কিছু-না-কিছু ভূমিকা পালন করে, তা অস্বীকার করা হচ্ছে না। কিন্তু তার সাথে ইচ্ছা ও ইখতিয়ারমূলক উপাদান একীভূত না হলে প্রকৃত কোন জাতিসত্তা গড়ে উঠতে পারে না। কেননা চিন্তা-বিশ্বাস ও আদর্শ এসব অভিন্নতার ভিত্তিকে গুড়িয়ে দিতে পারে। বাহ্যিক দৈহিক অভিন্নতা আন্তরিক ও অভ্যন্তরীণ একাত্মতা সৃষ্টি করতে পারে না।

মানবাধিকারের সনদের প্রথম ধারা—মানুষ পরস্পরের ভাই হবে—বিশ্বাস ও ধর্মে যতই পার্থক্য থাক-না-কেন—এ ক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে না। কেননা চিন্তা-বিশ্বাস ও আদর্শের পরস্পর বিপরীত দুই ভাই-ও পরস্পরের প্রকৃত ভাই হতে পারে না, ঐক্যবদ্ধ জাতি হয়ে উঠা অনেক দূরের ব্যাপার।

ব্যক্তিদের ঐক্য ও এক ঐক্যবদ্ধ জাতিসত্তা গড়ে তোলার জন্য ব্যক্তিদের জীবনধারা ও জীবন-সঙ্গী গ্রহণে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক। কিন্তু চিন্তা-বিশ্বাসে ও জীবন-দর্শনে অভিন্ন না হলে দুই ব্যক্তির পক্ষেও পরস্পর মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব হয় না। এ যেমন বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত সত্য, তেমনি কুরআনে ঘোষিত সত্যও তাই।

কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (الحجرات: ١٠)

মু'মিন লোকেরা পরস্পরের ভাই।

অর্থাৎ ঈমানের দিক দিয়ে যারা পরস্পরের সাথে অভিন্ন, বাস্তব জীবনধারায়ও তারা পরস্পরের সাথে ঐক্যবদ্ধ। এই ঈমান-ই ব্যক্তিগণকে একীভূত করতে সক্ষম—জন্মভূমির অভিন্নতা নয়, বংশের রক্তের এককতা নয়, বর্ণ ও ভাষার এককতাও নয়। এগুলির অভিন্নতার ভিত্তিতে জাতি গঠনের চিন্তা যে ব্যক্তি প্রথম পেশ করেছে, তার নাম 'জুবিনো' বলে শুনা যায়। ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের জন্য এই সব কয়টির কিংবা এর মধ্যে কোন একটির অভিন্নতাকে ভিত্তি করা যেতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছিল সেই কোন্ দূর অতীতে। পরে তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ও সমাজবিজ্ঞানে স্বীকৃত মতাদর্শের স্থান দখল করে। মুসোলিনী ও হিটলার এই মতের উপর ভিত্তি করেই জার্মান ও ইটালীয়ান জাতি গড়ে তুলেছিলেন এবং

মানবেতিহাসের সবচাইতে মর্মান্তিক বিপর্যয় সর্বধ্বংসী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রকৃত কারণ-ও ছিল সেই মতটি।

উম্মত বা ঐক্যবদ্ধ জাতিসত্তা গঠনের ইসলামী ভিত্তি

কিন্তু ইসলামে ঐক্যবদ্ধ জতি গঠনের উপাদান ও কার্যকরণ সম্পূর্ণ ভিন্নতর। আর তা হচ্ছে 'ঈমান'। ইসলাম ঈমানের ভিত্তিতেই জাতি গঠন করে, ঈমানের উপরই তার স্থিতি, ঈমানের ভিত্তিতেই তার উৎকর্ষ, উন্নতি ও অগ্রগতি। এ জাতির গোটা জীবন-ই সার্বক্ষণিকভাবে পরিচালিত হয় সেই মৌলিক ও ভিত্তিগত ঈমান অনুযায়ী। যেখানেই ঈমানের লংঘন, সেখানেই জাতিসত্তার অস্তিত্ব বিপন্ন ও বিপর্যস্ত।

এই ঈমান বলতে বোঝায় আকীদা-বিশ্বাসে পরম ঐক্য ও একাত্মতা। এ ঈমান বংশানুক্রমিক নয়, আঞ্চলিক নয়, ভাষা বা বর্ণভিত্তিক নয়! এ ঈমান বিশ্বজনীন, চিরন্তন ও শাশ্বত। এ ঈমান শুধু ব্যক্তিগতই নয়, সামষ্টিকও। সমগ্র জীবন ও জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগ পরিব্যাপ্ত। বস্তুত এই ঈমানই হতে পরে বহু ব্যক্তির মিলন-ভিত্তি। এ ঈমান প্রত্যেক ব্যক্তির চেতনা সজ্জাত, প্রত্যেক ব্যক্তির মর্মমূলে গভীরভাবে গ্রথিত, রক্ত-মাংসের প্রতিটি অণুর সাথে সংমিশ্রিত। এ ধরনেরই একটি জনসমষ্টিকে ইসলামের ভাষায় 'উম্মত' বা 'সম্মিলিত জাতিসত্তা' বলা চলে।

কুরআনের পরিভাষায় 'উম্মত' জীবন লক্ষ্যে অভিন্নতা এবং ঐকান্তিক একাগ্রতার নিদর্শন। 'উম্মত' শব্দের মূল ও উৎস যদি হয় 'উম্ম'—অর্থাৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তাহলে বুঝতেই হবে যে, এক ও অভিন্ন লক্ষ্যাভিসারী এই জন-সমষ্টি। অন্তত এ দিক দিয়ে সামান্য বিভিন্নতাও নেই। আর ঈমান-আকীদার অভিন্নতাই যে জনসমষ্টির মধ্যে জীবন-লক্ষ্যের অভিন্নতার স্থপতি তা-ও অনস্বীকার্য।

কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে এ দিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। এ পর্যায়ের কতিপয় আয়াত এখানে উদ্ধৃত হচ্ছেঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (الحجرات: ١٠)

ঈমানদার লোকেরাই প্রকৃতপক্ষে পরস্পরের ভাই।

অর্থাৎ ঈমানের দিক দিয়ে যেসব ব্যক্তির মধ্যে একত্ব ও অভিন্নতা, তারাই পরস্পরের ভাই হতে পারে। পরস্পরের 'ভাই' হওয়া পরম ও চরম মাত্রার একত্ব ও একাত্মতা বোঝায়। এই একত্ব ও একাত্মতার মৌল উৎস হচ্ছে ঈমান। ঈমান না হলে এই একত্ব ও একাত্মতা যেমন হতে পরে না, তেমনি পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কও গড়ে উঠতে পারে না।

وَإِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (الانبياء: ٩٢)

এবং নিশ্চয়ই তোমাদের এই উম্মত একই উম্মত এবং আমি-ই তোমাদের রব্ব্। অতএব তোমরা কেবলমাত্র আমারই ইবাদত কর।

এ আয়াতে এক সাথে তিনটি কথা বলা হয়েছে। প্রথম আল্লাহ্-ই সমগ্র মানুষের একমাত্র রব্ব্—সার্বভৌম। সেই কারণেই দাসত্ব ও আনুগত্য করতে হবে সেই এক আল্লাহ্র, যিনি সকল মানুষের রব্ব্। আর এক আল্লাহ্কে 'রব্ব্' রূপে মেনে নিয়ে কেবল তাঁরই ইবাদত করাই হচ্ছে গোটা জনসমষ্টির একমাত্র কর্তব্য। এই তিনটি কাজই পরস্পর সম্পর্কিত, ওতপ্রোত এবং পরস্পর সঞ্জাত।

وَإِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (المؤمنون: ٥٢)

নিঃসন্দেহে মনে রাখবে, তোমাদের এই জনসমষ্টি এক অভিন্ন উম্মত। আর আমিই তোমাদের রব্ব্। কাজেই তোমরা ভয় করবে—সমীহ করবে কেবলমাত্র আমাকে।

এ আয়াতেও সেই তিনটি কথাই বলা হয়েছে। তবে পূর্বোল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে এক আল্লাহ্র ইবাদত করার কথা। আর এ আয়াতে বলা হয়েছে এক আল্লাহ্কে ভয় করার ও সমীহ করার কথা। ভয় করা ও ইবাদত করা—এ দুটি বিষয়ও ওতপ্রোত, একটি অন্যটির পরিণতি। আল্লাহ্কে ভয় করলেই মানুষ আল্লাহ্র ইবাদত করবে। কেননা 'ভয়' মানুষকে বাধ্য করে যাকে ভয় করে তার নিকট সমর্পিত হতে। যাকে ভয় করে না, মানুষ তাকে 'কেয়ার' করে না, করার কোন প্রয়োজনও মনে করে না। দ্বিতীয়ত আল্লাহ্র ইবাদত নিছক কোন আনুষ্ঠানিক ব্যাপার নয়, নয় শুধুমাত্র উঠ-বস করা বা না খেয়ে থাকার ব্যাপার। ইবাদতে মহান আল্লাহ্র সমীপে নিজের গোটা সত্তার সমর্পিত হওয়ার—সম্পূর্ণরূপে অবনত হওয়ার ভাবধারা প্রকটভাবে বর্তমান থাকা আবশ্যক। অন্যথায় 'ইবাদত' ইবাদত হবে না; হবে একটা প্রচলিত অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা—কিন্তু ইসলামে তা কাম্য নয়।

এখানে উল্লেখ্য, সূরা আল-আম্বিয়ার আয়াতটিতে মুসলিম জনগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর সূরা আল মু'মিনুন-এর এই শেষোক্ত আয়াতটিতে রাসূলগণ এবং তাঁদের উম্মত—উভয়কেই সম্বোধন করা হয়েছে। এ দুটি আয়াতেরই মূল প্রতিপাদ্য, ঈমান ও আকীদা-বিশ্বাসের অভিন্নতাই হচ্ছে কুরআনের দৃষ্টিতে ঐক্যবদ্ধ 'জাতিসত্তা' বা উম্মত গঠনের মৌল ভিত্তি। এ কথা কেবল মুসলিম উম্মতের ক্ষেত্রেই সত্য নয়, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের উম্মতের ক্ষেত্রে ছিল পরম সত্য। পূর্ববর্তী আয়াতটি হচ্ছেঃ

يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ طَيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ـ اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র দ্রব্যসমূহ ভক্ষণ কর এবং নেক আমল কর। তোমরা যা কিছুই কর, আমি সে ষিয়ে পূর্ণ অবহিত রয়েছি।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ـ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ(ال عمران: ١١٠)

তোমরাই হচ্ছ সর্বোত্তম জাতিসত্তা, মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যেই তোমাদেরকে গড়ে তোলা হয়েছে। তোমরা সব ন্যায় ও কল্যাণময় কাজের আদেশ কর, নিষেধ কর সব খারাপ—ঘৃণ্য—অকল্যাণকর কাজ থেকে (আর সর্বোপরি) তোমরা সব সময়ই এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল।

বস্তুত সব সময় ও সর্বাবস্থায় ঈমান রক্ষা করে চলাই এই সর্বোত্তম জাতিসত্তা গড়ে তোলার মৌল ভিত্তি। এই জাতসত্তা লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন নয়। কেননা জাতি-সত্তা মাত্রেরই একটা-না-একটা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকতেই হবে। একটা-না-একটা একক ও অভিন্ন লক্ষ্য ছাড়া কোন সম্মিলিত জাতিসত্তা গড়ে উঠতে পারে না। লক্ষ্যহীন সমবেত হওয়াকে যেমন 'ঐক্যবদ্ধ' জাতিসত্তা বলা যায় না, তেমনি বিভিন্ন লক্ষ্যের অভিসারী জন-সমাবেশকেও 'জাতি' নামে অভিহিত করা চলে না। একটি ঐক্যবদ্ধ অভিন্ন জাতিসত্তার জন্য একটা লক্ষ্য অবশ্যই থাকতে হবে এবং তার মধ্যকার সমস্ত ব্যক্তিকে হতে হবে একই লক্ষ্যের অভিসারী।

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ (التوبه: ١١)

অতঃপর ওরা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও রীতিমত যাকাত দেয় ও আদায় করে, তাহলেই ওরা তোমাদের দ্বীনী ভাই।

কুরআনের দৃষ্টিতে লোকদের শুধু পরস্পরে 'ভাই' হওয়াই লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য হচ্ছে লোকদের 'দ্বীনী ভাই' হওয়া। কেননা দ্বীনের ভিত্তিতে যে ভ্রাতৃত্ব, তাই ইসলামের কাম্য, শুধু 'ভাই' হওয়াটার যেমন কোন অর্থ হয় না, তেমনি প্রকৃত সম্ভবও নয়। দ্বীনের প্রতি ঈমান ও বাস্তবে সেই 'দ্বীন'-এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ লোকদের মধ্যে যে ভ্রাতৃভাব গড়ে তোলে, তাই পরস্পরকে প্রকৃতপক্ষে ভাই বানিয়ে দেয়। আর দ্বীন-এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ তখনই হতে পারে, যখন সালাত কায়েম করা হবে ও যাকাত দেয়া হবে। সালাত কায়েম ও যাকাত দেয়া ব্যতীত দ্বীনের অনুসরণ হতে পারে না। দ্বীনী ভাই হওয়ার জন্য ঈমানী ঐক্যের ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে সালাত কায়েম ও যাকাত দিয়ে দেয়া একান্তই অপরিহার্য।

এই সব কয়টি আয়াত থেকে যে মৌল কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠে, তা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিম উম্মতকে মু'মিন হিসেবেই সম্বোধন করেছেন এবং ভ্রাতৃত্ব ও জন-ঐক্যের ভিত্তি ও প্রাণশক্তি হিসেবে ঈমান-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

রাসূলে করীম (স) বিভিন্ন বাণী ও ভাষণের মাধ্যমে এই তত্ত্ব উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। একটি হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছেঃ

ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعٰى بِهَا اَدْنَاهُمْ۔

মুসলিমদের কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতা অভিন্ন। তাদের প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষ-ও সেই কর্তব্য পালনে ও বাধ্যবাধকতা রক্ষার জন্য সচেষ্ট হবে।[১]

বলেছেনঃ مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ اِذَا اشْتَكٰى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعٰى لَهٗ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمّٰى

ঈমানদার লোকদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব-ভালবাসা, পারস্পরিক দয়া সহানুভূতি ও মায়া-মমতার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন একটি দেহ। তার কোন অঙ্গ ব্যথা-ক্লিষ্ট হলে গোটা দেহই অনিদ্রা ও জ্বরের উত্তাপে জর্জরিত হয়ে পড়ে।[২]

اَلْمُسْلِمُوْنَ (اخوة) تَتَكَافَأُ دِمَاءُهُمْ وَيَسْعٰى بِذِمَّتِهِمْ اَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ اَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلٰى مَنْ سِوَاهُمْ۔

মুসলিমগণ ভাই-ভাই। তাদের রক্ত সমমর্যাদা সম্পন্ন। তাদের একজন সাধারণ ব্যক্তিও তাদের কর্তব্য-দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট। তাদের দূরবর্তী ব্যক্তিও তাদের নিকটে উপস্থিত। তারা তাদের ভিন্ন অন্যদের মুকাবিলায় এক ঐক্যবদ্ধ শক্তি বিশেষ।[৩]

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَعَلَ الْاِسْلَامَ دِيْنَهٗ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الْاِخْلَاصِ حُسْنًا لَهٗ فَمَنِ اسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَشَهِدَ شَهَادَتَنَا وَاَحَلَّ ذَبِيْحَتَنَا فَهُوَ مُسْلِمٌ لَهٗ مَا لَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا ۔

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামকে তাঁর দ্বীন বানিয়েছেন এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার বাণীকে তার জন্য সৌন্দর্য বানিয়েছেন। অতঃপর যে লোক আমাদের কেবলার দিকে মুখ করে সালাত কায়েম করবে, আমাদের কেবলার দিকে মুখ করে সালাত কায়েম করবে, আমাদের শাহাদাত উচ্চারণ করবে,

---

১. السيرة النبوية لابن هشام ج:٤، ص:٦٠٤

২. বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল।

৩. আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্।

আমাদের যবেহ করা জন্তু খাওয়া হালাল মনে করবে, সেই হচ্ছে মুসলিম। তার অধিকার তাই—যা আমাদের। তার দায়িত্ব ও কর্তব্যও তাই—যা আমাদের।

মুসলিম উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য ইসলাম কেবল ঈমানকে ভিত্তি বানিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তা ভিন্ন আর যে যে ভিত্তি মানুষ এই উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে সেগুলিকে মানুষের মধ্যে বিচ্ছেদ ও বিভিন্নতা সৃষ্টির কারণ রূপে চিহ্নিতও করেছে।

নবী করীম (স) বাস্তবভাবেই এ আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

নবী করীম (স) একদা জুয়াইবির-এর প্রতি দয়া ও স্নেহ-মমতার দৃষ্টিতে তাকালেন। তাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ হে জুয়াইবির, তুমি যদি বিয়ে করতে তাহলে তোমার স্ত্রীর সাহচর্যে তোমার লজ্জাঙ্গের পবিত্রতা রক্ষা করতে পারতে। আর সে দুনিয়া ও আখেরাতে তোমার সাথে সহযোগিতা করতে পারত।

জবাবে জুয়াইবির বললঃ হে রাসূল! আমার পিতা ও মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, আমাকে বিয়ে করার জন্য কে আগ্রহী হবে। আমার তো বংশ ও মর্যাদার কোন গৌরব নেই। ধন-মালও নেই। নেই সৌন্দর্য। এরূপ অবস্থায় কোন্ মেয়ে আমাকে বিয়ে করতে রাযী হবে?

তখন নবী করীম (স) বললেনঃ হে জুয়াইবির! তুমি মনে রাখবে, জাহিলিয়াতের যুগে যে ছিল হীন ও নীচ, ইসলাম তাকে উন্নীত অভিজাত ও মর্যাদাবান বানিয়ে দিয়েছে। ইসলাম জাহিলিয়াতের সমস্ত আভিজাত্যাভিমান এবং বংশ-গৌরবকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। সমস্ত মানুষকে একই আদম বংশজাত গণ্য করে একাকার করে দিয়েছে। এক্ষণে সব মানুষ বংশের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ অভিন্ন। সকলের পিতা আদম এবং আদম মাটির উপাদানে সৃষ্ট। এক্ষণে এই নীতি কার্যকর যে, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লানুগত ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়—ইহকালেও এবং পরকালেও। হে জুয়াইবির, এক্ষণে কোন মুসলিম তোমার চাইতে বেশী মর্যাদাবান, আমি তা মনে করি না। তবে যে লোক তোমার চাইতেও অধিক মুত্তাকী, অধিক আল্লানুগত, তার কথা আলাদা।

এর পর বললেনঃ হে জুয়াইবির! তুমি জিয়াদ ইবনে লবীদের নিকট চলে যাও। সে আনসার সম্প্রদায়ের বনু-বিয়াজা উপ-গোত্রের সরদার। তাকে গিয়ে বলঃ আমি রাসূলে করীম (স) কর্তৃক প্রেরিত, তিনি তোমাকে বলে পাঠিয়েছেন যে, জুয়াইবির-এর নিকট তোমার কন্যা যুলফাকে বিয়ে দাও।

জুয়াইবির রাসূলে করীম (স) কর্তৃক প্রেরিত হয়ে জিয়াদের নিকট চলে গেলেন। জিয়াদ ঘরেই ছিলেন। তাঁর নিকট তাঁর গোত্রের বহু লোক উপস্থিত ছিল। জুয়াইবির অনুমতি নিয়ে তথায় উপস্থিত হয়ে সালাম করে বললেনঃ হে লবীদ-পুত্র জিয়াদ। রাসূলে করীম (স) একটি বিশেষ প্রয়োজনে আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। আপনি অনুমতি দিলে আমি তা এখানেই প্রকাশ করতে পারি।

অনুমতি পেয়ে তিনি রাসূলে করীম (স) কর্তৃক শেখানো কথা বলে দিলেন।

জিয়াদ বললেনঃ রাসূলে করীম (স) এ জন্যই কি আপনাকে আমার নিকট পাঠিয়েছেন?

জুয়াইবির বললেনঃ হ্যাঁ, আমি নিশ্চয়ই রাসূলে করীম (স) সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলছি না।

জবাবে জিয়াদ বললেনঃ আমরা আমাদের কন্যা আনসার বংশের আমাদের সমমর্যাদার ছেলের নিকটই বিয়ে দিতে পারি। অতএব হে জুয়াইবির! তুমি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট চলে যাও এবং তাঁকে আমার অক্ষমতার কথা জানাও।

পরে জিয়াদ-কন্যা যুল্‌ফা জুয়াইবিরের কণ্ঠে বলতে শুনতে পেলঃ

কুরআন তো একথা নিয়ে নাযিল হয়নি। মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়্যাতও একথা প্রকাশ করেনি।

পরে সে পিতার নিকট জুয়াইবিরের সাথে তার কথোপকথন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে পিতা কন্যাকে সব কথা খুলে বলল। যুল্‌ফা সব শুনে বললঃ আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, জুয়াইবির রাসূলের নামে নিশ্চয়ই মিথ্যা বলেননি। এক্ষণই তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য লোক পাঠিয়ে দিন।

জিয়াদ রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেনঃ জুয়াইবির আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আপনি তার নিকট আমার কন্যা বিয়ে দেবার হুকুম দিয়ে পাঠিয়েছেন বলে প্রকাশ করলে আমি তার নিকট স্বীয় অক্ষমতার কথা বলেছি।

তখন নবী করীম (স) বললেনঃ "হে জিয়াদ, জুয়াইবির একজন মু'মিন। আর যে কোন মু'মিন পুরুষ যে কোন মু'মিন মেয়ের জন্য কুফু। মুসলিম পুরুষ যে কোন মুসলিম কন্যার জন্য কুফু। অতএব তুমি তোমার কন্যাকে জুয়াইবিরের নিকট বিয়ে দিতে পার।

পরে জিয়াদ কন্যার নিকট সবকথা খুলে বললে যুল্ফা বললঃ পিতা! আপনি রাসূলে করীম (স)-এর অমান্যতা করেছেন। আপনি অবিলম্বে জুয়াইবিরের সাথে আমার বিয়ে দিন। পরে এ বিবাহ সুন্নাত মুতাবিক অনুষ্ঠিত হয় এবং বাস্তবে প্রমাণ করা হয় যে, মুসলমানদের মধ্যে উচ্চ-নীচ—আভিজাত-অনভিজাতের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই।

অপর একটি বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়েছেঃ কাইস ইবন মুতাতিবা নামক এক মুনাফিক আওস ও খাজরাজ—দুই গোত্র ইসলাম কবুল করে রাসূলে করীম (স)-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষকতা করছিল বলে সে বিষয়ে বিদ্রূপাত্মক উক্তি করে, রাসূলে করীম (স) তা শুনে মসজিদের এক জরুরী ভাষণে বলেনঃ

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ الرَّبَّ وَاحِدٌ وَاِنَّ الدِّيْنَ وَاحِدٌ وَلَيْسَتِ الْعَرَبِيَّةُ لِاَحَدِكُمْ بِاَبٍ وَلَا اُمٍّ وَاِنَّمَا هِيَ اللِّسَانُ فَمَنْ تَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيِّ فَهُوَ عَرَبِيٌّ -

হে জনগণ! তোমরা নিশ্চিত জানবে, রব্ব এক ও একক, দ্বীন ইসলামও এক ও অভিন্ন। আরবী তোমাদের কোন বাপ-মা নয়। তা একটা ভাষা মাত্র। তাই যে লোক আরবী ভাষায় কথা বলে সে আরব। এজন্য তার স্বতন্ত্র কোন মর্যাদা নেই।

হযরত আলী (রা) বলেছেনঃ

হে জনগণ! আদম বংশে দাস-দাসীদের জন্ম হয়নি। সব মানুষ মুক্ত ও স্বাধীন! তবে আল্লাহ্ তোমাদের কতককে অপর কতকের উপর দায়িত্বশীল করেছেন মাত্র। অতএব যে ব্যক্তি বিপন্ন হয়ে কল্যাণময় কাজে ধৈর্য ধারণ করল, সে যেন আল্লাহ্র উপর নিজের কোন অনুগ্রহ প্রদর্শন না করে।

একবার তিনি মদীনার আশ্রাফ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে তিন দীনার করে বন্টন করলেন। একজন মুক্ত ক্রীতদাসকেও তা-ই দিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বললঃ আপনি এই দাসকে গতকালই মুক্ত করেছেন। আর আজই তাকে আমাদের সমান দান করলেন?

হযরত আলী (রা) জবাবে বললেনঃ

اِنِّيْ نَظَرْتُ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَمْ اَجِدْ بِوُلْدِ اِسْمٰعِيْلَ عَلٰى وُلْدِ اِسْحَاقَ فَضْلًا. اِنِّيْ لَا اَرٰى فِيْ هٰذَا الْفَيْءِ فَضِيْلَةً لِبَنِيْ اِسْمٰعِيْلَ عَلٰى غَيْرِهِمْ -

(الحكومة الاسلامية ص ٤٠٥)

আমি আল্লাহ্র কিতাব পড়েছি। তাতে ইসহাকের বংশের উপর ইসমাঈল বংশের লোকদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পাইনি। ইসলামের রাষ্ট্রীয় সম্পদে

ইসমাঈল বংশের লোকদের অন্যদের তুলনায় বেশী পাওয়ার অধিকারের কথা লিখিত নেই।

এসব কারণে ইসলাম বংশধারা বা দেশমাতৃকা ভিত্তিক জাতীয়তা সমর্থন করেনি। ইসলাম জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপন করেছে ইসলামী আকীদা গ্রহণ ও না গ্রহণের উপর। যারা সে আকীদা গ্রহণ করেছে তারা ইসলামী জাতীয়তার অন্তর্ভুক্ত, যারা তা গ্রহণ করেনি, তারা তার বাইরে। বিবাহ ও মীরাস প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও আকীদার ঐক্যই ভিত্তি হিসেবে গৃহীত, ঘর-বাড়ী, বংশ-রক্ত বা দেশমাতৃকা নয়।[১]

ঈমানের সূত্র কেবল উপস্থিত জীবিত লোকদেরকেই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত করে না, তাদেরকে নিয়েই জাতীয়তা গড়ে তোলে না। তা পূর্বে চলে যাওয়া লোকদের মধ্যেও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলে। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ বলে দিয়েছেনঃ

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِيْنَ جَاؤُمِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ (الحشر: ٩-١٠)

যেসব লোককে তাদের দিলের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই কল্যাণ লাভে সফল। তা সেই লোকদের জন্যও, যারা আগের লোকদের পরে এসেছে, যারা বলেঃ হে আমাদের রব্ব! আমাদেরকে ও আমাদের সেই সব ভাইকে ক্ষমা দান কর, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর আমাদের দিলে ঈমানদার লোকদের প্রতি কোনরূপ হিংসা-শত্রুতার ভাব জাগিয়ে দিও না। তুমি তো বড়ই অনুগ্রহসম্পন্ন—অতিশয় দয়ালু।

বস্তুত ঈমান-ই হচ্ছে স্বভাবসম্মত ঐক্যসূত্র, মিলন ভিত্তি, যেখানে একত্রিত ও অভিন্ন লোকেরাই ইসলামের দৃষ্টিতে একটি জাতিরূপে গণ্য হতে পারে। এই ব্যক্তিগণের পরস্পরের মধ্যে সমতার সম্পর্ক রচিত ও ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই দৃষ্টিতেই মুসলিম উম্মতের সম্পর্ক স্থিরীকৃত হয় দুনিয়ার অপরাপর জাতি ও সম্প্রদায়ের সাথে।

সর্বসমর্থিত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, ঈমান ও আকীদাগত অভিন্নতাই বহু ব্যক্তিকে অধিক বেশী একত্রিত এবং এক অভিন্ন ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনে সক্ষম। সক্ষম সেই সব ব্যক্তিকে একই জীবন লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করতে, তাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব-ভালোবাসা ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করতে, সক্ষম ধর্মহীন সমাজবিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত-জাতি ভিত্তিসমূহের ব্যবধান

---

১. تفسير الميزان ج:٤، ص:٢٠٠

নস্যাৎ করে এক উন্নত মানবতাবাদী জাতি গঠন করতে। তা থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়ায় ভাষা, বংশ, অর্থনৈতিক শ্রেণী বা দেশমাতৃকার ভিত্তিতে যে জাতি গঠন হয়, তা যেমন আদর্শ মানবিকতাবাদী জাতি হতে পারে না, তেমনি তা কোন স্থায়িত্বে গঠিত জাতিও হতে পারে না। এক জাতির লোকদের মধ্যে যে পার্থক্যহীনতা, গভীর আন্তরিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ গড়ে উঠা একান্তই আবশ্যক, তা কখনই গড়তে পারে না। তাদের পরস্পরের মধ্যে সেই স্বার্থহীন সহযোগিতা গড়ে উঠে না, যা একটি জাতির লোকদের মধ্যে জেগে উঠা কাম্য।

তাই দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য আদর্শ জাতি গঠনের জন্য ঈমানই হচ্ছে একমাত্র সূত্র ও ভিত্তি। অন্য সকল প্রকারের জাতীয়তাকে অস্বীকার করে ঈমানভিত্তিক জাতীয়তা গড়ে তোলাই দুনিয়ার বর্তমান জাতিসমূহের পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও লড়াই-ঝগড়া নির্মূল করে বিশ্বশান্তি স্থাপনের জন্য অপরিহার্য। আর এইরূপ জাতিই হতে পারে বিশ্বরাষ্ট্র স্থাপনের অগ্রবর্তী বাহিনী। এই জাতিই দুনিয়ার অন্যান্য মানব সমষ্টিকে ঈমানভিত্তিক জাতি গঠনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম।

আইনের দৃষ্টিতে সাম্য

ইসলামী রাষ্ট্রে আইনের দৃষ্টিতে সমস্ত নাগরিক সর্বতো সমান, নাগরিকদের অধিকার ও মর্যাদা এবং অপরাধের দণ্ডদানের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য না করাই ইসলামের চিরন্তন নীতি ও আদর্শ। ইসলামী আইনের সমীপে ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সুকৃতকারী ও দুষ্কৃতকারী সকলেই সমান, সকলের প্রতিই অভিন্ন আচরণ গ্রহণ করা হয় এবং যার যা ও যতটুকু প্রাপ্য, তাকে তাই এবং ততটুকুই দেয়া হয়। এ দিক দিয়ে নাগরিকদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্যকে বরদাশ্ত করা হয় না।

আইনের দৃষ্টিতে নাগরিকদের এই সাম্য ও সমতা তুলনাহীন, দৃষ্টান্তহীন। কেননা দুনিয়ার অপর কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ই আইনের নিকট সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা ও অধিকারের কোন ব্যবস্থা নেই বললেও একবিন্দু অত্যুক্তি হবে না।

ইসলামী রাষ্ট্রের এ সাম্যনীতি মূলত দ্বীন-ইসলামের পরম সাম্যনীতিরই পরিণতি। এই ক্ষেত্রে ইসলাম দুনিয়ার অপরাপর ধর্ম ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে মৌলিকভাবেই ভিন্নতর। ইসলাম এ ব্যাপারে যতটা গুরুত্ব আরোপ করেছে, দুনিয়ার অপর কোন ধর্ম বা মতবাদ তা করেনি, করতে পারেনি। দেশের ও

সমাজের লোকেরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যত শ্রেণীতে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে যত পর্যায়েই বিভক্ত হোক না কেন, আইনের দৃষ্টিতে ইসলাম তাদের মধ্যে একবিন্দু পার্থক্য করতে প্রস্তুত নয়।

ইসলামের এই সমতার নীতির মূলে দুইটি ভিত্তি বিদ্যমান। প্রথম— ইসলামের মৌল বিশ্বাস হচ্ছে, সমস্ত মানুষ এক ও অভিন্ন। মানুষের বংশ উৎপত্তি ও বিকাশ অভিন্ন ধারায় হচ্ছে। ফলে মানুষের মধ্যে কোন দিক দিয়েই পার্থক্য বা তারতম্য করা যেতে পারে না। মানুষ যতদিন মানুষ পদবাচ্য থাকবে, ততদিনই তাদের এ অভিন্নতা অক্ষুণ্ন থাকবে। কেননা সমস্ত মানুষ আদম ও হাওয়ার সন্তান। আর আদম ও হাওয়া মাটির উপাদানে সৃষ্ট।

মানুষের মানবীয় চেতনা, অনুভূতি, প্রয়োজন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা যতদিন অপরিবর্তিত থাকবে, ততদিন তারা সকলেই সমানভাবে এক আল্লাহ্‌র বান্দা। সকলেই এক আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। অতএব তাদের মধ্যে কোন বস্তুগত কারণে পার্থক্য সৃষ্টি করা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না।

সামাজিকতা ও অর্থনৈতিক অবস্থার দিক দিয়ে মানুষে মানুষে পার্থক্য হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। কিন্তু সেই কারণের দোহাই দিয়ে মর্যাদা ও অধিকারের দিক দিয়ে মানুষে মানুষে পার্থক্য করা—কতক মানুষকে অপরাপর মানুষের তুলনায় অধিক সম্মানিত বা সম্মানার্হ গণ্য করা এবং কারোর অধিকার বেশী কারোর অধিকার কম মনে করা বা আইনের চোখে কাউকে বেশী সুযোগ-সুবিধা দান ও অন্যান্যদের কম সুযোগ-সুবিধা দান অন্তত ইসলামের দৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না।

দ্বিতীয়—আইনের ক্ষেত্রে ও তার প্রয়োগ বা কার্যকরকরণে কাউকে অপর কিছু লোকের তুলনায় অগ্রাধিকার দান, কাউকে কম অধিকার দান, কেউ আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ করলেও কোন ধর-পাকড় হবে না, আর অপর কেউ আইন অনুযায়ী চললেও পদে পদে তাকে বাধাগ্রস্থ করা হবে—এমন অবস্থা ইসলামে কখনই হতে পারে না। কারোর জন্য এক রকমের আইন, আবার অন্যদের জন্য অপর ধরনের আইনের প্রয়োগ ইসলামের সমর্থনীয় নয়; দেশের আপামর জনগণ একই ধরনের আইন দ্বারা (Law of the Land) শাসিত হবে, সেই আইনে যা অপরাধ তা যেই করবে সেই—সে যে লোকই হোক-না-কেন—সেই অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট দণ্ডে দণ্ডিত হবে। এই হচ্ছে ইসলামে আইনের শাসনের বৈশিষ্ট্য। এ পর্যায়ে আল্লাহ্‌ বলেছেনঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء: ٦٥)

না, না, তোমার রব্ব-এর শপথ! এই লোকেরা কখ্খনই ঈমানদার (বলে গণ্য) হতে পারে না, যতক্ষণ তারা তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে হে নবী—আপনাকে বিচারক মেনে না নেবে এবং আপনি যে রায়-ই দেবেন তা মেনে নিতে নিজেদের মধ্যে কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করবে না। বরং তা মাথা পেতে মেনে নেবে।

আয়াতটি মুসলিম হওয়ার জন্য সাধারণ শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছে রাসূলে করীম (স)-কে লোকদের পারস্পরিক ও সামষ্টিক ব্যাপারে চূড়ান্ত বিচারকারীরূপে মেনে নেয়া এবং তার বিচার—বিচারের রায় অকুণ্ঠ চিত্তে মাথা পেতে নেয়ার কথা। এ এক সাধারণ ও কোনরূপ পার্থক্যহীন নীতি। এ নীতির মানদণ্ডে যারাই উন্নীত, তারাই মুসলিম; যারা উত্তীর্ণ নয়, তারা মুসলিম নয়। এই সাধারণ কথাটি মুসলিম নামধারী, মুসলিম পরিচয় দানকারী ও মুসলিম বংশে জন্মগ্রহণকারী ও নওমুসলিম—সর্বজনে প্রযোজ্য।

প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর আইনে নিজের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হতে দেখলে তা এড়িয়ে চলা এবং তাতে নিজেদের স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে মনে করলে তার প্রতি এগিয়ে আসার নীতিও ইসলামে সমর্থনীয় নয়। কেননা এ হচ্ছে সুবিধাবাদী চরিত্র। আর সুবিধাবাদ (utilitarianism) ইসলামে তীব্র ভাষায় সমালোচিত ও তীব্রভাবে ঘৃণিত। সুবিধাবাদ কখনই আদর্শ চরিত্রের ভূমিকা হতে পারে না, সুবিধাবাদী ব্যক্তি কখনই আদর্শ মুসলিম হতে পারে না, সুবিধাবাদ ও ইসলাম পালন—এ দুয়ের মাঝে আসমান-যমীনের পার্থক্য। এ জন্যই কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ - وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (النور: ٤٨-٤٩)

তাদেরকে যখন আল্লাহ্ ও তার রাসূলের দিকে ডাকা হয়— যেন রাসূল তাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদের মামলার ফয়সালা করে দিতে পারেন, তখন তাদের মধ্য থেকে একটি গোষ্ঠী পাশ কাটিয়ে দূরে চলে যায়। অবশ্য সত্য যদি তাদের অনুকূল হয়, তাহলে তারা রাসূলের নিকট বড় আনুগত্যশীল হয়ে এগিয়ে আসে।

এই পর্যায়ে আরও বলা হয়েছেঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

(الحج: ١١)

লোকদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থেকে আল্লাহ্‌র বন্দেগী করে। কল্যাণ দেখলে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, আর যখনই কোন বিপদ দেখা দেয়, অমনি পিছু সরে দাঁড়ায়। তাদের ইহকালও গেল, গেল পরকালও। সুস্পষ্ট ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

কুরআন অনুযায়ী বছরের চারটি মাস যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত হারাম। প্রাচীনকাল থেকেই—হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সময় থেকেই হজ্জ পালনে নিরাপত্তা ব্যবস্থার লক্ষ্যে এ নিয়ম চলে এসেছে। ইসলামের পূর্বে জাহিলিয়াতের সময়ও তা মোটামুটি পালন করা হতো। কিন্তু তখনকার লোকেরা নিজদের সুবিধানুযায়ী এই হারাম মাস কখনও অদল-বদল করে দিত। যে মাসে তাদের যুদ্ধ ও রক্তপাত করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়, সে মাসে তারা তাই করত। আর বলত, এ মাসের পরিবর্তে অপর একটি হারাম মাস আমরা পালন করব। মুহাররম-এর পরিবর্তে সফর মাসকে তারা নিজেদের ইচ্ছামত হারাম বানিয়ে নিত। কাবার ব্যবস্থাপকরাও তা সামান্য বৈষয়িক স্বার্থ লাভের জন্য মেনে নিত। এই সুবিধাবাদী নীতির তীব্র সমালোচনা করে আল্লাহ্ বলেছেনঃ

إِنَّمَا النَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَّيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوٓءُ أَعْمَالِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِينَ (التوبه: ٣٧)

নাসী (হারাম মাসকে হালাল ও হালাল মাসকে হারাম করণ) তো কুফরির উপর আর একটি অতিরিক্ত কুফরির কাজ, যদ্দ্বারা এই কাফির লোকদিগকে গুমরাহীতে নিমজ্জিত করা হয়। এক বছর একটি মাসকে হালাল করে নেয়, আবার কোন বছর সেই মাসকেই হারাম বানিয়ে নেয়, যেন এভাবে আল্লাহ্‌র হারাম করা মাসগুলির সংখ্যাও পুরা করা হয়। আর আল্লাহ্‌র হারাম করা মাস হালালও হয়ে যায়। আসলে তাদের খারাপ কাজগুলিকে তাদের জন্য খুবই চাকচিক্যময় করে দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহ্ সত্য অমান্যকারীদের কখনই হেদায়েত দেন না।

এই সুবিধাবাদী চরিত্রের কারণেই ইয়াহুদী পণ্ডিতরা সাধারণ মানুষকে খুশী করা ও তাদের থেকে সামান্য হীন বৈষয়িক স্বার্থ লাভের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাব বিকৃত করত। কুরআনে তাদের এই হীন কাজের সমালোচনা করে বলা হয়েছেঃ

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ (النساء: ٤٦)

যারা ইয়াহুদী সেজেছে, তারা কালামসমূহকে তাদের আসল স্থান থেকে এক পাশে সরিয়ে দিত।

বলা হয়েছেঃ

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ۔ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۔ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ (البقرہ: ٧٩)

তাই সেই সব লোকের ধ্বংস নিশ্চিত, যারা নিজেদেরই হাতে শরীয়াতের বিধান রচনা করে এবং তারপর লোকদেরকে বলেঃ এটা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নাযিল হয়েছে।—এরূপ বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এর বিনিময়ে তারা সামান্য স্বার্থ লাভ করবে। বস্তুত তাদের হাতের এ লিখনও তাদের ধ্বংসের কারণ এবং এর সাহায্যে তারা যা কিছু উপার্জন করে, তা তাদের ধ্বংসের উপকরণ।

আরও বলেছেনঃ

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۔ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ (المائدہ: ١٣)

অতঃপর তাদের নিজেদেরই ওয়াদা ভঙ্গ করাই ছিল (তাদের বড় অপরাধ), যে কারণে আমরা তাদেরকে আমাদের রহমত থেকে বহু দূরে নিক্ষেপ করেছি এবং তাদের দিলকে শক্ত, নির্মম ও মায়ামহব্বতহীন করে দিয়েছি। এখন তাদের অবস্থা এই যে, শব্দের উল্টা-পাল্টা করে মূল কথার নাড়াচাড়া করে ফেলে। যে শিক্ষা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, তাদের অধিকাংশই তা ভুলে গিয়েছে এবং প্রায় প্রত্যেক দিনই তাদের কোন-না-কোন খিয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতার সন্ধান পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে খুব কম লোকই এই দোষ থেকে বেঁচে আছে।

সাধারণ ইয়াহুদীরা ইয়াহুদী সমাজের নেতৃবৃন্দ ও আলিমগণের সুস্পষ্ট মিথ্যা ভাষণ, হারাম খাদ্য গ্রহণ, ঘুষ-রিশওয়াত গ্রহণ এবং আল্লাহ্‌র আইন-বিধান পরিবর্তন প্রভৃতি হীন কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত ছিল। তারা সাধারণ লোকদেরকে আল্লাহ্‌র নাফরমানী করার অনুমতি দিত এবং বলতঃ আমরাই তোমাদের শাফা'আতের জোরে উতরিয়ে নেব। তারা ছিল ভয়ানক রকমের হিংসুক। এই হিংসার দরুন তাদের দ্বীনকে তারা ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছিল। তাদের হিংসা-প্রতিহিংসার শিকার লোকেরা নিজেদের মৌলিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়ে যেত। তাদের ধন-সম্পদ পর্যন্ত তারা লুটেপুটে নিত। তারা জনগণের উপর জুলুম-নিষ্পেষণের পাহাড় ভেঙ্গে ফেলত।

এই কারণে ইসলাম ইসলামী শরীয়াত কার্যকরকরণের পথে বাধাদানকারী কোনরূপ শাফা'আত করাকে সম্পূর্ণরূপে হারাম করে দিয়েছে। ইসলামী দন্ডসমূহ সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের উপর যথাযথ কার্যকর করার জন্য প্রবল তাকীদ দিয়েছে এবং যা যার প্রাপ্য তাকে তা-ই দেবার জন্য আহবান জানিয়েছে এবং যার যা প্রাপ্য নয়, তাকে তা দিতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন।

নবী করীম (স)-এর বেগম উম্মে সালমা (রা)-এর একটি দাসী ছিল। সে অন্য লোকদের ঘরে চুরি করে ধরা পড়ে গিয়েছিল। তখন উম্মে সালমা (রা) তার পক্ষে রাসূলে করীম (স)-এর নিকট সুপারিশ করেছিলেন। তখন রাসূল (স) বলেছিলেনঃ 'উম্মে সালমা! এটা হচ্ছে আল্লাহ্র ঘোষিত ও নির্ধারিত 'হদ্দ' বা শাস্তি। তা কার্যকরকরণে কোনরূপ বাধা বরদাশ্ত করা যেতে পারে না। পরে রাসূলে করীম (স) সে অপরাধিনীর হাত কেটে দেয়ার নির্দেশ কার্যকর করিয়েছিলেন।[১]

রাসূলে করীম (স) উসামা ইবনে জায়দ (রা)-কে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ আল্লাহ্ নির্ধারিত দন্ডের ব্যাপারে কোন সুপারিশ করবে না। হযরত উসামা (রা) এক অপরাধী সম্পর্কে উক্ত রূপ সুপারিশ করেছিলেন।[২]

তিনি আল্লাহর রাসূল ছিলেন, ছিলেন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান। তিনি নিজেকে পর্যন্ত আইনের উর্ধ্বে রাখেন নি। বরং আইনের দিক দিয়ে তিনি নিজেকে সর্বসাধারণের স্তরে নামিয়ে রেখেছিলেন। নবী করীম (স) অসুস্থ হয়ে পড়লে একদা মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেনঃ 'আমার নিকট কারোর কিছু প্রাপ্য থাকলে তা যেন সে চেয়ে নেয়, কারোর উপর অবিচার করে থাকলে সে যেন তার প্রতিশোধ আমার উপর নিয়ে নেয়।' এই কথা শুনে সাওদা ইব্ন কাইস (রা) দাঁড়িয়ে বললেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যখন তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, আপনি তখন আপনার উষ্ট্রের উপর আরোহী ছিলেন। আপনার হাতে উট চালানোর চাবুক ছিল। আপনি চাবুক উর্ধ্বে তুললে তা আমার পেটে লেগেছিল।'

তখন নবী করীম (স) নিজের পৃষ্ঠদেশ (বা পেট) উম্মুক্ত করে দিয়ে বললেনঃ 'আজ তুমি তার প্রতিশোধ গ্রহণ কর।'

তখন সাওদা নবী করীম (স)-এর পিঠে মুখ রাখার অনুমতি নিয়ে বললেনঃ

أَعُوذُ بِمَوْضِعِ الْقِصَاصِ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ مِنَ النَّارِ .

---

১. الحكومة الاسلامية ص: ٤١٢

২. الحكومة الاسلامية ص: ٤١٣

আমি রাসূলের উপর প্রতিশোধ নেয়ার স্থানের বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাই।[১]

রাসূলে করীম (স) জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে সাওদা! তুমি প্রতিশোধ নিচ্ছ, না ক্ষমা করে দিচ্ছ?'

সাওদা বললেনঃ 'আমি বরং ক্ষমা করে দিচ্ছি।'

এ কারণেই নবী করীম (স) বলেছেনঃ

اَلنَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَاَسْنَانِ الْمُشْطِ

মানুষ চিরুনীর কাঁটাগুলির মতই সমান।

اَلنَّاسُ اَمَامَ الْحَقِّ سَوَاءٌ -

মানুষ আইনের দৃষ্টিতে সর্বতোভাবে সমান।

আল্লাহ তা'আলা এই সমান সমানের আইনই জারি করেছেন। বলেছেনঃ

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ (المائده: ٤٥)

তাওরাতে আমরা তাদের প্রতি এ আইন লিখে দিয়েছিলাম যে, জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের পরিবর্তে দাঁত এবং সব রকমের যখমের জন্য সমান বদলা নির্দিষ্ট।

আইনের দৃষ্টিতে মানুষের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্যকরণ—ধনী-গরীব বা শক্তিশালী-দুর্বলের মধ্যে কাউকে আইনের অধীন ও অন্য কাউকে আইনের উর্ধ্বে রাখাকে জাতীয় ধ্বংস ও কঠিন বিপর্যয়ের কারণ রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ

اَيُّهَا النَّاسُ .....اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ -

হে জনগণ! মনে রেখো তোমাদের পূর্বে এমন সব লোক ছিল, যাদের অবস্থা এই ছিল যে, তাদের মধ্যকার কোন শরীফ-অভিজাত-ব্যক্তি চুরি করলে তার উপর আইনের দন্ড কার্যকর করা হতো না। আর কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তার উপর আইন ও দন্ড কার্যকর করা হতো।[২]

---

১. اسد الغابة لابن الاثير ج:٢، ص: ٣٧٤ الحكومة الاسلامية ص ٤١٢

২. সহীহ্ মুস্লিম

নবী করীম (স) কর্তৃক ঘোষিত আইনের এ সমতা ও অভিন্নতাকে তিনি নিজে সারাটি জীবন ব্যাপী কার্যকর ও বাস্তবায়িত করেছেন। বিদায় হজ্জ-এর ভাষণকালে সমস্ত সূদী কারবার স্থগিত ঘোষণা প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রা)-এর সূদ বাবদ জনগণের উপর যা প্রাপ্য ছিল, তা রহিত ঘোষণা করে বলেছিলেনঃ

إِنَّ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَإِنَّ أَوَّلَ رِبًا أَبْدَأُ بِهِ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ -

জাহিলিয়াতের সময়ের সকল প্রকারের সূদী কারবার স্থগিত হয়ে গেল। আর কার্যত আমি সর্বপ্রথম রহিত ঘোষণা করছি আবদুল মুত্তালিব পুত্র আব্বাসের যাবতীয় সূদী কারবার।

অনুরূপভাবে জাহিলিয়াতের কালের সকল রক্তপাতের দাবি স্থগিত ঘোষণা কালে নবী করীম (স) তাঁর নিকটাত্মীয় রবীয়ার রক্তপাতের দাবিকে সর্বপ্রথম রহিত করে দিলেন।

বস্তুত নিকটবর্তী ও দূরবর্তী—আত্মীয় ও অনাত্মীয় নির্বিশেষে সকলের উপর শরীয়াতের দন্ড সমানভাবে কার্যকর করা, ক্রোধ ও ক্রোধহীনতা উভয় অবস্থায় আল্লাহ্‌র আইন বাস্তবায়িত করা এবং সাদা-কৃষ্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে ইনসাফ ও ভারসাম্য সহকারে অধিকার বন্টন করাই ইসলামের চিরন্তন বিধান। খুলাফায়ে রাশেদুন (রা) ইসলামের এই সাম্যের নীতির পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন এবং এ ব্যাপারে একবিন্দু দুর্বলতার প্রশ্রয় দেন নি। এই সাম্য নীতির ঘোষণাকে দৃঢ় ভিত্তিক ও বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যেই আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় ইরশাদ করেছেনঃ

لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا - وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ - وَاتَّقُوا اللَّهَ - إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائده: ٢)

ওরা যে তোমাদেরকে মসজিদে হারামে যাওয়ার পথে বাধাগ্রস্ত করেছে সেজন্য তোমাদের ক্রোধ-যেন তোমাদেরকে এতদূর উত্তেজিত করে না তোলে যে, তোমরাও তাদের শত্রুতায় অবৈধ বাড়াবাড়িতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে। তোমরা সকল পূণ্যময় ও আল্লাহ্‌র ভয়মূলক কাজে অবশ্যই পরস্পরের সাথে সাহায্য-সহযোগিতার কাজে এগিয়ে যাবে। অবশ্য গুনাহ ও নাফরমানীর কাজে কারোর সাথেই সহযোগিতা করবে না। তোমরা সব সময়ই আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকবে। কেননা একথা তো জানো-ই যে, আল্লাহ্ অত্যন্ত কঠিন আযাব দানকারী।

নবী করীম (স) স্বপ্নযোগে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পেয়ে মক্কায় উমরা পালনের উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কিরাম সমভিব্যাহারে মক্কার দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন পর কা'বার নিকট উপস্থিত হয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার সুযোগ পাওয়ার আশায় সকলের মনে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা জেগে উঠেছিল। কিন্তু হুদায়বিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হতেই মক্কার কাফিরগণ তাঁদের পথ রোধ করে বসে। শেষ পর্যন্ত তাদের সাথে সন্ধি করে নবী করীম (স) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। এ সময় সাহাবীগণের মনে মক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে যে শত্রুতার প্রচন্ড আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল, অতন্ত স্বাভাবিকভাবে (সম্ভবত), সেই অবস্থার প্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতে মুসলমানদেরকে সান্তনা দিয়ে সঠিক ইসলামী নীতির শিক্ষাদান করেছিলেন। কা'বা ঘরের সন্নিকটে যেতে মুসলমানদেরকে বাধা দিয়ে কাফিরগণ চরম মাত্রার শত্রুতা করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সময়ও আল্লাহ্ তাঁর নেক বান্দাদেরকে ক্রুদ্ধ হয়ে শত্রুতামূলক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌র তাক্ওয়ার ভিত্তিতে সকল শুভ ও কল্যাণময় কাজে সহযোগিতা ও সকল পাপ-নাফরমানীর কাজে পূর্ণ অসহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছেন। বাহ্য দৃষ্টিতে এ নির্দেশ বে-খাপ্পা ও অস্বাভাবিক মনে হলেও আল্লাহ্‌র ব্যবস্থায় তা-ই যে ছিল অতীব কল্যাণকর, তা পরবর্তী পাঁচ-ছয় বছরের ইতিহাস নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে।

অনুরূপ আর একটি নির্দেশের কালাম হচ্ছেঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا - هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

(المائده: ٨)

কোন জনগোষ্ঠীর শত্রুতা যেন তোমাদেরকে সুবিচার না করতে উদ্বুদ্ধ না করে। তোমরা (সর্বাবস্থায়ই) ন্যায়বিচার অবশ্যই করবে। জানবে, সর্বাবস্থায় ন্যায়বিচার করাই হচ্ছে তাক্ওয়ার অতীব নিকটবর্তী (ও তার সাথে সামঞ্জস্যশীল) নীতি।

মুসলিম সমাজ-ই হচ্ছে তাক্ওয়ার ধারক। আর এ তাক্ওয়ার দাবি হচ্ছে সর্বাবস্থায় নির্বিশেষে সকলের প্রতি ন্যায়বিচার কার্যকর করা। কিন্তু কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর সাথে শত্রুতা থাকার কারণে এ তাকওয়ার ধারক লোকেরাই সেই জনগোষ্ঠীর প্রতি অবিচার করে বসতে পারে। এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাকওয়ার অনিবার্য দাবি ন্যায়বিচারকে সব সময় ঊর্ধ্বে ও উন্নতশির করে রাখার নির্দেশ দিলেন। বস্তুত এই তাকওয়াভিত্তিক ন্যায়বিচারে আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষ যে সম্পূর্ণভাবে সমান হবে তাতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না।

শত্রুতার কারণে বিশেষ কোন জনগোষ্ঠীর প্রতি সীমালঙ্ঘনমূলক আচরণ গ্রহণ করতে কুরআন নিষেধ করেছে, কারোর প্রতি অবিচার করতে বা ন্যায়বিচার না করার জন্য উদ্বুদ্ধ হতে নিষেধ করেছে, তেমনি নবীর প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষের কারণে তাঁর দাওয়াত কবুল না করে নিজেদেরকে কঠিন বিপদে নিক্ষেপ করতেও নিষেধ করেছে। প্রথম পর্যায়ের নির্দেশ ছিল আল্লাহর প্রতি ঈমানদার লোকদের প্রতি আর দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্দেশ হচ্ছে অল্লাহর প্রতি ঈমান আনেনি—এমন লোকদের প্রতি। কুরআনে হযরত শুয়াইব (আ)-এর এই আহ্বান উদ্ধৃত হয়েছেঃ

وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ـ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ (هود: ٨٩)

আর হে আমার জনগণ! আমার সাথে শত্রুতা—আমার বিরুদ্ধতা যেন তোমাদেরকে এমন অবস্থায় ফেলে না দেয় যে, তোমাদের উপর সেই মহাবিপদ এসে পড়বে, যা নূহ, হুদ বা সালেহর সময়ের লোকদের উপর এসে পড়েছিল। আর লূত-এর জনগণও এই পরিণতিরই সম্মুখীন হয়েছিল; তারা তো তোমাদের থেকে খুব দূরে নয়।

হযরত শুয়াইব (আ)-এর সাথে শত্রুতা ও তাঁর বিরুদ্ধতা-বিদ্বেষই ছিল তাঁর তওহীদী দাওয়াত কবুল না করার একমাত্র কারণ। নবীর এ আহ্বানের সারমর্ম হচ্ছে, আমার সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষ তোমাদেরকে কঠিন বিপদে ফেলতে পারে। কেননা অকারণ বিদ্বেষ ও এক ব্যক্তির সাথে নির্বিচার শত্রুতায় অন্ধ হয়ে আল্লাহ্র তওহীদী দাওয়াত কবুল না করা নিতান্তই যুক্তিহীন ব্যাপার। এ অন্ধত্ব মানুষকে কোন কল্যাণ দিতে পারে না। তা ন্যায়বিচারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

এসব কারণেই ইসলাম নিরপেক্ষ সুবিচার করার নীতি উপস্থাপিত করেছে। তা মানসিক সাম্য ও অভিন্নতার বিপরীত ব্যাপার।

সাম্য ন্যায়বিচারের পরিণতি

ইসলাম যে সুবিচার ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠার উদাত্ত আহবান জানিয়েছে, তার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে লোকদের মধ্যে পূর্ণ মাত্রার সাম্য। এ কারণেই নিরপেক্ষ ন্যায়পরতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে। কুরআন পাঠে স্পষ্ট মনে হয়, ইসলাম যতটা গুরুত্ব এই ন্যায়বিচার নিরপেক্ষ সুবিচারের উপর আরোপ করেছে, অতটা অন্য কিছুর উপর আরোপ করেনি। এই নিরপেক্ষ সুবিচার ইসলামের ভিত্তিরূপে ঘোষিত হয়েছে। তা-ই হচ্ছে এ দুনিয়ায় ইসলামের প্রধান লক্ষ্য। ইসলাম এই সুবিচার ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠার আহ্বান

জানিয়েছে নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি। তাদের জাতি, বংশ, ভাষা, বর্ণ ও জন্মস্থান নির্বিশেষে।

ইসলাম দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে একই পিতা-মাতার সন্তান বলে ঘোষণা করেছে, যেন তাদের মধ্যে বংশ ও রক্তের দিক দিয়ে কোনরূপ পার্থক্য বা বৈষম্য সৃষ্টি করা না হয়। এ কারণে কুরআন ও রাসূলে করীম (স)-এর ভাষণে সাধারণত يَاأَيُّهَا النَّاسُ -'হে জনগণ!' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ফলে নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের প্রতিই ইসলামের এই উদাত্ত আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে। বলে দেয়া হয়েছে যে, এই সুবিচার নীতি পরিহার করার পরিণাম চরম স্বেচ্ছাচারিতা ও নিপীড়ন নিষ্পেষণ ছাড়া আর কিছুই নয়। ইরশাদ হয়েছেঃ

فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوا (النساء: ١٣٠)

অতএব তোমরা নিজেদের নফসের খাহেশের (প্রবৃত্তির কামনার) অনুসরণ করতে গিয়ে সুবিচার ও ন্যায়পরতা থেকে বিরত থেকো না।

মানুষ যখন আল্লাহর তাক্ওয়া শুন্য হয়ে যায়, তখন সে অনিবার্যভাবে স্বীয় অন্ধ কামনা-বাসনার অনুসরণ করতে বাধ্য হয়! আর অন্ধ কামনা-বাসনার অনুসরণ করলে ন্যায়পরতা ও নিরপেক্ষ সুবিচার করা কখনই সম্ভব হতে পারে না। অন্ধ কামনা-বাসনার আনুসরণ ও সুবিচার ন্যায়পরতা পরস্পর বিরোধী। যারা অন্ধভাবে শুধু নিজেদের মনের কামনা-বাসনারই অনুসরণ করে, তারা কখনই সুবিচার ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। পক্ষান্তরে যারা সুবিচার ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী, তাদেরকে নিজেদের নফসের কামনা-বাসনার অন্ধ অনুসরণ অবশ্যই পরিহার করতে হবে। বস্তুত সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠার পথে মনের কামনা-বাসনার অন্ধ অনুসরণ প্রচন্ডতম বাধা। অথচ মানব-সমাজে পূর্ণ সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠাই প্রধান কাম্য, তা মধুর চাইতেও অধিক মিষ্টি ও সুস্বাদু।

কেননা ন্যায়পরতা ও সুবিচার সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। সামাজিক ন্যায়পরতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত না হলে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

এ কারণে নবী করীম (স)-এর সারা জীবনের সাধনা ও সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল মানবিক সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ন্যায়পরতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (স)-এর জবানীতে বলিয়েছেনঃ

وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ (الشورى: ١٥)

এবং তোমাদের মাঝে ন্যায়পরতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি।

সুবিচার ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠাকারী ও যে লোক ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠার পক্ষের নয়—এই দুইজনের মধ্যে তুলনা করে কুরআন বলেছেঃ

هَلْ يَسْتَوِىْ هُوَ وَمَنْ يَّأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (النحل: ٧٦)

(আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেনঃ দুইজন ব্যক্তি, তাদের একজন বোবা-বধির। কোন কাজ-ই করতে সক্ষম নয়। সে নিজের মনিবের উপর বোঝা হয়ে আছে। যে দিকেই সে তাকে পাঠায় কোন একটি ভালো কাজ-ও তার দ্বারা হয় না।) অপর একজন আছে এমন, যে ইনসাফের নির্দেশ দেয় ও আর নিজেও সঠিক-সুদৃঢ় পথে মজবুত হয়ে আছে, বল, এই দুইজনই একই রকম হতে পারে?

এক কথায়, যে লোক সঠিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে ন্যায়পরতা ও সুবিচারের আদেশ করে এবং তা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করে, সে নিশ্চয়ই সেই লোকের সমতুল্য হতে পারে না, যে তা করে না বা করতে পারে না সাধ্য নেই বলে।

আল্লাহ্ এবং রাসূল নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে ন্যায়পরতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য নিঃশর্ত আহব্বান জানিয়েছেন। বলেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ (النحل: ٩٠)

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুবিচার—ন্যায়পরতা ও কল্যাণ কামনার আদেশ করেছেন। আল্লাহর এ আহ্বান শাশ্বত। স্থান-কাল-বংশ-বর্ণ-ভাষা-জাতীয়তা নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতিই এই আহবান।

ন্যায়পরতা ও সুবিচারের সুফল

ন্যায়পরতা ও সুবিচারের সুফল হচ্ছে মানুষের মধ্যে নিহিত যোগ্যতা-কর্মক্ষমতার প্রকাশ ও বিকাশ এবং তার পূর্ণত্ব লাভ। কেননা যোগ্যতা-কর্মক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ যখন নিঃসন্দেহে জানতে ও বুঝতে পারবে যে, তার সাধনা—শ্রম কখনই নিষ্ফল যাবে না, বরং সে যদি তার প্রতিভা অনুযায়ী কোন শুভ কর্ম সাধন করতে পারে তাহলে তা স্বীকৃতি ও মর্যাদা পাবে, অসাম্য ও অবিচারের মধ্যে পড়ে ব্যর্থ হয়ে যাবে না তাহলে বেশী বেশী শ্রম ও সাধনা করবে। অলসতা ও অকর্মণ্যতার প্রহেলিকায় পড়ে সে তার যোগ্যতা ও প্রতিভাকে বিনষ্ট করবে না।

সুবিচার ও ন্যায়পরতার ভিত্তিতে সামাজিক কার্যাদি সম্পন্ন হবে, প্রত্যেকেই তার ন্যায্য হক পেলে, মানুষ হবে শান্ত-শিষ্ট, নিশ্চিন্ত। সকল প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতাকে পরিহার করে সে এক মনে এক ধ্যানে কাজ করে যাবে। তখন সে নিজের প্রতি, নিজের প্রতিভা-যোগ্যতার প্রতি হবে অত্যন্ত আন্তরিক, অন্যান্য লোকদের প্রতিও সে হবে কল্যাণকামী। সে নিজের শ্রম-সাধনার ব্যর্থতা যেমন চাইবে না, পছন্দ করবে না, তেমনি অন্যান্য লোকদের সাধনা ব্যর্থ হোক, তা-ও তারা পছন্দ করবে না। নবী-রাসূলগণকে দুনিয়ায় প্রেরণ এবং কিতাব নাযিল করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই ন্যায়পরতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা। আল্লাহ্ নিজেই ঘোষণা করেছেনঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۔ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ ۔ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ (الحديد: ٢٥)

নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের রাসূলগণকে অকাট্য প্রমাণ সহকারে পাঠিয়েছি, আর তাদের নিকট আমরা কিতাব ও মানদন্ড নাযিল করেছি শুধু এই লক্ষ্যে যে, লোকেরা পরম সুবিচার সহকারে জীবন যাপন করবে। এ ছাড়া লৌহও নাযিল করেছি। তাতে যেমন রয়েছে বিরাট শক্তি, তেমনি জনগণের জন্য অফুরন্ত কল্যাণও।

সুবিচারের উপর ইসলামের গুরুত্বারোপ

ইসলাম দুনিয়ার সমাজে নিরপেক্ষ সুবিচার ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠার উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে। এজন্য ইসলাম জুলুম উচ্ছৃঙ্খলতা এবং জালিম ও বিচ্ছৃঙ্খলাকারীর নিকটে যেতেও নিষেধ করেছে। এই সুবিচার ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠার জন্যই মু'মিনদের পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসা করার জন্য মুসলিম সমাজকে এগিয়ে আসতে বলেছে।

বলা হয়েছেঃ

وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا (الحجرات: ٩)

মু'মিনদের দুইটি গোষ্ঠী বা পক্ষ পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হলে—হে মুসলিম সমাজ—তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি-সমঝোতা করে দাও।

যুধ্যমান দুই পক্ষের লোকই মু'মিন। তাদের মধ্যে যে সন্ধি ও সমঝোতা করা হবে, তা অবশ্যই ইনসাফ ও সুবিচারের ভিত্তিতে হবে। পক্ষপাতিত্ব বা জুলুমের ভিত্তিতে হবে না। কেননা তাহলে মূল ইনসাফের দাবি-ই অপূরণ থেকে গেল। এই সন্ধি ও সমঝোতা করার পর যে পক্ষ অপর পক্ষের উপর আক্রমণ করবে,

পরে সেই আক্রমণকারী পক্ষের বিরুদ্ধে গোটা মুসলিম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে এবং সে পক্ষকে দমন করার জন্য যুদ্ধ করতে হলেও সকলে মিলে সে পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও দ্বিধা করবে না। বলা হয়েছেঃ

فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ (الحجرات:٩)

সেই যুধ্যমান দুই দল মুসলিমের মধ্যে মীমাংসা ও সন্ধি-সমঝোতা করে দেয়ার পর উভয় দলের মধ্য থেকে কোন একটি দল যদি অপর দলের উপর আক্রমণ করে, তাহলে তোমরা—মুসলমানরা—সেই আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, যতক্ষণ না সেদল আল্লাহ্‌র বিধানের দিকে ফিরে আসে, তাহলে অতঃপর সেই দুইটি দলের মধ্যে আবার সন্ধি-সমঝোতা করে দেবে—পূর্ণ মাত্রায় সুবিচার ও ন্যায়পরতা সহকারে তোমরা-হে মুসলিম সমাজ—ন্যায়পরতা রক্ষা করে যাবে। কেননা আল্লাহ্ এই ন্যায়পর সুবিচারকারী লোকদেরকেই ভালোবাসেন।

এ কারণে ন্যায়পরতা ও সুবিচার দ্বীন-ইসলামের একটি মৌলিক বিধান ও চরম লক্ষ্য রূপে নির্ধারিত হয়েছে। ইসলামে তা সম্পূর্ণ নিঃশর্ত। কোন শর্ত আরোপ করে তার এই নীতি-সাধারণত্বকে ক্ষুন্ন করা যেতে পারে না।

উপরোক্ত নীতির দৃষ্টিতে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে—দুই বিবদমান পক্ষের মধ্যকার বিবাদ-যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য যদি যুদ্ধও করতে হয়, রক্তের বন্যাও বহাতে হয়, তবু তা করতে হবে। জুলুমদের জুলুম-মুক্তির উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করার অনুমতি স্বয়ং আল্লাহ্‌ই দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ এই জুলুম-মুক্তির উদ্দেশ্যে যুদ্ধকারীদের সাহায্য করবেন বলে ওয়াদাও করেছেন। বলেছেনঃ

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ (الحج: ٣٩)

যারা মজলুম, তাদের জুলুম মুক্তির উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করার জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহ যে তাদের সাহায্যকরণে খুবই সক্ষম, তাতেও কোন সন্দেহ নেই।

তবে ইসলাম এই শর্ত আরোপ করেছে যে, এ যুদ্ধ যেন কখনই ন্যায়পরতা ও সুবিচারের সীমালঙ্ঘন করে না যায়। কেননা যুদ্ধে ন্যায়পরতা ও সুবিচার রক্ষিত না হলে আর একটি জুলুম সংঘটিত হবে। তখন এ জুলুমের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ করার প্রয়োজন দেখা দেবে। এ কারণে সন্ধি-সমঝোতা করে দেয়ার পর যে পক্ষ আক্রমণ করবে, তার বিরুদ্ধে অতটাই শক্তি প্রয়োগ করা যাবে, যতটা তাকে

পুনরায় সন্ধি-সমঝোতা করার জন্য প্রয়োজন। তার বেশী কিছুই করা যাবে না। ইরশাদ হয়েছেঃ

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين (البقرة: ١٩٤)

যারা তোমাদের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করেছে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে ঠিক ততটাই সীমালঙ্ঘন করবে, যতটা তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করেছে (তার একটুও বেশী নয়)। আর জেনে রাখবে, আল্লাহ্ মুত্তাকী লোকদের সঙ্গে রয়েছে।

এই 'মুত্তাকী' বলতে তাদের বোঝানো হয়েছে, যারা সন্ধি-সমঝোতা করে দেয়ার পর পুনরায় হামলাকারী পক্ষের বিরুদ্ধে তাদের দমন করা ও আল্লাহ্র বিধান মাথা পেতে মেনে নিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করতে গিয়ে একটুও সীমালঙ্ঘন করবে না।

এই সুবিচার ও ন্যায়পরতা যেমন ইসলামের লক্ষ্য ও আদর্শ, তেমনি ইসলামের যাবতীয় হুকুম-আহকামের ভিত্তিও তাই। বস্তুত ইসলামের আইন-বিধানে সুবিচার ও ন্যায়পরতা-পরিপন্থী কিছুই নেই। অতএব ইসলামী আইন-বিধানই হচ্ছে সমাজের লোকদের মধ্যে সুবিচার ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় ও মাধ্যম। আর সমাজে সুবিচার ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠাকল্পে দায়েরকৃত মামলায় যে সাক্ষ্যদান করা হবে, তা-ও এই ন্যায়পরতা ও সুবিচার—এক কথায় পক্ষপাতিত্বহীন হতে হবে। এই কারণেই কুরআনে আল্লাহ্র এ নির্দেশ ঘোষিত হয়েছেঃ

يايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم (النساء: ٥)

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা সুবিচার প্রতিষ্ঠার পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াও, আল্লাহ্র জন্য সাক্ষ্যদাতা হয়ে দাঁড়াও। সে সাক্ষ্য তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে দিতে হলেও।

মামলার বিচারে সাক্ষ্যদান সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য জরুরী কার্যক্রম। সাক্ষ্য নিরপেক্ষ ও নির্ভুল হলেই বিচারের রায়ও নিরপেক্ষ ও সুবিচারপূর্ণ হতে পারে। কিন্তু সাক্ষ্যই যদি হয় ভুল বা পক্ষপাতিত্বের দোষে দুষ্ট, তাহলে বিচারের রায় কখনই নিরপেক্ষ বা ইনসাফকারী হতে পারে না। এ কারণে আয়াতে সাক্ষীদেরকে আল্লাহ্র জন্য সাক্ষ্যদাতা شهداء لله বলা হয়েছে। এ

কথাটিতে যেমন মর্যাদার প্রকাশ, তেমনি বিরাট ঝুঁকিও এতে নিহিত। আর আল্লাহ্‌র জন্য সাক্ষ্যদাতা হয়ে যখন ঈমানদার ব্যক্তি প্রকৃত সত্যকে সাক্ষ্যের মাধ্যমে বিচারকের সম্মুখে উদঘাটিত করবে, তখন তার সাক্ষ্যের আঘাত কার কার উপর পড়েছে, সে সাক্ষ্যে কার কার স্বার্থ নষ্ট হচ্ছে বা কার কার বিরুদ্ধে পড়ছে, সেদিকে বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য দেবে না। বরং সত্য সাক্ষ্য যা'র বিরুদ্ধেই হোক-না-কেন, দিতে একবিন্দুও কুণ্ঠিত হবে না। এই জন্যই আল্লাহ্ বলেছেনঃ

أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى

أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء: ١٣٥)

(তোমাদের সত্য সাক্ষ্যের আঘাত তোমাদের নিজেদের উপর) কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটস্থ লোকদের উপরই পড়ুক না-কেন, আর পক্ষদ্বয় ধনী কিংবা গরীব যা-ই হোক-না-কেন, তাদের সকলের অপেক্ষা আল্লাহ্‌র এই অধিকার অনেক বেশী যে, তোমরা তাঁর দিকেই বেশী লক্ষ্য দেবে। অতএব নিজেদের নফ্‌সের খাহেশের অনুসরণ করতে গিয়ে সুবিচার ও ন্যায়পরতা থেকে বিরত থাকবে না। তোমরা যদি মন রাখা কথা বল কিংবা সত্যবাদিতা থেকে দূরে সরে থাক, তাহলে জেনে রাখবে, তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত।

বস্তুত ধনী-গরীব বা প্রভাবশালী—কারোরই উচিত নয় সুবিচার ও ন্যায়পরতার পথে প্রতিবন্ধক হওয়ার এবং তার অধিকারও থাকতে পারে না কারোর। কেননা সুবিচার ও ন্যায়পরতা কেবল মুসলিম উম্মতের জন্যই সামষ্টিক শান্তি ও নিরাপত্তার বিধান করে না বরং বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য স্বাভাবিক উপায়ও গড়ে তোলে। কাজেই বিশ্বকে যদি যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত এড়াতে হয়, যদি আগ্রাসন ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ বন্ধ করতে হয়, তাহলে সুবিচার ও ন্যায়পরতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সকল প্রকারের কার্যক্রম তাকে বাস্তবায়িত করতে হবে। আর তা কেবল মাত্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন—তথা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সম্ভব। অপর কোন ধরনের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার দ্বারা বিশ্বশান্তি স্থাপন সম্পূর্ণ অসম্ভব। বরং সত্যি কথা হচ্ছে, আজ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত নেই বলেই বর্তমান বিশ্বশান্তি চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে গেছে।

সুবিচার প্রতিষ্ঠার রূপরেখা

সুবিচার প্রতিষ্ঠার কয়েকটি দিক রয়েছে। কুরআন মজীদে তার উল্লেখ হয়েছে। এখানে আমরা সংক্ষেপে সেই দিকগুলি তুলে ধরছি।

১. **শাসন-প্রশাসনে সুবিচারঃ** শাসন-প্রশাসনে পূর্ণ সুবিচার ও ন্যায়পরতা-নিরপেক্ষতা রক্ষা করা কর্তব্য। এজন্য কুরআন ন্যায়বাদী-সুবিচারক শাসক নিয়োগের শর্ত করেছে এবং প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের সুষ্ঠু নীতি অনুসরণ তার জন্য ফরয করে দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ - إِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ - إِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا (النساء: ٥٨)

(ঈমানদার লোকেরা) আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, যাবতীয় আমানত সেসবের প্রকৃত উপযোগী (বা মালিক) লোকদের নিকট সোপর্দ করে দাও। আর লোকদের পরস্পরের মধ্যে যখন কোন বিষয়ে ফয়সালা করবে (বা নীতি গ্রহণ করবে) তখন তা পূর্ণ ইনসাফ সহকারে করবে। আল্লাহ্ তো তোমাদেরকে উত্তম নসীহত করেছেন। আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন ও দেখেন।

اَلَّذِيْنَ إِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ - وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ (الحج: ٤١)

প্রকৃত সুবিচারকারী শাসক ওরা হতে পারে, যাদের আমরা পৃথিবীতে (কোথাও) প্রতিষ্ঠিত করে দিলে তারা 'সালাত কায়েম' করবে, যাকাত আদায়-বন্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা কার্যকর করবে এবং যাবতীয় ভালো-উত্তম-শরীয়াতসম্মত কাজের আদেশ করবে, সব ঘৃণ্য মন্দ-শরীয়াত বিরোধী কাজ নিষিদ্ধ করে দেবে (তা থেকে লোকদের বিরত রাখবে)। আর সমস্ত ব্যাপারের শেষ পরিণতি আল্লাহ্‌রই জন্য।

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, সবচেয়ে বড় 'মারূফ' হচ্ছে সুবিচার ও ন্যায়পরতা কার্যকর করা এবং সবচেয়ে বড় 'মুনকার' হচ্ছে জুলুম, অবিচার, শোষণ, নির্যাতন ও বঞ্চনা—তা বন্ধ করাই সবচেয়ে বড় মা'রূফ।

২. **আইন প্রয়োগে সুবিচার ও ন্যায়পরতা ঃ** সমাজের সকল লোকের উপর নিরপেক্ষ ন্যায়পরতা ও সুবিচার কার্যকর করার জন্য ইসলাম বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে, উৎসাহ দিয়েছে ও আকুল আহ্বান জানিয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোন পক্ষপাতিত্ব বা কোন ব্যতিক্রম করার কারোরই অধিকার নেই বলে বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করেছে। ইসলাম আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষকে সমান মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে। তাতে শাসক-শাসিত, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত বা নারী ও পুরুষের মধ্যে—কিংবা নগরবাসী ও গ্রামবাসীর মধ্যে কোনরূপ তারতম্য

করাকে সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছে। রাসূলে করীম (স) বলেছেন (পূর্বেও উদ্ধৃত হয়েছে) আইনের সম্মুখে সকল মানুষ সমান।

হযরত আলী (রা) বলেছেনঃ

সত্য একজনের পক্ষে যেমন, তেমনি তার বিপক্ষেও।

তা একজনের উপর কার্যকর হলে তার পক্ষেও কার্যকর হবে।[১]

৩. অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুবিচার ঃ ইসলাম সুবিচারপূর্ণ অর্থনীতি গ্রহণ করেছে, অর্থনৈতিক ব্যাপারাদিতে পূর্ণ সুবিচার, ন্যায়পরতা, নিরপেক্ষতা ও তারতম্যহীনতার নীতি কার্যকর করার জন্য বিশেষ তাকীদ দিয়েছেন। ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তা ও কর্মচারীদের কর্তব্য হচ্ছে এই নীতি অনুসরণ করা ও বাস্তবায়িত করে তোলা সম্ভাব্য সকল উপায় গ্রহণ করে। এ জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন প্রকারের জুলুম, শোষণ ও বঞ্চনার প্রশ্রয় দিতে সম্পূর্ণ নিষেধ করেছে। সূদ, পণ্য আটককরণ, অন্যায়ভাবে উচ্চমূল্য গ্রহণ, কাউকে দেয়া ও কাউকে না দেয়া—এই সবই হচ্ছে জুলুম ও অবিচারের বিভিন্ন দিক।

ইসলাম সূদী কারবার বন্ধ করে দিয়েছে মানুষকে শোষণের পথ বন্ধ করার লক্ষ্যে এবং তা করতে গিয়েও কোনরূপ জুলুম হওয়ার পথ উন্মুক্ত রাখেনি। এইজন্য ঘোষণা করেছেঃ

وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: ٢٧٩)

তোমরা যদি সূদী কারবার থেকে তওবা কর—আর করবে না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর—তাহলে তোমাদের মূলধন তোমরা ফেরত নিতে পারবে। তার ফল হবে এই যে, তোমরাও জুলুম করলে না আর তোমাদের উপরও জুলুম করা হলো না।

আয়াতের শেষাংশে বলা কথাটিই বিশেষ করে অর্থনীতির ক্ষেত্রে মৌলনীতি হিসেবে স্বীকৃত। ইসলাম অর্থনীতির ক্ষেত্রে কাউকে জুলুম করার অনুমতি দিতে প্রস্তুত নয়, কারোর উপর জুলুম হোক তা-ও ইসলাম বরদাশত করতে রাযী নয়। ইসলাম সকল পর্যায়ের শাসন-কর্তৃপক্ষকে অর্থনৈতিক ব্যাপারে পূর্ণ সুবিচার করার জন্য দায়িত্বশীল করে দিয়েছে। সে নিজে কারোর 'হক' হজম করবে না, অন্য কাউকেও হজম করতে দেবে না।

৪. সামাজিক সম্পর্ক রক্ষায় সুবিচার ঃ ইসলাম সামাজিক সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ণ সুবিচার ও ন্যায়পরতা রক্ষার উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে,

---

১. نهج البلاغة الخطبة ٢١١ طبعه عبده

যেন এ ক্ষেত্রে কোন তিক্ততা বা সম্পর্কহীনতা প্রশ্রয় পেতে না পারে। এইজন্য ব্যক্তির উপর তার পিতা-মাতার, নিকটাত্মীয়ের, প্রতিবেশীর এবং ইয়াতীম, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকের 'হক' ধার্য করেছে, তা যথাযথভাবে আদায় করার জন্য তাকীদ করেছে। ক্রয়-বিক্রয়েও কোনরূপ ঠকবাজি না হতে পারে—সেজন্য অত্যন্ত কড়া ভাষায় কুরআনে বলে দেয়া হয়েছেঃ

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (الاسراء: ٣٥)

এবং তোমরা সঠিক-দৃঢ়-ভারসাম্যপূর্ণ পাল্লায় পণ্য ওজন কর। এটা যেমন উপস্থিতভাবে কল্যাণকর, তেমনি পরিণতির দিক দিয়েও অতীব উত্তম।

কেননা সমাজে জুলুম যদি বিন্দু বিন্দু করেও পূঞ্জীভূত হয়, তাহলে একদিন তা বিস্ফোরিত হয়ে মহাবিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে। বস্তুত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জুলুম শোষণ দীর্ঘ দিন চলতে পারে না। তার একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া অনিবার্য। এইজন্য স্বৈরতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব ইসলামের দৃষ্টিতে মানব প্রকৃতি পরিপন্থী ব্যবস্থা। এসব ব্যবস্থা সাধারণ মানুষ কিছুদিনের জন্য হয়ত সহ্য করতে থাকে। কিন্তু একদিন বিদ্রোহের প্রলয়কান্ড সংঘটিত হয়, যা প্রতিরোধ করার সাধ্য কারোরই থাকে না।

এই কারণে ইসলাম মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে পূর্ণ ইনসাফ, সুবিচার, ন্যায়পরতা ও নিরপেক্ষতাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। অন্যথায় এর খারাপ প্রতিক্রিয়া কেবল পরকালেই নয়, ইহকালেও অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়া একান্তই অবধারিত।

ইসলাম ঘোষিত পরিপূর্ণ সুবিচার ও ন্যায়পরতার জন্য যে কার্যসূচী গ্রহণ করেছে, তা এভাবে বলা যায়ঃ

১. সমগ্র মানুষের ঐক্য ও অভিন্নতা—মানুষ হিসেবে;
২. মুসলিম উম্মার ঐক্য—মুসলিম ও ঈমানদার হিসেবে;
৩. জাতীয়তার দিক দিয়ে পূর্ণমাত্রার অভিন্নতা, পার্থক্যহীনতা;
৪. দ্বীন ও জীবন বিধানের ঐক্য ও অভিন্নতা;
৫. সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-মানবিক অধিকারে অভিন্নতা;
৬. আইনের দিক দিয়ে—আইন কার্যকরকরণে পার্থক্যহীনতা;
৭. আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জাতীয়তার অভিন্নতা।

এইসব ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন ইসলামী রাষ্ট্রের বিশেষ নীতি ও কার্যসূচী, ইসলামী রাষ্ট্রের এটা একটা বড় দায়িত্ব।

শু'রা

[কুরআন ও শুরা—হাদীস ও শু'রা—শুরায় মতপার্থক্য—রাসূলে করীম (স)-এর নীতি—জরুরী সংযোজন—যুক্তিসঙ্গত স্বাধীনতার নিরাপত্তা—স্বাধীনতা কি—স্বাধীনতার কয়েকটি দিক, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, চিন্তা-বিশ্বাসের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা—সমালোচনার অধিকার—নাগরিক স্বাধীনতা।]

ইসলামী রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যক্রম জনমতের ভিত্তিতে চালানো হয়। কুরআন ও সুন্নাতে বিধৃত আইনসমূহকে ধারাবদ্ধকরণ (Codification) থেকে শুরু করে তার প্রয়োগ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার সকল পর্যায়ে জনমত জানার সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নামাযের ইমাম নিয়োগ, সময় নির্ধারণ ও মসজিদের ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি কাজ এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল পর্যায়ে পরামর্শ করার একটা নীতি অনুসরণের বলিষ্ঠ তাকীদ রয়েছে। ফলে কোন ক্ষেত্রেই যাতে স্বৈরতান্ত্রিক প্রচলন হতে না পারে, সেই দিকেই প্রবল লক্ষ্য আরোপিত হয়েছে। কোন পর্যায়েই যেন এক ব্যক্তির মর্জীমত চলতে লোকেরা বাধ্য না হয়। মানবেতিহাসের যে অধ্যায়ে নিরংকুশ স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচণ্ড হয়ে চলেছিল, যখন মানুষের কোন অধিকার ছিল না কথা বলার, মত জানাবার, ইসলাম সেই সময়ই দুনিয়ায় সর্বব্যাপারে এই পরামর্শ দেয়ার ও নেয়ার ব্যবস্থা কার্যকর করেছে। কুরআন মজীদের একটি পূর্ণ সূরার নামই রাখা হয়েছে 'আশ্-শু'রা'—অর্থাৎ পরামর্শ। কুরআনী বিধানে লোকদের মতের কি গুরুত্ব, তা এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠে।

কুরআন ও শু'রা

কুরআন মজীদে ইসলামী সমাজের পরিচিতিস্বরূপ বলা হয়েছে, সেখানে সব কাজ পরামর্শের ভিত্তিতে চলে, নিজেদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে, নিজেদের মধ্যে মত বিনিময়ের মাধ্যমে। ইসলামী সমাজের লোকদের গুণ পরিচিতি স্বরূপ সূরা আশ্-শু'রা'তেই বলা হয়েছেঃ

فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ـ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبٰئِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ـ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ ـ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ـ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنفِقُونَ (الشورى: ٣٦، ٣٧، ٣٨)

(আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার ও আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুলকারী লোক তারা) যারা বড় বড় গুনাহ্ ও নির্লজ্জতার যাবতীয় কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাকে, আর ক্রোধ হলে তা ক্ষমা করে দেয়; যারা নিজেদের রব্ব-এর হুকুম পালন করে—আহ্বানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে আর নিজেদের সামষ্টিক ব্যাপারাদি পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে এবং আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় বিনিয়োগ করে।

এ আয়াত ইসলামী সমাজের লোকদের জন্য নিজেদের যাবতীয় কাজ কর্ম সম্পন্নকরণে ও নিজেদের যাবতীয় সমস্যার সমাধানে পারস্পরিক পরামর্শ করাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। প্রত্যেকটি ব্যাপারেই সংশ্লিষ্ট লোকদের মত প্রকাশের সুযোগ দান ও উত্তম মতটি গ্রহণের নীতি অনুসরণ জরুরী করে দিয়েছে। জীবন-জীবিকা আহরণ ও উৎপাদন এবং জীবন-ধারা গ্রহণেও তাই করা কর্তব্য বলে ঘোষিত হয়েছে। সামষ্টিক তথা জাতীয় আদর্শ নির্ধারণে ও কার্যসূচী গ্রহণে জনগণের মত অবশ্যই জানতে হবে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমেরও জনমত উপেক্ষা করা চলবে না। উন্নয়নমূলক কার্যসূচী ও অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে জনগণকে মত জানাবার সুযোগ দিতে হবে। প্রতিরক্ষামূলক কার্যসূচী, সেনাবাহিনী গঠন ও পরিচালনা ছাড়াও যাবতীয় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি গ্রহণ ও পলিসি নির্ধারণে জনমত গ্রহণকে অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে। অন্যথায় ভুল-ভ্রান্তি থেকে যেমন রক্ষা পাওয়া যাবে না, সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করাও সম্ভব হবে না। সর্বোপরি স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার মারাত্মক কুফল থেকে সমাজকে বাঁচানো অসম্ভব হয়ে পড়বে।

পরামর্শ করার গুরুত্ব এ থেকেও স্পষ্ট হয় যে, নবী করীম (স) আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রয়োজনীয় সব ব্যাপার সরাসরি ওহী লাভ করেন এবং মা'সুম, তা সত্ত্বেও তাঁকেও আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেনঃ

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ. فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ . اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

(ال عمران: ١٥١)

এবং হে নবী! আপনি লোকদের (সাহাবীগণের) সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর আপনি যে সংকল্প গ্রহণ করবেন, তা আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করেই ফেলুন। মনে রাখবেন, আল্লাহ্ নিঃসন্দেহে তাওয়াক্কুলকারী লোকদের পছন্দ করেন, ভালোবাসেন।

বস্তুত নবী করীম (স) তাঁর নবুয়্যাতের কার্যাবলী সম্পাদনে ও অন্যান্য যাবতীয় সামষ্টিক ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সাথে বিভিন্ন সময়ে

পরামর্শ করেছেন। অবশ্য যেসব ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নিটক থেকে সুস্পষ্ট বিধান পেয়েছেন, সেসব ক্ষেত্রে কারোর সাথে পরামর্শ করার প্রশ্ন উঠে না—তার প্রয়োজনও পড়ে না। কিন্তু যেসব ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সুস্পষ্ট বিধান বা কার্যপদ্ধতি আসেনি, তাতে তিনি পরামর্শ করেছেন। বদর যুদ্ধ কালে তিনি সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করেছেন, ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে তার উল্লেখ রয়েছে। তিনি সাহাবীগণকে একত্রিত করে বলেছিলেনঃ

اَشِيْرُوْا عَلَيَّ اَيُّهَا النَّاسُ ـ

হে লোকেরা, আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও।

তখন সাহাবায়ে কিরাম পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে ও প্রাণ খুলে পরামর্শ দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আনসারদের দেয়া মতকেই গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে সৈন্য সমাবেশ করার স্থান নির্ধারণেও সাহাবীগণ যথাযথ মত জানিয়েছিলেন।[১]

হাদীস ও শু'রা

শু'রার কথা কেবল কুরআনেই বলা হয়েছে, তা নয়। এই পর্যায়ে এত বিপুল সংখ্যক হাদীসের উল্লেখ হয়েছে যা গুণে শেষ করা যাবে না। এখানে কিছু সংখ্যক হাদীস উদ্ধৃত হচ্ছে।

নবী করীম (স) বলেছেনঃ

اِذَا كَانَتْ اُمَرَائُكُمْ خِيَارَكُمْ وَاَغْنِيَاءُكُم سُمَحَاءُكُمْ وَامُورُكُم شُورَى بَيْنَكُم فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ مِنْ بَطْنِهَا (شره ترمذى-كتاب الفتن ص ٧٨)

যখন তোমাদের শাসক ও কর্মকর্তাগণ হবে তোমাদের মধ্যের সর্বোত্তম ব্যক্তিরা, তোমাদের ধনশালী লোকেরা হবে তোমাদের মধ্যে অধিক দানশীল এবং তোমাদের সামষ্টিক ব্যাপারাদিতে পরামর্শ গ্রহণ ব্যবস্থা কার্যকর হবে, তখন জীবনে বেঁচে থাকা মৃত্যুর তুলনায় উত্তম হবে (আর এর বিপরীত হলে—পরামর্শ দেয়া নেয়ার ব্যবস্থা কার্যকর থাকবে না, তখন মৃত্যুই জীবনের তুলনায় উত্তম)।

তিনি বলেছেন ঃ

اِسْتَرْشِدُوا الْعَاقِلَ وَلَا تَعْصُوْهُ فَتَنْدَمُوْا ـ

---

১. السيرة النبوية لابن هشام ج:١، ص: ٦١٥

বুদ্ধিমান লোকের নিকট তোমরা পথ-নির্দেশ চাও। তার পথ-নির্দেশ অমান্য করো না। তাহলে তোমরা লজ্জিত-দুঃখিত হবে।

لَا مُظَاهَرَةَ أَوْثَقُ مِنَ الْمُشَاوَرَةِ وَلَا عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ.

পারস্পরিক পরামর্শ অপেক্ষা অধিক দৃঢ় ও নির্ভরযোগ্য নীতি আর কিছু হতে পারে না। আর সব কাজে গভীর চিন্তা-ভাবনার মত বুদ্ধিমত্তাও কিছু হতে পারে না।

'বুদ্ধিমত্তা' বলতে কি বোঝায়, জিজ্ঞাসা করা হলে নবী করীম (স) বললেনঃ

مُشَاوَرَةُ ذِى الرَّأْيِ وَاتِّبَاعُهُمْ.

মত দেয়ার যোগ্য লোকদের সাথে পরামর্শ করা এবং তাদের কথামত কাজ করাই হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা।

হযরত আলী (রা) তাঁর পুত্র মুহাম্মদ ইবনুল হানফীয়াকে বলেছিলেনঃ

লোকদের মত পরস্পরের সাথে মিলিয়ে নেবে। তন্মধ্যে যে মতটি অধিক ঠিক মনে হবে, তা-ই গ্রহণ করবে।

রাসূলে আকরাম (স) বলেছেনঃ

اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ فَإِذَا اسْتُشِيرَ فَلْيُشِرْ بِمَا هُوَ صَانِعٌ لِنَفْسِهِ.

যার নিকট পরামর্শ চাওয়া হবে, সে হবে একজন আমানতদার—পরম দায়িত্বশীল। তার নিকট পরামর্শ চাওয়া হলে সে এমন পরামর্শ দেবে, যা সে নিজের জন্য করতে প্রস্তুত।

إِذَا اسْتَشَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ.

তোমাদের কেউ যদি তার ভাইর নিকট পরামর্শ চায়, তাহলে অবশ্যই পরামর্শ দেবে।

বলেছেনঃ

مَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ.

যে পরামর্শ গ্রহণ করে কাজ করল, সে কখনই লজ্জিত হবে না।

مَنِ اسْتَشَارَ أَخَاهُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رُشْدِهِ فَقَدْ خَانَهُ.

যে লোক তার ভাইর নিকট পরামর্শ চাইল, সে যদি না বুঝে-শুনে খারাপ পরামর্শ দেয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আমানতে খিয়ানত করেছে।

مَا يَسْتَغْنِى رَجُلٌ عَنْ مَشُورَةٍ ـ

পরামর্শ গ্রহণ না করে কোন ব্যক্তিই চলতে পারে না।

مَنْ أَرَادَ أَمْرًا فَشَاوَرَ فِيهِ وَقَضَى هُدِىَ لِا رُشْدِ الأُمُورِ

যে ব্যক্তি কোন কাজ করার ইচ্ছা করল, পরে সেই বিষয়ে সে পরামর্শ-ও করল এবং তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, সে সর্বোত্তম পন্থায় কাজ করল।

নবী করীম (স)-এর প্রতি 'পরামর্শ কর' বলে আল্লাহ্‌র নির্দেশ নাযিল হওয়ার পর তিনি বলেছিলেনঃ

إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ لَغَنِيَّانِ عَنْهَا وَلٰكِنْ جَعَلَهَا اللهُ رَحْمَةً لِأُمَّتِى ـ مَنِ اسْتَشَارَ مِنْهُمْ لَمْ يَعْدِمْ رُشْدًا وَمَنْ تَرَكَهَا لَمْ يَعْدِمْ غَيًّا ـ

মনে রাখবে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল পরামর্শ করার মুখাপেক্ষী নন। তা সত্ত্বেও পরামর্শের এ বিধান আল্লাহ্ নাযিল করেছেন আমার উম্মতের প্রতি রহমত স্বরূপ। অতএব যে লোক পরামর্শ করবে, সে সঠিক পথ কখনই হারাবে না। আর যে লোক পরামর্শ করবে না, সে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাবে না।[১]

শু'রার মতপার্থক্য

এ পর্যায়ে প্রশ্ন উঠছে, পরামর্শক সংস্থার সদস্যগণ যদি রায় প্রদানে মতভেদ করে বসে—বিভিন্ন লোক বিভিন্ন পরামর্শ দেয়, তখন এই মত-বৈষম্য কি করে মুকাবিলা করা যাবে? ... কোন্‌টা গ্রহণ করা হবে, আর কোন্‌টা বাদ দিতে হবে?

এই প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, প্রচলিত ও সঠিক পন্থা এই হতে পারে যে, যে মতটি ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং অধিকাংশ লোকের দেয়া। তবে এই নীতি অনুসৃত হবে সেখানে, যেখানে প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কেউ নেই। এইরূপ অবস্থায় অধিকাংশ লোকের ইসলামসম্মত মত গ্রহণ না করে কোন উপায় থাকে না।

কিন্তু যদি পূর্ণ মাত্রার যোগ্যতাসম্পন্ন দায়িত্বশীল জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত ও নিয়োজিত থাকে, তহিলে সে এই ব্যাপারে পূর্ণ দখল দিতে পারে—যা কুরআন ও সুন্নাতের নিকটবর্তী সেই মতটি সে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারে এই শর্তে যে, তা কুরআন ও সুন্নাত—তথা ইসলামের মৌল ভাবধারার পরিপন্থী হবে না।

যদি উভয় মত-ই ইসলামের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়, কুরআন ও সুন্নাতের সমমানের দলীলভিত্তিক হয়, তাহলে দুটির যে কোন একটি মত গ্রহণ করার প্রধান ব্যক্তির অধিকার রয়েছে।

১. উদ্ধৃত হাদীসসমূহ সিহাহ্ সিত্তার কিতাবে রয়েছে। এখানে আল-হুকুমাতুল ইসলামীয়ার الشورى بين النظرية والتطبيق ص: ٢٧-٣٠ থেকে উদ্ধৃত করা হলো।

কেননা রাসূলে করীম (স)-কে দেয়া আল্লাহ্র নির্দেশে দু'টি তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। একটি হচ্ছে—নবী করীম (স)-কে সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ, তাদের মত জানতে চেষ্টা করার হুকুম। অতএব পরামর্শ করা ও বিভিন্ন মত সম্মুখে আসা প্রমাণ করে যে, সংশ্লিষ্ট জনগণ চিন্তা ও মতের অধিকারীও; চিন্তার উর্বরতাই প্রমাণিত হয় তাতে এবং সেসব মতের ভিত্তিতে কাজ করলে নিশ্চয়ই সুন্দর ও নির্ভুল সুফল পাওয়া যাবে—ঠিক যেমন বিদ্যুতবাহী তারসমূহের সংঘর্ষে বা সমন্বয়ে আলো স্ফুরিত হয়ে উঠে। এই কারণেই প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তির কর্তব্য সংশ্লিষ্ট লোকদের সাথে পরামর্শ করা। কেবল নিজের মতের ভিত্তিতে কাজ করা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার স্বৈরতান্ত্রিক পন্থা সম্পূর্ণ পরিহার করে চলা।

দ্বিতীয়, ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রধান ও বিভিন্ন পর্যায়ের প্রধানদের কর্তব্য হচ্ছে পরামর্শ করা, বিভিন্ন মত ও রায় শ্রবণ করা—মতের বিভিন্ন দিককে ওলট-পালট করে আলোচনা-পর্যালোচনা ও চুল-চেরা বিশ্লেষণ করা ও গভীর সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিবেচনার পর সার্বিক দৃষ্টিতে যে মত সর্বোত্তম বিবেচিত হবে, তাই গ্রহণ করা। তারপর فاذا عزمت 'তুমি যখন সংকল্পবদ্ধ হবে' পরামর্শ গ্রহণ ও সর্বোত্তম মত গ্রহণের সিদ্ধান্তের পর, তখন توكل على الله 'আল্লাহ্র উপর পূর্ণ নির্ভরতা' সহকারে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। আল্লাহ্ তোমায় সাহায্য করবে ও নির্ভুল কাজের তওফীক দান করবেন। সমস্যার সমাধান সহজতর হবে।

রাসূল (স)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ যখন তুমি সংকল্পবদ্ধ হবে এ কথা স্পষ্ট করে দেয় যে, আসলে চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার ও ক্ষমতা স্বয়ং রাসূলে করীম (স)-এর—যদিও তা পরামর্শের পর।

রাসূল করীম (স)-এর নীতি

এর অপর একটি ব্যাখ্যাও রয়েছে এবং তা হচ্ছে, জনগণের কাজ হচ্ছে, রাসূল (স) পরামর্শ চাইলে সাধ্যমত সর্বোত্তম ও নির্ভুল মত জানিয়ে দেয়া, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নবীর নিজের। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানেরও সেই দায়িত্ব ও ক্ষমতা রয়েছে।

নবী করীম (স) সাধারণভাবে কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মেনে নিয়েছেন—তার দৃষ্টান্ত খুব পাওয়া যায় না। বরং লোকদের মত জেনে নেয়ার পর তিনি প্রায় নিজস্ব সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। উদ্ধৃত আয়াতের শেষাংশ থেকে প্রতিভাত হয় যে, লোকদের পরামর্শ জেনে নেয়ার পর তিনি যে মতটিকে অধিক সঠিক, অধিক কল্যাণকর মনে করেছেন, সেটাই গ্রহণ

করেছেন, সেই মতটি বেশীর ভাগ লোকের, কি কম সংখ্যক লোকের—সে দিকে তেমন ভ্রুক্ষেপ করেননি। তাই ইসলামী রাষ্ট্রের ও সমাজে পরামর্শের বিধান তো রয়েছে, কিন্তু পাশ্চাত্যের ধর্মহীন গণতন্ত্রের নীতি Majority must be granted সংখ্যাধিক্যের মত অবশ্যই গৃহীত হতে হবে—ইসলামে নিঃশর্তভাব তা গৃহীত হয়নি।

নবী করীম (স) বদর যুদ্ধ কালে সাহাবায়ে কিরামের মজলিস করেছেন। বিশদ আলোচনা হয়েছে। হযরত আবূ বকর ও উমর (রা) নিজ মত প্রকাশ করেছেন। শেষে হযরত মিক্‌দাদ ইবনে আমর (রা) দাড়িয়ে বললেনঃ

'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি সিদ্ধান্ত নিয়ে অগ্রসর হোন। আমরা আপনার সঙ্গেই রয়েছি। বনী ইসরাইলীরা তাদের নবীকে যেমন বলেছিলঃ আপনি ও আপনার রব যান ও যুদ্ধ করুন, আমরা তো এখানেই আসন গেড়ে বসলাম—আমরা তেমন কথা নিশ্চয়ই বলব না। বরং বলবঃ 'আপনি ও আপনার রব অগ্রসর হোন, আমরা আপনাদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছি।'

রাসূলে করীম (স) এই মতটিকে খুবই পছন্দ করেছেন, তিনি তাঁর জন্য দোয়া করেছেন।

ওহোদ যুদ্ধকালে কুরাইশরা মদীনার উপকণ্ঠে পৌঁছে গেছে জানতে পেরে তিনি সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে পরামর্শে বসলেন। প্রশ্ন রাখলেনঃ মদীনার মধ্যে থেকেই যুদ্ধ করা হবে, না বাইরে গিয়ে মুকাবিলা করা হবে? সাহাবীগণ উভয় দিকেই মত দিয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলে করীম (স) তাঁদের মতকেই পছন্দ করলেন ও সিদ্ধান্ত করলেন, যাঁদের মত ছিল মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার পক্ষে।

আহযাব যুদ্ধকালেও পরামর্শ করতে গিয়ে রাসূলে করীম (স) বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী মতের সম্মুখীন হলেন। শেষে হযরত সালমান ফারসী (রা)-র মত গ্রহণ করে মদীনা নগরের বাইরে পরিখা খনন করলেন। হযরত সালমান (রা) একাই তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং রাসূলে করীম (স) তাঁর দেয়া পরামর্শ গ্রহণ করতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করলেন না, যদিও পরিখা খনন করে শত্রু বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করার পদ্ধতি আরবদের মূলতই জানা ছিল না।

সেই পরিখা যুদ্ধকালীন আর-ও একটি ঘটনা। ইসলামী বাহিনী খাদ্যাভাবে ভীষণ কষ্টের মধ্যে পড়ে গেছে। রাসূলে করীম (স) গাতফান কবীলার সরদার

উয়াইনা বিন হাচন ও হারিস ইবনে আউফের নিকট লোক পাঠিয়ে মদীনার এক-তৃতীয়াংশ ফল ও ফসল দেয়ার শর্তে যুদ্ধের ময়দান থেকে তাদের চলে যাওয়ার জন্য সন্ধি করলেন এবং এ ব্যাপারে একটি দস্তাবেজ লিপিবদ্ধ করলেন যদিও কোন লোককে সাক্ষী রাখা হয়নি। এটা ঠিক 'সন্ধি' ধরনেরও কিছু ছিল না। রাসূলে করীম (স) যখন এ বিষয়টি চূড়ান্ত করার ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি হযরত সায়াদ ইবনে মুয়ায ও সায়াদ ইবনে উবাদা (রা)-কে বিষয়টি জানালেন এবং তাঁদের পরামর্শ চাইলেন। তাঁরা শুনে বললেনঃ হে রাসূল! এ ব্যাপারে কি আমরা যা পছন্দ করব, তাই করতে পারব, না আল্লাহ্ আপনাকে এই কাজ করার জন্য আদেশ করেছেন? তিনি বললেন—না, আল্লাহ্ কোন আদেশ নাযিল করেন নি, আমিই চিন্তা করেছি এই কাজ করার। তখন তাঁরা বললেন 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা ও ওরা মুশরিক জাতি ছিলাম। আল্লাহ্‌কে জানতামও না, তাঁর ইবাদতও আমরা করতাম না। এক্ষণে আপনার দৌলতে আল্লাহ্ আমাদেরকে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দিয়ে সম্মানিত করেছেন। এই সময় ওদের সাথে এইরূপ চুক্তি করা কিছুতেই শোভণ হবে না। নবী করীম (স) তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং চুক্তির ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন।

তায়েফ যুদ্ধকালেও পরামর্শ গ্রহণের ব্যাপার ঘটেছিল। তায়েফ যাত্রাপথে একটি দুর্গ দেখা গেল। নবী করীম (স) সঙ্গীদের নিয়ে তথায় অবতরণ করলেন। ইতিমধ্যে হুবাব ইবনুল মুনযির (রা) উপস্থিত হয়ে বললেনঃ আমরা দুর্গের নিকটে পৌঁছে গেছি। এখন আল্লাহ্‌র নির্দেশ কিছু থাকলে আমরা তা-ই করব। অন্যথায় এই দুর্গ আক্রমণে বিলম্ব করাই শ্রেয়ঃ মনে করি।

রাসূলে করীম (স) তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করলেন।

উপরোদ্ধৃত শেষের দুইটি পরামর্শের ব্যাপারে বিবেচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যাবে—এই উভয় ক্ষেত্রেই নবী করীম (স) কর্মক্ষেত্রে বিবেচিত সর্বোত্তম, সর্বাধিক সত্য ও অধিক কল্যাণকর পন্থা গ্রহণের নীতি অবলম্বন করেছেন। এসব ক্ষেত্রে নবী করীম (স) কোন মত গ্রহণ ও কোন মত বর্জনে সংখ্যাগুরু (Majority) সংখ্যালঘুর (Minority)-র উপর ভিত্তি করে করেননি। বরং তিনি সকলেরই বক্তব্য শুনতেন, তবে তাঁর নিকট যে মতটি অধিক যথার্থ ও সঠিক বিবেচিত হয়েছে, সেটাই তিনি গ্রহণ করেছেন, সেটি বেশী সংখ্যক লোকের মত, না কম সংখ্যক লোকের—সেটা হিসেব করেননি।

কিন্তু হুদায়বিয়ার সন্ধির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্নতর অবস্থা লক্ষ্য করা গেছে। সঙ্গের সমস্ত সাহাবী মক্কার কাফিরদের সাথে কোনরূপ সন্ধি করার মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সন্ধি করলেন ও তাকে কার্যকর করলেন।

এক্ষেত্রে অধিক প্রকট ঘটনা হচ্ছে—হযরত উসামা ইবনে জায়দ (রা)-কে নিজ হাতে পতাকা দিয়ে বললেনঃ

سِرْ اِلٰى مَوْضَعِ قَتْلِ اَبِيْكَ فَاَوْطِئْهُمُ الْخَيْلَ فَقَدْ وَلَّيْتُكَ هٰذَا الْجَيْشَ .

তুমি রওয়ানা হয়ে যাবে সেইখানে, যেখানে তোমার পিতা শহীদ হয়েছে এবং সেই স্থানের লোকদেরকে অশ্ব-ক্ষুরে নিষ্পেষিত করবে। আমি তোমাকে এই বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করলাম।

অথচ বড় বড় সাহাবী এই পদক্ষেপ মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারেননি। তারা হযরত উসামা (রা)-কে সেনাপতি বানানোর বিরুদ্ধে মত জানিয়েছিলেন। কিন্তু নবী করীম (স) কারোর কথাই শুনেন নি, কারোর বিরুদ্ধতারও পরোয়া করেননি। সাহাবায়ে কিরামের বিপরীত মতও তাঁকে তাঁর সংকল্প থেকে একবিন্দু টলাতে পারে নি।[১] তিনি সাহাবায়ে কিরামের বিরূপ মত ও ক্ষোভের টের পেয়ে মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেনঃ "হে জনগণ! উসামাকে সেনাধ্যক্ষ নিয়োগের ব্যাপারে তোমাদের অ-মতের কথা আমার নিকট পৌঁছেছে! তোমরা পূর্বেও তার পিতা জায়েদকে সেনাধ্যক্ষ নিয়োগের বিরোধিতা করেছিলে। আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, সে সেনাধ্যক্ষ হওয়ার সম্পূর্ণ যোগ্য ছিল, তার পুত্রও যোগ্য"।

এই সব ঘটনা থেকে পরামর্শ গ্রহণের ব্যাপারে নবী করীম (স)-এর এই নীতিরই সন্ধান মেলে যে, নেতা পরামর্শ চাইবে, সংশ্লিষ্ট লোকেরা পরামর্শ দেবেও। কিন্তু গ্রহণ করবে তা, যা তার নিকট অধিক সঠিক ও কল্যাণকর বিবেচিত হবে। অধিকাংশ লোকের মত গ্রহণ করতে সে বাধ্য নয়। তবে কোন সময় অধিকাংশের মতও গ্রহণ করা যেতে পারে, যেমন করে নবী করীম (স) ওহোদের যুদ্ধের ক্ষেত্রে তাই করেছিলেন।

তবে মজলিসে শু'রায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে পরামর্শ দানের ব্যাপারটি নিশ্চয়ই রাষ্ট্রপ্রধান বা অন্যান্য পর্যায়ের নেতা নির্বাচনের ব্যাপারের মত নয়। এই শেষোক্ত ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতই গৃহীত হবে। অন্যথায় বিরোধ ও মতপার্থক্য গোটা সমাজকেই অচল করে দেবে। তাই অধিকাংশ লোকের সমর্থনে নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় সেই নেতা অধিকাংশ লোকের মত গ্রহণে সব সময়ই বাধ্য হতে পারে না। নেতা যদি মনে করে—অধিকাংশ লোকের মত বাস্তবতার কিংবা কুরআন ও সুন্নাহর সামগ্রিক ভাবধারার সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন নয়, তাহলে তখন যা অধিক সত্য বলে বিবেচিত হবে সেই মত—তা বেশী সংখ্যকের

---

১. مغازى الواقدى ج: ٢، ص: ٩٢٥-٩٢٦، سيرة ابن هشام ٢ ص: ٢١٦-٢١٨

হোক, কি কম সংখ্যকের—গ্রহণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করবে ও পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

এই নীতিই কুরআনের বিধান ও রাসূলের সুন্নাতের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল বলেই মনে হয়।

জরুরী সংযোজন

বর্তমান সময়ে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও ইসলামী আদর্শবাদী ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত সরকারকে সর্বসম্মতভাবে কুরআন সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে রচিত সংবিধানের পুরাপুরি অনুসরণকারী করে রাখা এবং তাকে আদর্শ বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করার জন্য একটি বিশেষ ও অমোঘ ভাবে কার্যকর পন্থা গ্রহণ করা একান্তই জরুরী মনে করি। সে পন্থাটি এই হতে পারে যে, দেশের সর্বজন পরিচিত, কুরআন ও সুন্নাহর গভীর ও ব্যাপক ইল্‌ম-এর ধারক এবং তাকওয়া-পরহেযগারীর দিক দিয়ে পরীক্ষিত ও আস্থাভাজন ব্যক্তিকে 'ইসলামী আদর্শের সংরক্ষক' মর্যাদায় নির্বাচিত করা হবে, যাকে সকল প্রকারের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব থেকে দূরে ও নিঃসম্পর্ক রাখা হবে। সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বা কুরআন ও সুন্নাহর বিরুদ্ধতা দেখলে সে কঠোর হাতে তা দমন করবে এবং শুধু এই ব্যাপারে তার কথাই হবে চূড়ান্ত। অবশ্য এ পর্যায়ে তার বক্তব্য হতে হবে অকাট্য দলীল প্রমাণভিত্তিক।

এ কথা স্বীকৃত ও এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলো শুধু পদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাখ্যা এবং যোগ্যতার মান বা শর্তসমূহ জনগণের নিকট পেশ করে স্বতন্ত্রভাবে এই পদে একজন বিশেষ ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা যেতে পারে।—গ্রন্থকার

যুক্তিসঙ্গত স্বাধীনতার নিরাপত্তা

স্বাধীনতা মানুষের নিকট সর্বাধিক প্রিয় বস্তু। বিশ্বমানবতা স্বাধীনতার জন্যই সর্বাধিক সংগ্রাম করেছে, লড়াই করেছে ও অকাতরে প্রাণ কুরবান করেছে। অতএব 'স্বাধীনতা' নিশ্চয়ই একটি পবিত্র ভাবধারাসম্পন্ন শব্দ। এ জন্য ব্যক্তি যেমন পাগলপারা, তেমনি পাগলপারা গোষ্ঠী, গোত্র ও জাতি। বিশেষ করে পরাধীন বা দুর্বল জনসমষ্টি তো স্বাধীনতার জন্য এতই উদগ্রীব যে, তা না হওয়া পর্যন্ত তারা স্বস্তির নিঃশ্বাসও ছাড়তে প্রস্তুত নয়। যে কোন উপায়েই হোক, স্বাধীনতা লাভের জন্য তারা সর্বক্ষণ চেষ্টায় নিরত থাকে। তবে দুনিয়ায় স্বাধীনতা লাভের জন্য লোকেরা যত কুরবানী দিয়েছে, রক্তের বন্যা বহিয়েছে, সেই অনুপাতে স্বাধীনতা খুব কমই অর্জিত হয়েছে। আর স্বাধীনতা অর্জিত হলেও তার সুফল লাভ করা খুব কম সংখ্যক লোকের ভাগ্যই সম্ভবপর হয়েছে। ফলে যুগ যুগ

শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরে দুনিয়ায় স্বাধীনতার সংগ্রাম চলা সত্ত্বেও আজও দুনিয়ার মানুষের অধিকাংশই প্রকৃত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত, স্বৈর শাসন বা সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত।

স্বাধীনতা কি

স্বাধীনতা বলতে কি বোঝায়, কি তার সংজ্ঞা—এ নিয়ে দুনিয়ার দার্শনিক-রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অনেক চিন্তা-গবেষণা করেছেন, অনেক লেখনী চালিয়েছেন।

প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মন্টেস্কো বলেছেনঃ

স্বাধীনতা হচ্ছে আইনের দৃষ্টিতে বৈধ সব কিছু করার—করতে পারার অধিকার। আইনে নিষিদ্ধ কোন কাজ করলে সে স্বাধীনতা হারাল, বুঝতে হবে। কেননা একজন যেমন আইন বিরোধী কাজ করেছে, তার দেখাদেখি অন্যরাও তেমন আইন বিরোধী কাজ করতে পারে।[১]

অন্যান্যরা বলেছেনঃ স্বাধীনতা হচ্ছে ব্যক্তির যে কোন উত্তম চিন্তা বা কাজের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকা।

স্বাধীনতার বহু কয়টি সংজ্ঞার মধ্যে একটি সংজ্ঞাকে ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ মন করা যেতে পারে। তা হচ্ছেঃ 'স্বাধীনতা' অর্থ হচ্ছে, সমাজ পরিপ্রেক্ষিত এমন হবে যে, প্রত্যেকটি নাগরিকই তথায় স্বীয় যোগ্যতা ও প্রতিভার বাস্তব প্রকাশ ও বিকাশ দানের সুযোগ পাবে, এর পথে কোন প্রতিবন্ধকতা আসবে না।

আল্লাহ্‌র নবী-রাসূলগণ এই স্বাধীনতার পয়গাম নিয়েই দুনিয়ায় এসেছেন এবং তাঁদের পেশ করা দাওয়াতের সারনির্যাস বা চরম লক্ষ্যই হচ্ছে ব্যক্তিদের এই স্বাধীনতা। কেননা সমাজের লোকেরা নানা প্রকারের বাধা প্রতবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে থাকে, তাদের উপর চাপানো থাকে মানুষের অকারণ চাপিয়ে দেয়া নানাবিধ দুর্বহ বোঝা। মানুষ মানুষের—কিংবা মানব রচিত আইন-বিধান ও রসম-রেওয়াজের শৃঙ্খলে থাকে বন্দী হয়ে।

মানুষকে সেই সব থেকে মুক্তিদান করাই হয় নবী-রাসূলগণের লক্ষ্য ও সাধনা। তাঁরা এমন এক সমাজ-পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম চালাতে থাকেন, যার ফলে সব বাধা-প্রতিবন্ধকতা ও ভুল ভাবে চাপানো সব বোঝা নিঃশেষ হয়ে যাবে, মানুষ সেসব কিছু থেকে মুক্তি লাভ করে কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও এক রাসূলের নেতৃত্ব মেনে চলতে পারে। এ ভাবেই যেন তারা

---

১. روح الشرائع ج: ١ ص: ٢٢٦ طبعة دار المعارف بمصر

তাদের মধ্যে নিহিত সব যোগ্যতা-প্রতিভার বিকাশ দান করতে পারে এবং যোগ্যতানুযায়ী কাজ করার পথে যেন কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়ে না পড়ে।

স্বাধীনতার কয়েকটি দিক

স্বাধীনতার কয়েকটি দিক বা পর্যায় রয়েছেঃ নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখ্য ও গুরুত্বপূর্ণঃ

১. ব্যক্তি-স্বাধীনতা;
২. চিন্তা ও আকীদা-বিশ্বাসের স্বাধীনতা;
৩. রাজনৈতিক স্বাধীনতা; ও
৪. সমালোচনার অধিকার
৫. নাগরিক স্বাধীনতা।

প্রত্যেকটি পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হচ্ছেঃ

১. ব্যক্তি-স্বাধীনতাঃ মৌলিকভাবে ও প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তির উপর অপর কোন ব্যক্তির কোন প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব নেই। প্রত্যেকটি মানুষই মুক্ত ও স্বাধীন জন্মগতভাবেই। কেউ-ই কারোর অধীন নয়, দাস নয়, নয় মনিব। সকলে মানুষ, সমান মর্যাদার ও সমান অধিকারের।

এ দৃষ্টিতে স্বাধীনতা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মগত ও স্বভাবগত অধিকার। তা কারোর কাউকে দেয়া বা নেয়ার উপর নির্ভরশীল নয়!

অতীতকালের কয়েকজন দার্শনিক এর বিপরীত মত দিয়ে গেছেন। তাঁদের মতে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে মনিব ও দাস— এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। দাসরা স্বাধীন লোকদের সেবা ও খেদমত করার জন্যই দৈহিক শক্তি ও ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। তাই স্বাধীন ব্যক্তিদের বিশেষত্ব ও অধিকারের কোন অংশই দাসদের প্রাপ্য হতে পারে না।

কিন্তু এই গ্রন্থকারের মতে প্রকৃত স্বাধীনতা বলতে বোঝায়, ব্যক্তির নিজ ঈমান-আকীদা অনুযায়ী নির্বিঘ্নে কাজ করার অবাধ অধিকার। ব্যক্তি যখন নবী-রাসূলগণ থেকে এক আল্লাহ্র দাসত্ব কবুলের আহ্বান গ্রহণ করে ও তদনুযায়ী আল্লাহ্র বিধান পালন করে জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত ও সংকল্প গ্রহণ করে, তখন তার এরূপ জীবন যাপনে সমাজ-পরিবেশ থেকে তাতে আনুকূল্য পেলে বুঝতে হবে, সেই ব্যক্তি প্রকৃতই স্বাধীন, সে সমাজও স্বাধীন। অন্যথায় নির্ঘাত পরাধীনতা।

হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে যখন ফিরাউনের নিকট উপস্থিত হয়ে বনী ইসরাইলীদের মুক্ত করে দেয়ার আহ্বান জানালেন, তখন ফিরাউন বলেছিলঃ

أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا .

তুমি যখন শিশু ছিলে তখন কি আমরা তোমাকে লালন-পালন করিনি? ...... (আর আজ তুমি আমার বিরুদ্ধতা করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছ?)

জবাবে হযরত মূসা (আ) বলেছিলেনঃ

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ (الشعراء: ٢٢)

তুমি আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছ, সেটা তো ছিল আমার জন্য আল্লাহ্র আয়োজিত একটি ব্যবস্থার নিয়ামত। আর সেই কথার দোহাই দিয়ে কি ইসরাইলী বংশের লোকদেরকে তুমি তোমার দাসানুদাস বানিয়ে রেখেছ?

অর্থাৎ অতীতে তুমি যদি কোন কারণে কোন ভালো কাজ করে থাক তাহলে সেই ভালো কাজের দোহাই দিয়ে আজ বিপুল সংখ্যক মানুষ—একটি বিরাট জনগোষ্ঠীকে— নিকৃষ্ট দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী করে রাখবে, এটা কোন দিক দিয়েই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। কেননা মানুষকে দাস বানিয়ে রাখা—মানুষের স্বাধীনতা হরণ করার সাথে কারোর কোন অনুগ্রহের তুলনা হতে পারে না। স্বাধীনতা বঞ্চিত অবস্থার ন্যায় মানুষের চরম দুর্গতিপূর্ণ অবস্থা আর কিছু হতে পরে না। আহলি কিতাব লোকেরা তাদের নেতা-পন্ডিত-পুরোহিতদের নিকট নিজেদের স্বাধীনতাকে বিক্রয় করে দিয়েছিল। তাদের হুকুম ও ফয়সালা বিনা শর্তে ও নির্বিচারে মেনে নিত। এ জন্য আল্লাহ্ তীব্র ভাষায় তাদের সমালোচনা করেছেন (সূরা আত-তওবাহ্ঃ ৩১)। কেননা আল্লাহ্ তো মানুষকে মুক্ত ও স্বাধীন সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তারা নিজেরাই সে স্বাধীনতা পরিহার করে নিজেদেরকে তাদেরই মত মানুষের দাসত্ব-শৃঙ্খলে বন্দী করে দিয়েছে। মানুষের জন্য এর চাইতে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে। অথচ আল্লাহ্র ইচ্ছা এই ছিল যে, মানুষের উপর তাদেরই মত মানুষের কোন কর্তৃত্ব হবে না, কর্তৃত্ব হবে একমাত্র আল্লাহ্র আর এ লক্ষ্যেই কুরআন তাদের আহবান জানিয়েছেন এই বলেঃ

يَاهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ (ال عمران: ٦٤)

হে কিতাবওয়ালা লোকেরা! তোমরা আস এমন একটি বাণীর দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে সমানভাবে গ্রহণীয় ও কল্যাণকর। তা এই যে,

আমরা এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোরই দাসত্ব করব না, তাঁর সাথে কাউকে শরীক বানাবো না এবং আমরা পরস্পরকে রব্ব-ও বানাব না এক আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে।

কুরআন তো মানুষের স্বাধীনতা রক্ষার এবং তাদের মধ্যে স্বাধীন মর্যাদার প্রাণ-শক্তি জাগিয়ে তোলার আদর্শ নীতি ঘোষণা করে দিয়েছিল এই বলেঃ

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ-(المنافقون: ٨)

ইযযত-মর্যাদা ও শক্তি-দাপট রয়েছে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য এবং মু'মিন লোকদের জন্য। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।

কুরআন এই অভয় বাণীও শুনিয়েছেঃ

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (ال عمران: ١٣٩)

তোমরা সাহসহীন হয়ো না, দুশ্চিন্তাক্লিষ্ট হয়ো না, তোমরাই তো সর্বোচ্চ মর্যাদাভিষিক্ত, যদি তোমরা বাস্তবিকই ঈমানদার হও।

বস্তুত কুরআন মানুষকে যে ঈমানের আহ্‌বান জানিয়েছে, সেই ঈমানই হচ্ছে তাদের প্রকৃত স্বাধীনতা রক্ষার একমাত্র অবলম্বন। সেই ঈমান যদি থাকে, তাহলে মানুষ কখনই নিজেকে তারই মত অন্য মানুষের দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দী করে—তারই মত মানুষকে ভয় করে নিজেকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করতে পারে না। তাই হযরত উমর ফারুক (রা) মানুষকে মানুষের নিকট লাঞ্ছিত, অপমানিত ও নির্যাতিত হতে দেখে অত্যন্ত ক্রোধ সহকারে বলেছিলেনঃ

مَتٰى تَعَبَّدْتُمُ النَّاسَ وَلَقَدْ وَلَدَتْهُمْ اُمَّهَاتُهُمْ اَحْرَارًا ـ

তোমরা মানুষকে কবে থেকে দাস বানাতে শুরু করলে, তাদের মায়েরা তো তাদেরকে স্বাধীন মুক্ত অবস্থায়ই প্রসব করেছিল!

হযরত আলী (রা) বলেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فَوَّضَ اِلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كُلَّ شَيْءٍ اِلَّا اِذْلَالَ نَفْسِهٖ ـ

মহান আল্লাহ্ তো মু'মিনদেরকে সব কিছুই সোপর্দ করে দিয়েছেন। কিন্তু তাদের নিজেদেরকে অপমানিত করার কোন অধিকার দেন নি।

ইসলামের ঘোষিত ঈমানের কালেমা لا اله الا الله محمد رسول الله. এমন বিপ্লবী বাণী, যার প্রতি ঈমান থাকলে কোন লোকের পক্ষেই এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব গ্রহণ ও একমাত্র রাসূলের নেতৃত্ব অনুসরণ ব্যতীত অন্য কারোর দাসত্ব করা এবং অন্য কারোর নেতৃত্ব মেনে চলার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আল্লাহ্

তো তাঁর সর্বশেষ নবী–রাসূল (স)-কে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেনই এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি মানুষকে সকল প্রকার দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে স্বাধীন করে দেবেনঃ

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ (الاعراف: ١٥٧)

রাসূল তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র-উত্তম জিনিস হালাল ঘোষণা করবে, যাবতীয় নিকৃষ্ট-মন্দ-খারাপ জিনিসকে হারাম ঘোষণা করবে এবং তাদের উপর থেকে সব দুর্বহ বোঝা ও নিগ্রহকারী শৃঙ্খলকে—যা তাদের উপর চেপে বসেছে—ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে।

২. **চিন্তা-বিশ্বাসের স্বাধীনতা ঃ** ব্যক্তি-স্বাধীনতার পর-পরই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে প্রত্যেকটি মানুষের নিজস্ব চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা। তার অর্থ—প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের ইচ্ছা ও পছন্দ মত একটা বিশ্বাস গ্রহণের স্বাধীনতা পাবে, যে-চিন্তা গবেষণা চালাবার যোগ্যতা আছে, তা সে স্বাধীনভাবে চালাতে পারবে, তাকে অপর কারোর চিন্তা গ্রহণ করতে জোরপূর্বক বাধ্য করা হবে না। কুরআন মজীদ-এই দিকেই ইঙ্গিত করেছে এ আয়াতটি দ্বারাঃ

لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ـ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ (البقرة: ٢٥٦)

দ্বীন গ্রহণে কোন জোর খাটানো চলবে না। প্রকৃত হেদায়েত ও প্রকৃত গুমরাহী এক্ষণে স্পষ্ট, পরিস্ফুট ও প্রতিভাত হয়ে উঠেছে।

আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন মানুষকে হেদায়েত করার লক্ষ্যে। কিন্তু তাঁর ক্ষমতা ও দায়িত্ব কতখানি?

فَذَكِّرْ اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ـ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (الغاشية: ٢١ ٢٢)

সে যা-ই হোক, হে নবী! তুমি উপদেশ দিতে ও নসীহত করতে থাক। কেননা তুমি তো একজন উপদেশ দানকারী রূপে নিযুক্ত ব্যক্তি মাত্র। তুমি তো কারোর উপর জোর প্রয়োগকারী রূপে নিযুক্ত নও।

অতএব ইসলাম কারোর উপর ইসলামী আকীদা গ্রহণের জন্য জোর চালায় না, শক্তি প্রয়োগ করে না। তা চালাবার অধিকারও কাউকে দেয় না। কাউকে অন্য ধর্মমত থেকে ফিরিয়ে আনবার বা তা গ্রহণে বাধাদানের পক্ষপাতী নয়।

তবে এ কথা ঠিক যে, ইসলাম কোন মুসলিমকে ইসলাম ত্যাগ করার ও অন্য ধর্মমত গ্রহণ করার অনুমতি দেয় না। কেননা তা করা হলে তো দ্বীন ইসলামের চরম অবমাননা হবে, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এইজন্য ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলাম ত্যাগকারী ব্যক্তি 'মুরতাদ' বলে অভিহিত এবং

মৃত্যুদণ্ডই তার জন্য স্থিরীকৃত। কেননা তার এ কাজ দ্বীন-ইসলামী, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে চরম শত্রুতামূলক কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়, আর তা করার সুযোগ কাউকেই দেয়া যেতে পারে না। দ্বীন-ইসলামের ব্যাপারে কারোর মনে প্রশ্ন থাকলে বা সন্দেহ-সংশয় জাগলে তার জবাব দেয়া ও তাকে শান্ত করার দায়িত্ব, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের। এজন্য দ্বীন-ইসলামের শিক্ষা ব্যাপক করার, নাগরিকদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্বও ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর অর্পিত হয়েছে। মানুষকে অশিক্ষিত রাখা—অশিক্ষিত হয়ে থাকতে দেয়া মানবতার অপমান, মানবতার বিরুদ্ধে পরম শত্রুতারূপে বিবেচিত।

তাই ইসলামী রাষ্ট্রে অসুস্থ, অনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ-পরিপন্থী এবং তার সাথে সাংঘর্ষিক চিন্তার কোন অবকাশ থাকতে পারে না; কিন্তু সুস্থ চিন্তা ও কল্যাণময় জ্ঞানচর্চা স্বাধীনভাবে চলতে পারে, তার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হবে না। শুধু তাই নয়, সেজন্য বিপুলভাবে উৎসাহ প্রদান করা হবে, তার সুযোগ-সুবিধারও ব্যবস্থা করা হবে। এমনকি মুশরিকদেরকে আল্লাহ্র কালাম শুনাবার পন্থাও গ্রহণ করা হবে, যাতে তারা তা শুনে তার মধ্যে নিহিত যৌক্তিক ভাবধারা অনুধাবন করার সুযোগ পায়। আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেনঃ

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ (التوبه: ٦)

আর মুশরিকদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি যদি তোমার নিকট আশ্রয় চেয়ে আসতে ইচ্ছা করে, তাহলে তাকে অবশ্যই আশ্রয় দেবে, যেন সে আল্লাহ্র কালাম শুনবার সুযোগ পায়। পরে তাকে তার নিরাপত্তার স্থানে পৌঁছে দাও। এই নির্দেশ এ জন্য দেয়া হলো এবং তা করা এজন্য প্রয়োজন যে, ওরা হচ্ছে এমন লোক যে, ওরা প্রকৃত ব্যাপার কিছুই জানে না।

'প্রকৃত ব্যাপার কিছুই জানে না'—অথবা আল্লাহ্র কালাম যে কত তাৎপর্য মাহাত্মপূর্ণ, তা ওরা জানতেই পারেনি। অতএব ওদের কেউ যদি ইসলামী রাষ্ট্রে ওদেরই প্রয়োজনে আশ্রয় চায়, তাহলে তা দেবে। কেননা এই সুযোগে সে আল্লাহ্র কালাম শুনতে পাবে। আর তা শুনতে পেয়ে আল্লাহ্র কালামের মাহাত্ম্য অনুধাবন করে ইসলাম কবুলও করতে পারে। কেননা মুশরিকদেরও আল্লাহ্র কালাম শুনিয়ে ইসলাম কবুলের সুযোগ করে দেয়া ইসলামী রাষ্ট্রের একটা অতিবড় দায়িত্ব।

এ কারণেই ইরশাদ হয়েছেঃ

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ـ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ (الزمر: ١٧-١٨)

অতঃপর সুসংবাদ দাও সেই সব বান্দাকে, যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং তার উত্তম দিকগুলি মেনে নেয় ও পালন করে। এই ধরনের লোকদেরকেই তো আল্লাহ্ হেদায়েত দান করেন এবং (পরিণামে) তারাই বুদ্ধিমান প্রমাণিত হয়।

৩. রাজনৈতিক স্বাধীনতাঃ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিকের অধিকার রয়েছে দেশের রাজনৈতিক ব্যাপারাদিতে অংশ গ্রহণের এবং প্রয়োজন ও সুযোগ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের কোন পদে নিযুক্ত হওয়ার, কোন কাজের জন্য দায়িত্বশীল হওয়ার। কোন নাগরিককে মৌলিকভাবে এই অধিকার থেকে বিরত রাখা বা বঞ্চিত করা যেতে পারে না। কেননা এ এক স্বাভাবিক—স্বভাবসম্মত অধিকার। এই অধিকার বিশেষ কোন শ্রেণী বা বংশের লোকের জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত হওয়া ও অন্যদের তা থেকে দূরে রাখার কোন নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে না।

ইসলাম ছাড়া দুনিয়ায় অন্যান্য রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এই অধিকার বিশেষ কোন বংশের বা বর্ণের জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত (Reserved) করা হয়ে থাকে। প্রাচীন বংশভিত্তিক কিংবা শ্রেণীভিত্তিক শাসন ব্যবস্থায় তা করা হতো বিশেষ বংশের বা বর্ণের কিংবা বিশেষ শ্রেণীর লোকদের জন্য। আর বর্তমান কালের দলভিত্তিক শাসন ব্যবস্থায় তা করা হয় বিশেষ দলের লোকদের জন্য, যদিও গণতন্ত্রের আদর্শে সকল নাগরিকের সমান অধিকারের শ্লোগান দেয়া হয় অত্যন্ত উঁচু গলায়। এর বিপরীত বংশ, শ্রেণী বা দলের লোকদের এক্ষেত্রে কার্যত কোন অধিকার দেয়া হতো না, এখনও হচ্ছে না। ফলে একালের গণতন্ত্র (?) প্রাচীনকালীন বংশ বা বর্ণ কিংবা শ্রেণীর লোকদের একচেটিয়া অধিকার ভোগের পরিণতিই নিয়ে এসেছে।

প্রাচীন গ্রীক, পারস্য, ভারত ও দুনিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রে উক্ত অবস্থা বিরাজ করছিল। আর বর্তমানে সে অবস্থা অত্যন্ত প্রকটভাবে লক্ষ্য করা যায় দুনিয়ার সব গণতান্ত্রিক (?) রাষ্ট্রে।

ইয়াহুদী বংশীয় রাষ্ট্রেও রাষ্ট্রীয় পদ লাভ করার অধিকার নির্দিষ্ট ছিল কেবলমাত্র ধনী ব্যক্তিদের জন্য। কেননা ধন-সম্পদই ছিল তাদের সামাজিক মর্যাদার ভিত্তি। যে লোক বিপুল ধন-সম্পদের মালিক নয়, তার পক্ষে রাষ্ট্রীয় উচ্চতর মর্যাদার কোন পদ লাভ ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। এ কারণেই আল্লাহ্ যখন তালূতকে বনী

ইস্রাইলীদের বাদশাহ্ নিয়োগ করলেন, তখন তারা তার উপর কঠিনভাবে আপত্তি জানিয়ে বলে উঠলঃ

أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ

(البقرة: ٢٤٧)

আমাদের উপর বাদশাহ হয়ে বসার অধিকার তার কি করে—কেমন করে হতে পারে? আমরাই বরং ওর তুলনায় অধিক অধিকারী। কেননা ওর বিপুল ধন-সম্পদ নেই।

কিন্তু আল্লাহ্ ওদের এই আপত্তিকে গ্রাহ্য করেন নি। তিনি আগেই বলে দিয়েছেনঃ

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ (البقره: ٢٤٧)

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তালুতকে বাছাই ও পছন্দ করে তোমাদের উপর নিযুক্ত করেছেন এবং তাকে জ্ঞান ও দৈহিক শক্তির প্রশস্ততার বিপুলতা দান করেছেন।

তার অর্থ, সমাজ ও রাষ্ট্রের যথার্থ নেতৃত্ব দানের জন্য প্রথমে প্রয়োজন জ্ঞানে বিপুল প্রশস্ততা, আর দ্বিতীয় প্রয়োজন সুস্বাস্থ্যের ও দৈহিক শক্তির বিপুলতা। তালুত এই দুইটি গুণেরই অধিকারী এবং একারণেই তাকে তোমাদের উপর বাদশাহ্ রূপে নিযুক্ত করা হয়েছে।

কিন্তু ইসরাইলী সমাজে এই দুইটি গুণের কোন গুরুত্ব ছিল না। বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় পদ লাভের জন্য তাদের নিকট সবচাইতে বেশী গুরুত্ব ছিল বিপুল ধন-মালের অধিকারী হওয়া। আর সেদিক দিয়ে তালুতের উল্লেখযোগ্য কোন স্থান ছিল না। সে বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী ছিল না। ইয়াহুদীরা ধন-মালের এত বেশী পূজারী ছিল যে, আল্লাহ্ তালুতকে প্রয়োজনীয় গুণের অধিকারী বলে ঘোষণা করার পর-ও তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে আল্লাহ্র কথার প্রতিবাদে পেশ করতেও দ্বিধাবোধ করল না।

হযরত ইউসুফ (আ) ছিলেন মিসরে নিতান্তই বিদেশাগত। আর তাঁর ধন-মালের অধিকারী হওয়ার কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। তিনি আল্লাহ্র নবী হিসেবে রাষ্ট্রীয় পদাধিকারী হওয়ার প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন বলেই তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলতে পেরেছিলেনঃ

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ - إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (يوسف: ٥٥)

আমাকে ধন-মালের সমস্ত ভান্ডারের কর্তৃত্বশালী নিযুক্ত কর। কেননা আমি যেমন সেসবের হেফাযতকারী তেমনি ধন-মাল বিলি-বন্টনের সুষ্ঠু নিয়ম সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত।[১]

বস্তুত ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগপ্রাপ্তির শর্ত হিসেবে ধন-মালের মালিক হওয়া, বিশেষ বংশ, গোত্র বা শ্রেণীর লোক হওয়ার এক বিন্দু গুরুত্ব নেই। বরং গুরুত্ব রয়েছে যোগ্যতার, উপযোগিতার, জ্ঞানের এবং নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার। ইসলামের মহান নবী (স)-ও এ দিকেই গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেনঃ

مَنِ اسْتَعْمَلَ عَامِلاً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّ فِيْهِمْ مَنْ هُوَ اَوْلٰى بِذَالِكَ مِنْهُ وَاَعْلَمُ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهٖ فَقَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالْمُسْلِمِيْنَ ـ

যে লোক মুসলমানদের মধ্য থেকে কোন একজনকে কর্মচারী নিযুক্ত করল এরূপ অবস্থায় যে, সে জানে যে, তাদের মধ্যে নিযুক্ত ব্যক্তির তুলনায় অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন ও আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত সম্পর্কে অধিক জ্ঞানবান ব্যক্তি রয়েছে, সেই নিয়োগকারী আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং মুসলিম জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল।[২]

অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রে কোন পদ লাভের জন্য দুটি গুণের প্রয়োজন। একটি হচ্ছে উপযুক্ততা, যোগ্যতা এবং দ্বিতীয়, কুরআন ও সুন্নাতের ইলম—অবহিত। এই দুইটি গুণের দিক দিয়ে যে ব্যক্তি অগ্রসর প্রতিপন্ন হবে, তাকেই নিযুক্ত করতে হবে। তার তুলনায় ন্যূনতম ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হলে তা হবে বিশ্বাসঘাতকতার ন্যায় মারাত্মক অপরাধ।

এই পর্যায়ে রাসূলে করীম (স)-এর নিম্নোদ্ধৃত কথাটি আরো বলিষ্ঠ, অধিক কঠিন সাবধানকারী। বলেছেনঃ

مَنْ وَلِّيَ مِنْ اُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ اَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَّلاَ عَدْلاً حَتّٰى يُدْخِلَهُ فِيْ جَهَنَّمَ ـ

যে লোক মুসলিম জনগণের কোন বিষয়ের সর্বোচ্চ পদাধিকারী নিযুক্ত হবে, সে যদি সেই মুসলিম জনগণের উপর কাউকে শুধু খাতির রক্ষার্থে শাসক

১. এ পর্যায়ে একটি কথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য। এক মিশরের বাদশাহ হযরত ইউসূফ (আ)-এর জ্ঞান-গরীমায় মুগ্ধ হয়ে পূর্বেই তাঁকে অতি উচ্চ পদমর্যাদা দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেই প্রেক্ষাপটে হযরত ইউসূফ (আ) দেশের চরম দুর্ভিক্ষাবস্থা লক্ষ করে অপেক্ষাকৃত কম দায়িত্বপূর্ণ এই পদটি গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন—সম্পাদক।

২. نظام الحكم والادارة في الاسلام عن سنن البيهقي ص: ٣٠٢

নিযুক্ত করে, তাহলে তার উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ, আল্লাহ্‌ তার কোন কার্যক্রম বা বিনিময় গ্রহণ করবেন না। শেষ পর্যন্ত তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।[১]

এই কারণেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, মক্কা বিজয় দিবসে নবী করীম (স) মক্কার শাসনকর্তা হিসেবে হযরত ইতাব ইবনে উসাইদ (রা)-কে নিযুক্ত করলেন শুধু তাঁর অধিক যোগ্যতার কারণে। অথচ তিনি ছিলেন যুবক, আর তাঁর সঙ্গে তখন বহু বয়স্ক সাহাবী ছিলেন। নবী করীম (স) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেনঃ

يَا عِتَابَ تَدْرِى عَلَى مَنِ اسْتَعْمَلْتُكَ؟ عَلَى أَهْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَوْ أَعْلَمُ لَهُمْ خَيْرًا مِنْكَ اِسْتَعْمَلْتُهُ عَلَيْهِمْ۔

হে ইতাব! তুমি কি জানো কোন্ সব লোকের উপর তোমাকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছি? জানবে—তারা হচ্ছে সব আল্লাহ্‌ ওয়ালা লোক। তোমার চাইতে অধিক ভালো আর কাউকে মনে করলেও জানবে আমি এদের উপর নিশ্চয় তাকেই নিযুক্ত করতাম।[২]

ইতাব অল্প বয়সের লোক ছিলেন বলে পরে কেউ কেউ তাঁর এই নিয়োগের উপর আপত্তি তুলেছিলেন। তখন নবী করীম (স) মক্কাবাসীদের নামে লিখিত এক ফরমানে বললেনঃ

وَلَا يَحْتَجُّ مُحْتَجٌّ مِنْكُمْ فِى مُخَالَفَتِهٖ بِصِغَرِ سِنِّهٖ فَلَيْسَ الْاَكْبَرُ هُوَ الْاَفْضَلُ بَلِ الْاَفْضَلُ هُوَ الْاَكْبَرُ۔

তোমাদের কেউ যেন ইতাবের অল্প বয়স্কতার কারণ দেখিয়ে তার বিরুদ্ধতা না করে। কেননা বয়সে বড় হলেই সে সর্বোত্তম হয় না, সর্বোত্তম যে, সে-ই বড়।[৩]

৪. সমালোচনার অধিকারঃ বস্তুত নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকারে অনেক বিষয়ই শামিল রয়েছে। তম্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হচ্ছে—শরীয়্যাতের আওতার মধ্যে শাসন কর্মকর্তাদের সমালোচনা করার অধিকার। অবশ্য তা শুধু দোষ বের করার জন্যই হবে না, হবে সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে, নির্ভুল উদ্দেশ্যে। কেননা এইরূপ সমালোচনা দোষ-ত্রুটি দূর করার জন্য বিশেষ সহায়ক। সমালোচনার ফলেই সমাজ-সমষ্টি পূর্ণত্ব লাভ করতে পারে, কর্মকর্তাদের সঠিক লালন

১. حقوق الانسان ص:٧٢

২. اسد الغابة ج:٣ ص:٣٥٨

৩. ناسخ التواريخ حالات النبى صلعم ص: ٣٨٧

প্রশিক্ষণ-ও তার দ্বারাই সম্পন্ন হতে পারে। পক্ষান্তরে সমালোচনার সুযোগ ও ব্যবস্থা না থাকলে ক্রটি-বিচ্যুতি ও জুলুম-অবিচার পাহাড় সমান স্তুপ জমা হয়ে যেতে পারে। আর এরূপ অবস্থায় শেষ পর্যন্ত এমন বিস্ফোরণ সংঘটিত হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে, যার ফলে গোটা শাসন ব্যবস্থাই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে, স্বৈরতান্ত্রিক শাসন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে।

এ পর্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হচ্ছে নবী করীম (স)-এর এই প্রসিদ্ধ হাদীস। ইরশাদ হয়েছেঃ

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَالِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيْمَانِ -

তোমাদের যে-কেউ কোন অন্যায়কে দেখতে পাবে, সে যেন তা নিজ হস্তে পরিবর্তন করে দেয়। তার সামর্থ্য না হলে তার বিরুদ্ধে যেন মুখে প্রতিবাদ জানায়। আর তা করাও সম্ভব না হলে সে যেন অন্তর দিয়ে তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। মনে রেখো, এটাও না হলে অতঃপর তার দিলে এক-বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে বলে মনে করা যায় না।[১]

হযরত উমর (রা) মসজিদে ভাষণ দিচ্ছিলেন। এই সময় মুসলিম বাহিনী একদিকে রোমান শক্তির সাথে এবং অপর দিকে পারসিক শক্তির সাথে প্রচন্ড যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। সমগ্র ইসলামী রাজ্যে জরুরী অবস্থা বিরাজ করছিল। একজন সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেনঃ আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার পরনের জামায় অধিক কাপড় ব্যবহারের কৈফিয়ত না দেবেন, আপনার ভাষণ আমরা শুনব না।

হযরত উমর (রা) ভাষণ বন্ধ করে তার ছেলের প্রাপ্ত কাপড় মিলিয়ে এই জামা তৈরী হয়েছে এ কথা সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করেন। তখন তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, এখন বলুন, আমরা শুনতে প্রস্তুত।

এক কথায় বলা যায়, ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্র পরিচালকদের সমালোচনা করার এত বেশী সুযোগ—বরং সেজন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে—দুনিয়ার অপর কোন ধরনের রাষ্ট্রে তার কোন তুলনা বা দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। শাসকগণ সেসব সমালোচনার যথাযথ জবাব দিতে বাধ্য হতেন, জবাব না দিলে একবিন্দু চলতে দেয়া হতো না। হযরত উমর (রা)-এর খলীফাতুল মুসলিমীন হিসেবে ভাষণ দানকালে—যখন আধুনিক ভাষায় চরম জরুরী অবস্থা সমগ্র দেশে বিরাজিত—তাঁর ভাষণ থামিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত একটা ব্যাপারের যথাযথ জবাব আদায় করে নেয়া এবং সান্ত্বনাদায়ক জবাবের পরই তাঁকে ভাষণ দেবার সুযোগ

১. বুখারী, মুসলিম।

করে দেয়া কোনক্রমেই সামান্য ব্যাপার মনে করা যায় না। এর এক হাজার ভাগের এক ভাগ সমালোচনার সুযোগ কি তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়?

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নেতা বাছাই করার ব্যাপারটিও ইসলামে গণরায়ের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। কোন ব্যক্তিকেই নিজ ইচ্ছামত রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে বসার সুযোগ দেয়া হয়নি এবং রায় জানাবার ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী উভয়ই সমান অধিকার সম্পন্ন।

কুরআন ও সুন্নাতের ব্যাখ্যাদানের ব্যাপারেও প্রত্যেক দ্বীনী ইল্‌ম সম্পন্ন ব্যক্তির পূর্ণ অধিকার আছে, অধিকার রয়েছে একজনের দেয়া ব্যাখ্যার সাথে দ্বিমত পোষণ করার এবং পাল্টা ব্যাখ্যা দানের। অবশ্য তা অকাট্য দলীল ও প্রমাণের ভিত্তিতে হবে—গায়ের জোরে হলে চলবে না। কেননা কুরআন ও সুন্নাতের ইল্‌ম অর্জন করার অধিকার সকলেরই রয়েছে, দলীলের ভিত্তিতে তার একটা ব্যাখ্যা দেয়ার অধিকারও সমানভাবে সকলের—অবশ্য কুরআন ও সুন্নাতের যথার্থ ইল্‌ম যারা অর্জন করেছে তাদের জন্য, যারা তা অর্জন করেনি, তাদের জন্য এই অধিকার থাকতেই পারে না। তেমনি কেউ নিজের দেয়া ব্যাখ্যাকেই একমাত্র ও চূড়ান্ত বলেও দাবি করতে পারে না, কারোর দেয়া ব্যাখ্যার সাথে মতপার্থক্য পোষণ করার অধিকার কেউ হরণও করতে পারে না। এ সম্পর্কে হযরত আলী (রা)-র একটি উক্তি স্মরণীয়। তিনি বলেছেনঃ

مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَاءِ .

> যে লোক কোন বিষয়ে বিভিন্ন প্রকারের মতের সম্মুখীন হলো, সে সেই মতসমূহের মধ্যে কোন্‌টি ভুল তাও সহজেই বুঝতে ও ধরতে পারে।[১]

মূলত নবী করীম (স) নিজেই এই অধিকারকে বাস্তবভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি সকল প্রকারের প্রশ্ন, আপত্তি ও সমালোচনা অত্যন্ত শান্তভাবে ও ধৈর্য সহকারে শুনতেন এবং প্রত্যেকটিরই সংশয় অপনোদনকারী (convincing) জবাব দিতেন।

নবী করীম (স) তাঁর প্রিয় পুত্র ইবরাহীমের রোগক্লিষ্ট ধ্বনি শ্রবণ করে কেঁদে উঠেছিলেন। তখন সাহাবী হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) বললেনঃ 'আপনি না আমাদেরকে শব্দ করে কাঁদতে নিষেধ করেছেন?' তখনই জবাবে তিনি বলেছিলেনঃ হ্যাঁ, তা নিষেধ করেছি বটে; কিন্তু আমি নিষেধ করেছি আহাম্মকের ন্যায় চিৎকার করা থেকে। আরও দুইটি বিকট ধ্বনির ব্যাপারেও

১. صوت العدالة الانسانية ج: ٢، ص: ٤٥٨

আমি নিষেধ করেছি! একটি হচ্ছে, বিপদকালে চিৎকার করা শয়তানের মুখোমুখি হয়ে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আনন্দ উল্লাসে চিৎকার করা।[১]

৫. নাগরিক স্বাধীনতাঃ প্রত্যেকটি নাগরিকের অধিকার আছে যে কোন স্থানে–শহরে, গ্রামে বসবাস গ্রহণ করার, যে-কোন হালাল উপার্জন-পন্থা, পেশা, বিশেষ জীবন ধারা গ্রহণের, প্রাকৃতিক অবদান থেকে কল্যাণ গ্রহণের—অবশ্য শরীয়াতের মধ্য থেকে—অধিকার রয়েছে।

বসবাস গ্রহণের ব্যাপারে ইসলাম প্রত্যেকটি নাগরিককে এই অধিকার দিয়েছে যে, নাগরিক যেখানেই নিরাপদে ও সুবিধাজনকভাবে বসবাস করতে পারবে বলে মনে করবে, সেখানেই সে অবস্থান গ্রহণ করতে পারবে, নিজের জমিতে ঘর-বাড়ি বানাতে পারবে। নবী করীম (স)-এর এই কথাটি স্মরণীয়ঃ

اَلْبِلَادُ بِلَادُ اللّٰهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللّٰه فَحَيْثُ مَااَصَابْتَ خيرا فاقم

দেশ-শহর-নগর-এর মালিক আল্লাহ্। মানুষ সব আল্লাহ্র বান্দা। অতএব তুমি যেখানেই কল্যাণ পাবে বলে মনে করবে, সেখানেই তুমি অবস্থান গ্রহণ কর।[২]

আর যে দেশের অধিবাসীদের উপর জুলুম ও জালিমের সর্বগ্রাসী আধিপত্য স্থাপিত হয়েছে, তাদেরকে লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ্ প্রশ্ন করেছেনঃ

اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُ فِيْهَا (النساء: ٩٧)

আল্লাহ্র যমীন কি বিশাল প্রশস্ত ছিল না?....তোমরা সেই জুলুমের দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র হিজরত করতে পারতে না কি?

প্রত্যেক ব্যক্তির কর্মের—যে-কোন পেশা গ্রহণের স্বাধীনতা রয়েছে, যতক্ষণ না তা শরীয়াত-পরিপন্থী হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের কোন নাগরিককে বিশেষ কোন পেশা গ্রহণ বা বর্জনের জন্য জোর প্রয়োগ করা হয় না, কাউকে সেজন্য বাধ্য করা হয় না। হযরত আলী (রা) তাঁর সময়ের এক শাসনকর্তাকে লিখে পাঠিয়েছিলেনঃ

وَلَسْتُ اَرٰى اَنْ اُجْبِرَ اَحَدًا عَلٰى عَمَلٍ يَكْرَهُهٗ ـ

যে লোক যে কাজ করা পছন্দ করে না, তাকে সেই কাজ করতে বাধ্য করা আমি বৈধ মনে করি না।[৩]

---

১. السيرة الجلبية ٢، ص: ٣٤٨

২. الفصاحة ص: ٢٢٣

৩. صوت العدالة الانسانية ج:١، ص: ١٣٢

তবে যদি কেউ উপার্জনহীন হওয়ার কারণে পরিবারের ব্যয়ভার বহনে ও তাদের প্রয়োজন পূরণে অসমর্থ হয়, তখন তাঁকে নিশ্চয়ই কোন-না-কোন বৈধ উপার্জনে বাধ্য করা হবে।

প্রাকৃতিক সামগ্রী, সম্পদ ও শক্তি উদ্ভাবন, ব্যবহারোপযোগী বানানো এবং তা নিজের দখলে রেখে তা থেকে উপকৃত হওয়া—তা ভোগ ও ব্যবহার করার অধিকার প্রত্যেকটি নাগরিকেরই রয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজের ন্যায় তা বিশেষ ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বা সমাজতান্ত্রিক সমাজের ন্যায় তা মুষ্টিমেয় ক্ষমতাসীনের ও ক্ষমতাসীন দলের লোকদের একচেটিয়া অধিকারের জিনিস নয়। সে অধিকার প্রত্যেকটি নাগরিকের, নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের।

ইসলামী রাষ্ট্রের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যসূচী

[ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বঃ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান—ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকার সংরক্ষণ—সংখ্যালঘুদের অধিকার—আহলি কিতাব লোকদের সাথে শুভ আচরণ—জিযিয়া ।]

ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব ঃ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান

জনগণকে ইসলামী জীবন-বিধান শিক্ষাদান এবং তদানুযায়ী জীবন যাপনের বাস্তব প্রশিক্ষণ দান—জন-জীবনকে পবিত্র পরিশুদ্ধকরণই ছিল নবী-রাসূল আগমনের আসল ও প্রকৃত লক্ষ্য। হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ) যখন কা'বা নির্মাণ করছিলেন, তখন তাঁরা দুইজন একত্রিত হয়ে মহান আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করেছিলেন এই বলেঃ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ - اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ - (البقره: ١٢٩)

হে আমাদের রব্ব, তুমি এই লোকদের মাঝে একজন রাসূল পাঠাও, যে তাদেরকে তোমার আয়াত পাঠ করে শোনাবে, তোমার কিতাব ও হিকমাতের শিক্ষা দান করবে এবং তাদের পবিত্র-পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ করবে। হে আল্লাহ্ তুমিই হচ্ছ মহাশক্তিশালী-বিজয়ী, মহাবিজ্ঞানী।

বস্তুত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান ইসলামী আদর্শে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেননা ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তি চরিত্র গঠনোপযোগী শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ব্যতীত কোন মানুষ মানুষ পদবাচ্য হতে পারে না, সামষ্টিকভাবে কোন উন্নতি-অগ্রগতিও লাভ করতে পারে না।

আল্লাহ্ প্রেরিত নবী-রাসূলগণই এ ব্যাপারে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। জনগণকে আল্লাহ্‌র দ্বীন শিক্ষাদানে এবং তদনুরূপ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করে তোলবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দানের জন্য সেই আদিকাল থেকেই প্রাণ-পণ চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছেন। এ দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে কুরআন মজিদে বলা হয়েছেঃ

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ - (البقره:١٥١)

যেমন করে আমরা তোমাদের মাঝে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদের সম্মুখে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে, তোমাদের পবিত্র পরিশুদ্ধ করে এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হিক্‌মাত শিক্ষাদান করে, আর তোমাদেরকে সেই সব বিষয়েই শিক্ষাদান করে, যা তোমরা জানতে না।

অন্যত্র বলেছেনঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ـ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

(ال عمران: ١٦٤)

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ বড়ই অনুগ্রহ করেছেন মু'মিনদের প্রতি এভাবে যে, তিনি তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র আয়াত তিলাওয়াত করে, তাদের পবিত্র পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাব ও হিকমাতের শিক্ষাদান করে—যদিও পূর্বে তারা সুস্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত ছিল।

এরূপ কথাই বলা হয়েছে এ আয়াতটিতেওঃ

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (الجمعة: ٢)

সেই আল্লাহ্ই তিনি, যিনি উম্মী লোকদের মাঝে তাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে রাসূল তাদের সম্মুখে আল্লাহ্‌রই আয়াত তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ-পবিত্র করে তাদেরকে কিতাব ও হিকমাতের শিক্ষাদান করে, যদিও তারা পূর্বে সবাই চরম গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত ছিল।

লক্ষণীয়, এই সব কয়টি আয়াতই রাসূলের চারটি কাজের তালিকা পেশ করেছে। তা হচ্ছেঃ লোকদের কাছে আল্লাহ্‌র আয়াত তিলাওয়াত করা, তাদের তাজকীয়া করা, তাদের কিতাবের তালিম দেয়া এবং হিকমাতের শিক্ষাদান। কোন আয়াতে শিক্ষাদানের কথাটি তাজকীয়া পবিত্র-পরিশুদ্ধকরণের আগে এসেছে, কোথাও এসেছে পরে। কেননা ব্যাপক অর্থে শিক্ষাদানের পরিণতিই হচ্ছে 'তাজকীয়া'। আর 'তাজকীয়া' শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দ্বারাই লাভ হতে পারে। কিন্তু যেখানে 'তাজকীয়া'-ই অতি উঁচু দরের লক্ষ্য, সেখানে তাজকীয়াকে শিক্ষাদানের পূর্বে স্থাপন করা উচিত।

সে যাই হোক, রাসূলে করীম (স)-এর আগমন যে কয়টি উদ্দেশে, যা তিনি তাঁর জীবদ্দশায় পূর্ণ পরিণত করেছেন, তাই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। ইসলামী রাষ্ট্রকে এই কাজ করতে হবে অত্যন্ত গুরুত্ব ও দায়িত্ববোধ সহকারে।

রাসূলে করীম (স) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে উম্মী সমাজকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, যার ফলে উম্মী অশিক্ষিত বলতে প্রায় কেউ ছিল না বললেও অত্যুক্তি হবে না। কেননা তিনি তো প্রধানত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছিলেন।

তার আরও একটি কারণ এই যে, কুরআন মজীদে ঈমান ও ইলমকে পরস্পর সংশ্লিষ্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমানহীন ইল্‌ম বা ইল্‌মহীন ঈমান প্রাণহীন দেহ বা দেহহীন প্রাণ সমতুল্য। বাস্তবতার দৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণ অর্থহীন। কুরআনের আয়াতঃ

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ (المجادلة: ١١)

আল্লাহ্ উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন সে সবকে, যারা তোমাদের মধ্যে ঈমানদার ও ইল্‌ম প্রাপ্ত লোক।

আয়াতটি থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, ব্যক্তি বা সমাজ উন্নতি-অগ্রগতি লাভ করতে পারে—ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই—ঈমান ও ইল্‌ম উভয়ের সমন্বয় সংঘটিত হলে। শুধু ঈমান দ্বারা উন্নতি লাভ সম্ভব নয়, যেমন আল্লাহ্‌র মর্জী অনুযায়ী অগ্রগতি লাভ সম্ভব নয় ঈমানহীন ইল্‌ম দ্বারা। তাই ইসলামী সমাজে যেমন ঈমান সৃষ্টির চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত ভাবে চলতে হবে, তেমনি সেই সাথে ইলম শিক্ষাদানের জন্যও চলতে হবে।

এই শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যাবে না—এক বিষয়ে শিক্ষা দান করা হবে, আর অপর বিষয়ে শিক্ষাদান করা হবে না—ইসলামী রাষ্ট্রে এ নীতি অচল। বরং সকল জরুরী বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করাই কর্তব্য। শিক্ষার বিষয়বস্তুকে 'ধর্মীয় শিক্ষা' ও 'বৈষয়িক শিক্ষা'—এই দুই ভাগে বিভক্ত করাও ইসলামের শিক্ষানীতির দৃষ্টিতে চলতে পারে না। কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে ও মানদণ্ডে সর্বপ্রকারের জরুরী ও কল্যাণকর জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানই ইসলাম ও মুসলমানের চিরন্তন ঐতিহ্য।

ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বঃ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকার সংরক্ষণ

মানুষের প্রয়োজন স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধিশীল ও বিকাশমান। সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের নিত্য নব প্রয়োজনের দিক উন্মুক্ত হয় এবং সে

প্রয়োজন পরিপূরণের তাকীদ অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দেয়। ব্যক্তিগণের নিবিড় সম্পর্কের পরিণতিই হচ্ছে সমাজ। ব্যক্তির প্রয়োজন বৃদ্ধি পাওয়া ও সম্প্রসারিত হওয়ার অর্থ, সমষ্টির প্রয়োজন বৃদ্ধি পাওয়া ও সম্প্রসারিত হওয়া। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রয়োজন ও সমষ্টির প্রয়োজনের মাঝে দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে উঠা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এ সমস্যার সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান না হলে সুস্থ সমাজ গড়ে উঠতে পারে না।

প্রাচীনকালে এই সমস্যার সমাধান করা হতো শক্তিবলে, অস্ত্রের সাহায্যে। শক্তি ও সৈন্যবলে বলীয়ান ব্যক্তিরাই সমাজের উপর সওয়ার হয়ে বসত এবং জনগণকে তাদের সম্মুখে মাথা নত করতে বাধ্য করা হতো।

কিন্তু মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা লাভের দরুন শক্তি ও অস্ত্র ছাড়াই এ সমস্যার সমাধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করে মানুষের অধিকার সংক্রান্ত জ্ঞানের সাহায্যে তা হওয়া সম্ভব। এই জ্ঞানের সাহায্যেই ব্যক্তি ও সমষ্টির প্রয়োজনের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন একান্তই জরুরী। ব্যক্তিগণের অধিকার সংরক্ষণ এবং তারই পরিণতিতে মানব-সমাজের উন্নয়ন বিধান সংস্কৃতিসম্পন্ন (cultured) সমাজের বৈশিষ্ট্য। এ দুইয়ের মাঝে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের পরিণাম গোটা মানবতার পক্ষেই চরম বিপর্যয়কর হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই কারণে ইসলামী শরীয়াতে ব্যক্তি ও সমষ্টির অধিকার সংক্রান্ত বিদ্যা বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। আর এর ফলেই একমাত্র ইসলামী সমাজে ব্যক্তি ও সমষ্টির স্বার্থ রক্ষা ও প্রয়োজন পূরণের কাজ অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণভাবেই সম্ভব হয়েছে। এ দিক দিয়ে দুনিয়ার অপর কোন সমাজের কোন তুলনাই হতে পারে না ইসলামী সমাজের সাথে।

অধিকার ও প্রয়োজনকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

১. অভ্যন্তরীণ, একই উম্মতের ব্যক্তিগণের পারস্পরিক সাংঘর্ষিক সম্পর্কের সাথে জড়িত।

২. বহ্যিক বা বৈদেশিক, দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক সাংঘর্ষিক সম্পর্কের সাথে জড়িত।

ইসলামের প্রশাসনিক বিধানে প্রথম পর্যায়ের অধিকার ও প্রয়োজন পূরণে যেমন ভারসাম্য স্থাপন করা হয়েছে, তেমনি করা হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্ষেত্রে।

ইসলাম নির্ধারিত অধিকার সংক্রান্ত আইন-বিধান কুরআন ও সুন্নাত থেকে নিঃসৃত। অতএব তাতে কোনরূপ রদ-বদল বা বৃদ্ধি-কমতির অবকাশ নেই।

সংখ্যালঘুদের অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্র যেহেতু আল্লাহ্‌র দেয়া পূর্ণাঙ্গ বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত. এ কারণে নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের অধিকার আল্লাহ্‌র বিধানে পুরাপুরি স্বীকৃত। এ

কারণে ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের অধিকার যতটা উত্তমভাবে আদায় করার ব্যবস্থা রয়েছে, ততটা অন্য কোন ব্যবস্থাধীন সমাজে কোনক্রমেই সম্ভব হতো না। তাদের এ অধিকার মানুষ হিসেবে যেমন, ইসলামের সুবিচার ও ন্যায়নীতিপূর্ণ বিধানের কারণেও তেমনই।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার মানবিক ও সুবিচারের দৃষ্টিতে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষিত হয়েছে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছেঃ

لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ (الممتحنه: ٨)

আল্লাহ্ তোমাদেরকে—হে মুসলিমগণ—নিষেধ করেন না এ কাজ থেকে যে, দ্বীনের ব্যাপার নিয়ে যেসব লোক তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কৃতও করেনি—তাদের সাথে তোমরা কল্যাণময় ও সুবিচারপূর্ণ নীতি অবলম্বন করবে। কেননা সুবিচারকারীদের তো আল্লাহ্ পছন্দ করেন—ভালোবাসেন।

এ আয়াত স্পষ্ট করে বলছে যে, যেসব অমুসলিম মুসলমানদের বিরুদ্ধে দ্বীন-ইসলামের কারণে যুদ্ধ করেনি, মুসলমানদের সাথে শত্রুতা করে তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি ও জায়গা-জমি থেকে বঞ্চিত করেনি, তারা মুসলমানদের নিকট—ইসলামী রাষ্ট্রের বিশেষ মর্যাদা ও অধিকার লাভ করবে। তাদের প্রতি পূর্ণ ইনসাফ করা হবে, তাদের অধিকার পুরাপুরি আদায় করা হবে এবং তাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা হবে। ইসলামী সমাজে তারা পূর্ণ মর্যাদা ও অধিকার সহকারে পরম নিশ্চিন্ততা ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পারবে। সকল প্রকারের মানবিক অধিকার পেয়ে তারা হবে পরম সৌভাগ্যবান।

কিন্তু যেসব অমুসলিম ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে শত্রুতামূলক আচরণ করবে, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণ পরিপন্থী কাজ করবে, তাদের ব্যাপারে কুরআনের ঘোষণা নিম্নরূপঃ

اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ـ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ(الممتحنة: ٩)

তোমাদেরকে সেসব লোককে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে আল্লাহ্ নিষেধ করছেন, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে দ্বীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করেছে ও দাপট

দেখিয়েছে। এ ধরনের লোকদেরকে যারাই বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, তারাই হবে জালিম।

অমুসীলম সংখ্যালঘুদের প্রতি ইসলামের আচরণ-নীতি কি হওয়া উচিত, তা উপরোদ্ধৃত আয়াতদ্বয় থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। এতে সন্দেহ নেই যে, ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা সহকারেই বসবাস করবে। মুসলিম জনগণের কর্তব্য হচ্ছে তাদেরকে সম্পূর্ণ শান্তিতে ও নিরাপত্তায় বসবাস করার সুযোগ দেয়া। তবে তা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা—তাদের সন্তান ও লোকজন—সংখ্যাগুরু মুসলিমদের স্বাধীন অধিকার ও মর্যাদার উপর কোন বিপদ বা অসুবিধা টেনে না আনবে, যতক্ষণ তারা ইসলামের বিরুদ্ধে কোন তৎপরতা না চালাবে, কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করবে। কিন্তু এসব কাজ যদি শুরু করে, যদি ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের সাথে যোগসাজস বা বন্ধুত্ব করে, তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রে তারা উক্তরূপ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। তখন মুসলমানদের জন্য শুধু জায়েযই হবে না—কর্তব্য হবে তাদের বিরুদ্ধে শক্ত ও অনমনীয় হয়ে দাঁড়ানো। তখন আর তাদের প্রতি কোন বন্ধুত্ব বা দুর্বলতা পোষণ করা হবে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে স্বয়ং তাদেরই পদচারণা।

অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের নমনীয়তা এতদূর যে, তাদের ধর্মমতে মদ্যপান ইত্যাদি কাজ সঙ্গত হয়—যা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ—সেই কাজ করার সুযোগ পাবে। তবে প্রকাশ্যভাবে, বিশেষ নগ্নতা সহকারে করার অনুমতি দেয়া হবে না। তা করলে দেশী আইন অর্থাৎ শরীয়াতের আইন অনুযায়ী তাদেরকে দণ্ডিত করা হবে। এছাড়া ব্যভিচার পর্যায়ের অপরাধে তাদেরকেও সেই শাস্তিই দেয়া হবে, যা অনুরূপ অপরাধে মুসলিম নাগরিকদেরও দেয়া হবে।

এরূপ অপরাধের বিচার ইসলামী আদালতের বিচারক হয় ইসলামী শরীয়াতের আইনের ভিত্তিতে করবে, না হয় বিচার করার জন্য তাদের ধর্মমতের ভিত্তিতে বিচারের জন্য সোপর্দ করবে। কুরআনের বিধান হচ্ছেঃ

فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۔ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۔
وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۔ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (المائدة: ٤٢)

ওরা যদি তোমার নিকট আসে (বিচার চায়, মামলা দায়ের করে) তাহলে তুমি হয় ওদের মধ্যে বিচার কার্য সম্পাদন কর, না হয় ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।

ইমাম কুরতুবী আয়াতটির বিস্তারিত ব্যাখ্যায় ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন বসবাসকারী অমুসলিমদের বিভিন্ন ব্যাপারে বিচারকার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন

অবস্থার উল্লেখ করে বিভিন্ন প্রকারের নির্দেশের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেনঃ কাফিররা ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মী না হলে তাদের কোন বিষয়ের বিচার করার কোন দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের উপর বর্তায় না। হ্যাঁ, যদি ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে তা করা যেতে পারে। আর যিম্মীদের মামলা ইসলামী রাষ্ট্রে দায়ের হলে তার বিচার অবশ্যই করা যাবে এবং তা কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী ইনসাফ সহকারে করতে হবে। এ ব্যাপারে ইজমা হয়েছে যে, আহলি কিতাব লোকেরা ইসলামী সরকারে মামলা দায়ের করলে তার বিচার কার্য সম্পাদন করা কর্তব্য, তা প্রত্যাখ্যান করা বা তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা কোন কোন মনীষীর মতে কর্তব্য পালন না করার শামিল।[১]

আহলি কিতাব লোকদের সাথে শুভ আচরণ

ইসলাম আহলি কিতাব লোকদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ গ্রহণের জন্য মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে। তাদের ধর্মমতের কোনরূপ অসম্মান না করতে বলেছে। তারা যাতে করে নিশ্চিন্তে নিজেদের ধর্ম ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করতে পারে, তার ব্যাপারে সহযোগিতা করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتٰبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ (العنكبوت: ٤٦)

তোমরা মুসলমানরা আহলি কিতাব লোকদের সাথে ঝগড়া-ফাসাদ, বাকবিতণ্ডা করো না। যদি কর-ই তবে তা উত্তমভাবে করবে। তবে যারা জালিম, তাদের প্রসঙ্গে এই নির্দেশ নয়। তোমরা বরং বলঃ আমরা ঈমান এনেছি যা আমাদের জন্য নাযিল হয়েছে তার প্রতি, আর যা তোমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে, তার প্রতিও।

কেননা আল্লাহর নিকট থেকে যা কিছুই নাযিল হয়েছে, তা হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ)-র প্রতি নাযিল হোক বা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি নাযিল হোক, তা সবই সত্য, তা সবই এক ও অভিন্ন ইসলাম।

নবী করীম (স) বলেছেনঃ

مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا وَكَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

যে লোক কোন চুক্তিবদ্ধ নাগরিকের উপর জুলুম করবে ও তার সামর্থ্যের

---

১. الجامع لاحكام القران للقرطبي ج ٦، ص ١٨٦

অতিরিক্ত কাজের চাপ দেবে—করতে বাধ্য করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী হয়ে দাঁড়াব।[১]

তিনি আরও বলেছেনঃ

مَنْ اٰذٰى ذِمِّيًّا فَاَنَا خَصْمُهٗ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمُهٗ خَصَمْتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

যে লোক কোন যিম্মীকে জ্বালা-যন্ত্রণা দেবে, আমি তার প্রতিবাদকারী। আর আমি যার প্রতিবাদকারী হব, তার বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আমি তার প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াব।[২]

নবী করীম (স) নাজরান এলাকার প্রধান খৃস্টান পাদরী আবুল হারিস ইবনে আল-কামাতাকে যে চুক্তিপত্র লিখে পাঠিয়েছিলেন, তা নিম্নোক্ত ভাষায় গ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত হয়েছেঃ

بسم الله الرحمن الرحيم ـ من محمد النبى الى الاسقف ابى الحارث واساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم ان لهم ما تحت ايديهم من قليل وكثير من بيعهم وصلوا تهم ورهبانيتهم وجوارالله ورسوله لا يغير اسقف من اسقفيته ولا راهب من رهبا نيته ولا كاهن من كهانته ولا بغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا شئ مما كانوا عليه ما نصحوا وصلحوا فيما عليهم غير مثقلين بظلم ولا ظالمين ـ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে। আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মাদ (স)-এর পক্ষ থেকে নাজরানের প্রধান পাদরী আবুল হারিস, নাজরানের অন্যান্য পাদরী, তাদের পুরোহিত, তাদের অনুসরণকারী ও রাহেবগণের প্রতি এই চুক্তি ..... তাদের জন্যই থাকবে কম-বেশী যা কিছুই তাদের হাতে আছে তা সবই, তাদের উপাসনালয়, মন্দির ও রাহেব কেন্দ্র ও আচরণ। তারা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতিবেশী, কোন পাদরী তার পাদরীত্ব থেকে, কোন রাহেবকে তার বৈরাগ্য থেকে এবং পুরোহিতকে তাদের পৌরহিত্য থেকে বদলানো হবে না, তাদের কোন অধিকার প্রত্যাখ্যান করা হবে না, তাদের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব বদলানো যাবে না, তাদের উপর ধার্য রয়েছে, যে নীতিতে তারা চলছে, তাতেও কোন পরিবর্তণ আনা হবে না—যতক্ষণ তারা কল্যাণ কামনা ও

১. فتوح البلدان للبلاذری ص: ١٦٧

২. روح الدين الاسلامي ص: ٢٧٤

শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখবে, তাদের উপর কোন জুলুম চাপানো হবে না, তাদেরকে জুলুমকারী হতে দেয়া হবে না।[১]

এখানে নবী করীম (স) ঘোষিত এক সুদীর্ঘ চুক্তিনামার বাংলা অনুবাদ দেয়া হলোঃ

পরম অনুগ্রহশীল আল্লাহ্‌র নামে—তাঁরই সাহায্য সহকারেঃ এটা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ্‌র সমস্ত মানুষের সাথে ঘোষিত চুক্তিনামা। মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী রূপে নিযুক্ত। আল্লাহ্‌র আমানতের আমানতদার তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে, যেন জনগণ রাসূল আগমনের পর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কোন যুক্তি পেশ করতে না পারে। আর আল্লাহ্ তো মহা পরাক্রমশালী সুবিজ্ঞানী। মুহাম্মাদ (স) এই চুক্তিনামা লিখেছেন তাঁর সময় মিল্লাতের লোকদের জন্য, পূর্ব ও পশ্চিম এলাকায় বসবাসকারী খৃস্ট ধর্মবিশ্বাসী সমস্ত লোকদের জন্য। তার নিকটবর্তী ও দূরবর্তী, তাদের স্বভাষাভাষী, তাদের কম বাকপটু, তাদের পরিচিত অপরিচিত সব মানুষের জন্য। এই লিখনীটি মূলত তাদের সঙ্গে কৃত এক চুক্তিনামা—ওয়াদাপত্র। এই ওয়াদা যে ভঙ্গ করবে, তার বিরুদ্ধতা করবে, এতে যে আদেশ দেয়া আছে তার বিপরীত কাজ করবে, সে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা-চুক্তি ভঙ্গ করেছে, তাঁর দ্বীনের প্রতি অপমান ও বিদ্রূপ করেছে, এজন্য সে লা'নতে পড়ার যোগ্য হয়েছে, শাসন কর্তৃপক্ষ হোক বা মু'মিন মুসলিমের মধ্য থেকে কেউ হোক। কোন রাহেব বা সাধক পাহাড়ে, উপত্যকায়, গুহায়, সভ্য এলাকায়, প্রস্তরময়, বালুকাময়, কুটিরবাসী, মন্দির যেই হোক-না-কেন, আমি-ই তাদের সকলের পৃষ্ঠপোষকতায় দ্রবীভূত হব, তাদের সংখ্যকের জন্য, আমি নিজে এবং আমার সহায়তাকারী আমার মিল্লাতের ও আমার অনুসরণকারী লোক। ওরা যেন আমার রক্ষণাবেক্ষণ অধীন, আমার দায়িত্বভুক্ত, যুক্তিবদ্ধ লোকেরা খারাজ ইত্যাদির যে বোঝা বহন করে, সেই কষ্টদায়ক অবস্থা তাদের থেকে আমি দূর করব, তবে তারা যা খুশী হয়ে দেবে তাই গ্রহণ করব, তাদের উপর কোন জোর খাটাব না, কোন ব্যাপারেই তাদের উপর জবরদস্তি করা হবে না। কোন পাদরীকে তার পদ থেকে বিচ্যুত করা হবে না, কোন রাহেবকে তার বৈরাগ্য থেকে বিরত করা হবে না, কোন ধ্যানমগ্ন ব্যক্তিকে তার ধর্ম কেন্দ্র থেকে বহিষ্কৃত করা হবে না, কোন বাউলকে তার বাউলী কাজ থেকে ফিরানো হবেনা, তাদের গির্জা, মন্দির, ধর্ম কেন্দ্রকে ধ্বংস করা হবে না, তাদের গির্জা বা ধর্মকেন্দ্রের কোন জিনিস মসজিদ

১. الطبقات الكبرى ج ١ ص ٢٦٦، البداية والنهاية ج ٥ ص ٥٥

الوثائق السياسية ص ١١٥ رقم ٩٥، مكاتيب الرسول ج ٢، ص ٣٢٣

নির্মাণে ব্যবহার করা হবে না, মুসলমানদের ঘর-বাড়ি নির্মাণে ব্যবহার করা হবেনা। যদি তা কেউ করে, তবে সে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতিই ভঙ্গ করল, তার রাসূলের বিরুদ্ধতা করল। রাহেব, পাদরী, পুরোহিত ও অন্যান্য ধরনের উপাসনাকারীদের উপর কোন জিযিয়া বা জরিমানা ধার্য হবে না। তারা যেখানেই বাস করুক, স্থলভাগে বা নদী-সমুদ্রে, পূর্বে বা পশ্চিমে, উত্তরে বা দক্ষিণে—তাদের সকলের দায়িত্ব আমি পালন করব, সংরক্ষণ করব। তারা সকলেই আমার যিম্মায়, আমার চুক্তিতে এবং সকল প্রকার অবাঞ্ছিত অবস্থার মধ্যে পূর্ণ নিরাপত্তায় থাকবে।

অনুরূপভাবে যারা পাহাড়-পর্বতে, অন্যান্য পবিত্র স্থানে ইবাদতে এককভাবে রত হয়ে আছে, তারা চাষাবাদ করলেও তাদের উপর ওশর বা খারাজ ধার্য হবে না। তাদের বিলাসবহুল জীবন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভাগ বসানো হবে না, বরং তারা ফসল পেলে একই পরিমাণ পাত্র ব্যবহারে তাদের সাথে সহযোগিতা করা হবে, যুদ্ধে যেতে তাদের বাধ্য করা হবে না, জিযিয়া বা খারাজ দিতেও বাধ্য করা হবে না। ধনশালী, জমি-জায়গার মালিক ও ব্যবসায়ীদেরকে প্রতি বছর মাত্র বারো দিরহাম দিতে বলা হবে। কারোর উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানো হবে না, তাদের সাথে ঝগড়া বিবাদ করা হবে না, শুধু উত্তম ও যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তাই বলা হবে। তাদের জন্য দয়ার বাহু বিছিয়ে দেয়া হবে, তারা যেখানেই ও যে অবস্থায়ই থাকুক, সব রকমের খারাপ আচরণ থেকে তাদের রক্ষা করা হবে।

মুসলমানদের নিকট কোন খৃস্টান বসবাস করলে সে তা-ই দেবে, যা দিতে সে রাযী হবে। তাকে তার উপাসনালয়ে প্রতিষ্ঠিত রাখা হবে এবং তার ও তার ধর্মীয় নিয়ম-নীতি পালনের মাঝে কোন আড়াল দাঁড়াতে দেয়া হবে না।

যে লোক আল্লাহর এই চুক্তির বিরুদ্ধতা করবে, এর বিরুদ্ধে শক্ত হয়ে দাঁড়াবে, সে আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূলের প্রতিশ্রুতির নাফরমানী করল। তাদের উপাসনালয় মেরামতে তাদের সাহায্য করা হবে, এটা হবে তাদের ধর্ম পালনের ব্যাপারে তাদের প্রতি সাহায্য ও সহযোগিতা। তা করা হবে চুক্তি পরিপূরণ স্বরূপ। তাদেরকে অস্ত্র বহনে বাধ্য করা হবে না, মুসলমানরাই তাদের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করবে। কিয়ামত কায়েম হওয়া ও এই দুনিয়ার নিঃশেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত মুসলমানরা এই চুক্তিকে রক্ষা করবে, এর বিরুদ্ধতা করবে না।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (স) লিখিত এই চুক্তি সমস্ত খৃস্টানদের জন্য এবং এর মধ্যে লিখিত যাবতীয় শর্ত রক্ষার ব্যাপারে সাক্ষী হলেন হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা)।[১]

হযরত মুহাম্মাদ (স) বিরচিত এই সুদীর্ঘ চুক্তিনামায় তিনি খৃস্টানদের জন্য যে কয়েকটি বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা তিন পর্যায়ে বিভক্তঃ

১. ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য ইসলামের দেয়া বিশ্বাসগত পূর্ণ স্বাধীনতা;

২. ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার এসব সংখ্যালঘুদের জন্য আনুকূল্য ও সমর্থনের বিশালতা ব্যাপকতা;

৩. সংখ্যালঘুদের জন্য দ্বীন-ইসলামের দয়া-অনুগ্রহের ব্যাপকতা।

বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন বসবাসকারী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে এসবই হচ্ছে ইসলামের চিরন্তন ও শাশ্বত নীতি। বিশ্বের অপর কোন ধরনের বা আদর্শের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এর কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। যখন-ই এবং যেখানেই ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবে, সেখানেই অমুসলিম সংখ্যালঘুদের এরূপ অবাধ অধিকার দেয়া হবে। রাসূলে করীম (স)-এর পর খুলাফায়ে রাশেদুন এই চুক্তিনামার দায়িত্ব পুরাপুরি পালন করেছেন, ইতিহাস তার অকাট্য প্রমাণ পেশ করে।

খলীফা উমর (রা) একজন বৃদ্ধ ইয়াহুদীকে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করতে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ তোমার এ অবস্থা হলো কেন? সে বললঃ জিযিয়া দেয়ার বাধ্যবাধকতা, প্রয়োজন, অভাব এবং বার্ধক্য। খলীফা তার হাত ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন এবং নিজের নিকট থেকেই তার প্রাথমিক ও তাৎক্ষণিক প্রয়োজন পূরণ করে দিলেন এবং বায়তুলমাল পরিচালককে এই ব্যক্তির অবস্থানুযায়ী প্রয়োজন পূরণ পরিমাণ মাসিক ভাতা নির্ধারণের নির্দেশ দিলেন। বললেনঃ

لَيْسَ مِنَ النِّصْفَةِ اَنْ نَسْتَعْمِلَهُ فِى شَبَابِهِ وَنَتْرُكَهُ فِى كِبَرِهِ .

এই লোকটির যৌবনকাল তো সমাজের কাজে অতিবাহিত হয়েছে, আর এখন এই বৃদ্ধকালে তাকে অসহায় করে ছেড়ে দেব, এটা কখনই ইনসাফ হতে পারে না।[২]

চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা) এক বৃদ্ধ খৃস্টানকে লোকদের নিকট ভিক্ষা চাইতে দেখে বললেনঃ

---

১. مجموعة الوثائق السياسية ص ٣٧٢، رسالة صورة العهد النبوية الطورية رقم ٨١٤

مكاتيب الرسول ج ٢ ص ٦١٣

২. [illegible] الاسلام

اِسْتَعْمَلْتُمُوْهُ حَتّٰى اِذَا كَبِرَ وَ عَجِزَ مَنَعْتُمُوْهُ اَنْفِقُوْا عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ـ

তোমরা এই লোকটিকে কাজে লাগিয়েছ, এখন সে বৃদ্ধ ও অক্ষম, আর এখন তোমরা তাকে রোজগার থেকে বঞ্চিত করেছ। এটা হতে পারে না। তোমরা বায়তুলমাল থেকে তার প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা কর।[১]

ইসলাম শুধু জীবিত মানুষের জন্যই সম্মানজনক ব্যবস্থা করেনি, মৃত মানুষ—অমুসলিমের—প্রতিও সম্মান প্রদর্শনের নীতি গ্রহণ করেছে। একটি 'জানাযা' (লাশ) বহন করে নিয়ে যেতে দেখে নবী করীম (স) দাঁড়ালেন। বলা হলো, ইয়া রাসূল! এ তো এক ইয়াহুদীর জানাযা। তিনি বললেনঃ কেন, ইয়াহুদী কি মানুষ নয়? তিনি বললেনঃ

اِذَا رَاَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا ـ

তোমরা যে কোন জানাযা বহন করে নিয়ে যেতে দেখলে অবশ্যই দাঁড়াবে।[২]

অমুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রতি ইসলামের এই উদার মানবিক আচরণ দেখেই তো তদানীন্তন দুনিয়ার অমুসলিম জনতা ইসলামী দেশজয়ীদেরকে সাদর সম্বর্ধনা জানিয়েছে দেশে দেশে। তারা তাদের স্বধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জন্য তাদের নগরীর ফটক খুলে দিয়েছে। হযরত আবূ উবায়দাতা ইবনুল জার্‌রাহ (রা)-র নেতৃত্বে ইসলামী মুজাহিদগণ যখন জর্দান এলাকায় উপনীত হলেন, তখন জর্দানের খৃস্টানগণ তাকে এক পত্র লিখে জানালঃ

اَنْتُمْ اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ اَحَبُّ اِلَيْنَا مِنَ الرُّوْمِ وَاِنْ كَانُوْا مَعَنَا عَلٰى دِيْنٍ وَّاحِدٍ لٰكِنَّكُمْ اَوْفٰى لَنَا وَاَرْءَفُ وَاَعْدَلُ وَاَبَرُّ، اِنَّهُمْ حَكَمُوْنَا وَسَلَبُوْا مِنَّا بُيُوْتَنَا وَاَمْوَالَنَا ـ

হে মুসলিম বাহিনী! তোমরা আমাদের নিকট রোমানদের তুলনায় অনেক বেশী প্রিয়, পছন্দনীয়, যদিও ওরা ও আমরা একই ধর্মে বিশ্বাসী ও পালনকারী। কিন্তু তোমরা আমাদের জন্য অধিক ওয়দা পূরণকারী, অধিক দয়াশীল, অধিক ন্যায় বিচারকারী এবং অধিক পূণ্যশীল। আর ওরা আমাদের উপর শাসন চালিয়েছে, সেই সময় আমাদের ঘর-বাড়ি, ধন-মাল সব লুটে নিয়েছে।[৩]

ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের প্রতি ইসলামের এই উদার মানবিক নীতি কার্যকর হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছেঃ

---

১. الحكومة الاسلامية ص٢٠١

২. বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৫।

৩ টমাস আর্নল্ডঃ 'ইসলামের দাওয়াত' গ্রন্থ, পৃঃ ৫৩।

প্রথম, শান্তি নিরাপত্তা বিনষ্টকারী কোন কাজ-ই তারা করবে না, যেমন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, মুসলমানদের শত্রু মুশরিকদের সাহায্য-সহযোগিতা করা—মুসলমানদের স্বার্থের বিরুদ্ধে মুসলমানদের কল্যাণ পরিপন্থী কার্যক্রম গ্রহণ করা।

দ্বিতীয়, ইসলামী রাষ্ট্র সরকার তাদের দেয় হিসেবে যা ধার্য করবে, তা দিতে এবং পালন করার জন্য যেসব আদেশ-নিষেধ জারি করবে, তা পালন করতে বাধ্য থাকবে। এবং

তৃতীয়, জিযিয়া দিতে বাধ্য ও রাযী হওয়া।

এসব শর্ত পূরণ যিম্মী হওয়ার—ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে তাদের দায়িত্ব গ্রহণের ভিত্তিরূপে পরিগণিত। এ ছাড়াও চুক্তি হিসেবে যেসব শর্ত গ্রহণ করা হবে, তা-ও অবশ্যই পালন করতে হবে।[১]

ধর্মীয় সংখ্যালঘু ইসলামী রাষ্ট্রে পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে জীবন যাপন করবে। তারা সেই সব অধিকার পাবে, যা পাবে মুসলিম নাগরিকগণ। তাদের উপর সেই সব দায়িত্ব কর্তব্য চাপবে যা চাপবে মুসলমান নাগরিকদের উপর। তা সামষ্টিক অধিকার যেমন, তেমনি অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও বৈদেশিক সাহায্য সহযোগিতা—এই সব দিক দিয়েই। ইসলামী রাষ্ট্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তাতে শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্র বিপুলভাবে বিস্তারিত ও সম্প্রসারিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য, তাদের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তাদের জান-মাল ও ইযযত-আবরুর পূর্ণ সংরক্ষণ হয়, তাদের প্রতি অকারণ কোন সন্দেহ বা শত্রুতা পোষণ করা হয় না। অবশ্য তা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে সন্ধি-চুক্তির শর্তাবলী পালন করতে থাকবে।

এরূপ অবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মীদের এই অধিকার দেয়া হবে যে, তাদের ধর্মীয় ব্যাপারাদি পরিচালনের জন্য তারা চাইলে তাদের লোকদেরই সমন্বয়ে একটি স্বাধীন বোর্ড গঠন করা যাবে। তাদের মন্দির, গির্জা বা মঠ ইত্যাদি উপাসনালয়ের ব্যবস্থাপনাও তারা স্বাধীনভাবে করবার অধিকারী হবে। তাদের বাচ্চাদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা স্বতন্ত্রভাবেও করা যেতে পারে। বিশেষভাবে তাদের বিষয় ব্যাপারাদির মীমাংসার কাজ তাদের লোকদের দ্বারা গঠিত বিচার-ব্যবস্থার মাধ্যমে আঞ্জাম দিতে পারবে। আর ইচ্ছা হলে দেশীয় আদালতেও তা নিয়ে আসতে পারবে। স্থানীয় মুসলিম নাগরিকদের সাথে কোন

---

১. جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام ج٢١ ص:٢٧١

ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হলে তারা সেই বিষয়ে মীমাংসা বা সুবিচার পাওয়ার লক্ষ্যে দেশীয় কোর্টে মামলাও দায়ের করতে পারবে।

অমুসলিম যিম্মী মুসলিম শাসক বা প্রশাসক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ন্যায্য অভিযোগও দায়ের করতে পারবে। শালীনতা ও আইনসিদ্ধতা সহকারে তারা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা ও সরকারী নীতি কার্যক্রমের সমালোচনাও করবার অধিকারী হবে।

খৃস্টান ঐতিহাসিক রবার্টসন লিখেছেনঃ

দুনিয়ায় মুসলমানগণ এমন এক জাতি, যারা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর প্রতি জিহাদ ও ক্ষমা—উভয়কে সমন্বিত করেছে। মুসলমানরা তাদের উপর বিজয়ী হয়েও এবং কর্তৃত্ব লাভ করবার পরও তাদেরকে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি স্বাধীনভাবে পালন করার অবাধ ও নির্বিঘ্ন সুযোগ করে দিয়েছেন।[১]

জিযিয়া

সকলেরই জানা কথা, ইসলাম আহলি কিতাব লোকদের উপর বিজয় লাভ করে তাদের উপর জিযিয়া ধার্য করে। কিন্তু জিযিয়া ধার্য হওয়া তাদের জন্য কোন অপমানের ব্যাপার নয়। এটা একটা বিশেষ 'কর', যা কেবল অমুসলিম নাগরিকদের নিকট থেকে আদায় করা হয়, ঠিক যেমন মুসলিম নাগরিকদের নিকট থেকে আদায় করা হয় যাকাত, এক-পঞ্চমাংশ ও অন্যান্য বহু প্রকারের সাদকা। আর এই কারণেই অক্ষম, পুঙ্গ, বৃদ্ধ, পাগল, বালক নারীদের থেকে তা নেয়া হয় না। কেননা জিযিয়া ব্যক্তির আয় অনুপাতে ধার্য হয়ে থাকে।

অবশ্য রাষ্ট্র-সরকার ইচ্ছা করলে জিযিয়া জমির পরিবর্তে মাথাপিছু কিংবা মাথাপিছুর পরিবর্তে জমির উপর-ও ধার্য করতে পারে। এই সময় পাশাপাশি বসবাসকারী মুসলমানদের নিকট থেকেও তো অনেক প্রকারের কর আদায় করা হয়। অমুসলিমদের নিকট থেকে জিযিয়া ভিন্ন অন্য কিছু আদায় করা হয় না। উপরন্তু তা ব্যক্তির সাধ্যের বেশী কখনই ধার্য করা হয় না। এজন্য ইসলামে কোন পরিমাণ স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট নেই।

আল্লামা সাইয়্যেদ রশীদ রেজা লিখেছেনঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে জিযিয়া সেই ধরনের কোন কর নয়, যা কোন দেশের বিজয়ী বাহিনী বিজিতদের উপর সাধারণভাবে ধার্য করে থাকে, ধার্য করে থাকে বড় পরিমাণের জরিমানা, যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতির পরিপূরণার্থে। জিযিয়া

১. روح الدين الاسلامى ص٤١١

মূলত খুবই সামান্য পরিমাণে ধার্য করা হয় এবং তদ্দারা সেই প্রয়োজন পূরণ করা হয়, যা তাদের বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালনে সরকারকে ব্যয় করতে হয়।[১]

বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্র এর বিনিময়ে অমুসলিমদের রক্ষণাবেক্ষণের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে। আর এর-ই ফলে যে-কোন অমুসলিম নাগরিক পূর্ণ স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা সহকারে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করতে পারে, বাঁচাতে পারে তাদের মান-সম্মান ও ধন-মাল।

যে দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সাথে অমুসলিমরা আবহমান কাল থেকে বসবাস করে আসে, তথায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর-ও সে সব অমুসলিম সেই দেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করবে না—বরং অমুসলিম হয়েও ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিক হয়ে বসবাস করতে প্রস্তুত হবে, তারা সরকারের নিকট থেকে সর্ব প্রকারের ব্যাপারে পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে, সরকার তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আর এ জন্য তাদের নিকট থেকে একটা বিশেষ 'কর' আদায় করার অধিকারী হবে। তবে তার নাম 'জিযিয়া'ই হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। —গ্রন্থকার

১. تفسير المنار ج ١١، ص ٢٨٢

ইসলামী রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গুরুত্ব

[মানব জীবনে অর্থ-সম্পদের গুরুত্ব—অর্থনৈতিক ব্যাপারাদি গুরুত্বপূর্ণ, তবে সকল ব্যাপারে আবর্তনবিন্দু নয়—অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও তার বিকাশ সাধনের উদ্বোধন—জমি আবাদকরণের নির্দেশ।]

মানব জীবনে অর্থ-সম্পদের গুরুত্ব

মানব জীবনে অর্থ-সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থনৈতিক ব্যাপারাদি মানুষের নিকট অত্যন্ত আবেগপূর্ণও বটে। কেননা মানব জীবনের চাকা তারই উপর আবর্তিত হয়। এ জন্য ইসলামও তার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেছে। ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে পারস্পরিক অর্থনৈতিক লেন-দেনের বিস্তারিত বিধানের খুটিনাটি অত্যন্ত বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে এই করাণেই। এ থেকে এ কথাও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, দ্বীন ইসলাম দুনিয়ার অপরাপর ধর্মের ন্যায় কতগুলি হিতোপদেশ ও আরাধনা-উপাসনার ধর্ম নয়। বরং ইসলাম হচ্ছে মানব জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণকারী ও সমস্যার সমাধানকারী এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান।

ইসলাম নির্দেশিত জীবন-বিধানের কার্যাবলী প্রধানত ও মূলত পরকালে আল্লাহ্‌র নিকট সুফল পাওয়ার লক্ষ্যে সুসম্পন্ন করা হয়। আর সেজন্য দৈহিক শক্তি ও সুস্থতা একান্তই জরুরী। আর দৈহিক সুস্থতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে অর্থনৈতিক প্রয়োজনাবলী যথাযথ পূরণ হওয়ার উপর। রাসূলে করীম (স) প্রায় সময়ই আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করতেন এই বলেঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى الْخُبْزِ وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَلَوْلَا الْخُبْزُ مَا صَلَّيْنَا وَ لَا صُمْنَا وَلَا اَدَّيْنَا فَرَائِضَ رَبَّنَا .

হে আমাদের আল্লাহ্‌, তুমি আমাদের খাদ্যে বরকত দাও। আর আমাদের ও আমাদের খাদ্যের মাঝে তুমি কোন ব্যবধান সৃষ্টি করো না। কেননা যথারীতি খাদ্য না পেলে আমরা নামায-রোযা করতে পারব না, আমাদের মহান রব্ব নির্দেশিত কর্তব্য সমূহ পালন করাও আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না।[১]

শুধু তা-ই নয়, রাসূলে করীম (স) এতদূর বলেছেনঃ

---

১. الحكومة الاسلامية ص ٣٠٥

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا

দারিদ্র্য মানুষকে কাফির বানিয়ে দিতে পারে।

এ সত্যও আমাদের সম্মুখে রাখতে হবে যে, মানুষ রূহ ও দেহের সমন্বয়। আর এই দুইটি দিকের মধ্যে মৌলিক দূরত্বও অনেক বেশী ও গভীর। এই কারণে ইসলাম এমন এক ব্যবস্থা চালু করেছে, যার ফলে রূহ্ ও দেহের মধ্যকার দূরত্ব দূর করে উভয়কে সংযুক্ত করে রাখা সহজ ও সম্ভব হয়। কেননা দেহ ও রূহের মধ্যে সম্পর্ক অটুট না রাখা হলেও জীবনটাই শেষ হয়ে যাওয়া অবধারিত।

কিন্তু তা শুধু ধন-সম্পদ দ্বারাই সম্ভব হতে পারে না। কেননা অর্থনৈতিক দৈন্য ও দারিদ্র্য রক্তের শূন্যতা বিশেষ। আর রক্তশূন্যতা দেহের পক্ষে মৃত্যুর আহ্বায়ক। অর্থ-সম্পদ মানুষের জন্য সেই কাজ করে, যা রক্ত করে মানুষের গোটা দেহে। রক্তই মানুষের জীবন ও স্থিতির নিয়ামক। রক্তে স্বল্পতা দেখা দিলে মানুষের দেহ নানা দুরারোগ্য রোগের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে অর্থ-সম্পদ না থাকলে মানুষের জীবন অচল হয়ে যায় অনিবার্যভাবে। তা যেমন ব্যক্তিজীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে, তেমনি করে সামষ্টিক জীবনেও। এই কারণে মানুষের আর্থিক প্রয়োজন প্রকট হয়ে দেখা দেয় তার জন্মমুহূর্ত থেকেই। অর্থ-সম্পদহীন ব্যক্তির যেমন কোন শক্তি বা মান-মর্যাদা থাকে না, তেমনি দরিদ্র জাতিও বিশ্ব জাতিসমূহের দরবারে সমস্ত ইয্যত-সম্মান ও সম্ভ্রম থেকে বঞ্চিত হয় অনিবার্যভাবে।

দুনিয়ার জাতিসমূহের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠে ও স্থিতি লাভ করে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে। সরকারসমূহের পরস্পরের যোগাযোগ ও সম্পর্ক সম্বন্ধ ও অর্থনৈতিক ভিত্তি ছাড়া গড়ে উঠতে ও গভীর হতে পারে না।

অর্থনৈতিক ব্যাপারাদি গুরুত্বপূর্ণ, তবে সকল ব্যাপারের আবর্তনবিন্দু নয়

তবে এ ব্যাপারে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার সাথে ইসলামের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এ দুটি ব্যবস্থায় অর্থনীতিই মূল ও আবর্তন-কিলক (Pivot)। আর ইসলামে তা মানব জীবনের অন্যান্য বহু গুরুত্বপূর্ণ দিকের ন্যায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—সন্দেহ নেই।

কুরআন মজীদে মানুষের একান্তভাবে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিয়োজিত সালাত (নামায)-এর সঙ্গেই যাকাতের উল্লেখ ও পালনের আদেশ উদ্ধৃত হয়েছে। বলা হয়েছেঃ

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

তোমরা সকলে সালাত কায়েম কর ও যাকাতের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত কর।

নামায ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক নিগূঢ়করণের একটি ব্যক্তিগত ইবাদত—যা অবশ্য জামা'আতের সাথে-ই আদায় করতে হয়। আর যাকাত ইবাদত হলেও একটি অর্থনৈতিক ব্যাপার! কুরআন মজীদে এরূপ এক সাথে দু'টি কাজের নির্দেশ প্রায় ৩২টি আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে। একটি নিছক ইবাদতের কাজের সাথে মিলিয়ে একটি অর্থনৈতিক ইবাদত ব্যবস্থার উল্লেখ করায় একথা স্পষ্ট হয় যে, ইসলামের 'রূহ্' ও 'বস্তু'—ইহ্‌কাল ও পরকাল উভয়ের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কেননা মূলত এ দুটিই ওতপ্রোত, অবিচ্ছিন্ন। একটি অপরটির পরিণতি।

ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান, মানব সমাজের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের এক অমোঘ ব্যবস্থা। তাই তার একটা অর্থ ব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য। তা না-থাকার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আছে বলেই ইসলাম মানুষের উপযোগী ভারসাম্যপূর্ণ জীবন-বিধান হতে পেরেছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও তার বিকাশ বিধানের উদ্বোধন

কুরআন মজীদ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাধনের বিশেষ আহবান জানিয়েছে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি খাতে বিপুল উৎপাদনের জন্য স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, যার ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি লাভ সম্ভব।

জমি আবাদকরণের নির্দেশ

আল্লাহ্ তা'আলা জমিকে প্রধান জীবিকা-উৎস বানিয়েছেন। মানুষের প্রায় সব প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'আলা এই জমি ও জমির ফসল থেকেই করেছেন। এজন্য জমিকে ভালোভাবে আবাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছেঃ

هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا (هود: ٦١)

সেই মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে জমি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতেই তোমাদেরকে আবাদ করেছেন।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে মাটির মৌল উপাদান থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই জমির আবাদকরণের দায়িত্ব তিনি তোমাদের উপর অর্পণ করেছেন, তোমাদেরকে জমির আবাদকারী বানিয়েছেন। জমি আবাদ করার ক্ষমতা তোমাদেরকে তিনি দিয়ছেন। আর জমি আবাদ করার অর্থ, তাতে নিজেদের

উপযোগী বাসস্থান বানানো, জমিকে বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং সেই জমি থেক নিজেদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় ফল-ফসল-সামগ্রী আহরণ ও চাষের মাধ্যমে উৎপাদন করার জন্য তোমাদেরকেই দায়িত্বশীল বানিয়েছেন।[১]

যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا

(الاعراف: ٧٤)

তোমরা পৃথিবীর সমতল ভূমির উপর সু-উচ্চ প্রসাদসমূহ নির্মাণ করছ ও তার পর্বতগাত্র খুঁড়ে ঘর-বাড়ি বানাচ্ছ।

ইরশাদ হয়েছেঃ

هُوَالَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِيْ مَنَا كِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ـ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (الملك: ١٥)

সেই মহান আল্লাহ্ যমীনকে তোমাদের জন্য নরম-সমতল-অনুগত বানিয়ে দিয়েছেন। অতএব তোমরা সেই যমীনের সর্বদিকে ও পরতে-পরতে পৌঁছতে চেষ্টা কর আর সেখান থেকে পাওয়া আল্লাহ্র রিযিক তোমরা বক্ষণ কর। আর শেষ পর্যন্ত তো তাঁর দিকেই উত্থান হবে।

উৎপাদনের প্রধান উৎস যমীন চাষাবাদ ও খোদাই করে ফসল ও সম্পদ উৎপাদনের এই নির্দেশ সকলেরই জন্য। কুরআন মানুষকে অলস-নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকতে নিষেধ করেছে এবং সব সময়ই উৎপাদনমুখী কাজে ব্যস্ত থাকতে বলেছে, তা ব্যবসায় হোক, চাষাবাদ হোক, শিল্প হোক কিংবা এই ধরনের অন্যান্য কাজ, যা থেকে মানুষের বিভিন্নমুখী প্রয়োজন পূরণ হতে পারে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি লাভের মাধ্যমে মানুষের জীবনে সাচ্ছন্দ্য আনা যেতে পারে। এ পর্যায়ের কয়েকটি হাদীসের উদ্ধৃত দেয়া যাচ্ছে।

রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

الْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءً أَفْضَلُهَا طَلَبُ الْحَلَالِ ـ

ইবাদতের সত্তরটি অংশ রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে হালাল রিযিক সন্ধান।[২]

অর্থাৎ হালাল রিযিক সন্ধানও একটি ইবাদত।

---

১. قنير فى سن التاويل ج:٩ ص:٣٤٦١

২. الحكومية الاسلامية ص:٥٣٥

اِتَّجِرُوا بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمْ ـ

তোমরা ব্যবসা কর, আল্লাহ্ তোমাদের প্রবৃদ্ধি দেবেন।

রাসূলে করীম (স) তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে সায়াদুল-আনসারী নামক সাহাবী (রা) তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেন। রাসূল (স) তার সাথে 'মুসাফাহা' করলেন। তখন বললেনঃ তোমার হাত এত শক্ত ও অমসৃণ কেন?

বললেনঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো এই হাতে হাতুড়ি পিটাই। তাতে যা রোজগার হয়, তা-দিয়েই আমার পরিবারের প্রয়োজন পূরণ করি।'

তখন নবী করীম (স) তাঁর হাতে চুম্বন দিলেন এবং বললেনঃ

هٰذِهٖ يَدٌلاَ تَمَسُّهَا النَّارُ ـ

এই হাত কখনই আগুনে পুড়বে না।

বলেছেনঃ

طَلَبُ الْحَلاَلِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّمُسْلِمَةٍ

হালাল রুজির সন্ধান করা প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য ফরয।

রাসূলে করীম (স) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা) নিজ হাতে শ্রম করেছেন ও হালাল রুজি উপার্জন করেছেন। তা করা সব নবী ও রাসূলের সুন্নাত।

অতএব ইসলামী রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককে হালাল রুজি উপার্জনের জন্য অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। যে যা উপার্জন করবে, তা দিয়ে প্রথমে নিজের ও নিজ পরিবারবর্গের প্রয়োজন পূরণ করবে। তার উপার্জনে দারিদ্র্য নিকটাত্মীয় ও পাড়া-প্রতিবেশীদেরও হক রয়েছে বলে তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এভাবে প্রত্যেক কর্মক্ষম ব্যক্তি যাতে হালাল উপার্জনে রত হয় এবং নিষ্কর্মা হয়ে বসে না থাকে, তা দেখা ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের কর্তব্য।

লোকদের উপার্জিত ধন-সম্পদ যাতে বিভিন্ন ধনী ব্যক্তিদের পকেটে চলে গিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য অর্থনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করতে না পারে, কোন হারাম কাজে কেউ লিপ্ত না হয়—হালাল উপার্জনের সুযোগ পায় তা দেখাও ইসলামী রাষ্ট্র-সরকারের দায়িত্ব। ইসলামী রাষ্ট্র জনগণকে বেহুদা ব্যয় ও অপচয় থেকে বিরত রাখতে ও প্রত্যেক নাগরিক যেন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সুবিচার পেতে পারে, ধন-সম্পদের সাধারণ বন্টন কার্যকর হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।

তবে মনে রাখতে হবে, ইসলামের দৃষ্টিতে উপার্জন জীবিকার একটা গুরুত্বপূর্ণ উপায় বটে; কিন্তু তা চরম লক্ষ্য নয়। এ কথাই বলিষ্ঠ ভাষায় বলা হয়েছে কুরআন মজীদের এ আয়াতটিতেঃ

وَابْتَغِ فِيمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ـ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

(القصص: ٧٧)

আল্লাহ্ তোমাকে যে ধন-মাল দিয়েছেন, তার মাধ্যমে তুমি পরকাল লাভ করতে চাইবে, তবে দুনিয়ায় তোমার যে অংশ রয়েছে, তা পেতে ভুল করবে না। আর আল্লাহ্ যেমন তোমার প্রতি দয়া করেছেন তুমিও তেমনিভাবে লোকদের প্রতি দয়া দেখাবে। তুমি দুনিয়ায় বিপর্যয় হোক, তা কখনই চাইবে না। কেননা আল্লাহ্ ফাসাদকারীদের মোটেই পছন্দ করেন না, ভালোবাসেন না।

অর্থাৎ দুনিয়ায় রুজি-রোজগারে আসল লক্ষ্য হতে হবে পরকালীন মুক্তি লাভ, কেবলমাত্র বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন নয়। আর দুনিয়ায় প্রাপ্তব্য অংশ প্রত্যেকের জন্য রয়েছে। তা ভুলে গিয়ে বৈরাগ্য গ্রহণ কখনই উচিত হতে পারে না।

মানুষ যেন কখনই এ কথা ভুলে না যায় যে, সে যা কিছুই লাভ করেছে তা একমাত্র আল্লাহ্র অনুগ্রহের কারণে। অতএব তার-ও উচিত অন্যান্য মানুষের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ করা। অন্যথায় দুনিয়ায় সর্বগ্রাসী বিপর্যয় সংঘটিতে হবে।

বস্তুত ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে মানুষ অতীব উঁচু মর্যাদার সৃষ্টি। সে 'আশরাফুল মাখলুকাত' নামে পরিচিত। দুনিয়ায় শুধু উৎপাদন (production) বৃদ্ধি ও ভোগ-ব্যয়-ব্যবহার (consumption) করার উদ্দেশ্যেই তাকে সৃষ্টি করা হয়নি। কাজেই তাকে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলে চব্বিশ ঘন্টা বন্দী করে রাখা যেতে পারে না। ধনশালী ও ধন-লোভীদের হাতে উৎপাদনের একটা নিষ্প্রাণ যন্ত্র হয়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। কাজেই তাদের কামনা-বাসনা ও ইচ্ছামত মানুষকে ব্যবহার করার কোন অধিকারই তাদের দেয়া যেতে পারে না। হযরত আলী (রা)-র একথাটি স্মরণ করা যেতে পারে। বলেছিলেনঃ

لَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللّٰهُ حُرًّا ـ

তুমি অন্য কারোর দাসানুদাস হবে না। আল্লাহ্ তো তোমাকে মুক্ত ও স্বাধীন বানিয়েছেন।[১]

---

১. نهج البلاغة قسم الكتب الرقم ٣١

কিন্তু মানুষকে যখন অর্থনীতির চাকায় জুড়ে দেয়া হয়, উৎপাদন ও ভোগ সম্ভোগই হয় তাদের একমাত্র কাজ, তখন সে নিকৃষ্ট দাসেই পরিণত হয় না, সে হয় অর্থনৈতিক জীব মাত্র। জন্তু-জানোয়ার দিন-রাত যে সব কাজ করে, মানুষকে কি সেই সব কাজ করার জন্যই দুনিয়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে?

কিন্তু বর্তমান দুনিয়ার বেশীর ভাগ রাষ্ট্রে—তা হয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, না হয় সমাজতান্ত্রিক—মানুষকে নিষ্প্রাণ যন্ত্রাংশ কিংবা জন্তু-জানোয়ারে পরিণত করা হয়েছে। আর ধন-লোভী ব্যক্তি, কোম্পানী বা রাষ্ট্র মানুষকে নির্মম পরিশ্রমের যাঁতাকলে বেঁধে দিয়ে শুধু উৎপাদনই করাচ্ছে, শুধু উৎপাদন ছাড়া এ দুনিয়ায় মানুষের যেন আর কোন কাজই নেই।

ইসলাম মানুষকে নিছক একটা উৎপাদন-মাধ্যম বা উৎপাদন যন্ত্র হতে দিতে প্রস্তুত নয়। ইসলাম মানুষের নিম্নতম প্রয়োজন পূরণের নিশ্চিন্ততা ও নিরাপত্তা দেয় মানুষের উচ্চতর মর্যাদা ও মহান মানীয় দায়িত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে। অতএব ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থ-সম্পদ লক্ষ্য নয়, শুধু উপায় (Means) মাত্র। এই মূল দর্শনকে রক্ষা করে ইসলামী রাষ্ট্র মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকবে।

ইসলামী রাষ্ট্রে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা

দৈহিক সুস্থতার প্রতি ইসলামের গুরুত্বারোপ—কুরআনের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষা—স্বাস্থ্য রক্ষা পর্যায়ে ইসলামী হুকুমতের দায়িত্ব।

দৈহিক সুস্থতার প্রতি ইসলামের গুরুত্বারোপ

ইসলাম নিছক কোন ধর্ম নয়, পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা। তাই ইসলাম মানুষের শুধু পরকাল সম্পর্কেই চিন্তা-ভাবনা করেনি, তার ইহকালীন কল্যাণও ইসলামের কাম্য। কুরআন এজন্যই মানুষকে এই দোয়া করার আহ্বান জানিয়েছেঃ

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً (البقر: ٢٠١)

হে আমাদের পরোয়ারদিগার, তুমি আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান কর, কল্যাণ দান কর পরকালেও।

এই কারণে ইসলাম মানুষের শুধু আত্মা বা রূহ্-এর উপরই গুরুত্বারোপ করেনি, মানুষের দেহের উপরও যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইসলাম চায় মানুষের দেহ সর্বতোভাবে সুস্থ থাক, যেমন কামনা করে তার 'রূহ্' বা আত্মার সুস্থতা। তাই মানবিক শক্তি-সামর্থের সাথে সাথে দৈহিক শক্তির সুস্থতার উল্লেখ করা হয়েছে একটি সমাজের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের গুণাবলীর তালিকায়। বলা হয়েছেঃ

بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ -

জ্ঞান ও দেহ উভয়ের প্রশস্ততাই তার থাকতে হবে।

অনুরূপভাবে শ্রমিক হওয়ার যোগ্যতার ক্ষেত্রেও দৈহিক শক্তির প্রয়োজনীয় উল্লেখ হয়েছে এ আয়াতেঃ

اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ (القصص: ٢٦)

তোমার উত্তম শ্রমিক হতে পারে দৈহিক শক্তিসম্পন্ন ও নৈতিক বিশ্বস্ততার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি।

বস্তুত অসুস্থ ব্যক্তি জীবনের কোন দায়িত্বই পালন করতে পারে না। অঙ্গহীন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয় না পূর্ণাঙ্গ মানুষের ন্যায় কাজ করা। সুস্থ ও পূর্ণ দেহসম্পন্ন মানুষ সুস্থ মানব-সমাজের ভারসাম্যপূর্ণ অংশ ও অঙ্গ হতে পারে। কেননা মানবসত্তা রূহ্ ও দেহের সমন্বয়। একটি অপরটির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয় প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী। এ কারণেই কুরআন পূর্ণ-দেহ, সুস্থ দেহ ও দৈহিক

শক্তির যথাযথ প্রশংসা করেছে। দৈহিক শক্তি বা সুস্থ দেহই আধার হতে পারে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির। আর তার পক্ষেই নির্ভুল চিন্তা-গবেষণা চালানো সম্ভবপর। রুগ্ন দেহ মানুষের উপর শরীয়াতও কষ্টদায়ক কাজের দায়িত্ব চাপায় না। যেমন রোযা ফরয করার আয়াতে বলা হয়েছেঃ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (البقره: ١٨٤)

যে লোক রোগাক্রান্ত বা বিদেশ সফরে থাকবে, সে (তো রমযান মাসেই রোযা রাখতে পারবে না) রাখবে অন্যান্য দিনে গুণে গুণে।

বিদেশ সফরকালে রোযা না-রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে এজন্য যে, সফর স্বতঃই একটি কষ্টদায়ক ব্যাপার। তাতে শারীরিক কষ্ট ও স্বাস্থ্যের বিকৃতির সম্ভাবনা প্রকট। তার উপর রোযা রাখা বাধ্যতামূলক হলে মুসলিম বিদেশ সফরকারীর কষ্টের সীমা থাকত না।

এমনিভাবে হজ্জ করতে গিয়েও যদি কেউ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে, তাহলে ইহ্রাম বাধা অবস্থায়ও মাথা মুণ্ডন করার অনুমতি রয়েছে। কেননা এ সময় মাথায় চুল রাখা কষ্টদায়ক হতে পারে। বলা হয়েছেঃ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْبِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكٍ (البقرة)

কিন্তু যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হবে অথবা যার মাথায় কোন রোগ হবে এবং সে কারণে মাথা মুণ্ডন করবে, সে 'ফিদিয়া' (বিনিময়) হিসেবে রোযা রাখবে, অথবা সাদকা দেবে কিংবা কুরবানী করবে।

অথচ ইহ্রাম বাধা অবস্থায় মাথা মুণ্ডন নিষিদ্ধ।

এ থেকে বোঝা যায়, শরীয়াতের দৃষ্টিতেও স্বাস্থ্য ও সুস্থতার গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা মানুষ দৈহিকভাবে যদি সুস্থই না থাকে, তাহলে তার পক্ষে শরীয়াত পালন করা—শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী কাজ করা—বাস্তবভাবেই সম্ভব হতে পারে না। অথচ শরীয়াত নাযিল-ই হয়েছে মানুষ তা পুরাপুরি ও যথাযথ পালন করবে বলে।

কুরআনের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষা

বস্তুত স্বাস্থ্য তত্ত্ব ও রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে কুরআনের ধারাবাহিক শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার লক্ষ্য, মানুষের দেহকে বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করা, রোগ প্রতিরোধ করা যাতে রোগ না হয়, পূর্বাহ্নেই তার বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ। আর

এ পর্যায়ে কুরআন মজীদের শিক্ষাকে কাজে পরিণত করা হলে মানুষের দেহ ও মন—উভয়ই বহু প্রকারের রোগ থেকে রক্ষা পেতে পারে।

আমরা সকলেই জানি, কুরআন মজীদ কিছু কিছু জিনিস হারাম ঘোষণা করেছে, তা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছে। সেই নিষিদ্ধ জিনিসসমূহ বাদে অন্য সব 'মুবাহ' বলে বুঝতে হবে। কেননা সে বিষয়ে কোন নিষেধ বাণী উচ্চারিত হয়নি। আর কুরআন যা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছে, যা গ্রহণ করতে নিষেধ করেনি, তার মূলে নৈতিক কারণের সাথে সাথে বস্তুগত কারণ নিহিত থাকা কিছু মাত্র অসম্ভব নয়। নিষিদ্ধ জিনিসগুলির খারাপ ও ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া থেকে মানুষের দেহকে রক্ষা করা অন্যতম লক্ষ্য। কুরআন মৃত জন্তু, রক্ত ও শূকর গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এ আয়াতেঃ

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (البقره: ١٧٣)

আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি শুধু মৃত, রক্ত, শূকর-গোশত নিষিদ্ধ করে দিয়েছেনঃ সেই জন্তুর গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ, যা আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো নামে বলি দেয়া হয়েছে। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি কঠিন ঠেকায় পড়ে—আইনের সীমা বা প্রয়োজনের সীমা লংঘন না করে—খায়, তাহলে তাতে তার কোন গুনাহ্ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ খুবই ক্ষমাশীল ও অতীব দয়াবান।

আয়াতে 'মৃত' বলতে মৃত—মরে যাওয়া জন্তু, যা জবাই করা হয়নি, কোন কারণে মরে গেছে, তা বুঝিয়েছে। কেননা এই মৃত্যু যদি কোন রোগের কারণে হয়ে থাকে, তাহলে তার গোশত খাওয়া মানুষের সুস্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হতে পারে। আর তা যদি রোগ-জীবাণুমুক্তও হয়, তবু তা খাওয়ার ফলে মানুষের শূল বেদনা (colic) বা দাস্ত-বমি কিংবা অন্যান্য বহু প্রকারের উদারিক রোগ হতে পারে।

'রক্ত' হারাম করা হয়েছে এজন্য যে, তা-ই হচ্ছে রোগ জীবাণুর অতি বড় মিলন কেন্দ্র। তা বহু প্রকারের মারাত্মক রোগের জীবাণুর আধার।

শূকর-গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ। কেননা শূকর-গোশত বহু প্রকারের কীট, পোকা (worm) ও পোকার ডিম বহন করে, যা খেলে মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়ে বহু প্রকারের চিকিৎসা অযোগ্য রোগ দেখা দেয়া অবশ্যম্ভাবী।

অপর একটি আয়াতে এই নিষিদ্ধ গোশতের তালিকা এভাবে দেয়া হয়েছেঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ

وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

(المائدة: ٣)

তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং সেই সব জন্তু, যা আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারোর নামে হত্যা করা হয়েছে। আর যা গলায় ফাঁস পড়ে, আঘাত খেয়ে, উচ্চস্থান থেকে পড়ে গিয়ে কিংবা সংঘর্ষে পড়ে মরেছে অথবা যা কোন হিংস্র জন্তু ছিড়ে-ছুড়ে খেয়েছে—যা জীবিতাবস্থায় যবেহ করা হয়েছে তা বাদে আর যা কোন দেবতার আস্তানায় যবেহ করা হয়েছে ....

গলায় ফাঁস পড়ে মরে যাওয়া জন্তু খুব দ্রুত পচে যায়, দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। আয়াতে বলা অন্যান্য জন্তুর ব্যাপারও তাই। উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাওয়া জন্তু ব্যথার চোটে ছটফট করে মরে যায়, যা আঘাত খেয়ে মরে যায়, আর যা হিংস্রতার বশবর্তী হয়ে গুতোগুতি করে মরে যায়। এসবগুলির এই অবস্থা। এসব জন্তুর গোশতে খুব দ্রুত রোগ-জীবাণু সংক্রমিত হয়, যার দরুন খুব দ্রুত পচে যায়। তাই এগুলিও খাওয়া সম্পূর্ণ হারাম।

শুধু এগুলিই নয়। এছাড়া যা নৈতিকতার দিকদিয়ে ‘খবীস’ (Bad, wicked) তা-ও ইসলামে হারাম ঘোষিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেনঃ

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (الاعراف: ١٥٧)

আহ্লি কিতাবের মধ্য থেকে যারা উম্মী নবী রাসূল [মুহাম্মাদ (স)]-এর অনুসরণ করে, যার বিষয়ে তাদের নিকট রক্ষিত তওরাত ও ইনজীল কিতাবে লিখিত দেখতে পায়, সে তাদেরকে ভালো ভালো কাজের আদেশ করে, মন্দ-নিষিদ্ধ কাজ করা থেকে বিরত রাখে এবং তাদের জন্য উত্তম-উৎকৃষ্ট জিনিসসমূহ হালাল ঘোষণা করে ও খবীস (খারাপ, ক্ষতিকর) জিনিসসমূহ হারাম ঘোষণা করে।

এসবের সাথে সাথে মদ্য ও যাবতীয় মাদক দ্রব্য হারাম করার ব্যাপারটিও যোগ করতে হবে। এ পর্যায়ে কুরআনের ঘোষণা হচ্ছেঃ

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائده: ٩٠)

মদ্য, জুয়া, আস্তানা ও ভাগ্য জানার জন্য তীর তোলা—প্রভৃতি—শয়তানী কাজের চরম মলিনতা; অতএব তোমরা তার প্রত্যেকটিই পরিহার কর। আশা করা যায়, তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।

এসব নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে মানুষকে বহু প্রকারের মারাত্মক মারাত্মক রোগ থেকে বাঁচাবার লক্ষ্যে। এগুলির যেমন বস্তুগত ক্ষতি আছে, তেমনি আছে নৈতিক ক্ষতিও। কেননা মদ্য ও সর্বপ্রকারের মাদক দ্রব্য মানব দেহে অত্যন্ত খারাপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, যার দরুন প্রথমে মানুষের হজম শক্তি নষ্ট হয়, পরে পাকস্থলীতে জখম হয় এবং গোটা স্বাস্থ্যের মর্মকেন্দ্রকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। তার এই খারাপ প্রতিক্রিয়া কেবল তার পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না, তা বংশানুক্রমে চলতে থাকে। মদ্যপায়ীর বংশ চরিত্রের দিক দিয়ে যেমন আদর্শ স্থানীয় হয় না, তেমনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ারও সম্ভব হয় না। কেননা মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানে ব্যক্তির যৌন শক্তিও বিলুপ্ত হয়, শুক্রকীট রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

এমনিভাবে পানাহারে মাত্রাতিরিক্ততাও ব্যক্তির পক্ষে খুবই মারাত্মক পরিণতি নিয়ে আসে। তাই কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ـ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ (الاعراف: ٣١)

তোমরা খাও, পান কর; তবে সীমাতিরিক্ততার প্রশ্রয় দিও না। কেননা আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের ভালোবাসেন না।

আয়াতটি ক্ষুদ্রায়তন হলেও তাতে স্বাস্থ্য রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বিধান নিহিত রয়েছে। মানুষের শরীর-স্বাস্থ্যের সুরক্ষা তার লক্ষ্য! কেননা পানাহারে মাত্রাতিরিক্ততার প্রশ্রয় দেয়া হলে তা হজম করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং অনিবার্যভাবে বহু মারাত্মক রোগ দেখা দিতে পারে।

পক্ষান্তরে কুরআন মুসলমানদের জন্য রোযা রাখা ফরয ঘোষণা করেছেঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ ـ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ (البقرة: ١٨٣)

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের প্রতি রোযা রাখা ফরয করে দেয়া হয়েছে, যেমন করে তা ফরয করে দেয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি। আশা কবা যায়, রোযা রাখার ফলে তোমরা বহু প্রকারের ক্ষতিকর জিনিস থেকে বাঁচতে পারবে।

রোযার নৈতিক কল্যাণ ছাড়াও অকল্পনীয় দৈহিক কল্যাণ রয়েছে। আধুনিক

কালের উন্নত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানও রোযার এই দৈহিক কল্যাণকে স্বীকার করেছে এবং বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় তা প্রয়োগ করা হচ্ছে।

কুরআন শুধু ক্ষতিকর জিনিসসমূহ চিহ্নিত করেই ক্ষান্ত হয়নি, কল্যাণকর প্রাকৃতিক সামগ্রী ও রোগ নিরাময়ের উপকরণাদির সন্ধান দিয়েছে। এ পর্যায়ে বিশেষভাবে মধুর উল্লেখ খুব বেশী গুরুত্ববহ। বলা হয়েছেঃ

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ - ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً - يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ - اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (النحل: ٦٨-٦٩)

আর লক্ষ্য কর, তোমার রব্ব্ মধু-মক্ষিকার প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন যে, পাহাড়ে-পর্বতে, গাছে ও ওপরে বিস্তীর্ণ লতা-পাতায় নিজেদের চাক নির্মাণ কর। অতঃপর সর্ব প্রকারের ফলের রস চুষে লও এবং তোমার রব্ব-এর নির্ধারিত উপায়ে চলতে থাক। এই মক্ষিকার পেট থেকে রঙ-বেরঙের পানীয় নির্গত হয়। তাতে রয়েছে লোকদের জন্য রোগ-নিরাময়তা। আর নিঃসন্দেহে এতে চিন্তা-গবেষণাসম্পন্ন লোকদের জন্য গুরুতর নিদর্শন রয়েছে।

বস্তুত মধুতে যে বিপুল মাত্রায় রোগ নিরাময়তা ও শক্তি-উপকরণ নিহিত, আধুনিক রাসায়নিক বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত ও প্রকাশিত হয়েছে। তাতে কুরআনের এই ঘোষণায় পরম সত্যতাই প্রমাণিত হয়েছে অকাট্যভাবে।

এ ছাড়াও যেসব জিনিস, কর্ম ও পন্থা ব্যক্তি ও সমষ্টির সুস্বাস্থ্যের অনুকূল, কুরআন মজীদে সেগুলিরও নির্দেশ করেছে। এ পর্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখ্য সাধারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ময়লা আবর্জনার নিমূর্লতা। বিশ্বনবী (স)-এর প্রতি দ্বিতীয়বারে অবতীর্ণ আয়াতে আল্লাহ্ তাঁর নবী (স)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ 'এবং তোমার পরিচ্ছদ ভূষণ পবিত্র-পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ কর।'

আয়াতটি আকারে ক্ষুদ্র হলেও তাৎপর্য বিশাল। এতে নবী করীম (স)-কে তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ মলিনতা-অপবিত্রতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা দেহ ও পোশাকের পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা এবং মন-মানসিকতা আত্মার পবিত্রতা ওতপ্রোত, একটি অপরটি থেকে অবিচ্ছিন্ন। একটি পবিত্র-পরিচ্ছন্ন-পরিশুদ্ধ মন মনিল ও দুর্গন্ধময় দেহ ও ময়লাযুক্ত পোশাক এক মুহূর্তের তরেও বরদাশত করতে পরে না। তদানীন্তন আরব সমাজ কেবল মন-মানসিকতার দিক দিয়েই মলিনতা কলুষতায় জর্জরিত ছিল না, সাধারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা-পবিত্রতার প্রাথমিক ধারণাটুকুও তারা হারিয়ে ফেলেছিল।[১]

১. তাফহীমুল কোরআন, ১৮ খণ্ড, পৃঃ ১০৬।

তাই আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ কেবল রাসূলে করীম (স)-এর প্রতিই নয়, সাধারণভাবে সব মানুষের প্রতিও।

কুরআনে যে, 'তাহারাত' পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা-পরিশুদ্ধতার নির্দেশ ও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, তা মন-মানসিকতা সহ পোশাক ও দেহ এবং ঘর-বাড়ি ও পরিবেশ--সবকিছু পরিব্যাপ্ত। আর এই কাজের জন্য প্রধান উপকরণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র দেয়া পানি।

পানি দ্বারাই পরিচ্ছন্নতা-পবিত্রতা লাভ করা সম্ভব। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র পানি নাযিল করেছেন। ইরশাদ হয়েছেঃ

أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (الفرقان: ٤٨)

এবং আমরা উর্ধ্বলোক থেকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন পানি নাযিল করেছি।

আল্লাহ্ পবিত্র পানি দিয়েছেন। এ পানিই মানুষ-জন্তু-জীবের পানীয়। এরই আর এক নাম জীবন। অতএব এ পানিকে দূষিত করা যাবে না।

মুসলমানের জীবনে পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই 'অযু' ছাড়া আল্লাহ্‌র ইবাদত—বিশেষ করে নামায—শুদ্ধ হতে পারে না। প্রত্যেক নামাযের জন্য অযুর তাকীদ করে বলা হয়েছেঃ

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (المائده: ٦)

তোমরা যখন নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল, কনুই পর্যন্ত দুই হাত, গিড়া পর্যন্ত দুই পা ধৌত করবে ও মাথা মুসেহ করবে।

চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে অন্ততঃ পাঁচবার বহিরাঙ্গের উক্ত অংশগুলি নিয়মিত ধৌত করা হলে বা পরিচ্ছন্ন করলে দেহ যে পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

আর স্ত্রী-সঙ্গমের পর গোটা দেহ যে ময়লাযুক্ত ও ক্লেদাক্ত হয়ে পড়ে, তা থেকেও পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসলের নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا (المائده: ٦)

স্ত্রী-সঙ্গমের কারণে অপবিত্র হয়ে পড়লে তোমরা অবশ্যই পবিত্রতা অর্জন করবে।

আর পানি পাওয়া না গেলে মাটির স্পর্শে পবিত্রতা অর্জন করতে বলা হয়েছেঃ

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

(المائده: ٦)

আর পানি না পেলে তোমরা পবিত্র মাটিকে লক্ষ্যস্থলরূপে গ্রহণ কর ও তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদয় মুসেহ কর।

কেননা মাটি সাধারণত ও স্বতঃই পবিত্র। তা মানব দেহকে সব রকমের রোগ-জীবাণু থেকে রক্ষা করে।

এ সব উপায়ে যে পবত্রিতা অর্জন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তার মূলে যে লক্ষ্য নিহিত রয়েছে, কুরআনে তা বলা হয়েছে এ ভাষায়ঃ

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (المائده: ٦)

আল্লাহ্ তোমাদের উপর কোন অসুবিধা চাপাতে চান না। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন-পবিত্র—ময়লামুক্ত করে রাখতে চান, চান তার নিয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করে দিতে এই আশায় যে, তোমরা শোকর করবে।

দেহকে পবিত্র রাখার লক্ষেই আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীর ঋতু অবস্থায় তার সাথে সঙ্গম করতে নিষেধ করেছেন। সেই নিষেধের কারণও দর্শিয়েছেন। বলেছেনঃ

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ (البقره: ٢٢٢)

হে নবী! লোকেরা তোমার নিকট ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা সম্পর্কে (আল্লাহ্‌র হুকুম) জানতে চায়। তুমি বল, তা কষ্টজনক-ক্ষতিকর। অতএব এই অবস্থায় স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাক হায়য চলাকালে। আর যতক্ষণ তারা পবিত্র না হচ্ছে, ততক্ষণ তাদের সাথে সঙ্গম করবে না।

স্ত্রীলোকের ঋতু-অবস্থাকে আয়াতে اذى বলা হয়েছে। তার অর্থ এমন সব ক্ষতি যা কোন জীবের প্রাণ বা দেহে পৌছতে পারে। তা বস্তুগতভাবে ক্ষতিকর হোক কি নৈতিক দৃষ্টিতে। ঋতু অবস্থাকে اذى বলার মূলে শরীয়াতের কারণ নিহিত—কেননা আল্লাহ্‌র শরীয়াত তা ক্ষতিকর মনে করে অথবা তা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ক্ষতিকর।[১] এক সাথে এই দু'টি দিক সম্মুখে থাকাই স্বাভাবিক।

---

১. لغات القران عبد الرشيد نعمانى اردو ج:١ ص:٦٢-٦٤

তবে আধুনিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে ঋতু অবস্থার সঙ্গমকে স্বামী স্ত্রী উভয়ের জন্য ক্ষতিকর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কেননা ঋতুস্রাবের রক্ত, পচা, ময়লা ও মারাত্মক রোগ জীবাণু জর্জরিত। পুরুষ তার সংস্পর্শে এলে তার প্রদাহ রোগ (Inflamation) হতে পারে। অনুরূপভাবে ঋতু অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম হলে স্ত্রীর অভ্যন্তরীণ ঝিল্লী (membrane) দীর্ণ হয়ে অস্বাভাবিক রক্ত সঞ্চয় (congestion) বা ক্ষরণ হতে পারে। এই সময়ের যৌন সঙ্গমে এমন অভ্যন্তরীণ দীর্ণতার সৃষ্টি হতে পারে, যার ফলে ব্যাপক রোগ জীবাণু (microbe) সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়তে পারে। স্বাস্থ্যে এমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে, যার ফলে স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যহীনা হয়ে যেতে পারে। এর ফলে কর্কট রোগ (cancer) হওয়াও অসম্ভব নয়।

যৌন রোগের সংক্রমণ রোধ করা ব্যভিচার নিষিদ্ধ হওয়ার মূলে নৈতিক অধঃপতন ও পাপাচার প্রসারতা ছাড়াও স্বাস্থ্যগত মারাত্মক ক্ষতির আশংকাকে কারণ বলা যেতে পারে। বলা হয়েছেঃ

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ـ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاۤءَ سَبِيْلًا (الاسراء : ٣٢)

তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও যাবে না। কেননা তা যেমন চরম মাত্রার নির্লজ্জতা, আর অতীব খারাপ পথ ও পন্থা।

ব্যভিচার চরম মাত্রার নির্লজ্জতা, চরিত্রহীনতা ছাড়াও সংক্রামক যৌন রোগ দেখা দেয়া খুবই সম্ভব। আর ইসলামে তা হারাম হওয়ার মূলে এও যে কারণ, তাতে সন্দেহ নেই।

মোটকথা, কুরআন মজীদ মানুষের সুস্বাস্থ্য রক্ষার উপর পূর্ণ মাত্রার গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং ইসলামী স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তিও রচনা করেছে। কুরআন উপস্থাপিত এই স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের চিরন্তনতা ও বৈজ্ঞানিকতা অনস্বীকার্য। রাসূলে করীম (স) এই কুরআনী স্বাস্থ্য তত্ত্বের ভিত্তিতে এক পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দুনিয়ার মানুষের নিকট দিয়ে গেছেন, যার বিস্তারিত বিবরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক।[১]

---

১. হাদীসে রাসূলে করীম (স) কথিত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তত্ত্ব ও তথ্যাদি নিয়ে বিভিন্ন বিরাট গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। সেই পর্যায়ে কতিপয় গ্রন্থের নাম এখানে উদ্ধৃত করছিঃ

(ক) طب النبى হাফেয আবু নয়ীম আহমদ আবদুল্লাহ আল-ইসফাহানী (মৃতঃ ৪৩০ হিঃ) লিখিত।

(খ) طب النبى শায়খ আল ইমাম আবুল আব্বাস আল-মুসতাগফিরী লিখিত।

(গ) طب النبى আবুল ওয়াজীর আহমাদ আল-আবহারী।

স্বাস্থ্য ও বিবাহ

বিবাহের সাথে স্বাস্থ্যের নিকট সম্পর্ক। এ পর্যায়ে বহু তত্ত্ব ও তথ্যও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। আধুনিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে সুস্বাস্থ্য রক্ষার দিক দিয়ে বিবাহের অসাধারণ গুরুত্ব সর্বজনমতের ভিত্তিতে স্বীকৃত হয়েছে, যদিও ইসলাম চৌদ্দশ বছর পূর্বেই এই বিষয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে। কুরআন মজীদ এ পর্যায়ে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা উপস্থাপিত করেছে, আধুনিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান তা জানতে পেরেছে অতি সম্প্রতি।

পুরুষ ও নারীর সুস্বাস্থ্যের জন্য বিবাহ—শুধু যৌন মিলনন নয়—অপরিহার্য। কিন্তু সেই বিবাহ হতে হবে এমন নারী পুরুষে, যাদের মধ্যে রক্ত সম্পর্ক খুব নিকটে নয়। আর এই কারণেই কুরআন কতিপয় নারী-পুরুষের পারস্পরিক বিবাহ হারাম করে দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْأَخِ وَبَنٰتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوٰتُكُم مِّنَ الرَّضٰعَةِ وَأُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبٰٓئِبُكُمُ الّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ الّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ ـ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ـ وَحَلٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلٰبِكُمْ ـ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (النساء: ٢٣)

তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাই'র কন্যা, বোনের কন্যা, তোমাদের দুগ্ধদানকারী মা, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীর মা, তোমাদের স্ত্রীদের কোলে নিয়ে আসা তোমাদের পালিতা কন্যা,—যেমন স্ত্রীর সাথে তোমরা যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছ তাদের,—যৌন সম্পর্ক স্থাপিত না করে থাকলে কোন গুনাহ হবে না, তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের বিবাহিতা, এ-ও হারাম যে, তোমরা দুই সহোদরাকে একসাথে স্ত্রীত্বে গ্রহণ করবে—পূর্বে যা তা তো হয়েই গেছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

এ আয়াতে সাত পর্যায়ের মেয়েলোককে বিবাহ করা পুরুষের জন্য হারাম করা হয়েছে। তারা পুরুষটির সাথে বংশগতভাবে সম্পর্কিত।

এতে দুধ সম্পর্কের কারণেও স্ত্রীলোককে হারাম করা হয়েছে। এটা মানব ইতিহাসের ধর্মসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র ইসলামেরই উপস্থাপন। তার কারণ হচ্ছে, যে নারী সন্তানকে দুগ্ধ দেয়, সে আসলে তার দেহের অংশ গড়ে, যা সেই দুগ্ধপায়ী সন্তানের দেহ গঠনে বিরাট ভূমিকা পালন করে। এক কথায়, সে দুগ্ধ তার দেহের অংশে পরিণত হয়। এই দুধই তার রক্ত, তা থেকেই দেহের

গোশ্‌ত। আর অস্থি-মজ্জাও তাতেই গড়ে উঠে। ফলে সে মহিলার তার আপন মা'র স্থানীয় হয়ে যায়। আর মা তো চিরকালের জন্যই হারাম।[১]

স্বাস্থ্য রক্ষা পর্যায়ে ইসলামী হুকুমাতের দায়িত্ব

ব্যক্তিগণের ও গোটা সমাজ-সমষ্টির সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য দুইটি বিষয়ের ব্যাপক প্রস্তুতি অত্যন্ত জরুরীঃ

ক. সার্বক্ষণিকভাবে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকা।

খ. প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক বিনিয়োগ ও জরুরী ঔষধসমূহের সুপ্রাপ্য করা—যা সাধারণত হাসপাতাল ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সম্ভব হয়। কোন এলাকায় মহামারী আকারে রোগ দেখা দিলে তার ব্যাপক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

এ দুটি কাজ-ই অত্যন্ত কঠিন ও ব্যাপক শক্তি-সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা। এজন্য ব্যাপক ও নির্ভুল পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। প্রয়োজন অমোঘ আইন-বিধানের ও বিপুল অর্থ-সম্পদের। বাস্তবতার দৃষ্টিতে এ কাজ কেবলমাত্র কোন রাষ্ট্র সরকারের পক্ষেই সম্ভব। তাই এতে কোনই সন্দেহ নাই যে, ইসলামী রাষ্ট্রের সকল প্রকারের দায়-দায়িত্বের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে জনগণের সুস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থার দায়িত্ব অবশ্যই প্রাথমিক ও সর্বোচ্চ পর্যায়ে গণ্য হতে হবে। কেননা ইসলামী শাসন কায়েম হবে ও চলবে তো জনগণের উপর। কিন্তু সেই জনগণ-ই যদি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না হয়, তাদের রোগ নিরাময়তার ব্যাপক ও কার্যকর ব্যবস্থা করা না হয়, তাহলে সে হুকুমত কোথায় দাড়াবে?

তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, এ ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর ব্যবস্থা অবশ্যই ইসলামী সরকারকে করতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণের জান-মালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা নিঃসন্দেহে রাষ্টিয় দায়িত্ব। এখানে রাসূলে করীম (স)-এর এ কথাটি স্বরণ না করে পারা যায় না।

اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَاَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِىْ كُلٍّ خَيْرٍ۔

শক্তিমান সুস্বাস্থ্যের অধিকারী মু'মিন ব্যক্তি অতীব কল্যাণময় এবং আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক প্রিয় দুর্বল স্বাস্থ্যহীন মু'মিন ব্যক্তির তুলনায়—সকল কল্যাণময় ব্যাপারেই।[২]

ইসলামী রাষ্ট্র প্রথম দিন থেকেই এই ব্যাপারে স্বীয় দায়িত্ব মেনে নিয়েছে এবং সব সময়ই এই কর্তব্যের বাধ্যবাধকতাকে কার্যকর করতে চেষ্টিত রয়েছে।

১. হাদীসে এই পর্যায়ে বহু বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে, ফিকাহ্‌র কিতাবেও বিস্তৃত আলোচনা আছে।

২. সহিহ্ মুসলিম শরীফ।

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি

[ইসলাম-ই সুষ্ঠু বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করেছে—আন্তর্জাতিক চুক্তি ও ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির প্রতি মর্যাদা দান, যুদ্ধের কারণ ও ইসলামী নীতি—ইসলাম ও বিশ্বশান্তি—যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে ইসলামের নীতি—ইসলামী সমাজে দাসদের অবস্থান—সীমালঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি—যুদ্ধাস্ত্র সীমিতকর—ইসলামের কূটনৈতিক সতর্কতা-সংরক্ষণতা—একক ও পারস্পরিক ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি—সামরিক ঋণ-চুক্তি-রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্নকরণ—বিজিত এলাকায় ইসলামের নীতি ।]

ইসলাম-ই সুষ্ঠু বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করেছে

পাশ্চাত্যের কোন কোন লেখক এ কথা লেখার ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন যে, আধুনিক পাশ্চাত্য দেশগুলিই নাকি সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও যোগাযোগের ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছে এবং এজন্য সুস্পষ্ট নীতি প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাদের দাবি হচ্ছে, বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা উদয়ের পূর্বে দুনিয়ায় কোন বৈদেশিক বা পররাষ্ট্রীয় নীতি ছিল না। কেননা তখন দুনিয়ার রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে কোন যোগাযোগ বা সম্পর্ক গড়ে উঠেনি।

কিন্তু তাদের এ দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং তার সাথে প্রকৃত সত্যের বিন্দুমাত্র সম্পর্কও নেই। মানব ইতিহাসের সাথে যাঁরা বিন্দুমাত্রও পরিচিতি রাখেন, তাঁরা ভাল করেই জানেন যে, বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্মের বহু পূর্ব থেকেই দুনিয়ার জাতিসমূহের পরস্পরে সুস্পষ্ট যোগযোগ ছিল। এজন্য তাদের মধ্যে কতিপয় নিয়ম-নীতিও নির্ধারিত হয়েছিল। সেগুলির ভিত্তিই তাদের মধ্যে সম্পর্ক ও যোগাযোগ প্রয়োজনানুরূপ রক্ষিত হত। আর দুনিয়ায় ইসলামের আগমন ও বিশ্বনবী(স)-র নেতৃত্বে মদীনায় প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই বৈদেশিক সম্পর্কের নীতি অধিকতর সুষ্ঠু ভিত্তির উপর দাড়াঁবার সুযোগ পেয়েছিল এবং এজন্য উত্তম ও কল্যাণময় নিয়ম-কানুনও রচিত হয়েছিল।

আমরা এখানে ইসলাম প্রবর্তিত বৈদেশিক নীতির বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হচ্ছি। কেননা সেজন্য ব্যাপক অধ্যয়ন, তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ এবং নবী করীম (স) এবং তাঁর পরে অন্ততঃ খুলাফায়ে রাশেদুন বিভিন্ন জাতির সাথে যেসব চুক্তি করেছিলেন সেগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না এই গ্রন্থটির অবয়ব অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে যাওয়ার ভয়ে। আসলে শুধু এই বিষয়ের উপর একখানি বৃহদাকার গ্রন্থের প্রয়োজন। তাই আমরা এখানে ইসলাম প্রবর্তিত

বৈদেশিক নীতির শুধু কুরআনভিত্তিক আলোচনা পেশ করতেই চেষ্টিত হব। এর ফলে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের নিকট একথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, ইসলামী হুকুমত প্রথম প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই ব্যাপক কর্মনীতি ও যোগাযোগ পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যা কোন রাষ্ট্রের জন্য জরুরী এবং দুনিয়ার জাতি ও জনগোষ্ঠির বৈদেশিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য জরুরী।

এসব কর্মনীতি ও পদ্ধতি মৌলনীতি সমন্বিত। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি সেসব মৌলনীতির ভিত্তিতেই রচিত হতে পারে। এটাই স্বাভাবিক। কেননা মূল শরীয়াতদাতা তো মৌলনীতিই দেবেন, পরে তারই ভিত্তিতে সময়োপযোগী খুঁটিনাটি নিয়ম-বিধি রচনা করবেন শরীয়াতভিজ্ঞ মনীষিগণ।

এখনে আমরা ইসলামের বৈদেশিক ও পররাষ্ট্রীয় পর্যায়ের মৌলনীতি সমূহের রূপরেখা উল্লেখ করছি।

আন্তর্জাতিক চুক্তি ও ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির প্রতি মর্যাদা দান

চুক্তি ও ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা বা পূরণ করা (وَفَاء) মানব প্রকৃতি নিহিত দাবি। মানুষ তার ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রাথমিক পাঠশালায়-ই তার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করে, এমনকি বয়স্করা যদি কখনও কোন ধরনের ওয়াদা প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে, তাহলে পরিবারের অল্প বয়স্করাই তার প্রতিবাদ করে উঠে। এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (স)-এর কথা বলে বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করছি। তিনি ইরশাদ করেছেনঃ

اَحِبُّوا الصِّبْيَانَ وَارْحَمُوهُمْ وَاِذَا وَعَدْتُمُوهُمْ شَيْئًا فَفُوا لَهُمْ

তোমরা বালক-বালিকাদের ভালবাসবে, তাদের প্রতি স্নেহ ও মমতা রাখবে। আর যদি কখনও তাদের নিকট কোন কিছুর ওয়াদা কর, তাহলে তা তাদের জন্য অবশ্যই পূরণ করবে।

তাছাড়া সামষ্টিক জীবনের স্থিতিস্থাপকতার জন্য যে-কোন পর্যায়ের পারস্পরিক ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী শর্ত। পারস্পরিক বিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসপরায়ণতা এই জীবনের মৌলিক ভিত্তি। ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি পূরণ ব্যতীত এই ভিত্তি রক্ষা পেতে পারে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা হুকুম করে দিয়েছেনঃ

وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (الاسرا: ٣٤)

তোমরা পারস্পরিক ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি সমূহ পূর্ণ কর। কেননা এই ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কিয়ামতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

আর মু'মিনদের গুণ-পরিচিতি পর্যায়ে বলা হয়েছেঃ

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُونَ (المؤمنون: ٨)

এবং কল্যাণপ্রাপ্ত হচ্ছে সেই সব মুমিন লোক, যারা তাদের আমানত সমূহ এবং তাদের ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি পূর্ণ সতর্কতার সাথে রক্ষা করে।

কুরআন মজীদে ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি পূরণকারীদের প্রশংসা ব্যাপদেশে বলা হয়েছেঃ

اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ - اَلَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ

(الرعد: ١٩- ٢٠)

কেবল বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে। তারা তো সেই লোক, যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়দা-প্রতিশ্রুতি পূরণ করে এবং চুক্তি কখনই ভঙ্গ করে না।

আর এর বিপরীত যারা ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাদের মন্দ বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ - اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ (الرعد: ٢٥)

আর যারা আল্লাহ্র ওয়াদা পাকা-পোক্ত ও সুদৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ্ যার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার আদেশ করেছেন, তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাদের উপর লা'নত বর্ষিত; আর তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত খারাপ বসবাস স্থান।

একটি আয়াতে ওয়াদা ভঙ্গকারীকে সেই নারীর সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে নিজ হাতে সূতা পরিপক্ক করার পর নিজেই তা কেটে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে। বলা হয়েছেঃ

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا - اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ - وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِىْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا (النحل: ٩١-٩٢)

তোমরা আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ কর, যখন তোমরা তাঁর সাথে কোন ওয়াদা শক্ত করে বেঁধে নিয়েছ এবং নিজেদের কিরা-কসম পাকা পোক্তভাবে করার পর তা ভঙ্গ করো না, যখন তোমরা আল্লাহ্কে সাক্ষী বানিয়ে নিয়েছ।

আল্লাহ্ তোমাদের সব কাজ-কর্ম সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। তোমাদের অবস্থা যেন সেই নারীর মত না হয়, যে নিজেই কঠিন পরিশ্রম করে সূতা কেটেছে ,পরে সে নিজেই তা টুকরা টুকরা করে ফেলেছে।[১]

যুদ্ধের কারণ ও ইসলামের নীতি

দূর অতীত কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দেশে দেশে ও জাতিতে জাতিতে যেসব যুদ্ধ হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, তার মূলে তিনটি কারণই প্রধানঃ

১। সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে অঞ্চলের পর অঞ্চল দখল করে স্বাধীন মানুষকে অধীন বানানো;

২। অন্যদের দেশের উপর আক্রমণ চালিয়ে সেই দেশে অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করা বা সেই দেশকে সন্ধিসূত্রে বন্দী করে নিজ দেশের বেকার ও অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য সেই দেশে অবস্থান গ্রহণের ও উপার্জনের অবাধ সুযোগ করে দেয়া; এবং

৩। নিজের দেশের শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের বাজার সৃষ্টি করা এবং নিজ দেশের মূলধন সেই দেশে অবাধ ও নির্বিঘ্ন বিনিয়োগের সুযোগ করার লক্ষ্যে পরদেশ দখল করা কিংবা নিজ দেশের শিল্পোৎপাদনের, প্রতিষ্ঠিত কল-কারখানা চালু রাখা ও বেকার সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সহজে লাভ করার জন্যও বিদেশের উপর সর্বাত্মক আক্রমণ চালানো ও দখল করে নেয়া হয়।

---

১. এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) থেকে বহু মূল্যবান হাদীস বর্ণিত ও উদ্ধৃত হয়েছে। এখানে ভিন্নতর বর্ণনা সূত্রে প্রাপ্ত কতিপয় হাদীস সেই সূত্রের ভাষা অনুযায়ী তুলে দিচ্ছিঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَفِ اِذَا وَعَدَ ـ

(ক) যে লোক আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার, সে যেন ওয়াদা করলে তা পূরণ করে।

اَقْرَبُكُمْ مِنِّىْ غَدًا فِى الْمَوْقَفِ اَصْدَقُكُمْ فِى الْحَدِيْثِ وَاَدَاكُمْ لِلْاَمَانَةِ وَاَوْفَاكُمْ بِالْعَهْدِ ـ

(খ) কাল কিয়ামতের দিন আমার অতি নিকটবর্তী হবে সেই লোক,যে তোমাদের মধ্যে কথার দিক দিয়ে অতীব সত্যবাদী, আমানতের খুব বেশী আদায়কারী এবং ওয়াদা খুব বেশী পূরণকারী।

يَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْوَفَاءُ بِالْمَوَاعِيْدِ وَالصِّدْقُ فِيْهَا

(গ) মু'মিনের কর্তব্য হচ্ছে ওয়াদা পূরণ করা ও তাতে সততা-সত্যবাদিতা রক্ষা করা।

কিন্তু এর কোন একটি উদ্দেশ্যেও পরদেশ আক্রমণের অনুমতি কুরআন মজীদে দেয়া হয়নি। এমন একটি আয়াত সমগ্র কুরআনে সন্ধান করেও পাওয়া যাবে না, যাতে এই ধরনের কোন প্রয়োজনে কোন দেশ দখল করার আদেশ করা হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসেও এই উদ্দেশ্যে পরদেশ আক্রমণের কোন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যেতে পারে না।

অনুরূপভাবে যেসব দেশের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তি রয়েছে, সেসব দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ একতরফাভাবে ও অতর্কিতে শুরু করারও কোন অনুমতি কুরআনে নেই। বলা হয়েছেঃ

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى
يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ـ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ـ وَلَا
تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ـ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ
أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ
عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ـ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ـ فَمَا جَعَلَ
اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ـ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ ـ
كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا ـ فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ
وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ـ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ
سُلْطَانًا مُبِينًا (النساء: ٨٩-٩١)

তারা তো এটাই চায় যে, তারা নিজেরা যেমন কাফির হয়েছে, তোমরাও তেমনিভাবে কাফির হয়ে যাও, যেন তোমরা তাদের সমান হয়ে যেতে পার। অতঃপর তোমরা তাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধু-পৃষ্ঠপোষক রূপে গ্রহণ করবে না, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরাত করে আসবে। তারা যদি হিজরাত করে না আসে, তাহলে তাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধু—পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করবে না। অবশ্য সেসব মুনাফিক এ কথার অন্তর্ভুক্ত নয়,যাদের সাথে তোমাদের কোনরূপ চুক্তি রয়েছে তাদের মধ্যে গিয়ে যদি তারা মিলিত হয়। সেই মুনাফিকরাও এই কথার মধ্যে শামিল নয়, যারা তোমাদের নিকট আসে বটে; কিন্তু তোমাদের বিরুদ্ধে বা তাদের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কুণ্ঠিত। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদেরকে তোমাদের উপর বিজয়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দিতেন, তখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। এক্ষণে তারা যদি তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসম্পর্ক হয়ে যায় ও তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই না করে এবং তোমাদের নিকট সন্ধির

প্রস্তাব পেশ করে, তখন তাদের উপর আক্রমণ করার তোমাদের জন্য আল্লাহ্ কোন পথ করে দেননি। আর এক ধরনের মুনাফিক তোমরা পাবে, যারা তোমাদের নিকট থেকেও; নিরাপত্তা পেতে চায় এবং নিজ জাতির পক্ষ থেকেও; কিন্তু যখনই ফিতনা সৃষ্টির সুযোগ পাবে, তাতেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে। এ ধরনের লোক তাদের মুকাবিলা করা থেকে যদি বিরত না থাকে, তোমাদের নিকট সন্ধি-শান্তির প্রস্তাব না দেয় এবং নিজেদের হস্ত তোমাদের উপর আক্রমণ করা থেকে বিরত না রাখে, তাহলে ওদেরকে যেখানেই ধরবে হত্যা করবে। এদের উপর আক্রমণ চালানোর কর্তৃত্ব ও অধীকার তোমাদেরকে সুস্পষ্ট করে দিলাম।

ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী'র তাফসীর অনুযায়ী আমাদের আলোচনার প্রেক্ষিতে উদ্ধৃত আয়াতটির সার বক্তব্য হচ্ছেঃ

১. মুশরিক, মুনাফিক ও সুপরিচিত ধর্মহীন-আল্লাহ্দ্রোহী লোকদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন জায়েয নয়।

২. বিশেষ করে হিজরাতের পর—অন্য কথায় ইসলমী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও যে লোক ইসলাম কবুল করবে না ও হিজরাত করে ইসলামী রাষ্ট্রে আসবে না, তাদেরকেও মুসলমানদের বন্ধু বা মিত্র মনে করা যায় না। কেননা সেরূপ অবস্থায় হিজরাতই হচ্ছে ইসলাম গ্রহণের বাস্তব প্রমাণ। তাই অপর আয়াতে বলা হয়েছেঃ

مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا (الانفال: ٧٦)

যারা হিজরাত করে আসেনি, তাদের অভিভাবকত্বের কোন দায়িত্ব তোমাদের নেই।

৩. তারা যদি হিজরাত না করে, বরং নিজেদের স্থানেই অবিচল হয়ে থাকে ইসলামী রাষ্ট্রের বাইরে, তাহলে তাদের পাকড়াও কর যেখানেই পাও এবং হত্যা কর। এরূপ অবস্থায় তাদের মধ্য থেকে কাউকেই বন্ধু রূপে গ্রহণ করবে না। ওদের কাউকে তোমাদের সাহায্যকারীও মনে করবে না।

৪. তবে যে লোকদের সাথে তোমাদের 'যুদ্ধ নয়' বা অন্য কোন ধরনের চুক্তি রয়েছে, হিজরাত থেকে বিরত থাকা মুসলমানরা যদি তাদের সঙ্গে মিলিত হয়, তাহলে তারাও সেই চুক্তির মধ্যে শামিল বলে গণ্য হবে। কেননা এটা অসম্ভব নয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরাত করে আসতে চাইলেও হয়ত কোনরূপ বাধা-প্রতিবন্ধকতার কারণে তারা ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ লোকদের নিকট আশ্রয় নিতে পারে।

৫. যারা চুক্তিবদ্ধ লোকদের সাথে মিলিত হবে কিংবা যারা মুসলমান তথা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক বা নিঃসাহস হয়ে পড়েছে, ফলে তারা যুদ্ধ করছে না ও যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সন্ধি করতে ইচ্ছুক নয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোন পথই আল্লাহ্ ইসলামী রাষ্ট্র বা মুসলমানদের জন্য খোলা রাখেননি।

৬. 'যুদ্ধ নয়' বা অন্য কোন ধরনের চুক্তি থাকলে চুক্তিবদ্ধ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না।

৭. যারা মুসলমানদের নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে প্রদর্শন করে, কিন্তু তাদের নিকট থেকে চলে গিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সুযোগ পেলেই কোন-না-কোন ক্ষতিকর বা বিপর্যয়ের কাজে লিপ্ত হয়, তাদের সম্পর্কেও আল্লাহ্র নির্দেশ হচ্ছে, তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে পাকড়াও করতে হবে এবং হত্যা করতে হবে। কেননা প্রকাশ্য মুনাফিকী করছে ও মুসলমানদের সাথে কৃত চুক্তিভঙ্গ করছে, যেহেতু তারা বাস্তবভাবেই প্রমাণ করেছে যে, ওরা মুসলমানদের সাথে শত্রুতা পরিহার করেনি।[১]

বস্তুত ওয়াদা খেলাফী ও চুক্তিভঙ্গ করা দ্বীনী ভাবধারাশূন্য লোকদের পরিচিতি। যে তা করে সে এই অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপিত করে যে, তার মধ্যে দ্বীনদারী বলতে বাস্তবিকই কিছু নেই।[২]

এমন কি যে মুশরিকদের ঈমানদার লোকদের কঠোর শত্রু বলে ঘোষণা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا (المائده: ٨٢)

ইয়াহুদ ও মুশরিক লোক দিগকেই তুমি মু'মিনদের সবচাইতে বেশী কঠিন ও কঠোর শত্রু রূপে পাবে।

সেই মুশরিকদের সাথে কৃত ওয়াদা-চুক্তি রক্ষা করার জন্য তাকীদ করা হয়েছেঃ

الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ (التوبه: ٤)

১. تفسير كبير ج:١٠، ص: ٢٢٠-٢٢٥

২. নবী করীম (স) বলেছেনঃ

لا دين لمن لا عهد له ·

যে লোক ওয়াদা পূরণ করে না, তার দ্বীন বা ধর্ম বলতে কিছুই নেই।

তোমরা যে মুশরিকদের সাথে চুক্তি করেছ, পরে তারা যদি সেই চুক্তির কিছুই ভঙ্গ না করে থাকে, তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকেই সাহায্য-ও না করে থাকে, তাহলে তাদের সাথে করা ওয়াদা-চুক্তিকে তার মেয়াদ পর্যন্ত সম্পূর্ণ কর।

তা সত্ত্বেও এই মুশরিকরা যদি তাদের কিরা-কসম ভঙ্গ করে ও মুসলমানদের সাথে করা ওয়াদার বিরুদ্ধতা করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি ইসলাম দিয়েছে। বলা হয়েছেঃ

وَاِنْ نَكَثُوا اَيْمَانَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِيْنِكُم فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَا اِيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ (التوبه: ١٢)

ওরা যদি তাদের ওয়াদা করার পর তাদের কিরা-কসম ভঙ্গ করে ও তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে গালমন্দ বলে, তাহলে তখন কুফরির এই সরদারদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর। ওদের কিরা-কসমের কোন মূল্য নেই—তাহলে হয়ত ওরা ওয়াদা ভঙ্গ করা থেকে বিরত থাকবে।

নবী করীম (স) কাফিরদের সাথে করা চুক্তি রক্ষায় দৃষ্টান্তহীন অবদান রেখেছেন। সেই চুক্তির একটা ধারায় লিখিত হয়েছিলঃ 'মক্কার কোন লোক মদীনায় পালিয়ে গেলে ও ইসলাম কবুল করলেও তাকে মুশরিকদের নিকট মক্কায় ফেরত পাঠাতে হবে।

কোন কোন বর্ণনামতে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরই—[আবার অপর একটি বর্ণনানুযায়ী রাসূলে করীম (স)-এর মদীনায় ফিরে আসার পর] আবূ বুচাইর নামক মক্কারত ইসলাম গ্রহণকারী এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হলো। সে মক্কায় ইসলাম কবুল করলে মুশরিকরা তাকে লৌহ-শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছিল। পরে কোনভাবে সুযোগ পেয়ে সেই শৃঙ্খল পরা অবস্থায় পালিয়ে গিয়ে সে রাসূলে করীম (স)-এর সম্মুখে উপস্থিত হলো। তখন সেই লোক বললঃ

ইয়া রাসূল! আপনি কি আমাদের মুশরিকদের হাতে ফিরিয়ে দেবেন? জবাবে নবী করীম (স) বললেনঃ

يَابَا بُصَيْرٍ اِنْطَلِقْ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى سَيَجْعَلُ وَلِمَنْ مَّعَكَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فَرَجًا وَّمَخْرَجًا .

হে আবূ বুচাই। সন্ধি অনুযায়ী তোমাকে মক্কায় ফিরিয়ে দিতে বাধ্য। অতএব তুমি যাও। আল্লাহ্ তোমার জন্য এবং তোমার মত দুর্বল অবস্থায় পতিত লোকদের জন্য নিশ্চয়ই কোন সুযোগ এবং মুক্তির কোন পথ বের করে দেবেন।[১]

---

১. سيرة ابن هشام ج:٢، ص: ٣٢٣

আবূ জান্দালের ঘটনা আরও মর্মস্পর্শী। ঠিক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার মুহূর্তে আবূ জান্দাল জিঞ্জির বন্দী অবস্থায় সন্ধিস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন। কুরাইশ সরদার সুহাইল তাকে চপেটাঘাত করে। এই মুহূর্তে চৌদ্দশ' কোষ মুক্ত কৃপাণ তার মস্তকে পড়তে কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু না, ইসলাম অশান্তি চায় না, সন্ধিশর্তের খেলাফ করারও অনুমতি দেয় না।[১]

এবং বাস্তবিকই আল্লাহ্ তা'আলা কিছু দিনে মধ্যেই তাদের জন্য মুশরিকদের কবল থেকে মুক্তিলাভের বিরাট সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে তার বিস্তারিত বিবরণ পঠিতব্য।

সেই দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا - وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ - وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (الانفال: ٧٢)

আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরাত করে দারুল-ইসলামে আসেনি, তাদের অভিভাবক হওয়ার কোন দায়িত্ব তোমাদের উপর বর্তে না, যতক্ষণ না তারা হিজরাত করে আসছে। কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে তারা যদি তোমাদের নিকট সাহায্য চায়, তাহলে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তা-ও এমন কোন জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হতে পারবে না, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে। বস্তুত তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ্ তা দেখছেন।

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় ইসলামের দৃষ্টিতে বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীর মধ্যে কৃত চুক্তি রক্ষা করা সর্বোপরি কর্তব্য। এমনকি কাফির-মুশরিকদের নির্যাতনাধীন নিপীড়িত মুসলিমদের সাহায্যার্থেও সেই চুক্তির বিরুদ্ধে কাজ করা যাবে না— সেই চুক্তি যে ধরনেরই হোক না কেন।

ইসলাম ও বিশ্বশান্তি

'শান্তি' কথাটি খুবই লোভনীয়, তা শুনবার জন্য মানুষ সব সময়ই উৎকর্ণ হয়ে থাকে। কেননা মানুষ স্বভাবতই শান্তির পক্ষপাতী, অশান্তির বিরুদ্ধে। মানুষ অন্তর দিয়ে কামনা করে, সর্বত্র শান্তি বজায় থাকুক, একবিন্দু অশান্তিও যেন কোথাও না থাকে, অশান্তির কারণ যেন কখনই না ঘটে। দুনিয়ার মানুষ শান্তির জন্য পাগল। আর দুনিয়ার বৃহৎ শক্তিবর্গ নিত্য নতুন শানিত মারণাস্ত্র

১. سيرة ابن هشام ج: ٤ ص: ٢١٨، الكامل للجزرى ج: ٢ ص: ١٢٨
اعلام الورى للطبرسى ص: ٩٧

নির্মাণে জাতীয় সম্পদের বেশীর ভাগ ব্যয় করছে। নিজেদের রক্ত-পিপাসা চরিতার্থ করার কুমতলবে কৌশলের পর কৌশল আঁটছে। তাদের পারস্পরিক চ্যালেঞ্জ শুনে বিশ্বমানবতা ভয়ে থরথর করে কাঁপছে।

কিন্তু মানুষ ভয়ে যতই কাঁপুক, শান্তির কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না; শুধু তাই নয়, শান্তি যেন ক্রমশ কঠিন থেকেও কঠিনতর হয়ে উঠছে। বৃহৎ শক্তিবর্গ যেমন করে মারণাস্ত্র নির্মাণে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে, তাতে যে কোন মুহূর্তে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যাওয়া অবধারিত মনে হয়। কেননা বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের সাম্রাজ্যবাদী চপল নীতির ফলে দুনিয়ার বিভিন্ন দিকে স্থানীয় বা আঞ্চলিক সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেছে এবং বছরের পর বছর অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, তবু তার মীমাংসা বা সমাপ্তি হচ্ছে না। তাতে মনে হয়—তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বশান্তির কোন সম্ভাবনাই লক্ষ্য করা যাবে না।

অপরদিকে বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যাতে বেঁধে না যায়, সে জন্য চেষ্টারও কোন অভাব নেই। এজন্য বড় বড় সভা-সম্মেলন হচ্ছে, দাবির প্রচণ্ডতাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে, মিছিল-বিক্ষোভ হচ্ছে। কেননা বিশ্বের মানুষ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য আদৌ প্রস্তুত নয়। একথা সকলেরই জানা আছে যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি সত্যিই শুরু হয়, তাহলে বিশ্বমানবতা ও বিশ্বসভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে।

কিন্তু এতসব সত্ত্বেও বিশ্বযুদ্ধের আশংকা বিন্দুমাত্রও কমছে না। কেননা প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা ও অশান্তির কঠিন কারণসমূহ বিদূরণ কার্যত সম্ভব হয়ে উঠছে না। কোটি কোটি মানুষের বেঁচে থাকার আকূতি বৃহৎ শক্তিবর্গের কর্ণকূহরে প্রবেশ করছে না, মারণাস্ত্র নির্মাণের প্রস্তুতি বন্ধ হচ্ছে না, পরস্পরে হুমকি প্রতি হুমকি দেয়াও চলছে অবিরাম।

এই প্রেক্ষিতে একথা বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না যে, বর্তমান বিশ্বের পরাশক্তিগুলি একটা বিশ্ব রক্তপাত ছাড়া বোধ হয় থামবে না, যুদ্ধ প্রস্তুতি প্রতি মুহূর্ত বাড়তে বাড়তে এমন এক পর্যায়ে পৌছে যাবে, যখন প্রকৃত যুদ্ধ ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

তার কারণও রয়েছে। কেননা বর্তমান দুনিয়ার পরাশক্তিসমূহের নিকট মারণাস্ত্র ছাড়া মানবিক আদর্শের কিছুই নেই, যা তারা গ্রহণ করে নিজেরা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে, আর অপরাপর শক্তিগুলিকেও যুদ্ধ থেকে বিরত রাখবে।

সত্যি কথা হচ্ছে, বর্তমান বিশ্ব নেতৃত্ব মনুষ্যত্ব বিবর্জিত। মানবিকতা বলতে কোন কিছুই কুত্রাপি দেখা যাচ্ছে না। ফলে পাশবিকতার ও পশ্বাচারই মানুষের

আকৃতিতে নৃত্য করছে সমগ্র বিশ্বের নাট্যমঞ্চে। পুঁজিবাদী—তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশ হোক, আর সমাজতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র হোক, মানবিক আদর্শের হাতিয়ার কারোর নিকটই নেই।

তাই একথা বলার সময় উপস্থিত হয়েছে যে, একমাত্র ইসলাম-ই পারে বর্তমান যুদ্ধ-ঝঞ্ঝা প্রকম্পিত বিশ্বকে শান্তির সন্ধান দিতে। বিশ্বশান্তির জন্য যে মানবিক আদর্শের প্রয়োজন, তা কেবল ইসলামেই রয়েছে।

তার বড় প্রমাণ, 'ইসলাম' শব্দটিই নির্গত হয়েছে 'সালামুন (سلم) ধাতু থেকে, যার আর এক অর্থ সন্ধি, সমৃদ্ধি। এই শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকেই কুরআন আহবান জানিয়েছে ঈমানদার লোকদেরকে। ইরশাদ হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً (البقرة: ٢٠٨)

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা সম্পূর্ণরূপে ইসলামে—সন্ধি, সমৃদ্ধিতে—প্রবেশ কর।

আর আজকের শত্রুও যদি সন্ধি ও সন্ধির পরিণতিতে সমৃদ্ধির জন্য আগ্রহান্বিত হয়, তা তার সাথে সন্ধির হাত মিলাতে দ্বিধা করা যাবে না। বলা হয়েছেঃ

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا (الانفال: ٦١)

শত্রুও যদি শান্তি ও সন্ধি-সমৃদ্ধির জন্য আগ্রহী হয়, তাহলে তুমিও তার জন্য আগ্রহী হও।

কুরআনের চিরন্তন আহবান হচ্ছে শান্তি রক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। এমন কি, পারিবারিক ক্ষুদ্র সংকীর্ণ পরিবেশেও শান্তি-সমৃদ্ধির ব্যবস্থা ইসলামই উপস্থাপিত করেছে। কেননা তাই হচ্ছে বৃহত্তর পরিবেশের প্রাথমিক স্তর। বলা হয়েছেঃ

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ (النساء: ١٢٨)

সন্ধি-সমৃদ্ধি-ই সর্বোত্তম ও সর্বাধিক কল্যাণের বাহক।

ইসলাম সব মু'মিন পুরুষ-নারীর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের কথা ঘোষণা করেছে। তাদের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ বা বিবাদ দেখা দিলে তা দূর করে অবিলম্বে সন্ধি কায়েম করে সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে। বলা হয়েছেঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ (الحجرات: ١٠

মু'মিনরা সব পরস্পর ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের এই ভাইদের মধ্যে সর্বদা সন্ধি-সমৃদ্ধি স্থাপন করতে থাক।

আর মুসলমানদের দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ ও যুদ্ধ যদি শুরু হয়ে যায়, তাহলে গোটা মুসলিম সমাজের দায়িত্ব হচ্ছে—তাদের মধ্যে অনতিবিলম্বে মীমাংসা করে দেয়া এবং প্রয়োজন হলে সীমালংঘনকারী পক্ষের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হয়ে যুদ্ধ করা, তাকে মীমাংসা মেনে নিতে বাধ্য করা। বলা হয়েছেঃ

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ - فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الحجرات : ٩)

মু'মিনদের দুটি পক্ষ যদি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে হে মুসলিমগণ! তোমরা সেই পক্ষদ্বয়ের মাঝে সন্ধি করে দাও। পরে যদি এক পক্ষ অপর পক্ষের উপর সীমালংঘন ও আগ্রাসন করে বসে, তাহলে তোমরা সকলে সম্মিলিতভাবে সেই পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না সেই পক্ষ আল্লাহ্‌র ফয়সালা—মীমাংসার দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে তাহলে তখন উভয় পক্ষের মাঝে ন্যায়পরতা সহকারে মীমাংসা ও সন্ধি করে দাও। আর তোমরা সকল ক্ষেত্রে সুবিচার ও ন্যায়পরতাকে প্রতিষ্ঠিত করবে। কেননা আল্লাহ্ ন্যায়পরতা ও সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন।

ইসলামের এসব আদেশ ও বিধানের চরম লক্ষ্যই হচ্ছে শান্তি রক্ষা, শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা, যেন মানুষ পরম শান্তি নিরাপত্তা সহকারে জীবন-যাপন করতে পারে। ইসলামের এই লক্ষ্য যেমন মুসলিম জনগণের মধ্যে, তেমনি সমগ্র মানব সমাজের মধ্যেও নিবদ্ধ। তাই আল্লাহ্ বলেছেনঃ

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً - وَاللَّهُ قَدِيرٌ - وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الممتحنة : ٧)

অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তোমাদের ও যাদের সাথে আজ তোমরা শত্রুতার সৃষ্টি করে ফেলেছ তাদের মধ্যে ভালোবাসার সঞ্চার করে দেবে। আল্লাহ্ তো বড়ই শক্তিমান, তিনি অতীব ক্ষমাশীল, দয়াবান।

বস্তুতই ইসলাম মানব জীবনের সকল দিকে ও ক্ষেত্রেই শান্তি স্থাপনের পক্ষে সচেষ্ট।

নবী করীম (স) আল্লাহ্‌র এই বিধানকে বাস্তবে অনুসরণ করেছেন এবং সমস্ত কাজ আল্লাহ্‌র দেখিয়ে দেয়া পন্থা ও পদ্ধতিতে আঞ্জাম দিয়েছেন।

মক্কা বিজয়কালে তিনি যে পরম মানবতাবাদী অবদান রেখেছেন, তা চিরকালের ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। তিনি সেদিন হযরত সায়াদ

ইবনে উবাদা (রা)-র হাতে পতাকা দিয়েছিলেন। তিনি সেই পতাকা নিয়ে যখন অগ্রসর হলেন, আবূ সুফিয়ানকে দেখতে পেলেন। তিনি তাকে সম্বোধন করে বললেনঃ

يَا أَبَا سُفْيَانَ الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ، الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْحُرْمَةُ، الْيَوْمَ أَذَلَّ اللّٰهُ قُرَيْشًا ـ

হে আবূ সুফিয়ান! আজকের দিন লড়াই জবাইর দিন, আজকের দিন সমস্ত হারাম হালাল হওয়ার দিন, আজ আল্লাহ্ কুরাইশদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন।

একথা শুনতে পেয়েই নবী করীম (স) বলে উঠলেনঃ

الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَرْحَمَةِ، الْيَوْمَ أَعَزَّ اللّٰهُ قُرَيْشًا ـ

না, আজকের দিন ক্ষমা ও দয়ার দিন। আজ-ই আল্লাহ্ কুরাইশদের সম্মানিত করেছেন।[১]

এ তো অনেক পরবর্তী সময়ের কথা। তার পূর্বে হুদায়বিয়ার সন্ধি মক্কার কুরাইশদের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। হুদায়বিয়ার এই সন্ধির ইতিহাস ও দলীল-দস্তাবেজ ইসলামের শান্তি প্রয়াসের উজ্জ্বল অকাট্য দলীল। তাতে কুরাইশদের দাবি অনুযায়ী রাসূলে করীম (স)-এর নামের পর 'রাসূলুল্লাহ্' লেখাও বাদ দিয়েছিলেন।[২]

যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে ইসলামের নীতি

প্রাচীন কালের ন্যায় আধুনিক কালের যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারটি অত্যন্ত নাজুক ও মর্মস্পর্শী। আন্তর্জাতিক ও বৈদেশিক রাজনীতির দিক দিয়ে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধবন্দীদের কতকগুলি বিশেষ অধিকার প্রখ্যাত 'জেনেভা কন্‌ভেশনে' স্বীকৃত হয়েছে এই সেদিন। কিন্তু ইসলাম তাদের জন্য বিশেষ মর্যাদার কথা ঘোষণা করেছে চৌদ্দশ বছর পূর্বে। আর সেই মর্যাদা রক্ষার জন্য জরুরী আইন-বিধানও উপস্থাপিত করেছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধবন্দী দুই প্রকারেরঃ

যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ড চলাকালে যারা আত্মসমর্পণ করেনি; কিন্তু তারা বিজয়ী বাহিনীর হাতে বন্দী হয়েছে, এদের ব্যাপারে সরকারের ইখ্‌তিয়ার রয়েছে, তাদের হত্যা করতে পারে। বিপরীত দিক দিয়ে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা যেতে পারে, যেন ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যায়। এরা এক ধরনের যুদ্ধবন্দী।

---

১. المغازى للواقدى ج:٢ ص:٨٣١– ٨٢٢

২. سيرة ابن هشام ج:٤ ص:٣١٨، الكامل للججزرى ج:٢ ص:١٣٨
اعلام الورى للطبرسى ص:٩٧

অপর ধরনের যুদ্ধবন্দী তারা, যারা যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর বিজয়ী বাহিনীর হাতে বন্দী হবে। এদেরকে হত্যা করা যাবে না। এ ধরনের বন্দীদের সম্পর্কে ইসলামের বিধান হলো. সরকার হয় নিছক অনুগ্রহের বশবর্তী হয়ে মুক্ত করে দেবে, না হয় বিনিময় গ্রহণ করে ছেড়ে দেবে। এর কোনটি সম্ভব না হলে তাদেরকে দাস বানিয়ে রাখা হবে। এই সময় তারা ইসলাম কবুল করলেও তাদের এই দাস-অবস্থা পরিবর্তিত হবে না। ফিকহ্‌বিদদের অধিকাংশই এই মত পোষণ করেন। এ পর্যায়ে কুরআন মজীদের ঘোষণা হচ্ছেঃ

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۚ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (الانفال: ٦٧)

কোন নবীর নিকট বন্দী পড়ে থাকা শোভন নয়—যতক্ষণ না সে যমীনে শত্রুবাহিনীকে নিঃশেষ ও খুব বেশী করে রক্তপাত করবে। তোমরা দুনিয়ার স্বার্থ চাও, অথচ আল্লাহ্‌র লক্ষ্য হচ্ছে পরকাল। আর আল্লাহ্ সর্বজয়ী সুবিজ্ঞানী।

আয়াতের স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, পৃথিবীতে ইসলামের দুশমনদের রক্তপাত চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছানো এবং পৃথিবীতে ইসলামের কর্তৃত্ব, সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করাই নবীর দায়িত্ব, যেন মুশরিক ও কাফিরদের ঔদ্ধত্যের মস্তক চূর্ণ হয়, ধুলায় লুণ্ঠিত হয় এবং দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে যায়। বন্দীদের প্রথম প্রকারের সাথে এ কথার মিল রয়েছে এবং অপর আয়াতে বলা হয়েছেঃ

فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (الانفال: ٥٧)

অতএব এই লোকদেরকে যদি তোমরা যুদ্ধের ময়দানে ধরে ফেলতে পার, তাহলে তাদের এমনভাবে বিধ্বস্ত করবে যে, অপর যেসব লোক তাদের মত আচরণ করবে, তারা যেন এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

মুসলমানদের সাথে চুক্তিভঙ্গকারীদের সম্পর্কে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। এতে নবী করীম (স)-এর প্রতি তাকীদ করা হয়েছে যে, ইসলামী বাহিনী যখন ময়দানে কাফির-মুশরিকদের সাথে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাতে জয় লাভ করবে, তাদেরকে ধরে ফেলতে পারবে, তখন তাদের উপর ওয়াদা ভঙ্গের চূড়ান্ত ধরনের প্রতিশোধ নিতে হবে, তাদের ক্ষেত্রে নির্মম শাস্তি কার্যকর করতে হবে। তাদের উপর এমন প্রভাব ফেলতে হবে, যেন তা দেখে অন্যান্য লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করে, রীতিমত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, ভয়ে থর-থর করে কাঁপে এবং চুক্তিভঙ্গ করার দুঃসাহস যেন কেউ না করতে পারে। তারা যেন নিরুপায় ও অক্ষম হয়ে মুসলমানদের সাথে সংঘর্ষে আসার ইচ্ছা চিরতরে ত্যাগ করে ও স্থান

ত্যাগ করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে। উদ্ধৃত আয়াতটি এই প্রথম প্রকারের বন্দীদের সম্পর্কে কথা বলছে। যেহেতু যুদ্ধ চলাকালে—যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই তাদেরকে পাকড়াও করা হয়েছে, তাই তাদেরকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করতে হবে। আল্লাহ্‌র কথাঃ

فَشَرِّدْبِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ

তাদের এমন কঠিন শাস্তি দেবে যে, পিছনের লোকেরা ভয় পেয়ে পিছু হটতে ও সম্মুখ-সমর থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

সেই সাথে আল্লাহ্‌র এই কথাটিও পঠনীয়ঃ

فَاِذَا لَقِيتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ - حَتّٰى اِذَا اَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ - فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا (محمد: ٤)

অতএব এই কাফিরদের সাথে যখন তোমাদের সম্মুখ-সংঘর্ষ সংঘটিত হবে, তখন প্রথম কাজ-ই হলো গর্দানসমূহ কর্তন করা। এমনকি তোমরা যখন তাদেরকে খুব ভালোভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলে, তখন বন্দীদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেল। অতঃপর (তোমাদের ইখতিয়ার রয়েছে যে,) অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে অথবা রক্তমূল্য গ্রহণের চুক্তি করবে—যতক্ষণ না যুদ্ধাস্ত্র সংবরণ করে।

মনে হয়, 'যুদ্ধ যতক্ষণ না অস্ত্র সংবরণ করে' কথাটি 'গর্দান মারা—কর্তন করা' কাজের শেষ মুহূর্ত অর্থাৎ হত্যা ও শাস্তিদানের কাজটি করতে হবে যুদ্ধ বন্ধ করার লক্ষ্যে। অতএব যুদ্ধক্ষেত্রে আটককৃত লোকদের হত্যা করার জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট সময় হচ্ছে যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত। অতঃপর এ কাজ আর চলতে পারে না।

আর যাদেরকে যুদ্ধ শেষ হওয়া ও অস্ত্র সংবরণের পর বন্দী করা হবে, তাদের সম্পর্কে কুরআনের ফয়সালা হচ্ছেঃ

حَتّٰى اِذَا اَثْخَنْتُمُوهَا فَشُدُّوا الْوَثَاقَ اِمَّا مَنًّا وَاِمَّا فِدَاءً

এমনকি তোমরা যখন তাদেরকে খুব ভালোভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলে, তখন বন্দীদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেল। অতঃপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে অথবা রক্ত বিনিময়ে ছেড়ে দেবে।

এ আয়াত ইসলামী সরকারকে ইখতিয়ার দিচ্ছে, বিনামূল্যে-বিনা বিনিময়ে ছেড়ে দেবে, না হয় বন্দী বিনিময় করবে কিংবা নগদ মূল্য গ্রহণ করে ছেড়ে দেবে।

তবে উক্ত পন্থা দু'টির কোন একটি করাও সম্ভব না হলে তখন তাদেরকে দাস বানিয়ে রাখবে। এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (স)-এর হাদীসে বিস্তারিত বিধান দেয়া হয়েছে।

এখানে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছেঃ

প্রথম—যুদ্ধ চলাকালে ধৃত বন্দীদের হত্যা করা একটা বিশেষ অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। বিশেষ সময় বা কালের সাথে নয়। বরং এ সিদ্ধান্ত চিরকালের কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর এবং শাশ্বত, যদিও তা একটা বিশেষ অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ [illegible] অবস্থার প্রেক্ষিতে এই বিধান দেয়া হয়েছে, সেই রূপ অবস্থা যখন এবং যেখানেই দেখা দেবে তখন এই নির্দেশ পালনীয় হবে। অনুরূপ অবস্থা বন্দীদের বাঁচিয়ে রাখা উচিত হবে না। ইসলামী ইতিহাসের প্রথম দিকে এরূপ অবস্থা বারবার দেখা দিয়েছে এবং তখন তা-ই করা হয়েছে, যার নির্দেশ উক্ত আয়াতে দেয়া হয়েছে। সেকালে এই বন্দীদের বাঁচিয়ে রেখে তাদের সংরক্ষণ করা নানা কারণেই অসম্ভব ছিল, এ কথা যেমন সত্য, তেমনি এ কথায়ও কোন সন্দেহ নেই যে, এই সব যুদ্ধরত অবস্থায় ধৃত শত্রুসৈন্যকে বাঁচিয়ে রাখা ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে কঠিন বিপদ ও বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারত।

এই প্রেক্ষিতেই কুরআনের এ সিদ্ধান্ত বিবেচ্য ও বিচার্য। তবে বর্তমান কালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মুসলিমগণ যখন শক্তিশালী ও উক্ত রূপ অবস্থায় ধৃত শত্রুসৈন্যকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হওয়া ও তাদের সংরক্ষণ খুব একটি দুঃসাধ্য না হওয়ার প্রেক্ষিতে—বিশেষ করে তাদের হত্যা করায় মুসলিমদের শক্তি বৃদ্ধি ও শত্রুপক্ষের দুর্বল হয়ে পড়ার তেমন কোন সম্ভাবনা নেই—তখনও কি এই সিদ্ধান্তই কার্যকর করা হবে?

হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত কুরআনী ফিকহ্‌বিদ আল্লামা আল-জাসসাস এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করে লিখেছেনঃ

> কুরআনের উপরোক্ত বিধান দেয়া হয়েছিল যখন মুসলিমদের সংখ্যা ছিল খুবই কম, আর মুশরিক-কাফির শত্রুদের সংখ্যা ছিল বিপুল। এরূপ অবস্থায় মুশরিকদের রক্তপাত করা ও হত্যাকান্ডের দ্বারা তাদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত করার পর যারা থেকে যাবে তাদের বাঁচিয়ে রাখা জায়েয। তাই উক্ত হুকুমটি তখনকার জন্য কার্যকর, যখন সেই অবস্থা দেখা দেবে যে অবস্থা প্রাথমিক কালের মুসলমানদের ছিল।[১]

আল্লামা রশীদ রিজা শত্রু নিধনযজ্ঞের দর্শন পর্যায়ে বলেছেনঃ

১. احکام القران ج:۳ ص:۳۹۱،ایضاح ص: ۷۲

দুইটি শত্রু বাহিনী যখন পরস্পরের সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হবে, তখন শত্রু হত্যা ও নিধন কাজে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করা আমাদের কর্তব্য। তাদেরকে বন্দী করতে চেষ্টা না করাই উচিত। কেননা তাতে আমাদের দুর্বলতাই প্রমাণিত হবে। আর ওরা আমাদের উপর অগ্রবর্তিতাই পেয়ে যাবে। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা যখন শত্রুদের হত্যা কার্য সম্পন্ন করে ফেলব—ও ওদের হত্যা ও জখম করব, তখন ওদের উপর আমাদের অগ্রবর্তিতা প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই শেষ মুহূর্তে যাদের ধরা হবে তাদেরকেই বন্দী বানানো হবে।[১]

দ্বিতীয়, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ধৃত শত্রুসৈন্যদের ব্যাপারে তিনটির যে কোন একটি পন্থা গ্রহণ করার রাষ্ট্র-সরকারের ইখতিয়ার রয়েছে—তন্মধ্যে তাদেরকে দাস বানাবার-ও ইখ্‌তিয়ার, এই পর্যায়ে খানিকটা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

দাস বানানোর মূলে প্রধান কারণ এই যে, কোনরূপ বিনিময় ব্যতীতই কিংবা বিনিময়ের ভিত্তিতে তাদেরকে ছেড়ে দিলে পুনর্বার তাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানো—ব্যাপকভাবে আক্রমণ করে বসা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। এই আশংকা একটা যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি রচনা করে। এছাড়া বর্তমান দুনিয়ার রেওয়াজ অনুরূপ কাঁটা তারের বেড়া রচনা করে তার মধ্যে আটকে রাখাও সব সময় সহজ বা সম্ভব হয় না। তখন বন্দীদেরকে দাস বানিয়ে নাগরিকদের মালিকানায় সঁপে দিয়ে 'হজম' (absorb) করে ফেলা ছাড়া অন্য কোন উপায়ই থাকে না।

উপরন্তু যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এই বন্দীদেরকে হত্যা করার কোন সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে না। এরূপ অবস্থায় দাস বানিয়ে মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়ার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না।

বরং এই পন্থা গ্রহণে একটি বিরাট মানবিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তা এভাবে যে, এই বন্দীদেরকে যখন বন্দী দশা থেকে মুক্ত করে মুসলমানদের মালিকত্বে—অভিভাবকত্বে—ছড়িয়ে দেয়া হবে, তখন তারা মুসলমানদের নিকট-সংস্পর্শে সাহচর্যে আসবার, তাদের মানবিক সহানুভূতি ও দায়িত্ব সচেতনতা সঞ্জাত লালন-পালন পেয়ে তারা মুক্ত-স্বাধীন জীবন যাপনেরই স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে। তখন তারা ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের ইসলামী চরিত্র অনুধাবন ও গ্রহণ করার বিরাট সুযোগ পেয়ে যাবে।

এরূপ অবস্থায় বন্দীদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামী রাষ্ট্র সরকারকে তিনটির যে-কোন একটি পন্থা গ্রহণের ইখতিয়ার দিয়েছেন, যেন বাস্তব অবস্থা

১. تفسير المنار ج:١٠ص:٩٧-٩٨

প্রেক্ষিতে উত্তম বিবেচিত পন্থা গ্রহণ সম্ভবপর হয়—এ যেমন মহান আল্লাহ্র একটি অতি বড় মেহেরবানী, তেমনি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত—তাতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না।

ইসলামী সমাজে দাসদের অবস্থান

এ কথা বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না যে, ইসলামী সমাজে এই দাসদের অবস্থান অন্যান্য অনৈসলামী সমাজে 'স্বাধীন' নামে পরিচিত নাগরিকদের তুলনায় কিছু মাত্র খারাপ নয়। কেননা যুদ্ধবন্দী—দাসদের ব্যাপারে ইসলামের একটা বিশেষ মানবিক নীতি রয়েছে। ইসলাম এই বন্দীদের প্রতি মানবিক মর্যাদা দেয়ার তাকীদ করেছে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি। সেই সাথে তাদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শন মমত্ববোধ ও শুভ আচরণ গ্রহণের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ

اِسْتَوْصُوْا بِالْاُسَارٰى خَيْرًا ـ

তোমরা বন্দীদের প্রতি কল্যাণময় আচরণ গ্রহণ করবে।[১]

খায়বর যুদ্ধশেষে হযরত বিলাল (রা) দুইজন নারীকে ধরে ইয়াহুদী পুরুষ নিহতদের স্তূপের নিকট নিয়ে গেলেন তাদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে। নিহতদের স্তূপ দেখে একটি মেয়ে ভয়ে-আতংকে চিৎকার করে উঠল এবং নিজের মাথায় মাটি মেখে বিলাপ করতে শুরু করে দিল। পরে দুজনকেই বাঁচিয়ে দেয়া হয়। তাদের একজন হচ্ছেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত সফীয়া বিনতে হাই ইবনে আখতাব (রা)।

রাসূলে করীম (স) মহিলা দুইজনের পাকড়াওকারী হযরত বিলাল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ

اُنْزِعَتْ مِنْكَ الرَّحْمَةُ يَا بِلَالُ حِيْنَ تَمُرُّ بِامْرَاتَيْنِ عَلٰى تَتْلٰى رِجَابِهِمَا

হে বিলাল! তুমি যখন মহিলা দুইজনকে তাদের পুরুষদের বধ্য ভূমিতে নিয়ে গিয়েছিলে, তখন দয়া-মায়া বলতে কি তোমার অন্তরে কিছুই ছিল না?

বন্দীদের রীতিমত খাবার ও পানীয় দেয়ার জন্য নবী করীম (স) বিশেষভাবে তাকীদ করেছেন। বলেছেনঃ

اَطْعَامُ الْاَسِيْرِ حَقٌّ عَلٰى مَنْ اَسَرَهُ

বন্দীদের পানাহারের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব বন্দীকারীর উপর অর্পিত।

---

১. سيرة ابن هشام ج:٢، ص: ٢٩٩

ইসলাম হত্যাকাণ্ড ঘটানোর ক্ষেত্রেও মানবিকতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। নিহত ব্যক্তির হাত-পা-নাক-কান ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটতে অত্যন্ত জোরের সাথে নিষেধ করেছে। এজন্য কুরআনে হেদায়েত দেয়া হয়েছেঃ

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ - وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ - وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ

(النحل: ١٢٦-١٢٧)

আর তোমরা যদি প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তাহলে শুধু ততটুকুই গ্রহণ করবে, যতখানি তোমার উপর অত্যাচার করা হয়েছে। আর যদি ধৈর্য ধারণ করতে পার তাহলে নিঃসন্দেহে ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য অতীব কল্যাণ রয়েছে।

হে মুহাম্মাদ! ধৈর্য সহকারে কাজ করতে থাক—আর তোমাদের এই ধৈর্যও আল্লাহ্রই দেয়া তওফীকের ফল— এই লোকদের কার্যকলাপে তুমি দুঃখিত হবে না এবং তাদের অবলম্বিত কৌশল-ষড়যন্ত্রের দরুন তোমার দিল ভারাক্রান্ত করো না।[১]

সীমালংঘনকারীদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

ইসলামে যুদ্ধের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিও অন্যতম পন্থা। ইসলামী অবস্থার প্রেক্ষিতে ও প্রয়োজনবোধে এই পন্থার আশ্রয় নিতে পারে। তবে সেজন্য সামরিক লক্ষ্য সুস্পষ্টরূপে থাকা জরুরী শর্ত। অর্থাৎ কৌশলগত লক্ষ্যের বেষ্টনীতে শত্রুর সামরিক তৎপরতা বন্ধ করা উদ্দেশ্যেই তা করা যেতে পারে। ইসলাম এই কৌশলটি প্রয়োগ করার অনুমতি দেয় কেবলমাত্র সীমালংঘনকারী ও আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে। সাধারণ ও নিরপরাধ লোকদেরকে কোনরূপ অসুবিধায় ফেলার কোন অধিকার ইসলাম কাউকেই দেয় না।

আর এটাই নবী করীম (স)-এর আদর্শ। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাচ্ছেঃ

রাসূলে করীম (স)-এর এক অশ্বারোহী বাহিনী সুমামাতা ইবনে আসাল নামক এক ইমামা অধিবাসীকে বন্দী করে। রাসূলে করীম (স) তার সাথে শুভ আচরণ গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর তাকে মুক্ত করে দেয়া হয়। পরে সে ইসলাম কবুল করে। পরে মক্কায় উমরা করার জন্য চলে যায়। তখন মক্কার কুরাইশরা তাকে আটক করে এবং হত্যা করার সিদ্ধান্ত

১. ওহোদের যুদ্ধে হযরত হামযা (রা)-র লাশ পেট ছেড়া ও কলিজাশূন্য অবস্থায় দেখতে পেয়ে রাসূলে করীম (স)-এর মনে যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, তারই প্রেক্ষিতে এই আয়াত। তিনি ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

নেয়। কিন্তু তাদের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তি বললঃ লোকটিকে ছেড়ে দাও। কেননা তোমরা কুরাইশরা নিজেদের জীবিকার জন্য ইমামা যাতায়াত করতে বাধ্য হও। পরে তারা তাকে ছেড়ে দেয়। অতঃপর লোকটি ইমামা উপস্থিত হয়ে মক্কার উপর অর্থনৈতিক বয়কট চালু করে দেয় এবং মক্কায় কোন জিনিসই যাতে না পৌছায়, তার শক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলে মক্কার অধিবাসীরা ভীষণ সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। তখন মক্কার লোকেরা রাসূলে করীম (স)-কে পত্র লিখে এই মর্মেঃ

> আপনি তো রক্ত সম্পর্কের হক আদায়ের উপর খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অথচ আপনিই তাদের সাথে রক্তসম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। আপনি আপনার পৈতৃক বংশের লোকদের তরবারী দ্বারা হত্যা করেছেন। আর বাচ্চাদের হত্যা করিয়েছেন ক্ষুধায় কাতর করে।

এই পত্র পেয়ে নবী করীম (স) সুমামা (রা)-কে নির্দেশ দিলেন তাঁর আরোপিত প্রতিবন্ধকতা প্রত্যাহার করার।[১]

শত্রুর বিরুদ্ধে আরোপিত অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি শত্রুকে দমন করার একটা কৌশল হওয়া এবং ইসলামে তা অবৈধ না হওয়া সত্ত্বেও তা প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন নিছক এই কারণে যে, তদ্দরুন সাধারণ নিরাপরাধ মানুষ কষ্ট পাচ্ছিল।

যুদ্ধাস্ত্র সীমিতকরণ

বর্তমান সময়ের দুনিয়ার প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ বন্ধকরণ কিংবা সীমিতকরণ পর্যায়ে যথেষ্ট চেষ্টা-প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দুনিয়ার শান্তিকামী চিন্তাবিদ মনীষিগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যও প্রচার করে আসছেন! কিন্তু এ কথায় কোনই সন্দেহ নেই যে, এর কোন কিছুই সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। বিশেষ করে দুনিয়ার বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গ মুখে অস্ত্র সংবরণের কথা যত বলে, তার তুলনায় অনেক বেশী যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ করছে। তদ্দারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করছে যেমন, তেমনি দুনিয়ার বাজারে লোকচক্ষুর অন্তরালে ব্যাপকভাবে অস্ত্র ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে বলা যায়, বর্তমান দুনিয়ায় আন্তর্জাতিক ব্যবসা সবচাইতে বড় পণ্য হচ্ছে মানুষ মারার অস্ত্র। সারাটি দুনিয়ায় অস্ত্রের কালোবাজারী চলছে। আর দুনিয়ার যেসব বড় বড় দেশ অস্ত্র নির্মাণ বন্ধের জন্য বড় বড় কথা বলে, আন্তর্জাতিক সভা-সম্মেলন করে মানবদরদী বক্তৃতা-ভাষণ দিচ্ছে, তারাই এই মারণাস্ত্রের কালোবাজারীতে তীব্র প্রতিযোগিতা চালিয়ে

১. سيرة ابن هشام ج:٢، ص: ٦٣٩

যাচ্ছে। আসলে ওরা মানুষের প্রতি দরদ দেখাবার ভান করে মানুষ মারার হাতিয়ার দেশে দেশে পৌঁছিয়ে দিচ্ছে সেসব দেশের শাসক-বিরোধী নির্যাতিত জনতার রক্তের বন্যা প্রবাহিত করার লক্ষ্যে।

একটি কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। তা হচ্ছে, মানুষ স্বভাবতই আধিপত্য ও কর্তৃত্ব প্রবণ। প্রত্যেকেই চায়, অন্য সকলের উপর তার কর্তৃত্ব হোক, সকলেই তার কর্তৃত্ব মেনে চলুক। আর এজন্য লক্ষ্যার্জনের উপায় হিসেবেও উপায়-উকরণ পর্যায়ে অস্ত্র সংগ্রহ করা তার স্বভাব। অস্ত্র নির্মাণের ও নিত্য নব ও উন্নত মানের অ-সরল-অস্বাভাবিক (Sophisticated) অস্ত্র উদ্ভাবনের মূলে এই কারণ নিহিত বললে কিছু মাত্র অতুক্তি হবে না।

কাজেই অস্ত্র নির্মাণ বন্ধের কোন আন্দোলন সফল হওয়ার প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর।

ঠিক এই কারণে ইসলাম অস্ত্র নির্মাণ বন্ধ করার নির্দেশ দেয়নি। তবে ইসলামের অবদান হচ্ছে, অস্ত্র নির্মাণের লক্ষ্য বদলে দিয়েছে এবং অস্ত্রের ব্যবহার নৈতিক নিয়ম-নীতি ও বাধ্যবাধকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে চায়।

ইসলাম শুধু অস্ত্র নির্মাণ বা তার ব্যবহারই নয়, বিবাদ-বিসম্বাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ বা রক্তপাতের লক্ষ্য ও ক্ষেত্র হিসেবে সম্পূর্ণ নতুন জিনিস পেশ করেছে। ব্যক্তিগত বা জাতিগত আধিপত্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। কেননা শুধু মানুষকে মানুষের দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দী করার পরিণতিই নিয়ে আসে। তার পরিবর্তে ইসলাম মানুষকে একটি অনন্য সাধারণ আদর্শ দিয়েছে এবং মানুষের উপর নিজের বা নিজের জাতির নয়, একমাত্র আল্লাহ্‌র নিরংকুশ প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম করার আহবান জানিয়েছে।

এভাবে অস্ত্র ব্যবহারের লক্ষ্যই পরিবর্তিত হয়ে গেছে এবং সেই লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে শক্তি অর্জন ও অস্ত্র নির্মাণ-সংগ্রহ একান্ত জরুরী বলে ঘোষণা করেছে।

এক কথায় ইসলাম বৈষয়িক কোন জিনিসের পরিবর্তে ঈমান-আকীদা রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ লড়াই করার নির্দেশ দিয়েছে। ইসলামের এ লড়াই এবং অস্ত্রের ব্যবহার পাশবিকতার পরিবর্তে সম্পূর্ণ মানবিকতাবাদী, নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতার পরিবর্তে দয়া-ভালোবাসা ও সংশোধনী দৃষ্টিভঙ্গীতে চিরভাস্বর।

ইসলামের লক্ষ্য অর্জনের জন্য অস্ত্রের ব্যবহার ক্ষেত্র বিশেষে অপরিহার্য। বৈষয়িকতা—তথা আল্লাহ্‌দ্রোহিতামূলক জীবন-বিধানকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেই তথায়

আল্লাহ্-বিশ্বাসী ও খোদানুগত জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। তাই কুরআনের নির্দেশ হচ্ছেঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۔ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۔ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۔ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ (الانفال: ٦٠)

এবং তোমরা যতদূর তোমাদের পক্ষে বেশী শক্তি ও সদা সজ্জিত বাঁধা অশ্ববাহিনী সংগ্রহ ও প্রস্তুত করে রাখ। উহার সাহায্যে তোমরা আল্লাহ্‌র দুশমন ও তোমাদের দুশমনকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখবে—এছাড়া আরও দুশমন রয়েছে, যাদের তোমরা জানো না, আল্লাহ্ই তাদেরকে জানেন। আর আল্লাহ্‌র পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তার পুরা মাত্রার শুভ ফল তোমাদেরকে আদায় করে দেয়া হবে। তোমাদের উপর কখনই জুলুম করা হবে না।

আয়াতটি থকে স্পষ্ট জানা যায়, আল্লাহ্ নিজেই মুসলিমদের শক্তি ও যুদ্ধ-সরঞ্জাম সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছেন; কিন্তু তার পশ্চাতে উদ্দেশ্য হিসেবে নির্দেশিত হয়েছে মুসলমানদের ও আল্লাহ্‌র দুশমনদের ভীত-সন্ত্রস্ত করা, যেন তারা আল্লাহ্‌র দ্বীনের সাথে এবং সেই দ্বীনের ধারক মুসলিমদের সাথে শত্রুতা করার মত সাহসও না পায়; বরং তারা আল্লাহ্ ও মুসলিমদের ভয়ে সব সময় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। অন্য কথায় সর্বত্র যেমন আল্লাহ্‌র রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহ্‌র রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের এক মাত্র পক্ষপাতী মুসলিমদের প্রাধান্য স্থাপিত থাকে। আর এই শক্তি ও যুদ্ধের সরঞ্জাম সংগ্রহে যে ধন-সম্পদ নিয়োজিত ও ব্যয়িত হবে, তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় হিসেবে গণ্য হবে।

স্পষ্ট কথা, শক্তি ও অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহের মূল লক্ষ্যই হলো প্রধানত আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ও কাফেরী শক্তিকে ভীত-সন্ত্রস্ত রাখা।

ইসলামে কূটনৈতিক সতর্কতা-সংরক্ষণতা

ইসলামের একটা নিজস্ব সমর-নীতি ও সমর-কৌশল (Strategy) রয়েছে। শান্তি ও সন্ধির সময়ের জন্যও রয়েছে অনুসরণীয় বিশেষ নীতি ও আদর্শ। কূটনৈতিক রীতি-নীতি ও পদ্ধতি এই পর্যায়ে গণ্য।

ইসলামে কূটনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, রাষ্ট্রদূত ও রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের একটা বিশেষ স্থান ও মর্যাদা রয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে একটা বিশেষ সতর্কতা ও সংরক্ষণতা। তার দৃষ্টান্ত কুত্রাপি লক্ষ্য করা যাবে না।

ইসলামী রাষ্ট্রে বিদেশী রাষ্ট্রের কুটনীতিকদের পক্ষে এই রাষ্ট্রের আদর্শের পরিপন্থী মত প্রকাশেরও অধিকার রয়েছে। তা করলে তদ্দরুন তাকে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না। তার কোন ক্ষতি সাধিত হবে না ইসলামী রাষ্ট্র বা মুসলিম জনগণের হাতে।

এখানে আমরা এই পর্যায়ের একটি মাত্র ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত পেশ করছি। মিথ্যা নবুয়্যাতের দাবিদার মুসায়লামা ইবনে হুবাইব রাসূলে করীম (স)-এর নিকট লিখিত এক পত্র সহ দুইজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। তাতে লিখিত ছিলঃ

> আমি নবুয়্যাতের ব্যাপারে আপনার সাথে শরীক। তাই অর্ধেক দেশ আমার, আর অপর অর্ধেক কুরাইশদের জন্য। কিন্তু কুরাইশরা সীমালংঘনকারী লোক।

এই পত্রের বাহকদ্বয়কে রাসূলে করীম (স) জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'তোমরা দুইজন কি বল'? বললঃ আমাদেরও বক্তব্য তাই, যা এই পত্রে রয়েছে।

তখন নবী করীম (স) মুসায়লামাকে যে পত্র লিখেছিলেন, তা এইঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مِنْ مُّحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ اِلٰى مُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابِ، اَلسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اِمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ـ

> মহান দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদের নিকট থেকে মিথ্যাবাদী মুসায়লামার নিকট প্রেরিত এই পত্র। শান্তি তার প্রতি, যে আল্লাহ্র নিকট থেকে আসা হেদায়েতের বিধান মেনে নেবে ও অনুসরণ করে চলবে। অতঃপর বক্তব্য এই যে, এই পৃথিবীর মালিক তো আল্লাহ্। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। আর শুভ পরিণতি কেবলমাত্র মুত্তাকী লোকদের জন্য।[১]

নবী করীম (স) মুসায়লামা প্রেরিত দূতদ্বয়ের প্রতি যে আচরণ গ্রহণ করলেন, তা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে লক্ষণীয়। তারা দ্বীন-ইসলামের মূল আকীদার পরিপন্থী মত প্রকাশ করেছিল; কিন্তু রাসূলে করীম (স) সেজন্য তাদের প্রতি কোন আক্রমণাত্মক বা প্রতিশোধমূলক আচরণ গ্রহণ করেননি।

আর স্বয়ং মুসায়লামাকে রাসূলে করীম (স) যে জবাব লিখে পাঠিয়েছেন, তা আরও অধিক গুরুত্বের অধিকারী। দুইখানি পত্রের বক্তব্যের মধ্যে তুলনা করলেই উভয়ের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্যের আসল রহস্য উদঘাটিত হতে পারে। রাসূলে করীম (স) প্রেরিত পত্র থেকে নবুয়্যাতের পবিত্র ভাবধারার সৌরভ মন-মগজকে

---

১. سيرةابن هشام ج:٢، ص: ٦٣٩

আলোড়িত করে। তাতে নিহিত প্রকৃত নিষ্ঠা, নিঃস্বার্থপরতা, মহান আল্লাহ্র নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব মালিকত্বের অপূর্ব এবং অত্যন্ত বলিষ্ঠ প্রকাশ। আর অপর চিঠিটির ভাষাহীন স্বার্থপরতা, লোভ, অহংকার ও আত্মন্তরিতায় প্রকট।

একক ও পারস্পরিক ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি

রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির সাথে পারস্পরিক চুক্তিকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

১. এক-পক্ষীয় ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি।
২. দ্বি-পক্ষীয় চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি।

এক পক্ষীয় ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত সরল ও সহজ রূপ। একটি রাষ্ট্রীয় বা সার্বভৌম শক্তি কতগুলি নির্দিষ্ট ব্যাপারে প্রাথমিক পর্যায়ে অপর একটি সার্বভৌম শক্তি বা রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন ও রক্ষার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করে। তা স্বীকার করে নেয় যে, তাকে স্বীকৃতি (Recognition) দিচ্ছে, তার সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করতে আগ্রহী, তার উপর কোনরূপ আগ্রাসন না করার ওয়াদা করছে, তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারাদিতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, ইসলামে এরূপ চুক্তি প্রতিশ্রুতির দৃষ্টান্ত রয়েছে।

নবী করীম (স) তাবুক যুদ্ধে গমনকালে রোমান সাম্রাজ্যের সন্নিহিত এলাকায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। অতঃপর তাবুক উপস্থিত হলে আইলা অধিপতি ইয়াহ্ না ইবনে রুবা তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে রাসূলে করীম (স)-এর সাথে সন্ধি করল। নবী করীম (স) তাকে একটি লিখিত দলীল দিলেন। তাতে নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি লিখিত ছিলঃ

بسم الله الرحمن الرحيم ـ هذه امنة من الله ومحمد النبى رسول الله ليحنة رؤبة
واهل ايلة سفنهم وسيارتهم فى البر والبحر لهم ذمة الله وذمتمحمد النبى،
ومن كان معهم من اهل الشام اهل اليمن واهل البحر فمن احدث منهم حدثا
فانه لا يحول ما له دون نسفه و نفسه وانه طيب لمن اخذه من الناس وانه لا
يحل ان يمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يريدونه ـ

পরম দয়াময় দয়ালু আল্লাহ্র নামে। এটা নিরাপত্তা পত্র—আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূল নবী মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে ইয়াহ না ইবন রু'বা ও ইয়ামন অধিবাসীদের জন্য। স্থল ও জলভাগে তাদের জাহাজ-নৌকা ও অন্যান্য যানবাহন চলবে, ওদের জন্য আল্লাহ্র যিম্মা রয়েছে, রয়েছে নবী মুহাম্মাদের যিম্মা। আর সিরিয়া, ইয়ামন ও সমুদ্র এলাকার এবং তাদের সঙ্গী-সাথী

লোকগণও এই যিম্মাদারীর অন্তর্ভুক্ত। কেউ যদি তাদের মধ্য থেকে কোন দুর্ঘটনা ঘটায় তাহলে তাদের ধন-মাল তাদের জীবন-প্রাণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না; তা উত্তম-উৎকৃষ্ট বিবেচিত হবে যা লোকদের নিকট থেকে গ্রহণ করবে। তারা জল-পথে যেখানে উপস্থিত হবে, সেখানেই চলাচল করতে নিষেধ করা কারোর জন্য হালাল হবে না, এমনিভাবে স্থল ও জলপথে যেখানেই তারা উপস্থিত হবে, তাদের চলাচলে কোনরূপ বাধা দেয়া চলবে না।[১]

নবী করীম (স) এই লিখিত চুক্তিপত্রে উক্ত লোকদের জন্য সর্বাবস্থা ও সর্বক্ষণের জন্য পূর্ণ নিরাপত্তা দিলেন। তাদের বেঁচে থাকার ও জীবন যাপনের পূর্ণ অধিকার স্বীকার করে নিলেন। তাদের নিকট থেকে কোন জবাবী প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি গ্রহণ না করেই তিনি তাদের চলাচলের পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়ে দিলেন।

আর পারস্পরিক বা দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি আবার দুই ভাগে বিভক্ত। তাতে উভয় পক্ষই কতিপয় নেতিবাচক শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নেয়। যেমন উভয় পক্ষ একই ওয়াদা করল যে, তাদের কোন পক্ষই অপর পক্ষের জন্য কোন অসুবিধার সৃষ্টি করবে না, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না প্রভৃতি। কখনও এও হয় যে, উভয় পক্ষ-ই কতিপয় বিষয়ে ইতিবাচক কাজের প্রতিশ্রুতি দেয়। যেমন, পারস্পরিক ব্যবসা ও পণ্যের আমদানী-রফতানি করা, সাংস্কৃতিক চুক্তি—উভয় দেশ সাংস্কৃতিক বিনিময় করবে ইত্যাদি। ইসলামী রাজনীতিতে এই উভয় ধরনের চুক্তির দৃষ্টান্ত রয়েছে।

প্রথম ধরনের চুক্তির দৃষ্টান্ত হচ্ছে বনু জুম্‌রা'র ঘটনা।

নবী করীম (স) যখন 'আরওয়া' যুদ্ধে 'বিদান' উপস্থিত হলেন কুরাইশ ও কিনানা পুত্র আবদ মনাফ পুত্র বকর-পুত্র বনু জুম্‌রার সাথে মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে, এই সময় বনু জুম্‌রা রাসূলে করীম (স)-এর প্রতি সৌজন্যমূলক আচরণ (mockness gentleness) ও বিনয় প্রদর্শন করে। আর তার প্রতি সৌজন্য ও বিনয়মূলক আচরণ দেখিয়েছিল মখ্‌শী ইব্‌ন আমর আজ-জুমারী। আর সে ছিল তখনকার সময় তাদের প্রধান। পরে রাসূলে করীম (স) যখন বদর যুদ্ধে উপস্থিত হয়ে আবু সুফিয়ানের অপেক্ষা করছিলেন তার জন্য করা ওয়াদার কারণে, তখন মখ্‌শী ইব্‌ন আমর জুমারী—যে বিদান যুদ্ধে বনু-জুমরার প্রতি নম্রতা ও বিনয় দেখিয়েছিল—এসে বললঃ 'হে মুহাম্মাদ! আপনি কি এই পানির স্থানে কুরাইশদের সাথে মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে এসেছেন?' তখন নবী করীম (স) বললেনঃ

---

১. سيرة ابن هشام ج:٢، ص: ٥

হ্যাঁ, হে বনু জুমরার সরদার? তা সত্ত্বেও তুমি চাইলে তোমার ও আমাদের মধ্যে যে চুক্তি রয়েছে তা তোমার নিকট প্রত্যাহার করে দিতে পারি। অতঃপর আমরা পরস্পর যুদ্ধ করব। তারপর আল্লাহ্র আমাদের যে ফয়সালাই করে দেন...।[১]

হুদায়বিয়ার সন্ধিতেও অনুরূপ অবস্থাই দেখা দিয়েছিল।

আর ইতিবাচক বিষয়ে দুই পক্ষের মধ্যে চুক্তির দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে উল্লেখ্য হচ্ছে, হুদায়বিয়ায় নবী করীম (স) ও খুজায়া'র মধ্যে অনুষ্ঠিত সন্ধিচুক্তি। সে চুক্তির একটি ধারায় লিখিত হয়েছিলঃ 'যে লোক বা গোত্র মুহাম্মাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে চাইবে, সে তাই হবে। আর যারা কুরাইশদের সাথে চুক্তি করতে প্রস্তুত হবে, তারা তাই করবে। এই শর্তের ভিত্তিতে খুজায়া রাসূলে করীম (স)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। সে চুক্তিটি আধুনিক কালের প্রতিরক্ষামূলক চুক্তি'র মতই ছিল।

রাসূলে করীম (স)-এর জীবনের ঘটনাবলী থেকে জানা যায় যে, চুক্তি প্রত্যাহারের কাজ কখনও প্রত্যক্ষ ও সরাসরিভাবে সম্পন্ন হতো এবং কখনও তা হতো অপ্রত্যক্ষভাবে।

উত্তরকালে কুরাইশরা যখন বনু কিনানা'র সাথে অপ্রত্যক্ষভাবে অস্ত্র সাহায্য দানে অগ্রসর হলো, তখন নবী করীম (স) এই কাজকে চুক্তি ভঙ্গরূপে গণ্য করেছিলেন।

পরে কুরাইশ ও বনু বকর গোত্রদ্বয় যখন খাজাযা'র উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাতে তাদের খুব বেশী ক্ষতি সাধিত হলো। নবী করীম (স)-এর সাথে তাদের যে চুক্তি ছিল তার বিরুদ্ধ কাজ করল। তখন তিনি তাদের এই কাজকে হুদায়বিয়ায় অনুষ্ঠিত চুক্তির বিরুদ্ধতা ও চুক্তিভঙ্গ গণ্য করলেন। আর তারপরই নবী করীম (স) মক্কা বিজয়-অভিযানে গমন করেন।[২]

এইসব ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ইসলামের একটা বিশেষ নীতি ও আদর্শ রয়েছে। শরীয়াতের উৎস থেকে তা উৎসারিত।

সামরিক ঋণচুক্তি

যুদ্ধাবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের নিকট থেকে নগদ অর্থ বা প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র ঋণ বা ধারস্বরূপ গ্রহণ করতে পারে। নবী করীম (স) নিজেও তাই করেছেন। নাজরানের খৃষ্টানদের সাথে গৃহীত সন্ধিচুক্তিতেই তাদের উপর জিযিয়া ধার্য হওয়ার এবং সেই সাথে ত্রিশটি বর্ম, ত্রিশটি অশ্ব ও ত্রিশটি উট দেয়ার শর্ত করে নিয়েছিলেন। তাতে এ-ও লিখিত হয়েছিলঃ

---

১. سيرة ابن هشام ج:٢، ص: ٥

২. سيرة ابن هشام ج:٢، ص: ٣٩٠-٣٩٧

আমার প্রতিনিধিবর্গ যে অশ্ব ধার বাবদ গ্রহণ করবে, তারাই সেজন্য জামিন হবে। তারাই তা ফেরত দিবে। এর বদলে নজরান ও তার সঙ্গীরা আল্লাহর প্রতিবেশিত্ব ও আল্লাহর রাসূল নবী মুহাম্মাদ (স)-এর যিম্মা লাভ করবে তাদের নিজেদের উপর, তাদের মিল্লাতের উপর, তাদের এলাকার উপর, তাদের ধন-মালের উপর, তাদের উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকলের জন্য।.....[১]

রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্নকরণ

অপরাপর রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তিকরণ নিজেদের কল্যাণের দৃষ্টিতে যেমন ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে সম্পূর্ণ বৈধ, তেমনি অপর পক্ষের সেই চুক্তির স্পষ্ট লংঘন ও শত্রুতামূলক আচরণ গ্রহণের ফলে গোটা চুক্তিটির প্রত্যাহার এবং রাজনৈতিক-কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্নকরণের বৈধতা অবশ্যই বৈধ হবে। হুদায়বিয়ার সন্ধি এবং তার পরিণতি-ই তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

তবে চুক্তি প্রত্যাহার ও সম্পর্ক ছিন্নকরণের কাজটি অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত কারণে ও মানবিকতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হবে। বস্তুত স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্তসমূহ যখন অপর পক্ষ দ্বারা লংঘিত হবে, তখন সেই চুক্তিকে বহাল মনে করা এবং তাকে প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে প্রত্যাহার না করা ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হতে পারে। তাই উক্ত রূপ অবস্থায় চুক্তি প্রত্যাহৃত হওয়ার কথা জানিয়া দেয়া ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

اَلَّذِيْنَ عَاهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِىْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ....... وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ - اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ

(الانفال - ٥٦-٥٨)

যাদের সাথে তুমি সন্ধিচুক্তি করেছ, পরে তারা প্রত্যেকটি সুযোগেই তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ্কে একবিন্দু ভয় পায় না............

কখনও কোন জাতি-জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে তোমরা চুক্তিভঙ্গের ভয় পাও তাহলে তাদের সেই ওয়াদা-চুক্তিকে প্রকাশ্যভাবে তাদের মুখের উপর প্রত্যাহার কর। কেননা আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক—চুক্তিভঙ্গকারীদের আদৌ ভালোবাসেন না —পছন্দ করেন না।

বিজিত এলাকায় ইসলামের নীতি

দূর অতীত কাল থেকে এই রীতি চলে এসেছে যে, যখন কোন জাতি অপর জাতি ও রাষ্ট্রের উপর বিজয় লাভ করে ও তা দখল করে নেয়, তখন বিজয়ীরা

১. فتوح البلدان للبلاذرى ص: ٧٦

বিজিত এলাকায় না করে এমন কোন অপকর্ম—অত্যাচার, নিপীড়ন, লুণ্ঠন, নারী-ধর্ষণ, অপমান—নেই। কুরআন মজীদে সেই দিকে ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছেঃ

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ

(النمل: ٣٤)

রাজা-বাদশাহ—সাম্রাজ্যবাদীরা যখন কোন দেশ দখল করে বিজয়ী হয়ে তথায় প্রবেশ করে, তখন সেই দেশ ও জনবসতিটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ বিপর্যস্ত ও ধ্বংস করে দেয় এবং তথাকার সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে করে লাঞ্ছিত অপমানিত।........ওরা সকলেই এবং সব সময়ই তা-ই করে।

রাজা-বাদশাহ ও দেশ বিজয়ীদের এই মানবতা-বিরোধী কার্যকলাপের ইতিহাস যেমন দীর্ঘ, তেমনি অত্যন্ত মর্মান্তিক। আলেকজান্ডার মাকদুনী (দি গ্রেট) যখন পারস্যে প্রবেশ করেছিল, তথাকার দুর্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ধূলিসাৎ করে দিল, হাজার-হাজার বছর ধরে জ্বলা অগ্নিঘর ধ্বংস করল, পুজারীদের হত্যা করল, তাদের বই-পুস্তক-গ্রন্থাদি ভস্মীভূত করে দিল। শেষে পারস্য রাষ্ট্রের উপর নিজের শাসক নিযুক্ত করে ভারত অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেল। এখানে উপস্থিত এখানকার রাজাদের হত্যা করল, শহর-নগর ধ্বংস করল, মূর্তিঘর—মন্দিরসমূহ বরবাদ করে দিল এবং তাদের ধর্মগ্রন্থ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহামূল্য গ্রন্থাদি জ্বালিয়ে দিল। তার পর এখান থেকে চীন যাত্রা করল।[১]

এ ছাড়া তাতার ও মোগলরা ইরান-ইরাক যুদ্ধে কি ধ্বংসলীলার সৃষ্টি করেছে, নিরীহ মানুষকে হত্যা করে উষ্ণ রক্তের বন্যা প্রবাহিত করেছে, তা ইতিহাস পাঠক মাত্রেরই জানা আছে। তারা এ সব করেছে এই বিশ্বাস নিয়ে যে, এরূপ করার তাদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। কেননা দেশের পর দেশ—জনপদের পর জনপদ দখল করে সর্বত্র নিজেদের প্রভূত্বে পতাকা উড্ডীন করা তাদেরই জন্য শোভন। এজন্য তারা যদি ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ করে তবে তা আর যা-ই হোক, তাদের জন্য কিছুমাত্র দোষের নয়।

উত্তরকালে মানবাধিকারবাদীরা দেশ জয়ের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় অনেক নিয়ম-নীতি রচনা করেছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করার ও তা মেনে চলার মত অবসর বা মনোভাব বোধ হয় কারোরই নেই।

এ কালের মানব রক্তলোলুপ সাম্রাজ্য শক্তিগুলি একদিকে জাতিসংঘ (United Nations) গঠন করে মানবতার দরদ ভারাক্রান্ত ও মানবীয় স্বাধীনতার উন্নতমানের নীতিকথা প্রচার করছে, আর সেই সময়ই তারা নিজেরাই নিরীহ

---

১. تاريخ الكامل لابن الاثير ج ٢، ص: ١٦٠.

মজলুম-নিরস্ত্র-দুর্বল মানুষের উপর স্টীম রোলার চালাচ্ছে, নিষ্পেষিত করে দিচ্ছে মানুষ-পশু-ঘর-বাড়ি-সভ্যতা-সংস্কৃতি কেন্দ্র, বিমানে বোমা নিক্ষেপ করে ভস্ম করে দিচ্ছে শহর-নগর। এদের মধ্যে সামান্য-সাধারণ মানবিকতা তো দূরের কথা, একবিন্দু লজ্জা-শরমও নেই। ওরা শুধু পশুই নয়, পশুর চাইতেও নিকৃষ্ট জীব, হিংস্র সাপদের চাইতেও নির্মম।

কিন্তু ইসলামের যুদ্ধনীতির ন্যায় দেশ-জয়ের নীতি উন্নত মানবিকতা ও যৌক্তিকতায় চির উদ্ভাসিত। হ্যাঁ, ইসলামী রাষ্ট্রও যুদ্ধ করেছে। তদানীন্তন বিশ্বের দুই পরাশক্তি—পারস্য সাম্রাজ্য ও রোমান সাম্রাজ্য দখল করেছে। কিন্তু দুনিয়ার বিজয়ীরা সাধারণত যা করে বলে ইতিহাসে বিধৃত, তার একবিন্দু—একটি কণা পরিমাণ করেছে বলে কেউ দাবি করতে পারে কি?

করেনি বলেই বিভিন্ন অমুসলিম বসতি-জনপদের লোকেরা ইসলামী বাহিনীকে তাদের শহর-নগর দখল করে নেয়ার জন্য আকুল আহবান জানিয়েছে এবং প্রতিষ্ঠিত শক্তির বিরুদ্ধে তার সমধর্মী হওয়া সত্ত্বেও নগর প্রাচীরে দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে ও সাধারণ জনতা ইসলামী বাহিনীর অকল্পনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করেছে এবং বিজয়ী ইসলামী বাহিনী যখন নগরে প্রবেশ করেছে, তখন সেখানকার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সাদর সম্বর্ধনা জানিয়েছে। এ পর্যায়ের অসংখ্য কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। এ পর্যায়ে একটি কথার উল্লেখ-ই যথেষ্ট। নবী করীম (স) এবং খুলাফায়ে রাশেদূন যখন কোন বসতি দখলের উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছেন, তখন অত্যন্ত তাকীদ সহকারে হেদায়েত দিয়েছেন; বেসামরিক জনগণ—বিশেষ করে নারী, বালক-বালিকা, বৃদ্ধ, ধার্মিক—পাদরী পূরোহিত, ধর্মস্থান—মন্দির, গির্জা, ফসলের বৃক্ষ, ক্ষেতে-খামার ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করবে। এর কোন কিছুই ধ্বংস করা যাবে না। জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে শুধু খাদ্যের প্রয়োজন হলে যবেহ করা যাবে, পাইকারীভাবে ও বিনা প্রয়োজনে তা-ও হত্যা করা যাবে না।

এই দীর্ঘ আলোচনার ভিত্তি ও সনদ হিসেবে আমরা কুরআন ও সুন্নাত–রাসূলে করীম (স)-এর কর্মনীতির উল্লেখ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছি। দুনিয়ার যে কোন এলাকার বা যে কোন সময়ের ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য তাই বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণীয় আদর্শ।

আসলে দুনিয়ার যে কোন সময়ের যে কোন স্থানের ইসলামী রাষ্ট্র গোটা মানবতার অভিভাবক। মানবতাকে রক্ষা করা, দাসত্ব-শৃঙ্খল ও দারিদ্র্য লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত করাই তার প্রধান দায়িত্ব। অতীতের যে কোন ইসলামী হুকুমত এই দায়িত্ব পালন করেছে, পালন করবে এ যুগে—আজ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত—কায়েম হওয়া ইসলামী রাষ্ট্রও। বিশ্বমানবতার একমাত্র বন্ধু হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র। তাই ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার জিহাদ করা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য।

গোপন তথ্য সংগ্রহ ও সাধারণ শান্তি-শৃঙ্খলা

[সাধারণ কল্যাণ ও বিশেষ কল্যাণ—সরকারী কর্মচারীদের পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ—শত্রু সৈন্যদের তৎপরতা পর্যবেক্ষণ—বহিরাগতদের তৎপরতা ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ।]

ইসলাম ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও আকীদা-বিশ্বাসের স্বাধীনতার প্রধান উদগাতা। মানুষের ব্যক্তিত্ব ও তার আকীদা বিশ্বাসের প্রতি ইসলামে শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ মানব সমাজের ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত। অনুরূপভাবে মানুষের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও ব্যক্তিগত অবস্থার গোপনীয়তা ইসলামের দৃষ্টিতে দুর্ভেদ্য দুর্গ বিশেষ।

এ কারণে ইসলাম কখনই মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারাদি—আকীদা, চিন্তা ভাবনা ও তৎপরতা বা কার্যকলাপে খোঁজ-খবর লয়ে বেড়ানোর প্রবণতাকে সমর্থন জানায় নি। এ দিকে ইঙ্গিত করেই কুরআন মজীদ স্পষ্ট ভাষায় নিষেধবাণী উচ্চারণ করেছেঃ

وَلَا تَجَسَّسُوا (الحجرات: ١٢)

এবং অপরের গোপনীয় বিষয়াদি খোঁজাখুঁজি করে বেড়িও না।

অনুরূপভাবে কারোর ভিতরকার গোপনীয় বিষয়াদি যদি কেউ জানতেও পারে, তখন তা জনগণের মধ্যে প্রচার করে দেয়া ও সামাজিকভাবে তাকে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত করা ইসলামে অত্যন্ত ঘৃণিত ও নিষিদ্ধ কাজ বলে ঘোষিত। এ পর্যায়ে কুরআনের বাণী হচ্ছেঃ

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (الحجرات: ١٢)

এবং তোমরা একে অপরের গীবত করে বেড়িও না।

এই গীবত কার্যটি অত্যধিক ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য হওয়ার কথা বোঝাবার জন্য। এর পরই দৃষ্টান্তমূলক কথা স্বরূপ বলা হয়েছেঃ

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ـ وَاتَّقُوا اللَّهَ ـ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (الحجرات: ١٢)

তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাই'র গোশত খাওয়া পছন্দ করবে?......তোমরা নিজেরাই তো এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাক।

'লোকদের গোপন দোষ খোঁজ করে বেড়িও না' এবং 'তোমরা পরস্পরের দোষ গেয়ে—প্রচার করে বেড়িও না' দুটি কথা একই আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে।

এ থেকে একটি মৌলনীতি উদঘাটিত হচ্ছে। আর তা হচ্ছে—অন্যদের গোপন তত্ত্ব-রহস্য সংরক্ষণ করা। তা জানতে চেষ্টা করাই হারাম। কুরআনের ভাষায় তা চিরদিনের তরে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।[১]

সাধারণ কল্যাণ ও বিশেষ কল্যাণ

একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায়, এই নিষেধ দুটি ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। সমাজ-সমষ্টির সাথে এর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, সামষ্টিক কল্যাণ এর দ্বারা ব্যাহত হয় না বলেই মনে করা যায়।

কিন্তু না, এ দুটো নিষিদ্ধ কাজই সংক্রামক এবং এর প্রতিক্রিয়া গোটা সমাজকে জর্জরিত করতে পারে। অন্য কথায় নিষিদ্ধ কাজ দুটির দুইটি দিক রয়েছে। একটি ব্যক্তিগত দিক আর অপরটি সামাজিক দিক। কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে তা না হলেও তেমন ক্ষতির আশংকা থাকে না। কিন্তু তা যখন সামষ্টিক রূপ পায়, তখন তা মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়! অথবা বলা যায়, ব্যক্তিগত দোষ-ত্রুটি সন্ধান না করা হলেও তেমন ক্ষতি হয় না, কিন্তু সামষ্টিক ক্ষেত্রে অনেক সময় তা না করাই বরং অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে। তখন সমষ্টির কল্যাণকে ব্যক্তির ক্ষতির উপর অগ্রাধিকার দেয়া ছাড়া কোনই উপায় থাকে না।

ইসলামী শরীয়াত মানুষের ব্যক্তিগত গোপন তথ্য জানতে চেষ্টা করতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছে এবং ব্যক্তিগণের গীবত করাকে সুস্পষ্ট হারাম ঘোষণা করেছে। কিন্তু সামষ্টিক প্রয়োজনে যদি ব্যক্তিগণের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং কারোর অনুপস্থিতিতে তার দোষ-ত্রুটি বলার আবশ্যকতা দেখা দেয়, তখন তা অবশ্যই করতে হবে, তখন ব্যক্তি অধিকারের উপর সামষ্টিক প্রয়োজনকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। সে পর্যায়ে ব্যক্তিগণের দোষ খোঁজ করা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দোষ ত্রুটি জনগণের মধ্যে প্রচার করে দেয়া সমষ্টির স্বার্থ রক্ষার জন্য একান্তই অপরিহার্য কর্তব্য।

বরং ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে সমষ্টির স্বার্থ—তথা অস্তিত্ব রক্ষার্থে ব্যক্তিগণের ব্যক্তিগত জীবনের প্রকৃত অবস্থা জানবার জন্য চেষ্টা করা ও সেই পর্যায়ে ব্যাপক অনুসন্ধান করা ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। কেননা রাষ্ট্র যদি ব্যক্তিগণের সঠিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত না থাকে, তাহলে রাষ্ট্রীয় সংরক্ষণ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হতে পারে না। এমনকি, এরূপ অবস্থা দেখা দেয়াও অসম্ভব নয় যে, ব্যক্তিগণের প্রবণতা, চরিত্র ও কর্মতৎপরতা সম্পর্কে সরকারের অবহিতির অভাবের দরুন রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। কেননা সমাজে এসব

---

১. রাসূলে করীম (স) ও বলেছেনঃ

لا تذموا المسلمين ولا تتبعون عوراتهم ـ

তোমরা মুসলমানদের নিন্দা করো না, তাদের গোপনীয়তা খুঁজো না।

ব্যক্তিদের অস্তিত্ব ও অবস্থান অকল্পনীয় নয়, যারা রাষ্ট্রের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর কার্যকলাপে গোপনভাবে নিয়োজিত রয়েছে। এই লোকদের তৎপরতা যথাসময়ে বন্ধ করা না হলে তা গোটা সমাজে ও রাষ্ট্রকেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারে।

এরূপ অবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্র সরকারের পক্ষে সে দেশের প্রত্যেকটি নাগরিক সম্পর্কে অবহিতি রাখা এবং তার তৎপরতা ও গতিবিধি লক্ষ্য করা যে একান্তই কর্তব্য তাতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। একথা যেমন সাধারণ সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্মত, তেমনি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকেও স্বীকৃতব্য।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, পাশ্চাত্যপন্থী রাষ্ট্র সরকারের নীতিতে জনগণকে হয়রান পেরেশান করার লক্ষ্যে বা পদে পদে তাদেরকে উত্যক্ত করে রাখার উদ্দেশ্যে এ কাজ করা যাবে না। তা করা হলে তা কুরআনের উদ্ধৃত নিষেধের আওতায় পড়বে এবং অত্যন্ত গুনাহের কাজ হবে। বরং সত্যি কথা হচ্ছে, তা করার অধিকার ইসলামী রাষ্ট্রের নেই।

মদীনীয় সমাজের মুনাফিকরা ইসলামের দুশমনদের পক্ষ থেকে নিয়োজিত গোয়েন্দা হিসেবে কার্যরত ছিল। তারা মুসলমানদের যাবতীয় গোপন তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করে সঙ্গোপনে শত্রুদের জানিয়ে দিত! এ পর্যায়ে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّازَادُوْكُمْ اِلَّاخَبَالاً وَّلَا اَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ـ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ـ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ (التوبه: ٤٧)

ওরা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধে গমন করত, তাহলে তোমাদের মধ্যে দোষ-ত্রুটি ছাড়া আর কিছুই বাড়িয়ে দিত না। ওরা তোমাদের মধ্যে ফিত্না সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পূর্ণ শক্তিতে চেষ্টা চালাচ্ছে আর তোমাদের লোকদের অবস্থা এই যে, তাদের কথা বিশেষ উৎকর্ণতা সহকারে শুনতে সচেষ্ট অনেক লোকই তোমাদের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ্ এই জালিমদের খুব ভালো করেই জানেন।

ইসলামী সমাজে মুনাফিকদের চরিত্র ও ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর কার্যকলাপ সম্পর্কে উক্ত আয়াতে কথা বলা হয়েছে। ওরাই কাফির মুশরিক—ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করত। তারা অবস্থান করত মুসলমানদের মধ্যে; কিন্তু কাজ করত শত্রুদের জন্য।

ইসলাম ও মুসলমানদের সামষ্টিক স্বার্থে ও অস্তিত্ব রক্ষার্থে নবী করীম (স) গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছিলেন। ফলে কাফিরদের নিয়োজিত গোয়েন্দাদের ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে ক্ষতিকর তৎপরতা ধরা পড়ে যেতে লাগল। তখন

মুনাফিকরাই এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চিৎকার করে উঠল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের চিৎকার বা আপত্তির জবাবে ইরশাদ করলেনঃ

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ - قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ - وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

(التوبه:٦١)

এদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা নিজেদের কথাবার্তা দ্বারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে-এই ব্যক্তি বড় কান-কথা শুনে। বল, তিনি তো তোমাদেরই ভালোর জন্য এই রূপ করেন। আল্লাহ্র প্রতি তিনি ঈমান রাখেন এবং ঈমানদার লোকদের প্রতি বিশ্বাস রাখেন। তিনি তাদের জন্য রহমত, যারা তোমাদের মধ্যে ঈমানদার। বস্তুত যারা আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট ও জ্বালা দেয়, তাদের জন্য পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে।

অর্থাৎ রাসূলে করীম (স) লোকদের নিকট খবর সংগ্রহ করেন, লোকেরা তাঁকে সর্ববিষয়ে জানায়। তাঁর এই খবর শ্রবণ সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে, সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করার উদ্দেশ্যে, কোন খারাপ উদ্দেশ্যে নয়, অকারণ কারোর প্রতি সন্দেহপ্রবণ হয়েও নয়, কারোর ক্ষতি সাধনও তার লক্ষ্য নয়। আর তাঁকে খবরদাতা লোকেরা যেহেতু ঈমানদার, নিষ্ঠাবান, সেই কারণে তিনি তাদের নিকট থেকে পাওয়া খবরকে সত্য বলে বিশ্বাসও করেন। কাজেই তাঁর এই কাজ মু'মিনদের জন্য রহমত স্বরূপ। আর হে মুনাফিকরা, রাসূল (স) তোমাদের কথা শুনলেও বিশ্বাস করেন না। কেননা তোমাদের প্রকৃত অবস্থা অপ্রকাশ্য ও অজ্ঞাত। উদ্ধৃত আয়াতে আল্লাহ্র বক্তব্য হলোঃ

রাসূলে করীম (স) কাফির শত্রুদের গোপন ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রমের খবরাদি জানতে পারেন। তার মূলে তাঁর উদ্দেশ্য মুসলমানদের সামষ্টিক কল্যাণ। কাফিরদের আকস্মিক ও অতর্কিত আক্রমণ থেকে মুসলিম জনগণকে রক্ষা করাও তাঁরই অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এজন্য মুসলিম জনগণকে সব সময় উৎকর্ণ, সতর্ক, সদা-সচেতন, জাগ্রত ও অবহিত করে রাখার জন্যই সংবাদ সংগ্রহকারী বিশেষ দায়িত্বশীল লোক নিয়োগ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল এবং তিনি তা-ই করেছিলেন।[১]

১. ওহোদ যুদ্ধের পর এক সময় বনূ আসাদ গোত্র মদীনার উপর অতর্কিত আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিয়েছিল। নবী করীম (স)-এর নিয়োগকৃত সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহকারিগণ সঙ্গে সঙ্গেই তাদের এই প্রস্তুতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেছিলেন এবং তিনি আগে ভাগেই একটি শক্তিশালী বাহিনী তাদের মস্তক চূর্ণ করার জন্য হযরত আবু সালমা'র নেতৃত্বে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারা অতর্কিতে তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের হতচকিত করে দিয়েছিলেন। তারা সবকিছু ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল এবং মুসলমানরা বিপুল গনীমতের মাল লাভ করেন। (তাফহীমুল কোরআন, ১২ খন্ড, পৃ-৩-৪)

অতএব ইসলামী রাষ্ট্রকেও অনুরূপ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে সংবাদ সরবরাহকারী একটা সদা তৎপর কার্যকর সংস্থা অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে। এক দিকে সাধারণ নাগরিকদের অভাব-অনটন-প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত হয়ে যথাসময়ে— অবিলম্বে—তা পূরণের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অপর দিকে ইসলামের দুশমনদের গোপন ক্ষতিকর কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিতি লাভ করে তাৎক্ষণিকভাবে তা নস্যাৎ করে দেয়ার এবং মুসলিম জনগণ ও ইসলামী রাষ্ট্রকে তার ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য এরূপ একটি সংস্থা অবশ্যই থাকতে হবে।

সেই সাথে এই সংস্থাকে আরও তিন পর্যায়ের কাজ করতে হবেঃ

১. ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করা, যেন তারা প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব—যা তাদের নিকট আমানত—যথাযথভাবে পালন করতে পারে ও তাতে কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি, অবজ্ঞা-অবহেলা-উপেক্ষা বা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ না ঘটে।

২. শত্রুপক্ষের সেনাবাহিনীর চলাচল ও গতিবিধি লক্ষ্য করা, যেন যথাসময়ে যে-কোন আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করা যায়।

৩. বিদেশী লোকদের গতিবিধি ও তৎপরতা তীক্ষ্ণভাবে নজরে রাখা, যেন তারা শত্রুপক্ষের জন্য কোন গোয়েন্দাগিরি করতে বা দেশের অভ্যন্তরে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে না পারে।

সরকারী কর্মচারীদের পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ (control)

ইসলামী রাষ্ট্রের বাস্তবতামূলক প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের কল্যাণ সাধন এবং পূর্ণ আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা সহকারে আল্লাহ্র আইন-বিধানসমূহ পুরাপুরি কার্যকর করা। তাই এ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত জনগণের ধন-ভান্ডার থেকে নিয়মিত বেতন ভাতা প্রাপ্ত লোকেরা যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে কিনা, সেদিকে অবশ্যই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, ইসলামের বিশেষ চেষ্টা থাকে, সরকারী দায়িত্বপূর্ণ পদে সর্বাধিক যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের নিয়োগ, যেন জনগণ সর্বাধিক উন্নত মানের খেদমত (service) লাভ করতে পারে। ইসলামের এই লক্ষ্য পুরামাত্রায় অর্জিত হচ্ছে কিনা, কর্মচারীবৃন্দ সততা, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা সহকারে দায়িত্ব পালন করছে কিনা, জনগণের সাথে আদর্শিক ও মানবিক আচরণ গ্রহণ করছে কিনা, তা-ও সরকারী কর্তৃপক্ষকে তীক্ষ্ণভাবে দেখতে হবে। অন্যথায় ইসলামী রাষ্ট্র তার আসল লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়ে যাবে। এ কারণে নবী করীম (স) যখনই বাইরে কোথাও কোন বাহিনী প্রেরণ করতেনঃ

يَبْعَثُ مَعَهُ مِنْ ثِقَاتِهِ مَنْ يَتَجَسَّسُ لَهُ خَبَرَهُ ـ

তখন তিনি তার সাথে এমন সব বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য লোক পাঠাতেন যারা বাহিনীর লোকদের খবরাখবর জেনে রাসূলে করীম (স)-কে জানাত।[১]

হযরত আলী (রা) খলীফাতুল মুসলিমীন হিসেবে মালিক আশ্‌তারকে লিখিত পত্রে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন তাঁর নিয়োজিত কর্মচারীদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য লোক নিয়োগ করেন। এ পর্যায়ে তাঁর নির্দেশ ছিলঃ

وابعث العيون من اهل الصدق والوفاء عليهم فان تعاهدك فى السر لا مورهم حدوة لهم على استعمال الا مانه والرفق بالرعية وتحفظ من الاعون فان احد منهم بسط يده الى خيانة اجتمعت بها عليه عندك اخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهدا فبسطت عليه العقوبة فى بدنه واخذته بما اصاب من عمله ثم نصبته بمقام المذلة وسمته بالخيانة قلدته عار التهمة ـ

সরকারী কর্মচারীদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত লোক নিয়োগ কর। তারা যদি গোপনে তাদের ব্যাপারাদি তোমাকে জানাতে থাকে, তাহলে আমানত রক্ষা ও জনগণের প্রতি দয়ার্দ্রতা প্রদর্শনে তারা সতর্ক ও সক্রিয় হবে। এদের সহযোগিতায় তুমিও রক্ষা পাবে। তোমার নিকট যদি এমন খবর পৌঁছায় যে, তারা বিশ্বাসভঙ্গের উদ্যোগ নিচ্ছে, তাহলে তোমার নিযুক্ত খবরদাতা লোকদেরকে সেজন্য সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করবে। পরে তাদের উপর শাস্তি প্রয়োগ করবে এবং তারা কাজের যে ক্ষতি সাধন করেছে, তার পূরণ করতে পারবে। পরে অপরাধীদের লাঞ্ছিত করবে বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে দায়ী করে এবং একটা লজ্জা তাদের গলায় ঝুলিয়ে দেবে।[২]

বস্তুত গোপন উপায়ে জনগণের ও সরকারী কর্মচারীদের বিশেষ অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাওয়া—অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এবং বৈদেশিক ক্ষেত্রে অন্যান্য রাষ্ট্রের গোপন তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করার প্রচলন প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। তবে পূর্বে এ ব্যাপারটি আধুনিক কালের মত খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বর্তমানে তো এটা একটা বৈজ্ঞানিক পর্যায়ে উন্নীত বিষয়। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে তা একটি বিষয়রূপে গণ্য হয়ে রয়েছে।

---

১. الحكومة الاسلامية ص: ٦٠٢

২. نهج البلاغة قسم الكتب الرقم ٥٣

শত্রু সৈন্যদের তৎপরতা পর্যবেক্ষণ

স্বয়ং নবী করীম (স) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গোয়েন্দা ব্যবস্থাকে পুরাপুরি কার্যকর করে তুলেছিলেন —বিশেষ করে শত্রু পক্ষের সেনাবাহিনীর চলাচল ও গতিবিধি সম্পর্কে সঠিক সংবাদ পাওয়ার সুষ্ঠু ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করেছিলেন—এই ব্যবস্থার সাহায্যে যথেষ্ট কল্যাণ লাভ করেছেন। তাঁরা সামরিক বিজয়ে এই বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে, রাসূলে করীম (স)-এর যুদ্ধজয়ের ইতিহাসে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে রয়েছে। রাসূলে করীম (স) নিয়োজিত ব্যক্তিরা গোপনে প্রতিপক্ষের তৎপরতা ও গতিবিধি যা কিছু দেখতে পেত, তার যথাযথ বিবরণ তাঁকে জানিয়ে দিত। ফলে নবী করীম (স) শত্রুর মুকবিলায় আগাম পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন এমন ভাবে যে, শত্রুপক্ষ কিছুই কল্পনা করতে পারত না। তারা তাদের পদক্ষেপের পূর্বেই আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হয়ে যেমন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত, তেমনি ইসলামী বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়ে চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত। কুরআন মজীদের একটি সূরা'র নিম্নোদ্ধৃত শব্দগুলি সেই দিকেই ইঙ্গিত করছে।

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ـ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ـ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا (العديت:١-٣)

শপথ সেই (ঘোড়াগুলির), যা হ্রেষা ধ্বনি করে দৌড়ায়, পরে (নিজেদের ক্ষুর দিয়ে) অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝাড়ে, আর অতি প্রত্যুষকালে আকস্মিক আক্রমণ চালায়।

নবী করীম (স) বলেছেনঃ

اَكْمِنِ النَّهَارَ وَسِرِ الَّيْلَ وَلَا تُفَارِقْكَ الْعَيْنُ ـ

দিনের বেলা লুকিয়ে থাকবে, রাত্রিবেলা চলবে এবং গোয়েন্দা সাহায্য যেন কখনই বিচ্ছিন্ন না হয়।

১. বদর যুদ্ধে নবী করীম (স) সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে মদীনা থেকে বের হয়ে পড়লেন। পথিমধ্যে এক আরব গোত্রপতির বাড়িতে অবস্থান নিলেন। তিনি কুরাইশদের সম্পর্কে খবরাখবর জানবার জন্য চেষ্টা করলেন। তিনি আরব গোত্রপতিকে কুরাইশ এবং মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে চিন্তাভারাক্রান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।[১] জবাবে গোত্র প্রধান বললঃ শুনেছি, মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর সঙ্গীরা অমুক দিন মদীনা থেকে বের হয়ে এসেছেন। এই খবর সত্য হলে আজ তাঁর আমার এই স্থানে উপস্থিত হওয়ার কথা। আর এ-ও খবর পেয়েছি যে, তারাও অমুক দিন মক্কা থেকে বের হয়ে এসেছে। এ খবর সত্য হলে আজ তাদের অমুক স্থানে উপস্থিত হওয়ার

১. বলা বাহুল্য লোকটি রাসূলে করীম (স)-কে চিনতে পারেনি।

কথা—সেটা ঠিক সেই স্থানই ছিল, যেখানে কুরাইশরা সেই দিন অবস্থান নিয়েছিল।

২. 'বদর'-এ উপস্থিত হয়ে নবী করীম (স) চতুর্দিকে লোক পাঠিয়ে দিলেন কুরাইশদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর সংগ্রহের জন্য। তাঁরা দুইজন ক্রীতদাস ধরে নিয়ে এলেন। তাদের নিকট থেকে কুরাইশ বাহিনীর অবস্থান, তার লোকসংখ্যা এবং নেতৃত্বে কারা কারা রয়েছে ইত্যাদি সর্ববিষয়ে আগাম খবর পাওয়া গেল। নবী করীম (স) সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে বললেনঃ

هٰذِهٖ مَكَّةُ قَدْ اَلْقَتْ اِلَيْكُمْ اَفْلاَذَ كَبِدِهَا ـ

এবারে মক্কা তার কলিজার টুকরাগুলিকে তোমাদের সম্মুখে পেশ করে দিয়েছে।[১]

মোটকথা, রাসূলে করীম (স) নিজে বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে শত্রু বাহিনীর মধ্যে ও তাদের এলাকায় গোয়েন্দাগিরির কাজে নিযুক্ত করতেন, তাদের পাঠানো খবরের ভিত্তিতে তিনি যুদ্ধের কৌশল তৈয়ার করতেন এবং শত্রু পক্ষের সব পরিকল্পনাকে ব্যর্থ ও নিষ্ফল করে দিতেন।

রাসূলে করীম (স.) আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ (রা)-কে একটি গোয়েন্দা বাহিনীর নেতা বানিয়ে মক্কায় পাঠালেন। সঙ্গে একখানি মুখ বন্ধ করা পত্র দিয়ে দিলেন। বললেন, দুইদিন দুইরাত্রি পথ চলার পর এই পত্র খুলে পড়বে এবং তাতে যে নির্দেশ লেখা রয়েছে, সেই অনুযায়ী কাজ করবে। দুইদিন পথ চলার পর পত্রখানা খোলা হলে দেখা গেল, তাতে লিখিত রয়েছেঃ

اِذَا نَظَرْتَ فِىْ كِتَابِىْ هٰذَا فَامْضِ حَتّٰى تَنْزِلَ نَخْلَةَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ فَتَرَصَّدْ بِهَا قُرَيْشًا وَتَعْلَمْ لَنَا مِنْ اَخْبَارِهِمْ ـ

আমার এই পত্র পাঠ করার পর কিছু দূর চললেই মক্কা ও তায়েফ-এর মধ্যবর্তী নাখালা নামক স্থানে (অথবা খেজুর বাগানে) উপস্থিত হবে এবং তথায় ঘুপটি মেরে বসে থেকে কুরাইশদের সম্পর্কে খবরাখবর জানবে এবং আমাদের আগাম জানাবে।[২]

খন্দকের যুদ্ধে কুরাইশ এবং ইয়াহুদী ও গাতফান ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নেমেছিল। এই সময় নবী করীম (স) এমন এক কৌশল অবলম্বন করেছিলেন যে, তার ফলে তাদের মধ্যে অনৈক্য ও বিরোধ

১. سيرة ابن هشام ج:١، ص: ٦١٢-٦١٧

২. سيرة ابن هشام ج:١، ص ٦٠٢

বেঁধে যায়। পরে তিনি হুযায়ফাতা ইবনুল-ইয়ামান (রা) কে পাঠিয়ে তাদের ভেতরকার অবস্থা জানবার ব্যবস্থা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, রাসূলে করীম (স) গৃহীত কৌশল এক শত ভাগ সফল হয়েছিল।[১] হুযায়ফাতুল ইয়ামান (রা) কুরাইশদের ইচ্ছা, সংকল্প ও যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পর্কে নবী করীম (স)কে পূর্ণ ও বিস্তারিত খবর দিয়েছিলেন।

ঐতিহাসিকভাবে এই সত্য প্রমাণিত যে, নবী করীম (স) কর্তৃক শত্রুপক্ষ সম্পর্কে আগাম খবর জানার জন্য গৃহীত এই পন্থা ছিল তদানীন্তন আন্তর্জাতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অভিনব। সেকালের কোন রাষ্ট্রনায়ক বা সমর-অধ্যক্ষের পক্ষে এ ধরনের কোন কর্মপন্থা গ্রহণের চিন্তা করাও সম্ভব হয়নি। এ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় আল্লাহ্র এই কথার সত্যতাঃ;

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ـ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (العنكوت: ٦٩)

আর যারাই কেবলমাত্র আমাদের জন্য ও আমাদের দেখিয়ে দেয়া পথে জিহাদ করবে, আমরা অবশ্যই তাদেরকে আমাদের নির্ভুল পথ ও উপায় পন্থাসমূহ জানিয়ে দেব। আর বস্তুতই আল্লাহ্ তো কেবল তাদের সঙ্গেই রয়েছেন যারা ঐকান্তিক নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও আত্মোৎসর্গের ভাবধারাসম্পন্ন।

এই সত্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বলেছেনঃ একজন সদা সচেতন মেধাবী-প্রতিভাসম্পন্ন সূক্ষ্ম খবর সংগ্রহকারী লোক বিশ হাজার যোদ্ধার তুলনায় যুদ্ধের ময়দানে অধিক কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

তাবুক যুদ্ধে রওয়ানার সময় নবী করীম (স) তাঁর লোক মারফত খবর পেয়েছিলেন যে, মদীনারই একটি বাড়িতে কিছু সংখ্যক মুনাফিক একত্রিত হয়ে লোকদিগকে যুদ্ধযাত্রায় বিলম্ব করার জন্য উসকানী দিচ্ছে। তিনি এ খবর পাওয়ার পর হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা)-কে কতিপয় লোক সহ তথায় পাঠিয়ে দিলেন এবং সেই সভা-গৃহকে জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তা-ই করা হয়েছিল।

এ থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায়, নবী করীম (স)-এর বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য লোক মদীনার সর্বত্র নিয়োজিত ছিল যাবতীয় খবরাখবর যথাসময় তাঁর নিকট পৌঁছাবার জন্য। উক্ত ঘটনা তার ফলেই সম্ভব হয়েছিল। ফলে মদীনার ইয়াহুদীরা অত্যন্ত গোপনে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্রই করেছে, তা সব আগাম খবর পেয়ে তিনি ছিন্নভিন্ন ও ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।

---

১. ঐ, ২য় খন্ড, পৃ ২৩২; مغازى الواقدى ص: ٤٨٢

খায়বর যুদ্ধে ইয়াহুদীদের সুরক্ষিত প্রাচীনতর দুর্গজয় করাও নবী করীম (স)-এর পক্ষে এই পন্থার সাহায্যে সহজ ও সম্ভব হয়েছিল।

এই প্রেক্ষিতে চূড়ান্ত কথা হলো, ইসলামী রাষ্ট্রকে সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থাকে অত্যাধুনিক সাজ-সজ্জা সহকারে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

বহিরাগতদের তৎপরতা ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ

ইসলামী রাষ্ট্রের তৃতীয় পর্যায়ের সাধারণ শান্তিরক্ষা ও সংবাদ সংগ্রহমূলক কাজ হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শত্রু পক্ষীয় লোকজনের আগমন, গতিবিধি ও তৎপরতা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সতর্কতার দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা। কেননা দুনিয়ার কোন রাষ্ট্রই দেশের অভ্যন্তরে পঞ্চম বাহিনীর উদ্ভবকে বরদাশত করতে পারে না, পারে না সেইরূপ অবস্থার কোনরূপ সুযোগ করে দিতে। কেননা তা-ই বহু রাষ্ট্র ও সরকারের পতনের কারণ হয়ে দেখা দেয়। স্বয়ং নবী করীম (স)-ও এই নীতি অবলম্বন ও পুরাপুরি কার্যকর করেছিলেন। আর এই উপায়ে তিনি শত্রুদের বহু ষড়যন্ত্র ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম রোধ করতে ও তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

নবী করীম (স)-এর গোটা জীবন ও তৎপরতা প্রমাণ করে যে, তিনি এ উপায়ে বহু শত্রুকে সত্য দ্বীন-ইসলামের নিকট নতি স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলেন। আর এই তৎপরতার লক্ষ্যও ছিল তাই। এর ফলে তিনি বহু রক্তপাত এড়িয়ে যেতেও সক্ষম হয়েছিলেন।

নবী করীম (স) নিজে যেসব যুদ্ধ-জিহাদে অংশ গ্রহণ করতেন কিংবা শত্রুদের মুকাবিলা করার জন্য কোন বাহিনী কোথাও পাঠাতেন, তার মূলে নিহিত উদ্দেশ্য থাকত শত্রুদের ঐক্যবদ্ধতা ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়া। তাদের ঐক্যের কাতারে ব্যাপক ভাঙ্গন ধরানো। কেননা তিনি জানতেন, ইসলামের পথের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয়ে গেলে ইসলামের মর্মস্পর্শী মহাসত্যের বাণী জনগণের হৃদয়-মনকে সহজেই স্পর্শ করবে ও দ্বীন গ্রহণ করতে তাদের আর কোন বিলম্ব হবে না।

বস্তুত কাফির শত্রুরা যখন ঐক্যশক্তি হারিয়ে ফেলে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের উপর বিজয়ী হতে পারার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যায়, মানুষ তখন তার স্বাভাবিক প্রবণতার দিকে প্রত্যাবর্তন করে নির্ভুল পথের সন্ধানে খুব বেশী আগ্রহী ও উদ্যোগী হয়ে পড়ে, ঠিক তখন-ই ইসলাম তাদের দিলে প্রবেশ করতে পারে। পারে তাকে টেনে এনে ইসলামী মুজাহিদদের কাতারে দাঁড় করে দিতে। এ তত্ত্বের সত্যতা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

কেননা বহু সংখ্যক জাতি-গোত্র ও জনগোষ্ঠী ইসলামী শক্তির নিকট পরাজিত হয়ে সত্য পথ প্রাপ্তির দ্বারে উপস্থিত হয়েছে এবং সত্যকে গ্রহণ করে জীবনকে ধন্য করতেও প্রস্তুত হয়ে গেছে।

মক্কা বিজয়ের ঘটনা দ্বারা এ কথা দিনের আলোর মতই স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

নবী করীম (স) জানতেন যে, মক্কা বিজিত হলে শত্রুদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিলে এবং জনগণ শান্ত-নির্ঝঞ্ঝাট পরিমন্ডলে গভীর সূক্ষ্ম অনাসক্ত দৃষ্টিতে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পেলে খুব বেশী দিন অতিবাহিত হওয়ার আগেই তারা তাদের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা দ্বীন-ইসলামের যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে পারবে এবং পরিশেষে কবুল করতেও বিলম্ব হবে না। এ কারণে তিনি মক্কার কুরাইশদের উপর বিজয়ী হবেন—এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন এবং এ সংকল্পও তাঁর ছিল যে. এ বিজয় সার্বিক হতে হবে। এ কাজ সম্ভব হতে পেরেছিল গোটা পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে গোপন থাকার ও কারোরই সে বিষয়ে একটি অক্ষরও জানতে না পারার কারণে। বস্তুত রাসূলে করীম (স)-এর মক্কা আক্রমণের পরিকল্পনা কোন একজন সাহাবীরও জানা ছিল না। কেবলমাত্র হযরত হাতিব ইবনে আবূ বলতায়া (রা) রাসূলে করীম (স)-এর ব্যস্ততা ও উদ্বিগ্নতা দেখে নিজেই আঁচ করেছিলেন এবং এবারের লক্ষ্য মক্কা হতে পারে বলে মনে করেছিলেন। তাঁর পরিবারবর্গ তখনও মক্কায় অবস্থান করছিল। তাদের নিরাপত্তার কোন বিঘ্ন হতে পারে মনে করে মক্কাগামী এক বৃদ্ধার মাধ্যমে কুরাইশ সরদারদের নিকট লিখিত এক পত্রে এ কথা জানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নবী করীম (স) যথাসময় অবহিতি লাভ করেন ও এক বাহিনী পাঠিয়ে সেই চিঠি উদ্ধার করেন। এই প্রেক্ষিতেই কুরআন মজীদের এ আয়াতটি নাযিল হয়ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ - يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ

(الممتحنة: ١)

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু-পৃষ্ঠপোষক বানিয়ো না, ভালোবাসা পোষণ করে তাদেরকে (গোপন কথা) জানিয়ে দাও, অথচ ওরা অমান্য-অস্বীকার করেছে সেই মহাসত্যকে যা তোমাদের নিকট এসেছে। ওরা রাসূলকে এবং বিশেষ করে তোমাদেরকে (মক্কা থেকে) বহিষ্কৃত করেছে শুধু এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের রব্ব্ আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো।

এভাবে রাসূলে করীম (স) নিজ শাসন এলাকায় শত্রুদের পক্ষে কোন গোয়েন্দাগিরি (Spying) করতে দেন নি। যখনই এই পর্যায়ে কোন কাজ হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা জানতে পেরে সমস্ত পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

ইমাম আবূ ইউসুফ লিখেছেনঃ

> ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য যে, মুশরিক দেশে যাওয়ার পথসমূহে সীমান্তবর্তী সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী থাকবে, তারা সেদিকে গমনকারী বা তথা থেকে আগমনকারী ব্যবসায়ীদের তল্লাশী চালাবে। গমনাগমনকারীদের নিকট অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়া গেলে তা কেড়ে নেবে, কারোর নিকট পত্রাদি থাকলে তা পড়ে দেখবে। তাতে মুসলমানদের কোন গোপন ও অপ্রকাশনীয় তত্ত্ব বা তথ্য লিখিত থাকলে তাকে পাকড়াও করবে এবং তাকে সরকারে সোপর্দ করবে তার বিচার করার উদ্দেশ্যে।[১]

ইসলামী রাজ্যের যেসব লোক বিদেশী শক্তির স্বার্থে গোয়েন্দাগিরি করে, ইসলাম তাদের ব্যাপারে কঠোর নীতি অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে। অনুরূপভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক (যিম্মী)রাও যদি বিদেশী শক্তির স্বার্থে ও তার নির্দেশে ইসলামী রাজ্যের অভ্যন্তরে কোন গোয়েন্দাগিরি করে, তাহলে যিম্মীদের নাগরিকত্ব লাভের প্রধান শর্তই ভঙ্গ করা হবে। কেননা যিম্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক হচ্ছেঃ

> তারা মুসলমানদের কোনরূপ কষ্ট দেবে না, মান-সম্মান-আবরু নষ্ট করার মত কোন কাজ—যেমন মুসলিম নারীর সাথে ব্যভিচার, অন্যান্য চরিত্রহীতার কাজ, চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই করে তাদের ধন-মাল হরণ এবং বাইরের মুশরিক-ইসলাম দুশমনদের জন্য গোয়েন্দাগিরি করা ইত্যাদি কাজ করবে না। এর কোন একটি কাজ-ও করলে তাদের নাগরিকত্বের শর্ত চূর্ণ হয়ে যাবে।[২]

যিম্মীদের জন্য এই বাধ্যবাধকতাও রয়েছে যে, তারা দেশের মুসলমানদের কোন গোপন খবর বাইরের শত্রুদের নিকট পৌঁছাবে না, তাদের গোপন প্রস্তুতি ও শক্তি-সামর্থ সম্পর্কেও তাদেরকে অবহিত করবে না। কেউ তা করলে সে তার নাগরিকত্বের শর্ত ভঙ্গ করেছে বলে ধরে নিতে হবে। তখন তার রক্ত হালাল। অতঃপর তার ব্যাপারে আল্লাহ্, রাসূল ও মু'মিনদের কোন দায়িত্ব (যিম্মাদারী) থাকলো না।[৩]

কাযী আবূ ইউসুফ লিখেছেনঃ

---

১. كتاب الخارج لابى يوسف طبعه القاهرة ١٠٢ الخ

২. شرائع الاسلام كتاب الجهاد ص: ٣٢٩

৩. تذكرة للفقهاء ج:١ ص:٤٤٢

আপনি গোয়েন্দা কর্মে লিপ্ত লোকদের ফয়সালা জানতে চেয়েছেন, যাদেরকে পাকড়াও করা হবে। তারা হয় যিম্মী হবে, না হয় যুদ্ধকারী শত্রুপক্ষের লোক হবে অথবা মুসলমান হবে।

তারা যদি সামরিক প্রতিপক্ষের লোক হয় কিংবা হয় যিম্মী—যারা জিযিয়া দেয়, তারা ইয়াহুদী, খৃস্টান ও অগ্নিপূজারী যা-ই হোক, তাদের হত্যা করতে হবে, আর যদি মুসলমানদের কেউ হয়—ইসলাম পালনে সুপরিচিত, তাহলে তাকে কঠিন যন্ত্রণার দণ্ডে দণ্ডিত করতে হবে এবং দীর্ঘমেয়াদী আটকে বন্দী করতে হবে—যেন শেষ পর্যন্ত সে তওবা করতে পারে।[১]

বস্তুত বিদেশী শক্তির পক্ষে ইসলামের রাজ্যে গোয়েন্দাগিরি করা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মারাত্মক দণ্ডনীয় অপরাধরূপে গণ্য। এ বিষয়ে ইসলামে মৌল নীতিই দেয়া হয়েছে, বিস্তারিত ও খুটিনাটি আইন দেয়া হয়নি। কেননা গোয়েন্দাগিরির কোন স্থায়ী একটি মাত্র রূপ বা ধরন নেই। তা নিত্য নতুন রূপে সংঘটিত হতে পারে। তাই ইসলামের মৌলনীতির ভিত্তিতে বিস্তারিত আইন-বিধি রচনা করার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের উপর অর্পিত। রাসূলে করীম (স) এজন্য খবর সংগ্রহকারী লোক নিয়োগ করেছেন এবং তাদের দেয়া সংবাদের ভিত্তিতে তিনি যুদ্ধ কৌশল রচনা করেছেন, তা ঐতিহাসিকভাবেই প্রমাণিত।

ইয়াফে নামক মদীনার এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন হযরত জায়দ ইবনে আরকম। তাঁকে মদীনার মুনাফিকদের উপর দৃষ্টি রাখার জন্য দায়িত্বশীল নিযুক্ত করা হয়েছিল। বনু মুস্তালিক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে প্রধান মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই গোপনভাবেই বলেছিলঃ 'মদীনায় পৌঁছার পর আমাদের মধ্যকার অধিক সম্মানিত ব্যক্তি অধিক হীন ব্যক্তিকে বহিষ্কার করবে'। হযরত জায়দ তা শুনতে পেয়ে উপস্থিতভাবে তাকে যা বলার তা তো বললেনই, সঙ্গে সঙ্গে তা নবী করীম (স)-কে জানিয়ে দিলেন।[২]

ইসলামী রাষ্ট্রকে এজন্য লোকদেরকে বিশেষ শিক্ষা প্রশিক্ষণে তৈরী করতে ও সংশ্লিষ্ট কাজে বিশেষ দক্ষ, সাহসী ও সুকৌশলী বানাতে হবে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এর উপর যেমন ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভরশীল, অনুরূপভাবে মুসলিম জনগণের ইসলামী জীবন যাপন ও ইসলামী আইন-বিধানের পূর্ণ কার্যকরতাও এরই উপর নির্ভর করে। তাই এই বিভাগটিই ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য একান্তই অপরিহার্য।

---

১. كتاب الخراج ص:٢٠٥-٢٠٦

২. مجمع البيان ج:٥ ص:٢٩٤

ইসলামী রাষ্ট্রের সামরিক বিভাগ

[সামরিক শক্তি মুসলিম উম্মতের সংরক্ষক, দ্বীন ও জাতির খিদমতে সেনাবাহিনী।]

সামরিক শক্তি মুসলিম উম্মতের সংরক্ষক

প্রত্যেক স্বাধীন জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব তার প্রতিরক্ষা শক্তির উপর নির্ভরশীল। যে-জনগোষ্ঠী শত্রুর মুকাবিলা করতে ও শত্রুর আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে যত বেশী সক্ষম ও শক্তিশালী, তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সংরক্ষণ তত বেশী নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য। পক্ষান্তরে সেই শক্তির দুর্বলতা প্রতিরক্ষা কজের দুর্বলতা এবং তার অস্তিত্বের উপর একটা প্রচণ্ড হুমকি বিশেষ। এই দৃষ্টিতেই প্রত্যেকটি স্বাধীন জনগোষ্ঠীর জন্য সুদক্ষ সু-সাহসী সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনীয়। জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব শত্রুদের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করা ও স্বাধীনভাবে নিশ্চিন্তে জীবন যাপনের জন্য জনগণকে নিশ্চয়তা দানই সেই জাতির সামরিক বাহিনীর একমাত্র কাজ। জনগণের ও দেশের স্বাধীনতার পাহারাদার হচ্ছে এই সামরিক বাহিনী। পাহারাদারীর উদ্দেশ্যেই তাদেরকে নিযুক্ত ও প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত করা হয়ে থাকে।

অবশ্য একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের সামরিক বাহিনীর কার্যকলাপ ইদানিং প্রচণ্ড সমালোচনার সম্মুখীন। দুনিয়ার দেশসমূহের সামরিক বাহিনীর দুই ধরনের ভূমিকা অত্যন্ত স্পষ্ট। অনুন্নত দেশসমূহে সামরিক বাহিনীকে শত্রু দেশের মুকাবিলায় তৎপরতা গ্রহণের পরিবর্তে নিজেদের দেশটিকেই বারবার দখল করে। জনগণের সরকার সামরিক শক্তির বলে উৎখাত করে নিজেরাই ক্ষতাসীন হয়ে বসে। অন্য কথায় জাতির স্বাধীনতার পাহারাদারীর পরিবর্তে নিজেরাই দেশের মালিক ও হর্তাকর্তা হয়ে বসে ও নিজ দেশের জনগণকে নিজেদের গোলাম বানিয়ে নেয়। রক্ষকের ভূমিকা ত্যাগ করে ভক্ষকের ভূমিকা পালন করে, জনগণের বেতনভুক্ত 'কর্মচারী' হওয়া অবস্থায়ই জনগণের 'প্রভু' 'মালিক' ও 'মনিব' হয়ে বসে। তখন সেই দেশের জনগণ একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও নিকৃষ্টতম 'পরাধীন' জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়।

পক্ষান্তরে উন্নত দেশসমূহের সামরিক বাহিনীকে দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা, সাম্রাজ্যের সীমা সম্প্রসারণ ও বিভিন্ন পার্শ্ববর্তী স্বাধীন ক্ষুদ্র দুর্বল জাতিসমূহকে

অধীন ও গোলাম বানানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। এই সময় তারা তাদের দেশের সাম্রাজ্য লোভী সরকারের হাতিয়ার হয়ে বিভিন্ন দেশে সামরিক সর্বধ্বংসী অভিযান চালায়। নিরীহ জনগণের রক্তের বন্যায় শহর-নগর-গ্রাম ভাসিয়ে দেয়। এ পর্যায়ে দুনিয়ায় কত যে রক্তপাত হয়েছে, কত যে শহর-নগর-জনপদ ধ্বংস হয়েছে আর কত কোটি কোটি নির্দোষ মানুষের জীবনের চির অবসান ঘটেছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই।

কিন্তু ইসলাম সামরিক বাহিনীর উক্ত দ্বিবিধ ভূমিকার কোন একটিকেও সমর্থন করে না। বরং এর প্রতিবাদে ইসলাম সদা সর্বদা সোচ্চার।

সামরিক বাহিনীর প্রথম প্রকারের পদক্ষেপ—নিজ দেশের জনগণ নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে তার হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার ব্যাপারটি ইসলামের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট বিশ্বাসঘাতকতার শামিল, ক্ষমতা লোভের নগ্ন নির্লজ্জ প্রকাশ এবং স্বাধীন জনগণকে পরাধীনতা বা দাসত্ব-শৃঙ্খলে বন্দী করা পর্যায়েরই কাজ। এ ধরনের কাজকে কুরআন মজীদে কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে।

কুরআন মজীদে এ পর্যায়ের বহু সংখ্যক আয়াত রয়েছে। একটি আয়াতে বলা হয়েছেঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ـ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (القصص: ٨٣)

পরকালের এই ঘর—জান্নাত—আমরা কেবল সেই লোকদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেব, যারা দুনিয়ায় স্বীয় বড়ত্ব ও উচ্চত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব চায় না, চায় না প্রশান্ত পরিবেশকে বিপর্যস্ত করতে। এই সব থেকে যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে দূরে থাকবে, পরকালীন কল্যাণ—জান্নাত—কেবল তাদের জন্যই হবে।

আয়াতের 'বড়ত্ব' উচ্চত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব—কর্তৃত্ব চায় ও দখল করে তারা, যাদেরকে জনগণ তা দেয়নি। জনগণ যাদেরকে তা দিয়েছে, তাদেরকে সেখান থেকে হটিয়ে দিয়ে যারা বল প্রয়োগে সেই স্থান দখল করে নেয়, আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাত পাওয়ার অধিকারী বানাবেন না।

সামরিক বাহিনীর লোক একটি দেশের প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত। এ কাজ দেশের জনগণের একটা গুরুত্বপূর্ণ খেদমতের কাজ সন্দেহ নেই। এদিক দিয়ে তারা দেশের খাদেম। আর যেহেতু জাতীয় ধন-ভাণ্ডার থেকে তারা মর্যাদা উপযোগী বেতন ভাতা পেয়ে থাকে, এ কারণে তারা জাতির বেতনভুক কর্মচারী। তারা যদি এ দায়িত্ব পালন না করে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা দখল করে বসে,

তাহলে তারা নিঃসন্দেহে নিজেদের 'বড়ত্ব', উচ্চত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব চাইল। আয়াতে তাদেরকে জান্নাতের উপযোগী লোক নয় বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অপর দিকে দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সেনাবাহিনী স্বাধীন জাতিসমূহকে গোলাম বানাবার হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হয় বলে সারা দুনিয়ায় তাদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা বিরাজ করছে।

দ্বীন ও জাতির খেদমতে সেনাবাহিনী

কিন্তু ইসলামী হুকুমতের সেনাবাহিনী উপরোক্ত দুই ধরনের সেনাদের মত হবে না। কেননা এ উভয় ধরনের সেনারাই মূলত অন্যায় প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা, জনগণের স্বাধীন মর্যাদা ও মানবিক মৌলিক অধিকার হরণ ও জনগণের ধন-সম্পদ লুণ্ঠনের হাতিয়ার হয়ে থাকে। তারা খুব সহজেই স্বৈরতান্ত্রিক শাসকের ক্রীড়নকে পরিণত হয়। তারা যেমন ব্যক্তি বিশেষের নিরংকুশ কর্তৃত্বের সংরক্ষক হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি নিজ জাতি স্বার্থের পরিবর্তে বৈদেশিক শক্তিগুলির স্বার্থ রক্ষার বাহন হয়ে থাকে।

ইসলামী রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী প্রকৃতই দেশ, জাতি ও জাতীয় আদর্শের খাদেম। তারা জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার কাজে সদাসর্বদা আত্মনিয়োগ করে থাকে। মুলত তারা দ্বীনের মুজাহিদ।

ইসলামের উদয়লগ্নে এই ব্যাপারটির গুরুত্ব যথাযথভাবে অনুভূত হয়েছিল। দ্বীন-ইসলাম এসেই ছিল মানুষকে গোলামী ও জাহিলিয়াতের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে, অন্ধকার থেকে আলোকোদ্ভাসিত পরিমণ্ডলে জীবন যাপনের নিশ্চিত-নির্বিঘ্ন সুযোগ দানের জন্য। গোলামীর জিঞ্জির ছিন্ন করে মানুষকে আযাদী দান করার জন্য। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিপরীত শক্তির সাথে তার সংঘর্ষ অনিবার্য। বিশেষ করে যারা ইসলামের পথ রোধ করতে চায়, ইসলাম তাদের দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হবে না, প্রতিরোধকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সম্মুখের দিকে এগিয়ে যাবে।

ইসলামের প্রাথমিক কালের এবং তার পরবর্তী সময়ের ইসলামী জীবন-ধারা লক্ষ্য করলেই নিঃসেন্দহে বুঝতে পারা যায়, মুসলমানদের সামরিক তৎপরতা অনন্য ও একক ধরনের। ইসলামের শিক্ষাকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করলেও এক দৃষ্টান্তহীন সামরিক ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া যাবে। বস্তুত কুরআন তো অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় সামরিক বিষয়াদি নিয়ে কথা বলেছে এবং বিভিন্ন দিক ও দিগন্ত উন্মোচিত করেছে, যার কোন দৃষ্টান্ত অতীতে পাওয়া যায় না।

কুরআনের কতিপয় আয়াতে তীর নিক্ষেপণ ও অশ্বারোহণ ও অস্ত্র পরিচালনের শিক্ষা লাভ ও দান এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে সামরিক চর্চা ও তৎপরতায় লিপ্ত থাকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে দক্ষতা অর্জন প্রত্যেকটি মু'মিনের কর্তব্য বলে ঘোষিত হয়েছে। কয়েকটি আয়াত এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (المائده: ٣٥)

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য সন্ধান কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর। আশা করা যায়, তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে।

ঈমানের দাবি আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া, তাক্‌ওয়ার দাবি আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের সন্ধান করা আর এই নৈকট্য লাভর উপায় হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ (বা যুদ্ধ) করা।

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (التوبه: ٤١)

তোমরা বেরিয়ে পড়—চলতে শুরু করে দাও, হালকাভাবে (ছোট ছোট বাহিনী নিয়ে) কিংবা ভারী অস্ত্র-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে (বিরাট বাহিনী নিয়ে) এবং আল্লাহ্‌র পথে তোমরা জিহাদ কর তোমাদের জান ও মাল দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য প্রভূত কল্যাণের উৎস, যদি তোমরা জানো।

অর্থাৎ সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়তে হবে। এছাড়া কল্যাণ লাভের কোন বিকল্প উপায় নেই।

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ـ هُوَ اجْتَبٰكُمْ (الحج: ٧٨)

এবং আল্লাহ্‌কে লক্ষ্য রূপে নির্দিষ্ট করে তোমরা জিহাদ কর যেমন জিহাদ সেজন্য করা বাঞ্ছনীয়। সেই আল্লাহ্-ই তোমাদেরকে (আল্লাহ্‌র জন্য জিহাদ করার লক্ষ্যে) বাছাই করেছেন।

জিহাদের এই নির্দেশসমূহ পালন শুরু হয় আদর্শ প্রচার থেকে এবং শেষ হয় সশস্ত্র যুদ্ধ করে ইসলামের বিজয় সাধনে। আর দুনিয়ায় ইসলাম এসেছেই তো বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য। কিন্তু তা ইসলামের দুশমন শক্তির সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ করা ছাড়া সম্পন্ন হতে পারে না। বাতিল ও কাফির শক্তিকে পর্যুদস্ত ও পরাজিত করে রাষ্ট্রক্ষমতা ইসলামের হাতে তুলে দেয়া এবং বাস্তবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করাই এ জিহাদ ও যুদ্ধের একমাত্র লক্ষ্য।

এ জিহাদের নির্দেশ সর্বপ্রথম এসেছিল রাসূলে করীম (স) এবং তাঁর সাহাবায়ে-কিরামের প্রতি। রাসূলে করীম (স) এবং সাহাবায়ে-কিরাম এ নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছেন, কিন্তু এ নির্দেশ তো ঈমানদার ব্যক্তিমাত্রের প্রতি। দুনিয়ায় যদ্দিন ঈমানদার লোকের অস্তিত্ব আছে, তদ্দিন কুরআন আছে। আর যদ্দিন কুরআন আছে, তদ্দিন চির নতুন হয়ে আছে জিহাদ ও যুদ্ধের এ নির্দেশ, আর জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ্র ঘোষণা হলোঃ

وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا (النساء: ٩٥)

নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা লোকদের তুলনায় কার্যত জিহাদকারীদের মর্যাদা অনেক বেশী করে দিয়েছেন।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ইসলামে জিহাদ কোন পেশা—জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে গ্রহণীয় নয়। জিহাদ হচ্ছে প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির ঈমানী দায়িত্ব—ঈমানের ঐকান্তিক দাবি। যারা এ জিহাদ করবে না, জিহাদ থেকে বিমুখ হয়ে থাকবে, তাদের ঈমান গ্রহণযোগ্য নয় গ্রহণযোগ্য নয় আল্লাহ্র নিকট, গ্রহণযোগ্য নয় মু'মিন সমাজের নিকট।

ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের সমগ্র মুসলমানই হচ্ছে সেই রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী। তারা যেমন সৈন্য নয়, তেমনি নয় 'ভাড়াটে সৈন্য"! বর্তমান কালে দুনিয়ার প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্রেই একটা সুসংগঠিত সেনাবাহিনী রয়েছে। তারা দিন-রাত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণে ব্যস্ত থাকে আর তাদের জন্য বরাদ্দ থাকে জাতীয় বাজেটের শতকরা আশি ভাগ। এমনি একটি পেশাদার সৈন্যবাহিনী—যাদের একমাত্র কাজ যুদ্ধ করা—ইসলামের দৃষ্টিতে সাধারণভাবে কাম্য নয়। তবে এ যুগের চাহিদা প্রাচীন কাল থেকে যে ভিন্নতর, তাতে সন্দেহ নেই। তাই একদিকে ঈমানদার জনগণকে যোদ্ধা বানানো, অপরদিকে সামরিক ব্যাপারাদি লয়ে দিন-রাত চিন্তা-ভাবনা করা, নতুন নতুন সমর-কৌশল উদ্ভাবন ও সাধারণ লোকদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাদান এবং অস্ত্র চালানোয় অভ্যস্তকরণের জন্য বিশেষ লোক অবশ্যই নিয়োজিত করতে হবে।

মোটকথা, ইসলামে সামরিক কার্যক্রমের উদ্দেশ্য দেশ দখল নয়, জাতির পর জাতিকে জয় করে গোলাম বানানো নয়। এক কথায় বলতে গেলে ইসলাম ও মুসলমানের প্রতিরক্ষাই হচ্ছে সামরিক তৎপরতার একমাত্র লক্ষ্য।

এই লক্ষ্যকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা চলেঃ

১. ইসলামী দেশ ও রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা এবং বৈদেশিক আক্রমণকারী ও শত্রুদের হামলা থেকে মুসলিম উম্মতকে রক্ষা করা।

২. পরাধীন দুর্বল-অক্ষম (المستضعفين)-দের স্বৈর শাসনের নিপীড়ন থেকে মুক্ত করা, গোলাম জনতাকে স্বাধীন করা, যেন তারা নিজেদের পছন্দানুযায়ী যে কোন জীবন-বিধান বা ধর্ম গ্রহণ করে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করবার সুযোগ পায়।

প্রথম প্রকারের সামরিক তৎপরতা পর্যায়ে কুরআন মজীদে আহ্বান হচ্ছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا - وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

(ال عمران: ٢٠٠)

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য অবলম্বন কর, বাতিল পন্থীদের মুকাবিলায় দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা প্রদর্শন কর—শক্ত ও দৃঢ় হয়ে দাঁড়াও, সীমান্ত রক্ষার কাজে সর্বদা প্রস্তুত ও সদা সতর্ক-উৎকর্ণ থাক এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আশা করা যায়, তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।

আয়াতটির তাৎপর্য নানা দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু ইমাম কুরতুবীর মতে সহীহ তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ্‌র পথে নিরবচ্ছিন্নভাবে আত্মনিয়োগ করে থাকা। আসল অর্থ যুদ্ধের অশ্ব সব সময় প্রস্তুত করে রাখা। ইসলামে বা ইসলামী রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করার যে কোন ছিদ্রপথে সার্বক্ষণিক পাহারাদারী করা।[১]

আর رابطوا অর্থ, তোমরা লেগে থাক সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণে, সীমান্ত চৌকির পাহারাদারিতে। আল্লামা বাগদাদী লিখেছেনঃ مرابطة এর মূল কথা হলো এদিকের লোকেরা নিজেদের ঘোড়া ও ওদিকের লোক নিজেদের ঘোড়া এমনভাবে বাঁধবে, যেন উভয় পক্ষ যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেছে। পরে এই অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি সীমান্তে অবস্থান গ্রহণ করে দেশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করে সর্বক্ষণ সতর্ক হয়ে, সে-ই مرابط — তার নিকট কোন যানবাহন থাক আর না-ই থাক।

তিনি আরও লিখেছেনঃ مرابطت দুই প্রকারের। এক প্রকার হচ্ছে, ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তে কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার লক্ষ্যে পাহারাদারী করা। আমরা এখানে এই অর্থকেই সামনে রাখছি।

গোটা আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার কাজে সদা সর্বদা সতর্ক হয়ে প্রস্তুত থাকা, এজন্য পরম ধৈর্য ধারণ করা এবং অন্যদেরকেও ধৈর্য ধারণে প্রস্তুত করা। এটা সাধারণভাবে সকল মু'মিনেরই কর্তব্য। বিশেষভাবে মুসলমানদের সামরিক তৎপরতার এটা একটা বিশেষ দিগন্ত।

১. الجامع لاحكام القرآن ج ٤ ص: ٣٢٣

আর দ্বিতীয় পর্যায়ের সামরিক তৎপরতা চালাবার জন্য কুরআন মজীদে বিশেষ ভঙ্গীতে আহ্বান জানানো হয়েছে। মজলুম—অধীন মানুষকে মুক্ত করার লক্ষ্যে যুদ্ধ করা তো ঈমানদার লোকদের উপর আল্লাহ্ অর্পিত কঠিন দায়িত্ব। তাই আল্লাহ্ প্রশ্ন তুলেছেনঃ

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا - وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (النساء: ٧٥)

তোমাদের কি হয়েছে, আল্লাহ্র পথে তোমরা যুদ্ধ করছ না কেন? অথচ অবস্থা এই যে, দুর্বল-অক্ষম-অধীন-অসহায় পুরুষ-নারী-শিশুরা ফরিয়াদ করছে এই বলে যে, হে আমাদের রব্ব! তুমি আমাদেরকে এই জালিমদের শাসনাধীন জনপদ থেকে মুক্তি দান কর, আমাদের জন্য তোমার নিকট থেকে একজন পৃষ্ঠপোষক—বন্ধু (মুক্তিদাতা) বানিয়ে দাও, বানিয়ে দাও একজন সাহায্যকারী।

পরাধীন মানুষ যে কি চরম কঠিন দুরবস্থার মধ্যে—অমানুষিক নির্যাতন-নিষ্পেষণ সয়ে-সয়ে তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যেতে বাধ্য হয় তা আল্লাহ্র নিজের অংকিত এ চিত্র থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

আয়াতটি এক দিকে যেমন এই রূপ অবস্থায় নিপতিত জনগোষ্ঠীর মর্মান্তিক অবস্থা তুলে ধরছে, তাদের উক্ত রূপ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তাদের নিজেদেরই সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা চালানো উচিত এবং তাদের এই মুক্তি সংগ্রামে বিশ্বমানবের সাহায্য চাওয়া উচিত বলে জানিয়ে দিচ্ছে, তেমনি দুনিয়ার মানুষের—বিশেষ করে ঈমানদার লোকদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা এবং জালিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে সেখানকার মজলুম-বঞ্চিত মানুষগুলিকে মুক্ত ও স্বাধীন করে দেয়া ঈমানের ঐকান্তিক দাবি বলে ঘোষণা করছে। এরূপ অবস্থা দেখেও তাদের মুক্তির জন্য যুদ্ধ না করা আল্লাহ্র নিকট চরম অনভিপ্রেত—তা আয়াতের বলার ভঙ্গী থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ইসলামী মুজাহিদরা যখন তদানীন্তন পারস্যের উপর আক্রমণ করেছিলেন, তখন পারসিক নেতা রুস্তম তাঁদের এই আক্রমণের কারণ বা লক্ষ্য এবং তাঁদের ধর্মমত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে জবাবে মুসলিম বাহিনীর মুখপাত্র বললেনঃ

هُوَ دِينُ الْحَقِّ وَعَمُودُهُ الَّذِي لَا يَصْلُحُ اِلَّا بِهِ فَشَهَادَةُ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ...... اِخْرَاجُ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ اِلٰى عِبَادَةِ اللّٰهِ وَالنَّاسُ بَنُوْا اٰدَمَ وَحَوَّاءَ اِخْوَةٌ لِاَبٍ وَاُمٍّ۔

আমাদের দ্বীন বা ধর্ম হচ্ছে পরম সত্য দ্বীন। তার মৌল ভাবধারা শুধু তারই জন্য শোভনীয় ও সঙ্গতিসম্পন্ন। তা হচ্ছেঃ আল্লাহ্ ছাড়া কেউ ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল—এর সাক্ষ্য দান....... আর আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ আল্লাহ্‌র বান্দাগণকে তাদের মত বান্দাদের নিকৃষ্ট গোলামী থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহ্‌র বান্দা বানিয়ে দেয়া, একমাত্র আল্লাহ্‌র বান্দা হয়ে জীবন যাপনের সুযোগ করে দেয়া।

ইসলামে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উৎস

[আনফাল—যাকাত—এক পঞ্চমাংশ—ফিতরার যাকাত—খারাজ ও ফসলের ভাগ—জিজিয়া— অন্যান্য—ব্যতিক্রমধর্মী– আয়।]

প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্যই অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনা একান্তই প্রয়োজন। বর্তমান গ্রন্থের পূর্ববর্তী বিস্তারিত আলোচনায় ইসলামী রাষ্ট্রের বহুবিধ দায়িত্বের কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে দায়িত্বসমূহ যথাযথ পালনের জন্য বিপুল পরিমাণের অর্থ-সম্পদ রাষ্ট্রের নিকট মওজুদ একান্তই আবশ্যক। তাই এ পর্যায়ে দুটি প্রশ্নঃ

ইসলামী হুকুমত তার বিরাট দায়িত্ব পালন ও বিস্তৃত কার্যসূচীর বাস্তবায়নে যে অর্থ সম্পদের প্রয়োজন তা কোত্থেকে এবং কেমন করে পূরণ করা হবে? আর এই প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পদ সংগ্রহের দায়িত্ব কে বহন করবে?

অন্য কথায়, ইসলামী রাষ্ট্র অর্থ-সম্পদের কোন্ সব উৎসের উপর নির্ভরশীল? এক-পঞ্চমাংশ مقانم যাকাত ও খারাজ প্রভৃতি প্রচলিত করসমূহের দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব হবে কি? কিংবা এছাড়াও আরও কোন কোন আমদানি উৎস আছে কি, যা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন পূরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে? এ পর্যায়ে একটি কথা সাধারণভাবে বলা হয় যে, আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ মদ্য উৎপাদন, মদ্য আমদানি-রপ্তানি, জুয়া, সূদী কারবার, বেশ্যাবৃত্তি, প্রমোদ কর ইত্যাদি বাবদ সাধারণত যে বিপুল পরিমাণ অর্থ আয় করে থাকে, তা ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, সে সবের দুয়ার চিরতরে বন্ধ। ফলে ইসলামী রাষ্ট্র বর্তমান যুগের আমদানির একটা বিরাট অংশ বা খাত থেকেই বঞ্চিত থেকে যাবে। তাহলে শুধু যাকাত ও এক-পঞ্চমাংশ আয় দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্র তার বিরাট অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে পারবে কি?[১]

আমরা বলব—না, ইসলামী রাষ্ট্র শুধু যাকাত ও এক-পঞ্চমাংশ আয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকবে না। এ দুটি শুধু একদিকের প্রয়োজন পূরণের জন্য বিধিবদ্ধ হয়েছে। এ দুটি ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের আরও আয়ের উৎস ও সূত্র রয়েছে। এখানে সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা যাচ্ছেঃ

---

১. আধুনিক রাষ্ট্রকে সাধারণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, বেসরকারী প্রশাসন, বিচার বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, সড়ক ও নির্মাণ কার্যক্রম এবং সাধারণ স্বাস্থ্য প্রভৃতি খাতে বিরাট ব্যয়ভারের সম্মুখীন হতে হয় এবং তা রীতিমত বহন করতে হয়।

আনফাল'—ফাই, গনীমত

ইসলামী রাষ্ট্র যেসব জমি-জায়দা যুদ্ধ ছাড়াই দখল করবে, রাষ্ট্রের পতিত জমি, পর্বতশৃঙ্গ, উপত্যকা-গর্ভ, বন-জঙ্গল এবং খনি, আর উত্তরাধিকারহীন ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ-সম্পত্তি, সরকারী অনুমোদন ব্যতীত যুদ্ধ করে শত্রু পক্ষের নিকট থেকে যোদ্ধারা যা পাবে, দেশের সমস্ত পানিরাশি, স্বতঃউদ্ভুত উদ্ভিদ-বৃক্ষলতা, মালিকবিহীন চারণভূমি, রাজা-বাদশা প্রদত্ত জমি ইত্যাদি।

এই সব কিছুর মালিকানা রাষ্ট্রের। কেননা আসলে এসব সর্বসাধারণ জনগণের হলেও সেই জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র সরকারের ব্যবস্থাধীন থাকবে। সরকার এ সবের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যা আয় করবে, তা জনগণের কল্যাণেই ব্যয় করবে। এ পর্যায়ে দলীল হচ্ছে কুরআনের আয়াতঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ - قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ - فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (الانفال:١)

তোমাকে লোকেরা গনীমতের মাল (এর ব্যয় খাত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি তাদের জানিয়ে দাও—এই গনীমতের মাল তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের। অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুষ্ঠু ও ঠিক রূপে গড়ে তোল। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মেনে চল—যদি তোমরা প্রকৃতই মু'মিন হয়ে থাক।

আর যেসব ধন-সম্পদ আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট, তা মুসলিম জনগণের সার্বিক কল্যাণে ব্যয় হবে। কুরআন মজীদে এ পর্যায়ে বলা হয়েছেঃ

وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ - وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (الحشر : ٦)

আর যে ধন-মাল আল্লাহ্ অন্য লোকদের দখল থেকে বের করে এনে তাঁর রাসূলকে ফিরিয়ে দিলেন, তা এমন নয় যার জন্য তোমরা ঘোড়া ও উট দৌড়িয়েছ। বরং আল্লাহ্ তাঁর রাসূলগণকে যে জিনিসেরই উপর ইচ্ছা কর্তৃত্ব ও আধিপত্য দান করেন। আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপরই ক্ষমতাবান।

অন্য কথায়, মুজাহিদদের প্রত্যক্ষ যুদ্ধ করা ছাড়াই যেসব ধন-মাল ইসলামী রাষ্ট্রের মালিকানায় আসবে, যা পাওয়া যাবে কোন জনগোষ্ঠীর সাথে সন্ধি করার ফলে অথবা পরাজয় বরণ করে অধীন হয়ে থাকতে বাধ্য হয়ে যে জিযিয়া ইসলামী রাষ্ট্রকে দেবে, এছাড়া ধ্বংসাবশেষ, পরিত্যাক্ত, অনাবাদী মালিকবিহীন জমি-জায়গা, ঘর-বাড়ি, কল-কারখানা ইত্যাদি ও উপত্যকা-গর্ভ সম্পদ—এ

সবই রাসূলের—আর তাঁর অবর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তৃত্ব ও ব্যবস্থাপনাধীন থাকবে। সে তা সবই পরিকল্পিতভাবে জনসাধারণের জন্য ব্যয় করবে।

বলা বাহুল্য, এসব থেকে ইসলামী রাষ্ট্র বিরাট নগদ সম্পদ লাভ করতে পারবে—এককালীণ কিংবা মাসে বছরে, অথবা মৌসুম অনুযায়ী।

এ পর্যায়ে একটি মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্তমান মুসলিম দুনিয়া সারা বিশ্বের তুলনায় শতকরা ৬৬ ভাগেরও বেশী কাঁচা তৈল উৎপাদন করে। যে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য এই খাতে আয় নেহায়েত কম নয়।

যাকাত

যাবতীয় গৃহ পালিত পশু—গরু, উট, ছাগল, মহিষ, নগদ অর্থ, স্বর্ণ-রৌপ্য ও ফসলাদি থেকে তা পাওয়া যাবে।

এক পঞ্চমাংশ

সাতটি জিনিসের এক-পঞ্চমাংশ ইসলামী রাষ্ট্রের হাতে আসবেঃ

১. যুদ্ধরত শত্রুপক্ষের নিকট থেকে শক্তি প্রয়োগের ফলে যাই হস্তগত হবে;

২. স্বর্ণ, সীসা, পিতল, তামা, লোহা, মূল্যবান পাথরসমূহ, সালফার, তৈল, আলকাত্‌রা, পীচ, লবণ, কাঁচ, সেঁকোবিষ (ইত্রণভধন্ত্র) সুরমা, দস্তা প্রভৃতি। জমির তলদেশ থেকে প্রাপ্ত খনিজ পদার্থ মৌলিকভাবে 'আন্‌ফাল' হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদ। কিন্তু সরকার তা পুঁজি করে আটকে রাখতে পারে না কিংবা কাউকে তা বিনামূল্যে দিয়ে দিতে পারে না। তা উত্তোলনের সময় যথাযথভাবে ওজন করে তার বিন্দু বিন্দুর হিসেব সংরক্ষণ করতে হবে! কেননা উদ্ধৃত আয়াত অনুযায়ী ব্যবস্থাপনার দিক দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রই রাসূলের স্থলাভিষিক্ত। আর এই ঘরের যাবতীয় আমদানি জনগণের কল্যাণেই ব্যয় হবে;

৩. মাটির তলায় জমা রাখা সম্পদ (كنز);

৪. সমুদ্র থেকে লব্ধ সম্পদ;

৫. যে সব হালাল সম্পদ হারাম সম্পদের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে আছে এমন ভাবে যে, তা আলাদা করা সম্ভব হয় না;

৬. যিম্মীরা মুসলমানদের নিকট থেকে যে জমি ক্রয় করেছে, তা কৃষি জমি হোক, কি বসবাসের জমি; এবং

৭. ব্যবসায়, শিল্পোৎপাদন ও উপার্জনের মুনাফা এবং উপার্জনকারীর সাম্বাৎসরিক ব্যয় বহনের পর যা অতিরিক্ত ও উদ্বৃত থাকবে। সকল প্রকারের পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থাই এর অন্তর্ভুক্ত। এর ভিত্তি হচ্ছে এ আয়াতঃ

وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ - إِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ (الانفال: ٤١)

আর তোমরা জেনে রাখো, তোমরা যে গনীমতের মাল লাভ করেছ, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্, তাঁর রাসূল, নিকটাত্মীয়গণ, ইয়াতীম, মিস্কনি ও নিঃস্ব পথিকদের জন্য নির্দিষ্ট–যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনে থাক।

এই পর্যায়ের সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ খুব সামান্য পরিমাণের হবে না। বরং তার পরিমাণ হবে বিরাট।

'গনীমত' শব্দের আসল আভিধানিক অর্থ এমন জিনিস লাভ, যার মালিক কেউ নেই। পরে মুশরিকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত জিনিসকে গনীমত বলা শুরু হয়। যে সব মাল-সম্পদ কোনরূপ শ্রম বা কষ্ট স্বীকার ছাড়াই লাভ হয় তাও গনীমত। আরবরা সেই সব মালকেই 'গনীমত' বলত, যা-ই মানুষ লাভ করে। যুদ্ধ ছাড়া লাভ করা হলেও তা গনীমত নামেই অভিহিত।

কুরআন মজীদেও এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ ভিন্নতর। যেমনঃ

تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ (النساء: ٩٤)

তোমরা চাও দুনিয়ার সম্পদ পেতে, অথচ আল্লাহ্র নিকট রয়েছে বিপুল গনীমতের সম্পদ।

আয়াতের مغانم শব্দটি عرض الحيوة الدنيا এর বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত। কাজেই মানুষ এ দুনিয়ায় যেসব সম্পদই লাভ করে, গনীমত বলতে কেবল তা-ই বোঝায়। যুদ্ধে লব্ধ ধন-মালই কেবল 'গনীমত' নয়, বরং মানুষ যা কিছুই উপার্জন করে–তা বস্তু হোক, কি অ-বস্তু–তা সবই এর মধ্যে গণ্য।

হাদীসে 'গনীমত' বলা হয়েছে মানুষ যে ফায়দাই লাভ করুক, তাকে। যাকাত সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا -

হে আল্লাহ্! তুমি এই যাকাত গনীমত বানাও, জরিমানা বানিও না।[১]

---

১. سنن ابن ماجة كتاب الزكاة

غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ الْجَنَّةُ .

যিকর-এর মজলিসসমূহের লব্ধ সম্পদ হচ্ছে জান্নাত।[১]

'রামযান' মাসের প্রশংসায় রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

هُوَ غَنَمٌ لِلْمُؤْمِنِ .

তা মু'মিনের জন্য গনীমত।[২]

রাসূলে করীম (স)-এর বিভিন্ন ভাষণেও এই গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ দেয়ার উল্লেখ রয়েছে।

১. আবদুল কাইস গোত্রের লোকেরা রাসূলে করীম (স)-এর নিকট ইসলাম কবুলের পর বলল, আমরা কেবল মাত্র হারাম মাসেই আপনার সাথে সাক্ষাৎ করবার সুযোগ পাব। কাজেই আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বলুন, যা আমরা অনুসরণ করব ও অন্যান্য লোককে পালনের আহ্বান জানাব। তখন নবী করীম (স) বললেনঃ

أُمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ أُمُرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ؟ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامُ الصَّلَوٰةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَوٰةِ وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ .

আমি তোমাদেরকে চারটি কাজের আদেশ করছি ও চারটি কাজের নিষেধ করছি। আদেশ করছি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান গ্রহণের জন্য! তোমরা কি জান, ঈমান কি? তা হচ্ছে 'আল্লাহ্ ছাড়া কেউ মাবুদ নেই' বলে সাক্ষ্য দান, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া এবং এজন্য যে, তোমরা গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ দেবে।[৩]

এ কথা স্পষ্ট যে, এই হাদীসটিতে যে 'গনীমত' কথাটি রয়েছে, তা নিশ্চয়ই যুদ্ধে কাফিরদের নিকট থেকে পাওয়া মাল-সম্পদ নয়। কেননা আবদুল কাইস গোত্রের তখনকার অবস্থায় কারোর সাথে যুদ্ধ করার কোন প্রশ্নই উঠে না। তাই এখানে 'গনীমত' শব্দের আসল আভিধানিক অর্থ গ্রহণই শ্রেয়। আর তা হচ্ছেঃ

هُوَ مَا يَفُوزُونَ بِهِ بِلَا مَشَقَّةٍ .

'গনীমত' হচ্ছে সেই মাল-সম্পদ যা কোনরূপ শ্রম বা কষ্ট স্বীকার ব্যতীত অর্জিত হয়।

---

১. এবং ২. مسند احمد ص: ٢٣٠

৩. صحيح البخارى ج: ٤، ص: ٢٠٥، صحيح مسلم ج:١ ص:٣٥ سنن لنسـاء ج: ٢ ص: ٢٣٣

مسند احمد ج: ٢ ص: ٢١٨

২. হযরত আমর ইবনে হাজম (রা)-কে ইয়ামন প্রেরণকালে রাসূল (স) যে লিখিত দলীল দিয়েছিলেন, তাতেও এই গনীমত শব্দের উল্লেখ হয়েছেঃ

مَرَهُ لِتَقْوَى اللّٰهِ فِى اَمْرِهِ كُلِّهِ وَاَنْ يَاخُذَ مِنَ الْمَغَانِمِ خُمُسَ اللّٰهِ.

তাদের আদেশ করবে সর্ব ব্যাপারে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বনের জন্য এবং গনীমত থেকে আল্লাহ্‌র এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করবে।[১]

ফিত্‌রার যাকাত

একে যাকাতুল-আবদাল বা 'দেহের যাকাত'-ও বলা হয়। ঈদুল ফিত্‌রের দিন ঈদের নামাযের পূর্বেই প্রত্যেক পরিবারের মাথাপিছু ফিত্‌রার যাকাত দিতে হয়।

খারাজ ও ফসলের ভাগ

মুসলমানরা যুদ্ধ করে যে জমি দখল করে, সেই জমি চাষ করে যারা ফসল ফলায়, তাদেরকে এই দুটি কর দিতে হয়। কেননা এই জমি সর্বসাধারণ মুসলিমের মালিকানা সম্পত্তি। অতএব সেই জমির আয় জনগণের কল্যাণেই ব্যয় হতে হবে। অবশ্য চাষকারীরা তা থেকে নির্দিষ্ট অংশ নিয়ে নেবে।

আর খারাজ হচ্ছে জমির উপর ধার্যকৃত নগদ দেয় কর। যেমন প্রতি একরে জমি ভোগ-দখলকারী ব্যক্তি দশ দীনার বা অনুরূপ পরিমাণের অর্থ সরকারে দিয়ে দেবে প্রতি বছর।

আর জমির ফসলের ভাগ মূলত জমির উৎপাদনে অংশীদারিত্ব। তা অমুসলিমদের হাতে থাকলে খারাজ দিতে হবে, আর মুসলমানদের মালিকানাধীন জমির ফসলের এক দশমাংশ বা তার অর্ধের বায়তুলমালে জমা করতে হবে।

জিযিয়া

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম যিম্মীদের নিকট থেকে এই কর আদায় করা হয় তাদের পূর্ণ নিরাপত্তার দায়িত্ব ইসলামী সরকার গ্রহণ করে বলে।

অন্যান্য

এ ছাড়া আরও বহু প্রকারের কর ধার্য হতে পারে। যার পরিমাণ শরীয়াতে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি, তার জন্য বিশেষ কোন সময়কালও নির্দিষ্ট নেই। ইসলামী রাষ্ট্র সরকারই তা প্রয়োজনানুপাতে ধার্য করবে।

---

১. سوير لحوالك فى شرح مؤطا مالك ج:١ ص:٢٧٠

ব্যতিক্রমধর্মী আয়

উপরে ইসলামী রাষ্ট্রের কতিপয় মৌলিক অর্থনৈতিক উৎসের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ কয়টিই একমাত্র চূড়ান্ত উৎস নয়। এ কয়টি ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের আরও বিভিন্ন আয়ের উৎস রয়েছে। এ সব সূত্র ও উৎস থেকে যা কিছু আয় হবে তাও সর্বসাধারণ মুসলিমের সার্বিক কল্যাণে ব্যয় করা হবে। তবে সেগুলি বাধ্যতামূলক নয়। এই পর্যায়ে কতিপয় আয়ের সূত্রের উল্লেখ করা যাচ্ছেঃ

(ক) আল-মাযালিমঃ ব্যক্তির বাড়াবাড়িমূলক কিংবা কর্তব্যে অবহেলামূলক কার্যকলাপে অথবা অন্য লোকের ধন-সম্পদ বিনষ্টকরণের দরুন—যা তার মালিক জানে না, তার ক্ষতি পূরণের সাথে সংশ্লিষ্ট। যার উপর জুলুম করা হলো, তার জন্য ব্যয় করার লক্ষ্যে সেই ব্যক্তির নিকট থেকে আদায় করা হবে। এই সব ক্ষেত্রে সরকার হস্তক্ষেপ করবে এবং যা কিছু জরিমানা ইত্যাদি বাবদ আদায় করা হবে তা নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করা হবে।

(খ) কয়েক প্রকারের কাফ্ফারাঃ যেমন ইচ্ছামূলক হত্যা বা ভুলবশত হত্যা, মানত রক্ষা না করার, ওয়াদা খেলাফী করা, কিরা-কসম ভঙ্গ করা—যা খাদ্য খাওয়ানো ও কাপড় পরানোর সাথে সংশ্লিষ্ট,—প্রভৃতি ক্ষেত্রে আদায় করা হবে। সরকার এ সব ক্ষেত্রে কাফ্ফারা দেবার জন্য দায়ী ব্যক্তির সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

(গ) লুকতাঃ পড়ে পাওয়া মাল-সম্পদ, হারিয়ে যাওয়া ধন-মাল যার মালিক বহু খুঁজেও পাওয়া যায়নি। সরকার সে মালের ধারক হবে শরীয়াত আরোপিত শর্তানুযায়ী।

(ঘ) ওয়াকফ্, অসীয়ত, সাধারণ মানত আর মিনায় হাজীদের দেয়া কুরবানীসহঃ ইসলামী হুকুমাত এসব ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবে এবং জনগণের কল্যাণে ব্যয় করবে।

উপরে উল্লিখিত আয়ের উৎসসমূহ নিয়েই সরকার ক্ষান্ত থাকবে না। সরকার নিজেই বহু শিল্প-কারখানা, ব্যবসা, বাণিজ্য, মুদ্রা প্রচলন, বীমা, কৃষি ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব, অর্থনৈতিক শক্তির বৃদ্ধি, পানি সাপ্লাই ব্যবস্থামূলক প্রতিষ্ঠান, স্থল জল ও আকাশ পথের যানবাহন ব্যবস্থা, জলকর, ডাক-ব্যবস্থা, টেলিফোন, টেলিগ্রাম ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমেও বিপুল আয় সরকারের হস্তগত হবে। বৈদেশিক বাণিজ্য—আমদানি ও রফতানি শুল্কও একটা বিরাট উৎস হিসেবে গণ্য।

এ প্রেক্ষিতে মনে করা যায়, ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের পরিমাণ তার ব্যয় বাজেটের চাহিদা পূরণে যথেষ্ট হবে। কাজেই উপরে উল্লিখিত উৎসসমূহকে সীমিত ও নগণ্য মনে করা কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। বরং এ সব উৎস ও সূত্র থেকে লব্ধ সম্পদ রাষ্ট্র সরকারকে তার সার্বজনীন কল্যাণ সাধনের কার্যসূচী সফল করার জন্য যথেষ্ট হবে। বলা যায়, শুধু যাকাত যদি রীতিমত পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব-নিকেশ ও কড়াকড়ি করে আদায় করা হয়, তাহলে জনগণের সাধারণ দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন অনায়াসেই দূর হয়ে যাবে। জনগণের মধ্যে সাধারণ সচ্ছলতা দেখা দেবে। এ কথা জোর দিয়েই বলা যায়। ধনীরা যদি তাদের উপর ফরযরূপে যাকাত নিয়মিতভাবে ও সঠিক হিসেব করে দিয়ে দেয়, তাহলে দেশে দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের নাম-চিহ্নও কোথাও থাকবে না। যাকাত আল্লাহ্ ফরযই করেছেন সর্বকালের সকল সমাজের সাধারণ দারিদ্র্য দূর করার প্রধান ও কার্যকর মাধ্যম হিসেবে। যাকাতের হিসেব ও দেয় পরিমাণ শরীয়াত কর্তৃক যাই নির্ধারিত হয়েছে, তাই জনগণের দারিদ্র্য দূরকরণ ও সাধারণ সচ্ছলতা বিধানে এতই কার্যকর, যার কোন তুলনা দুনিয়ার অর্থ ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তাছাড়া ইসলামী রাষ্ট্র নির্দিষ্ট কতিপয় আয়ের উৎসের উপর এমনভাবে একান্ত নির্ভরশীলও নয় যে, এ কয়টি উৎস থেকে যা আয় হবে, তাই হবে তার একমাত্র ধন। বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্র আল্লাহ্র বিধানভিত্তিক এক ক্ষমতাবান রাষ্ট্র। সাধারণ আয়ের উৎস থেকে লব্ধ সম্পদ তার দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট না হলে প্রয়োজন পরিমাণ আরও অধিক আয়ের জন্য নতুন নতুন পথ ও পন্থা গ্রহণ করার পূর্ণ ইখতিয়ার তার রয়েছে এবং তদ্দ্বারা তার সার্বিক কল্যাণমূলক বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্য উপায় গ্রহণ করতে পারবে।

এক কথায় বলা যায়, ইসলামী রাষ্ট্র আল্লাহ্র জমীনে আল্লাহ্র খিলাফত প্রতিষ্ঠাকারী রাষ্ট্র। আর আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্বলোকের একমাত্র স্রষ্টা। এখানকার শক্তি ও সম্পদের নিরংকুশ মালিক। দুনিয়ার সব কিছুই তিনি মানুষের সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত করে রেখেছেন। এ থেকে ব্যক্তি যেমন তার প্রয়োজন পূরণের অধিকারী ব্যক্তিগত দখল (Possession)-এর মাধ্যমে নিরংকুশ মালিকানা অধিকার ছাড়াই, তেমনি রাষ্ট্র ও তার কল্যাণমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পূর্ণ অধিকারী ও দায়িত্বশীল। ব্যক্তিদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে এই রাষ্ট্র ও সরকার গঠিত, পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত, তেমনি রাষ্ট্র আল্লাহ্ অনুমোদন প্রাপ্ত ও জনগণের সার্বিক সমর্থনে প্রতিষ্ঠিত বলে শরীয়াতের সীমার মধ্যে থেকে শরীয়াতেরই দাবি পূরণের যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকারী। তা যেমন

রাজতান্ত্রিক বা স্বৈরতান্ত্রিক কিংবা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র বা সরকার নয়, তেমনি নয় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে গড়ে না-উঠা ও না-চলা রাষ্ট্র।

অতএব এই রাষ্ট্র মানুষের মর্যাদা ও অধিকার সংরক্ষণের জন্য পুরা মাত্রায় দায়িত্বশীল। এই রাষ্ট্রই সক্ষম মানুষের বৈষয়িক ও পরকালীন—বস্তুগত ও নৈতিক—দৈহিক ও মানসিক যাবতীয় চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করতে

মানবতার সার্বিক কল্যাণ কেবলমাত্র এই রাষ্ট্রের উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল। এরূপ রাষ্ট্রই মজলুম, বঞ্চিত মানবতার একমাত্র আশা ভরসার শেষ লক্ষ্যস্থল।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ